প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কাব্য-নিদর্শন। শুধু প্রাচীনতম বলিয়া নয়, নানা কারণে এই কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যবান্। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা প্রাচীন এবং সেই কারণেই আধুনিক পাঠকের নিকট দুরূহ। অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "অনেকদিন হইল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে [১৯১৬]। কিন্তু নানা কারণে সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি (পরীক্ষোত্তিতীর্ষুদের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়) কাব্যটির প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। এই অবহেলা একেবারে নির্হেতু নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রবেশে বাধা আছে। বানান অপ্রচলিত, ভাষা কিছু দুর্বোধ। তবে আনুনাসিকের খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ ধ্বনির কণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের ঝোপঝাড় ডিঙ্গাইয়া একবার যিনি এই কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ করিবেন তিনি ঠকিবেন না।" শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রচারস্বল্পতার দিকটি আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৪২ প্রথম সংখ্যা) তিনি লিখিয়াছেন, "বড়ু চণ্ডীদাসের পদের প্রচার হয় নাই। কৃষ্ণকীর্তন পড়িবার পাঠক অল্প। আমার বোধ হয়, কৃষ্ণকীর্তন হইতে পদ বাছিয়া ভাষা যথাসম্ভব 'চণ্ডীদাসী' করিয়া 'চণ্ডীদাসের শতপদ' নামে পৃথক পুস্তক প্রকাশ করিলে সাধারণ পাঠকেও অল্প টীকার সাহায্যে রসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মোট পদের সংখ্যা চারিশত আঠারো। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগটি হইল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নির্বাচিত পদের একটি সংকলন। সংকলিত পদের সংখ্যা একশত নয়, দুইশত। বড়ু চণ্ডীদাসের পদের ভাষাকে ভাঙ্গিয়া 'চণ্ডীদাসী' করিবার চেষ্টা করি নাই। তবে আশা করিতেছি, যে উদ্দেশ্যে বিদ্যানিধি মহাশয় ভাষা সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বাংলা অনুবাদের সাহায্যে ভাষার উপর হস্তক্ষেপ না করিয়াও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরা পুঁথির ভাষা ও বানান সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছি। কোথাও পাঠ অশুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলে পদের মধ্যে তাহা সংশোধন করা হয় নাই। সর্বত্রই মূল পাঠ অনুসৃত হইয়াছে এবং অনুমিত অশুদ্ধ পাঠের স্থলে পাদটীকায় প্রস্তাবিত শুদ্ধ পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে।

বর্তমান সংকলনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ড বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের অন্তর্গত সকল পদ গৃহীত হইয়াছে। দানখণ্ড হইতে বাছিয়া কুড়িটি পদ এবং অবশিষ্ট প্রত্যেকটি খণ্ড হইতে অনধিক দশটি করিয়া পদ নির্বাচন করা হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদনকালে মূল কাহিনীর ধারাটি যাহাতে অবিচ্ছিন্ন থাকে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি।

আধুনিক বাংলা ভাষায় চর্যাগীতির অনেক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পদের অনুবাদের চেষ্টা সর্বপ্রথম।

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

এই গ্রন্থের তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগ কাব্য-আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগ পদ ও পদের অনুবাদ এবং তৃতীয় ভাগ ভাষাতাত্ত্বিক টীকাটিপ্পনী ও পৌরাণিক প্রসঙ্গ পরিচিতি। কাব্য-আলোচনা অংশটি উনিশটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই অংশে বিভিন্ন দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটির বিশিষ্টতা ও মূল্যনিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে সেটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল। এই প্রসঙ্গে তিনি সম্পাদককে লিখিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দতত্ত্বের গুরুত্ব তার ভাষাতত্ত্বের গুরুত্বের চেয়ে কম নয়। এ বিষয়ে গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল করার—কিন্তু এখন নয়। তোমার প্রেরণায় এখনই হল।" বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ইতিহাসে এই প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান অধ্যায়রূপে বিবেচিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রচনাটির জন্য অধ্যাপক সেন মহাশয়কে প্রণতি সহ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে সর্বদা উপদেশ নির্দেশ দিয়াছেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., ডি. ফিল মহাশয়। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম. এ., পি. আর. এস্., পি. এইচ. ডি মহাশয়ের নিকট আমার আলোচনার কিছু অংশ দেখাইবার সুযোগ পাইয়া উৎসাহিত হইয়াছি। কতকগুলি সংস্কৃতশ্লোকের অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন অধ্যাপক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম. এ., পি. আর. এস্ মহাশয়। অধ্যাপক ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় এম. এ., ডি. ফিল ও ডক্টর শ্রীসুশীল রায় এম. এ., ডি ফিল. মহাশয়ের নিকট হইতে নানাভাবে সহায়তা পাইয়াছি। তথ্যসংগ্রহে সহযোগিতা করিয়াছেন শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী এম. এ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের গ্রন্থাগার হইতে তথাকার কর্মিবৃন্দের সহায়তায় বহু গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ব্যবহারের সুযোগ পাইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল পুঁথির ফটোস্টাট কপি ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিবিভাগ। বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুঁথির তিনটি ব্লক ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকটেই আমি কৃতজ্ঞ।

কাব্য-আলোচনা ও গ্রন্থ-সম্পাদনে হয়তো কিছু অপূর্ণতা থাকিয়া গেল, সেজন্য সম্পাদক ক্ষমাপ্রার্থী।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৬৬।

বিনীত
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণমালা

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

কাব্য-আলোচনা ও পাঠ-বিচার ১৭—১৭০

দ্বিতীয় ভাগ

পদ ও পদের অনুবাদ ১৭৩—৩৭৮

চিত্রসূচী

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

প্রাচীন সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ কথা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পূর্ববর্তী পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্যের নানাস্থানে রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ ও উভয়ের লীলাকাহিনীর বিবরণ রহিয়াছে। প্রথমে পুরাণগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ কি ভাবে হইয়াছে দেখা যাইতে পারে।

কৃষ্ণলীলার বর্ণনায় বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে ভাগবত উল্লেখযোগ্য। ভাগবতের মধ্যে কৃষ্ণলীলার বিস্তৃত বিবরণ থাকিলেও কৃষ্ণের প্রিয়তমা গোপীর নাম যে রাধা, এ কথা স্পষ্টভাবে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাসলীলার বর্ণনায় আছে রাসমণ্ডল হইতে কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীগণকে অন্তরালে রাখিয়া তাঁহার প্রিয়তম গোপীর সঙ্গে নিভৃতে বিবিধভাবে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল অপর গোপীসকল কৃষ্ণের সন্ধান করিতে গিয়া বৃন্দাবনের এক প্রান্তদেশে কৃষ্ণের পদচিহ্ন ও সেই সঙ্গে একটি ব্রজবধূর পদচিহ্নও দেখিতে পাইল। এই দেখিয়া কৃষ্ণের প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে তাহাদের উক্তি :

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

অনুবাদ : ভগবান ঈশ্বর হরি নিশ্চয় এই নারী কর্তৃক আরাধিত হইয়াছেন, যাহার জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতচিত্তে ইহাকে এই নিভৃত প্রদেশে লইয়া আসিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভাগবতে রাধার নাম স্পষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত শ্লোকটির অন্তর্গত 'অনয়ারাধিতঃ' কথাটি বিশেষ লক্ষণীয়। এই কথাটির 'অনয়া আরাধিতঃ' পাঠও গ্রহণ করা যাইতে পারে। সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিয়াছেন, "অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ ন ত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকরণঞ্চ দর্শিতং।" অর্থাৎ তিনি 'অনয়ারাধিতঃ' কথাটির মধ্যেই রাধা নামের সন্ধান পাইয়াছেন। পরবর্তী কালে কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

ভাগবতের ন্যায় খিল-হরিবংশেও গোপীগণসহ কৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা আছে। ভাগবতে স্পষ্টভাবে রাধা নামের উল্লেখ না থাকিলেও গোপীগণের মধ্যে কৃষ্ণের প্রিয়তমা একজন প্রধানা গোপীর উল্লেখ আছে এবং সনাতন গোস্বামীর মতে কৌশলে তাহার নাম ব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু খিল-হরিবংশে রাধার নাম নাই এবং সেখানে কৃষ্ণের প্রিয়তমা কোনো প্রধানা গোপীরও উল্লেখ নাই।

ভাগবতের সম্পূর্ণ অনুসরণে বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা আছে। ভাগবতে যেখানে বলা হইয়াছে 'অনয়ারাধিতঃ' এখানে সেইস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে 'বিষ্ণুরভ্যর্চিতো'। বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্গত শ্লোক :

অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্য জন্মানি সর্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চিতো যয়া॥

যে রমণীকর্তৃক অন্যজন্মে সর্বাত্মা বিষ্ণু অভ্যর্চিত হইয়াছিলেন, এইস্থলে উপবেশন করিয়া সেই রমণী কোনো পুষ্পের দ্বারা সেই কৃষ্ণকর্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছেন।

পদ্মপুরাণের নানাস্থানে রাধানামের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার একস্থানে বর্ণনা আছে, একদিন নারদ বৃন্দাবনের মধ্যে বালক কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া সহজেই তাঁহাকে ভগবানের অবতার রূপে কল্পনা করিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন লক্ষ্মীও অবশ্যই কোনো গোপঘরে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহার পর তিনি খোঁজ করিয়া দেখিলেন ভানু নামক এক গোপবর্ষের গৃহে একটি সুন্দরী সুলক্ষণা কন্যা। নারদ বুঝিলেন ইনিই লক্ষ্মীর অবতার কৃষ্ণবল্লভা।

পদ্মপুরাণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছু সংশয় আছে। ইহার অন্তর্গত কোন্ কাহিনী প্রাচীন এবং কোন্ অংশটি পরবর্তী কালের সংযোজন—তাহা প্রশ্নের বিষয়। উপরে উদ্ধৃত নারদের কাহিনীটি যদি মূল হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে রাধার যে জন্মকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা কিছু পরিমাণে পদ্মপুরাণের অনুসৃত। পদ্মপুরাণের রচনাকাল আনুমানিক ষষ্ঠ শতক হইতে অষ্টম শতকের মধ্যে। এই সময়ে বৈষ্ণবধর্মমতে রাধার বিশেষ প্রসার ও প্রসিদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায় না। তাই একথা মোটামুটি ভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, পদ্মপুরাণের অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনীগুলি পরবর্তী কালের সংযোজন।

মৎস্যপুরাণের একটি শ্লোকার্ধে রাধার নাম পাওয়া যায় : রুক্মিণী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। অর্থাৎ দ্বারাবতীতে রুক্মিণী আর বৃন্দাবনের বনে রাধা।

বায়ুপুরাণের অন্তর্গত একটি শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ :

রাধা-বিলাস-রসিকং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্।
শ্রুতবানস্মি বেদেভ্যঃ যতস্তদ্‌গোচরোঽভবৎ॥

রাধাবিলাসরসিক পরমপুরুষ কৃষ্ণের নাম বেদ হইতে শুনিয়াছি, বেদের মধ্য হইতেই ইহার কথা জানা গিয়াছে।

বরাহপুরাণের অন্তর্গত শ্লোক :

তত্র রাধা সমাশ্লিষ্য কৃষ্ণমক্লিষ্টকারণম্।
স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ॥

অক্লিষ্ট-কারণ (উৎপত্তিরহিত) কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রাধা অদূরে নিজ নামে পরিচিত কুণ্ডকে তীর্থরূপে পরিণত করিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাহিনী বেশ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কাহিনীর দিক হইতে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অভিনবত্ব হইল, এখানে রাধাকে কৃষ্ণের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। এই পুরাণমতে রাধা হইলেন কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা। রাধা কৃষ্ণের বিবাহ ছাড়াও উভয়কে কেন্দ্র করিয়া বহু কাহিনী এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে বর্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অন্তর্গত যে সকল কাহিনী পাই, তাহার কতখানি প্রামাণিক এবং কতটা পরবর্তী কালের যোজনা—তাহা লইয়া সংশয় আছে।

এতক্ষণ বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ কোথায় কোথায় রহিয়াছে দেখা গেল, এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পূর্ববর্তী সাহিত্যে তাহার সন্ধান করা যাইতে পারে।

প্রাচীন সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণকে প্রথম একত্র দেখিতে পাই হালের প্রাকৃত গানের সংকলন গাথা-সপ্তশতীতে। এই গ্রন্থ কবে সংকলিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে ইহা যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্ববর্তী সে কথা কেহ অস্বীকার করেন নাই। এই সংকলন গ্রন্থে কৃষ্ণের ব্রজলীলা সম্বন্ধীয় কয়েকটি পদ আছে, তাহার একটিতে রাধাকৃষ্ণকে একত্র মধুরভাবে পাওয়া যায় :

মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএঁ অবণেন্তো।
এতাণঁ বলবীণং অণ্ণাণঁ বি গোরঅং হরসি॥

হে কৃষ্ণ, মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার চক্ষু হইতে ধূলি অপনীত করিয়া তুমি তোমার পুরোবর্তিনী অন্যান্য বল্লবীগণের গৌরব হরণ করিতেছ।

অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী কবি ভট্টনারায়ণের বেণী-সংহার নাটকের নান্দী শ্লোকটি এই :

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তৎপাদপ্রতিমানিবেশিতপদস্যোদ্ভূতরোমোদ্গতে-
রক্ষুণ্ণো-ঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥

এই শ্লোকে কালিন্দী-পুলিনে রাসকালে কেলিকুপিতা অশ্রুকলুষা রাধা ও তাহার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের অনুনয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক দুইটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে :

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ॥

বৃন্দাবন হইতে আগত সখার প্রতি প্রবাসী কৃষ্ণের উক্তি, 'হে ভদ্র, সেই গোপবধূগণের বিলাস-সুহৃৎ এবং রাধার গোপন সাক্ষী কালিন্দীতীরবর্তী লতাগৃহগুলির কুশল ত? স্মরশয্যা কল্পনবিধির জন্য ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় মনে হয়, এখন সেই পল্লবগুলি শুকাইয়া জীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে।' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনূদিত)

ধ্বন্যালোক অলঙ্কার গ্রন্থে উদ্ধৃত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রাচীন আর একটি শ্লোক :

যাতে দ্বারবতীং পুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুললতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
উদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদ্গলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভি র্জলচরৈরুৎকণ্ঠমাকূজিতম্ ॥

মধুরিপু কৃষ্ণ দ্বারবতী চলিয়া গেলে তাঁহারই বস্ত্র দেহে জড়াইয়া এবং কালিন্দী-তটকুঞ্জের বঞ্জুল লতাগুলিকে জড়াইয়া ধরিযা সোৎকণ্ঠা রাধা এমন গুরুবাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বিগলিত তারস্বরে গান গাহিয়াছিল যে তাহাতে যমুনাবক্ষের জলচরগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া কূজন আরম্ভ করিয়াছিল। (শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনূদিত)

এই পদটি আলঙ্কারিক কুন্তকের (১০ম—১১শ শতাব্দী) বক্রোক্তি-জীবিত অলঙ্কার গ্রন্থে ও শ্রীধর দাস সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃতেও (১২০৬ খ্রী) পাওয়া যায়।

দশম শতকের কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক চারিটি পদ রহিয়াছে। এখানে সেই পদগুলি উদ্ধার করা গেল :

কোঽয়ং দ্বারি হরিঃ প্রযাহ্যুপবনং শাখামৃগস্যাত্র কিং
কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণাদহং বানরাৎ।
রাধেঽহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পান্বিতা
মিত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ ॥

'দ্বারে ও কে?' 'আমি হরি (হরির এক অর্থ বানর)।' 'উপবনে যাও, বানরের এখানে কি প্রয়োজন?' 'প্রিয়ে আমি কৃষ্ণ।' 'কৃষ্ণ বানর বলিয়াই তো বেশী ভয় করিতেছে।' 'হে রাধে, আমি মধুসূদন (মধুসূদন-এর এক অর্থ ভ্রমর)।' 'তবে পুষ্পশোভিত ওই লতায় যাও।'—এইভাবে প্রিয়াকর্তৃক হৃতবাক্ লজ্জিত হরি তোমাদের রক্ষা করুন।

দ্বিতীয় শ্লোকটি হইল :

ময়ান্বিষ্টো ধূর্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহ স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুণমন্যাভিসৃতঃ।
ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্ধনগিরে
র্ন কালিন্দ্যাঃ কূলে ন চ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ ॥

সখি, আমি এই সারারাত্রি সেই ধূর্তকে অন্বেষণ করিয়াছি,—এখানে থাকিতে পারে, ওখানে থাকিতে পারে, এইভাবে; নিশ্চয়ই সে অন্য গোপীর নিকট অভিসার করিয়াছে। মুররিপুকে (কৃষ্ণকে) আমি ভাণ্ডীরতলে দেখি নাই, গোবর্ধন গিরির তটভূমিতে দেখি নাই, কালিন্দীকূলে দেখি নাই, বেতসকুঞ্জেও দেখি নাই। (শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনূদিত)

তৃতীয় শ্লোক :

[······] ধেনুদুগ্ধকলশানাদায় গোপ্যো গৃহং
দুগ্ধে বষ্কয়িণীকুলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্যতি।

ইত্যন্যব্যপদেশগুপ্তহৃদয়ঃ কুর্বন্ বিবিক্তং ব্রজং
দেবঃ কারণনন্দসূনুরশিবং কৃষ্ণঃ স মুষ্ণাতু বঃ ॥

ধেনুর দুগ্ধপূর্ণ কলসগুলি লইয়া গোপীগণ গেল। পরিণতবৎসা ধেনুগুলিকে দোহন করিয়া এই রাধিকাও ধীরে ধীরে যাইবেন। এইরূপে অন্যছলনায় কৃষ্ণ হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া ব্রজকে নির্জন করিলেন। কারণস্বরূপ এবং নন্দপুত্র সেই কৃষ্ণ তোমাদের অকল্যাণ দূর করুন।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের অন্তর্গত চতুর্থ শ্লোক :

সত্রাসার্ত্তি যশোদয়া প্রিয়গুণপ্রীতেক্ষণং রাধয়া
লগ্নৈর্বল্লবসূনুভিঃ সরভসং সংভাবিতাত্মোর্জিতৈঃ।
ভীতানন্দিতবিস্মিতেন বিষমং নন্দেন চালোকিতঃ
পায়াদ্বঃ করমূর্ধস্থিতমহাশৈলঃ সলীলো হরিঃ।

করাগ্রস্থিত মহাশৈলধারণকারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের রক্ষা করুন। লীলাময় এই শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা সন্ত্রস্তভাবে এবং রাধা প্রিয়গুণে প্রীত হইয়া দেখিতেছেন। মহাশৈললগ্ন গোপবালকগণ নিজেদের এই সম্মানে গর্বিত, তাহারা সাগ্রহে তাঁহাকে দেখিতেছেন। ভীত আনন্দিত এবং বিস্মিত নন্দ ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে দেখিতেছেন।

রাধা নামক একখানি 'বীথি' জাতীয় নাটকের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে ত্রয়োদশ শতকের সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোশ গ্রন্থে।

প্রাকৃতপৈঙ্গলের অন্তর্গত দুই একটি পদে রাধাকৃষ্ণলীলার আভাস আছে। নিম্নে উদ্ধৃত পদটি কৃষ্ণের নৌকালীলা বিষয়ক :

অরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ন দেহি।
তুহুঁ এথনই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি ॥

ওরে রে কৃষ্ণ, নৌকা বহিতেছে, ডগমগ ছাড়, দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করিয়া দিয়া যা চাও তা লও। (সুকুমার সেন অনূদিত)

অপর একটি পদ :

জিনি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ
মুট্ঠি অরিট্ঠি বিণাস করে।
গিরি হথ্থ ধরে।

যিনি কংসকে বিনাশ করিয়া কীর্তি প্রসারিত করিয়াছেন, মুষ্টিক ও অরিষ্ট বিনাশ করিয়াছেন এবং হস্তে গিরি ধারণ করিয়াছেন।

দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে রচিত বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে দুইটি শ্লোকে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে :

তেজসেঽস্তু নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ॥

সেই তেজোরূপের প্রতি নমস্কার—যিনি ধেনুর পালক ও লোকপালক; যিনি রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত এবং যিনি শেষনাগের উপরে শায়িত।

কৃষ্ণকর্ণামৃতের আর একটি শ্লোক :

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।
যে বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলা মুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥

ধন্যাত্মা সাধুজনের আস্বাদিত তোমার অমৃতচরিত, রাধারাণীর অবরোধজনিত কৈশোরচাপল্যচেষ্টাবিশেষ এবং তোমার শ্রীমুখপদ্মে যে ভাবযুক্ত বেণুগীতাদি সেইগুলিই আমার হৃদয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হউক। (বিমানবিহারী মজুমদার অনূদিত)

কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। দুইটি পদ ব্যতীত অন্যত্র রাধা নামের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও সেগুলি যে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। পরবর্তী কালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিতে গিয়া সর্বত্র রাধার উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বাদশ শতকে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দ পুরাপুরি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য গ্রন্থ। জয়দেব রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। এই লক্ষ্মণসেনের লিখিত বলিয়া অনুমিত একটি পদে রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ আছে :

কৃষ্ণ ত্বদ্বনমালয়া সহ কৃতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্।
ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিতস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

হে কৃষ্ণ, কুঞ্জান্তরে তোমার বনমালার সহিত গোপীর কুন্তল এবং ময়ূরপুচ্ছ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি ইহা গ্রহণ কর। কোনো দুগ্ধমুখ গোপশিশু কৃষ্ণকে বলিলে (উদ্ভূত) রাধাকৃষ্ণের অলসহাস্যযুক্ত লজ্জানম্র দৃষ্টি জয়যুক্ত হউক।

জয়দেব-গোষ্ঠির অন্যতম কবি উমাপতি ধরও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কিছু পদ লিখিয়াছিলেন :

ভ্রূবল্লীচলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্বোদ্ভেদকৃতাবহেলবিনয়শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥

কোনো গোপী কর্তৃক ভ্রূলতাবিভ্রমের দ্বারা, কোনো গোপী নয়নোন্মেষের দ্বারা, কোনো গোপী ঈষদ্‌হাস্যের জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরণের দ্বারা পথে চলিবার সময় শ্রীকৃষ্ণকে

আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ইহাতে গর্বজনিত অবহেলায় রাধার আনন বিনয়শ্রী ধারণ করিয়াছিল। এইরূপ রাধার আননে পতিত সেই শ্রীকৃষ্ণের আতঙ্ক ও অনুনয়যুক্ত দৃষ্টি জয়যুক্ত হউক।

অভিনন্দ কবির একটি পদ :

রাধায়ামনুবন্ধনর্মনিভৃতাকারং যশোদাভয়া-
দভ্যর্ণেম্বতিনির্জনেষু যমুনারোধোলতাবেশ্মসু।

রাধিকার সহিত কেলিক্রীড়ায় উৎসুক কিন্তু যশোদার ভয়ে ভীত শ্রীকৃষ্ণ যমুনাকূলের নিকটবর্তী নির্জন লতাগৃহে প্রবেশ করিতেছেন।

এতদ্‌ব্যতীত আচার্য গোপীক, শতানন্দ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পূর্ববর্তী বহু কবির পদে রাধা কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুধু পুরাণে নয়, প্রাচীন সাহিত্যেও রাধাকৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করিয়া বিচ্ছিন্ন পদ বা কাহিনী দীর্ঘকাল হইতে রচিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপর জয়দেবের নানা প্রভাব আছে ; আবার জয়দেব যখন গীতগোবিন্দ রচনা করেন তখন তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কবিদের রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক রচনার দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। কারণ জয়দেব-পূর্ববর্তী রাধা-কৃষ্ণলীলার যে চিত্র পাইলাম তাহা বিচার করিলে সহজেই বলা যায়, কি লীলারস কি কাব্যরস—কোনোদিক হইতেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ খুব একটা আকস্মিক রচনা নয়। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাই বলা চলে তিনি পরোক্ষভাবে জয়দেব-পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কবিদের দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিংবা এমনও হইতে পারে, বড়ু চণ্ডীদাস একই সঙ্গে জয়দেব ও তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গীতগোবিন্দ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে নানা দিক হইতে জয়দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গীত-গোবিন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। উভয়কাব্যের মধ্যে যে কেবল রচনাগত মিলই আছে তাহা নয়, উভয়ের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়।

গীতগোবিন্দ কাব্যটি বিভিন্ন সর্গে বিভক্ত। প্রত্যেক সর্গ এক একটি বিশেষ নাম দ্বারা চিহ্নিত। যেমন, প্রথম সর্গের নাম 'সামোদদামোদরঃ', দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অক্লেশকেশবঃ', তৃতীয় সর্গের নাম 'মুগ্ধমধুসূদনঃ' ইত্যাদি। সর্গের শেষে 'ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে সামোদদামোদরো নাম প্রথমঃ সর্গঃ' 'ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে অক্লেশকেশবো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ'—এইরূপ লিখিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটিও কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এক একটি খণ্ডের এক একটি নাম। যেমন প্রথম খণ্ডের নাম 'জন্ম', দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'তাম্বূল', তৃতীয় 'দান' ইত্যাদি। প্রত্যেক খণ্ডের সমাপ্তিবাক্য অনেকটা গীতগোবিন্দরই অনুসৃত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জন্মখণ্ডের শেষে আছে 'ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং', দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে আছে 'ইতি তাম্বূলখণ্ডং সমাপ্তং' ইত্যাদি।

গীতগোবিন্দে বিভিন্ন রাগরাগিণী ও তাললয়ের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও একই রীতির অনুসরণ লক্ষিত হয়।

গীতগোবিন্দ বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি-সমন্বিত নাট্যলক্ষণযুক্ত কাব্য গ্রন্থ। কবির বিবৃতি ছাড়াও গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণ, রাধা-সখী এবং কৃষ্ণ সখীর মধ্যে কথোপকথন আছে। গীতগোবিন্দে প্রধান চরিত্র তিনটি—রাধা, কৃষ্ণ ও সখী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও তিন মুখ্য চরিত্র—রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবির বিবৃতি ব্যতীত রাধা-কৃষ্ণ, রাধা-বড়াই, কৃষ্ণ-বড়াই প্রভৃতির মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি রহিয়াছে। কাব্যের গঠনগত দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গীতগোবিন্দের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল লক্ষিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি পদ গীতগোবিন্দের অনুবাদ। এখানে শুধু কবি হিসাবে নয়, অনুবাদক-কবি হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাস কিরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। বড়ুর কাব্যে গীতগোবিন্দের কিছু আক্ষরিক অনুবাদ আছে, কিছু আছে ভাবানুবাদ। গীতগোবিন্দের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও দশম সর্গের অন্তর্গত কোনো কোনো গীতের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো কোনো পদের মিল আছে।

গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে আছে :

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্ ॥

[কৃষ্ণ বিরহে অধীর শ্রীরাধা চন্দন ও চন্দ্রকিরণের নিন্দা করিতেছেন, মলয় পবনকে বিষবৎ জ্ঞান করিতেছেন।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ অংশে আছে :

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে ।

বসন্তরঞ্জন রায় এই অনুবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সর্বতোভাবে আদর্শের সৌন্দর্য রক্ষা করিয়া রীতিসিদ্ধ ভাষায় এমন কথায় কথায় অনুকরণ চণ্ডীদাসেরই অনুরূপ।" এখানে মূলের আদর্শ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই একথা সহজেই উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জয়দেবের বাণীচাতুর্যের পরিচয় না মিলিলেও আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে রাধাবিরহের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত পদটি উল্লেখযোগ্য :

আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥

গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে আছে :

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্॥

[রাধা নিজবক্ষে অবিরল বর্ষিত মদনের শরাঘাত হইতে হৃদয়মধ্যস্থিত কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য সজল আয়ত নলিনীপত্র বর্মস্বরূপ বক্ষে ধারণ করিয়াছেন।]

গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে আছে :

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥

[রাধিকা ধ্যান কল্পনায় গড়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সম্মুখে কখনো বিলাপ করিতেছেন, কখনো হাসিতেছেন, বিষণ্ণ হইতেছেন, কাঁদিতেছেন, কখনো বা কৃষ্ণের আবির্ভাব কল্পনায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই চরণের যে অনুবাদ পাই, তাহাতে সংস্কৃত ভাষার সেই ধ্বনিগাম্ভীর্য বা ছন্দস্পন্দন লক্ষিত হয় না। বড়ু লিখিতেছেন :

তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে॥

এখানে মূল পদের ভাব সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে এবং অনুবাদ স্বাভাবিক হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহার পরের চরণ :

ঘন বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে॥

ইহা তো গীতগোবিন্দের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। গীতগোবিন্দের চরণটি এইরূপ :

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।

[কৃষ্ণবিরহে রাধা ঘরকে অরণ্যতুল্য, প্রিয়সখীদিগকে জালস্বরূপ এবং নিজের নিঃশ্বাসকে দাবানল সমান মনে করিতেছেন।] 'সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে' [বনমধ্যে ব্যাধজালে বেষ্টিতা হরিণীর ন্যায়] এবং 'বনের হরিণী যেন তরাসিলী মনে'— চিত্রকল্পের দিক হইতে মিল আছে।

তনের উপর হারে। আল মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই পদ গীতগোবিন্দের নিম্নোদ্ধৃত পদের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ :

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥—৪র্থ সর্গ।

[কৃষ্ণবিরহে রাধা এমনই কৃশাঙ্গী হইয়াছেন যে, স্তনের উপরের মনোহর হারটিকেও ভার বোধ হইতেছে।]

জয়দেবের কাব্য-পংক্তি হইতে সহজ ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদের আরও কিছু নমুনা দেওয়া গেল। গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গে :

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।

[মদনমনোহর বেশে কৃষ্ণ রতিসুখসারভূত অভিসারে গমন করিয়াছেন।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডে :

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥

গীতগোবিন্দের দশম সর্গে :

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী দেহি খরনয়নশরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্ যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥

[সত্যই যদি তুমি আমার উপর কোপ করিয়া থাক, তবে তোমার নয়নের তীক্ষ্ণ শরে আমায় আঘাত কর। ভুজবন্ধনে কিংবা দশনাঘাতে যেভাবে আমায় শাস্তি দিয়া তুমি খুশী হও তাহাই কর।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডে :

ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশন দংশনে।
মোর সমুচিত ফল কর রুষ্ট মনে ॥

গীতগোবিন্দের দশম সর্গে :

নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্ ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ ॥

[রাধার নীল নলিনাভ নয়ন দুইটি এখন কোকনদ রূপ ধারণ করিয়াছে। কুসুম-শর-দৃষ্টিতে যদি কৃষ্ণতনু রঞ্জিত করা যায় তবেই হয় রূপপূর্তি।]

বৃন্দাবনখণ্ডে :

তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন ধরে কোকনদ রূপে।
মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ হএ তোর আনুরূপে ॥

জয়দেব যেখানে রাধার নয়ন 'নীলনলিন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বড়ু সেখানে লিখিয়াছেন 'মলিন নলিন'।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে জয়দেবকে অনুসরণ করিবার ফলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীতে কিছু অপ্রাসঙ্গিকতা আসিয়া পড়িয়াছে। গীতগোবিন্দের সপ্তম সর্গে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল শ্রীরাধা মনে মনে এই আশঙ্কা করিতেছেন যে, জনার্দন বুঝি অপর কোনো নায়িকার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সেই চিন্তারই এক অংশ :

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে ॥

[কৃষ্ণ সেই রমণীর মৃগমদ শোভিত নখাঘাতশশিদীপ্ত কুচযুগ-গগনে মুক্তাহাররূপ তারকাবলী সন্নিবিষ্ট করিতেছেন।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে-রাধার 'প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার' এবং যাহার স্বামী নপুংসক আইহন, তাহারই রূপ নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ বর্ণনা করিতেছে :

মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতী হার॥
তাত তিথ নখ রেখ চান্দের আকার।

এখানে প্রশ্ন শ্রীরাধার কুচযুগে কৃষ্ণের সম্ভোগের পূর্বেই নখরেখা অঙ্কিত করিল কে? এইখানেই আসিয়াছে অপ্রাসঙ্গিকতা এবং এই অপ্রাসঙ্গিকতার কারণ জয়দেবকে অপ্রয়োজনে অনুসরণ।

আরও একস্থানে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গীতগোবিন্দে বিভিন্ন সর্গের শিরোদেশে কবির উক্তির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকগুলির মিল আছে। গীতগোবিন্দে বিভিন্ন গীতের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য যেমন কবি কথা বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও সেইরূপ দেখি। গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে কবি কাহিনীর সূত্র ধরাইয়া দিতেছেন :

যমুনাতীরবানীরনিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্।
প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী॥

[যমুনাতীরে বানীরনিকুঞ্জে নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট প্রেমভরে উদ্‌ভ্রান্ত মাধবকে রাধিকার সখী আসিয়া বলিল।] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও দেখি, কবি দুই পদের ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়াছেন। যেমন,

আধায় সাদরং চিত্তে দামোদরসমীহিতং।
মধুরং রাধিকামাহ বৃদ্ধা কপটকোবিদা॥—তাম্বূলখণ্ড।

কিংবা,

অত্রান্তরে তত্র কলিন্দকন্যাতটোপকণ্ঠং সরণৌ নিষণ্ণঃ।
চিরায় রাধামধুরাধরোষ্ঠে কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো জরতীঞ্জগাদ॥—দানখণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস যে জয়দেবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এই সকল বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করিলে সে কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়

কাহিনী চরিত্র পুরাণ-প্রভাব বাগ্‌ভঙ্গিমা আঙ্গিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক হইতে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয়—এই তিনটি গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। গ্রন্থ তিনটি একত্রে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে চৈতন্য-পূর্ব যুগে বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণের স্বরূপ এবং রাধাকৃষ্ণলীলার প্রকৃতি কিরূপ ছিল।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনী অনুসরণে রচিত। বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশেরও কিছু কিছু কাহিনী ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে।

বৃন্দাবনলীলায় রাধাকৃষ্ণের রাস, নৌকালীলা ও দানলীলার যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা ভাগবতবহির্ভূত ; হয়তো কবি এ ক্ষেত্রে সমকালীন কথক, পাঁচালীকার বা গায়কগণের গীত লৌকিক কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। কেহ কেহ মালাধরের রচনার উপর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাবও অনুমান করিয়া থাকেন।

রাধা-কৃষ্ণের দান ও নৌকালীলার কাহিনী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপালবিজয় উভয় গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় সম্পূর্ণ লৌকিক কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, আর গোপালবিজয়ের দৈবকীনন্দন স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, 'লৌকিক বলিঞা না করিহ উপহাসে'।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে রাধার নাম সর্বত্র উল্লিখিত হয় নাই। অনেক স্থলে 'এক নারী'—এইরূপ উল্লেখের সাহায্যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। যেমন রাসলীলা অংশের বর্ণনা :

বৃন্দাবনে গোপী-সনে ভ্রমে নারায়ণ।
চন্দ্রের বেড়িয়া যেন শোভে তারাগণ॥
আচম্বিতে গোপী-মধ্যে নাই নারায়ণ।
এক নারী লয়ে কৃষ্ণ করিল গমন॥
তার সঙ্গে ক্রীড়া করি যমুনার তীরে।
সুগন্ধি কুসুম তুলি বুলে ধীরে ধীরে॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বড়াইয়ের নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপালবিজয় এই উভয় গ্রন্থেই রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনীর প্রধান তিন চরিত্র রাধা কৃষ্ণ এবং বড়াই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন—যে রাধা সেই চন্দ্রাবলী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়ে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন নয়, তাহারা পরস্পর স্বতন্ত্র।

তিনটি গ্রন্থেই রাধা চরিত্র রহিয়াছে, তবে রাধার জন্মবৃত্তান্ত কেবল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপালবিজয়ে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে রাধার নামোল্লেখ থাকিলেও তাহার আর কোনো অতিরিক্ত পরিচয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার পিতার নাম সাগর, মাতার নাম পদুমা বা পদ্মা এবং তাহার স্বামী হইল নপুংসক অভিমন্যু বা আইহন। গোপালবিজয়ে রাধার মাতার কোনো উল্লেখ নাই, স্বামী আইআন এবং তাহার পিতার নাম সুরানন্দ।

বাপ সুরানন্দ জার সভার বিদিত
স্বামী আইআন বীর জগত-পুজিত।

পুরাণাদিতে রাধার পিতার নাম বৃষভানু। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপালবিজয় উভয় গ্রন্থেই রাধার পিতার লৌকিক নাম গ্রহণ করা হইয়াছে, কোনো পুরাণে রাধার পিতার নাম সাগর বা সুরানন্দ নয়।

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে কৃষ্ণের লীলাস্বাদনের প্রধান দুইটি ধারা দেখা যায়। একটি ধারায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমণ্ডিত মূর্তি প্রকটিত, অপর ধারায় বৃন্দাবনলীলায় মত্ত কৃষ্ণের প্রেমময় মূর্তি বিকশিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয় এই তিনখানি গ্রন্থেই দেখি কৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্যময় এবং ভুভারহরণার্থ পৃথিবীতে তাহার আবির্ভাব। কিন্তু সামগ্রিকভাবে

বিচার করিলে বুঝা যাইবে শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়েই কৃষ্ণের যথার্থ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য রূপ প্রকাশ পাইয়াছে; অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কংসের বিনাশের জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিলেও তাহার প্রেমচপল লীলামূর্তিই সবিশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ বলা যায়, প্রাক্‌চৈতন্য যুগে কৃষ্ণের লীলাস্বাদনের যে দুইটি ধারা দেখা গিয়াছিল, তাহার একটি ধারার কবি মালাধর ও কবিশেখর এবং অপর ধারার কবি বড়ু চণ্ডীদাস।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য, সুতরাং ইহাতে যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তি প্রকাশ পাইবে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু গোপালবিজয়ে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপটি প্রকাশ পাইলেও, উহার দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কৃষ্ণ অনেক পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কৃষ্ণের অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাম্বূল দান নৌকা ইত্যাদি খণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে প্রচণ্ড বিরূপতা ও কলহ লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে কৃষ্ণের প্রতি রাধার ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হয় বৃন্দাবনখণ্ড হইতে। ইহার পূর্বে দান ও নৌকাখণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে মিলন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু সে মিলনে রাধার দিক হইতে কোনো প্রকার আকুলতা বা সমর্থন ছিল না। নৌকাখণ্ড-পরবর্তী ভার এবং ছত্রখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধার কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় লক্ষ্য করা যায়, এবং বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা নিজেই কৃষ্ণের নিকট যাইবার জন্য শাশুড়ীর প্রতি ছলনা করে। গোপালবিজয়ে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড রাসখণ্ড রহিয়াছে। এই সকল খণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় চটুল উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকিলেও দেখা যায় দানখণ্ড হইতেই রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে উভয়ের গুণস্মরণে মুগ্ধ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডে রাধা বলিয়াছে :

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

কিন্তু গোপালবিজয়ে মনোদুঃখ প্রকাশে অসমর্থ রাধা 'কুম্ভারের পুনি'র ন্যায় অন্তরে অনুক্ষণ দগ্ধ হইয়াছে এবং এই দানখণ্ডেই কৃষ্ণ রাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বংশিধ্বনি করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার নিকট হইতে দানগ্রহণের ব্যাপারে কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াছে, গোপালবিজয়েও রাধার নিকট হইতে দানগ্রহণের কাজে বড়াই কৃষ্ণকে সাহায্য করিয়াছে। এখানে 'বিকিছলে' বড়াই গোপীগণের সঙ্গে রাধাকে যমুনার তীরে লইয়া আসিলে কৃষ্ণ তাহার নিকট বার বৎসরের দান চাহে এবং সর্বশেষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় রাধার প্রতিটি অঙ্গের জন্য পৃথক পৃথক দান দাবি করে :

কেশের বিচার আগু দেহ মোর পাশে
একে একে দেখোঁ ইথে কোন ধন বইসে।
সীমন্তে সিন্দুর তোর অমূল্য রতনে
কামের কনকদণ্ড লুকাবে কেমনে।
এ তোর ললাটে জত দেখোঁ পত্রাবলী
ইহার দানের বেলে দেখিব বিকলি।

শ্রবণে হিল্লোল বহে হীরাধর কড়ি
কে পারে বলিতে মূল্য ইথে দান বড়ি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় গোপালবিজয় গ্রন্থেও দেখি রাধার নিকট কৃষ্ণ মাঝে মাঝেই তাহার অবতারত্বের কথা প্রকাশ করিয়াছে। রাধা যখনই কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করে তখনই কৃষ্ণ রাধাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলে :

আহ্মি দেব নারাঅণ সংসারের সার
ভূমিভার খণ্ডাইতে গোকুলে অবতার।
... ...
পুরুব জনমে রাধে তুহ্মি মোর নারী
তে কারণে আপনা না বাসি তোহ্মা স্মরি।
সে কারণে রাধিকা আইলুঁ তোর ঠাঞে
কামভএ শরণ লইলু তুআ পাএ।

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া রাধার মনে কিরূপ ভাবনার উদয় হইল সে চিত্র কবিশেখর অঙ্কন করিয়াছেন। কবিশেখরের বর্ণনা :

কৃষ্ণের বচনে রাই লাজে অধোমুখী
মোনে মোনে অনুমানি ভূমি নখে লেখি।
সব গুণে আগল নাগর-শিরোমণি
ঘরে প্রাণ স্থির নহে জার বংশী শুনি।
জার নাম শুনিলে সুদিন করি জানি
জারে দেখিলে জনম সফল করি মানি।

কিন্তু এতৎসত্বেও কৃষ্ণের নিকট রাধা আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। প্রেমের আহ্বান সত্বেও লজ্জা ও কুলকলঙ্কের ভয়ে রাধা কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে কৃষ্ণ মূর্ছিত হইয়া পড়ে। পরে জ্ঞান ফিরিলে বড়াই কৃষ্ণকে সান্ত্বনা দিয়া রাধা-লাভের জন্য তাহাকে যমুনার ঘাটে কাণ্ডারী হইবার পরামর্শ দেয়।

গোপালবিজয়ের নৌকাখণ্ডের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নৌকাখণ্ডের তুলনার অবকাশ রহিয়াছে। কারণ উভয় গ্রন্থেই রাধাকৃষ্ণের নৌকালীলার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে এবং উভয় গ্রন্থকারই নৌকাখণ্ডের কাহিনী নির্মাণে লৌকিক কাহিনীকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ প্রথম রাধার সখীদের ও বড়াইকে যমুনা নদী পার করাইয়া দেয়, সর্বশেষে রাধাকে তাহার নৌকায় তুলিয়া লয়। যখন বড়াই ও সখীরা যমুনার অন্য পারে চলিয়া গিয়াছে, তখন রাধা একাকী যমুনার এ প্রান্তে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছে :

মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞিঁ ঘাটে মহাদানী।
বড়ায়িক ছাড়ী কেহ্নে হৈবোঁ একাকিনী॥
কেহ্নে সব সখিজন আগু কৈলোঁ পার।
কাল হঅাঁ গেল মোরে যৌবনভার॥

কি ভৈল কি ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে।
কেহ্নে মন কৈলোঁ। জাইতেঁ মথুরার হাটে ॥

কিন্তু গোপালবিজয়ে কৃষ্ণের নৌকায় কে আগে উঠিবে কে পরে উঠিবে—যখন এইরূপ চিন্তা ও কথাবার্তা চলিতেছে, তখন

সহিতে নারিঞা রাধে ভরছে সভাএ
আপনে চঢ়িলা একা কাহ্নাঞির নাএ।
তা দেখি কাহ্নাঞি আতি-আনন্দে মুগধে
জনম-দরিদ্র জেন পাএ মহা-নিধে।
নাএর এদিগে রাধে উদিগে মাধবে
তীরে চকমিত হঞা দেখে সখী সবে।
আধ জমুনাএ লাও লঞা বনমালী
রাধিকা-সহিতে কিছু পাতিল ঢামালী।

এই ঢামালীরই শেষ পরিণতি যমুনা নদীতে নৌকার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের মিলন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা কৃষ্ণের মিলন-মুহূর্তে রাধা কৃষ্ণকে বলিয়াছে :

দধি দুধ নঠ কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর ডুবায়িলেঁ পসার।
বলে জলে কোলে কৈলে কাহ্নাঞিঁ ল
কৈলেঁ বড়ই খাঁথার ॥
সব সখি দেখে মোর কাহ্নাঞিঁ ল
না তুলিহ জলের উপর ॥
যত ছিল মনে তোর কাহ্নাঞিঁ ল
চিরকাল মনোরথ।
তাহার কারণে কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর মরণের পথ ॥

অপরদিকে গোপালবিজয়ে যমুনা নদীর মধ্যে :

কাহ্নাঞি রাধার জত অনুমতি লএ
হেঠমাথে রহে রাধে কিছু নাহি কএ।
সমঅ বুঝিঞা কানু রাধা কৈল কোলে
দশ দিগ চাহে রাই কিছু নাহি বোলে।
তখন সুন্দরী রাধে চাটু করি বোলে
চাপিঞাঁ না ধর কোলে সুন্দর গোপালে।
ছিণ্ডে জানি গলার গজমুতি হার
না ধর না ধর কানু করি পরিহার।

অধরে দশনাঘাত না দিহ চুম্বনে
মোছা জেন নাহি জাঅ নঅন-অঞ্জনে।
মন দিহ মুছিতে কপোল-পত্রাবলী
মুকল না হএ জেন মাথার কবরী।
মন করি গাএ হাথ দিহ দামোদর
নখরেখ জানি লাগে কুচের উপর।

গোপালবিজয়ে নৌকাখণ্ডের অন্তর্গত কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই উক্তির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দানখণ্ডের অন্তর্গত রাধার নিম্নোদ্ধৃত উক্তির সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

সুন্দর কাহ্নাঞি তবেঁ যাওঁ তোর কোল।
কভোঁ না লঙ্ঘিবেঁ যবেঁ আহ্মার বোল॥
মাথার মুকুট কাহ্নাঞিঁ ভাগি জুণি জাএ॥
যোড় হাত করি কাহ্ন বোলোঁ তোর পাএ॥
ছিণ্ডি জুণি জাএ কাহ্নাঞিঁ সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে॥
আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।
সখি সব দেখিআঁ বুলিব দন্তঘাতে॥
নখঘাত না দিহ মোর পয়োভারে।
আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিঁক নিস্তারে॥

গোপালবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দান ও নৌকাখণ্ডের মধ্যে নানাপ্রকার সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডের এবং গোপালবিজয়ের রাসখণ্ডের অন্তর্গত কাহিনীর মধ্যে বিশেষ কোনো মিল বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না।

কাহিনী ব্যতীত আঙ্গিকের দিক হইতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপাল-বিজয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচারের অবকাশ আছে। লক্ষ্য করা যায় তিনটি গ্রন্থেই পয়ারের আধিক্য, তবে স্থানে স্থানে দীর্ঘ-ত্রিপদীও রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কোনো অধ্যায় বা খণ্ড বিভাগ নাই, সমগ্র গ্রন্থখানি রাগ-রাগিণীতে বিন্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীটি তেরোটি স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত, গোপালবিজয় কাব্য চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপালবিজয়ে বড়াই চরিত্র রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বড়াই চরিত্রের কোনো উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপালবিজয়ের বড়াই চরিত্র লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় গোপালবিজয় অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াই অনেক বেশী কর্মতৎপর। কাহিনীর কাঠামোর দিক হইতেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াইকে অনেক বেশী প্রখর হইতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীর অনেকটা অংশ জুড়িয়া কৃষ্ণের প্রতি রাধার বিরূপতা প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে বড়াইকে সর্বদা রাধার বিরূপতা দূর করিবার কাজে নিয়োজিত থাকিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রথমাংশে কৃষ্ণের প্রতি রাধার কোনরূপ প্রেমভাব জাগ্রত হয় নাই, বরং কৃষ্ণের নিকট হইতে সর্বদা সে দূরে সরিয়া থাকিতে

চাহিয়াছে; অপরদিকে গোপালবিজয়ে কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে বিরূপতা তাহা নিতান্তই বাহিরের ছলনা মাত্র, বস্তুতঃ কাহিনীর সূচনা হইতেই দেখি কৃষ্ণ ও রাধার মধ্যে প্রেমের একটি গভীর বন্ধন রহিয়াছে। সুতরাং কাহিনীর এই পটভূমিতে রাধা-কৃষ্ণের মিলনসাধনে বড়াইয়ের সক্রিয়তার বিশেষ কোনো অবকাশ ঘটে নাই।

আজ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি মাত্র পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেই পুঁথিরও শেষাংশ খণ্ডিত। সুতরাং কাহিনীর পরিণতিতে কি ঘটিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বিতীয় প্রামাণিক পুঁথি যতক্ষণ আবিষ্কৃত না হইতেছে ততক্ষণ বলিবার কোনো উপায় নাই। আমরা সাধারণভাবে অনুমান করিয়া থাকি, কৃষ্ণ কংসের বিনাশের জন্য মথুরায় গেলেন, সেইস্থান হইতে আর তিনি বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন না। পুরাণে এই বিবরণই আছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। গোপালবিজয়ের কাহিনীতে কিন্তু দেখি কৃষ্ণ মথুরায় কংসকে বধ করিয়া এবং সেখানে উগ্রসেনকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া বিরহকাতরা গোপীগণের ব্যথা দূর করিবার জন্য পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছে। গোপালবিজয়ের কাহিনীর এই পরিণতি দেখিয়া নূতন করিয়া প্রশ্ন জাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীটিই বা কিভাবে সমাপ্ত হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুরাণের আধারে লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য, গোপালবিজয়ও তাহাই। গোপালবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে নানা দিকে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। এখন গোপালবিজয়ের কাহিনীর শেষাংশ দেখিয়া কি অনুমান করা যায় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের শেষেও কৃষ্ণ মথুরা হইতে বৃন্দাবনে রাধার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল?

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলী

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাব ভাষা চরিত্রবিন্যাস ও রচনাশৈলীর মধ্যে নানাদিক হইতে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে রচিত বলিয়া তাহার মধ্যে ভাব চরিত্রবিন্যাস প্রভৃতি তত সূক্ষ্ম পরিমাণে আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি না। অবশ্য প্রাচীনকালের কাব্যে এই সূক্ষ্মতা যে একেবারে দুষ্প্রাপ্য তাহা আমাদের বক্তব্য নহে। পদাবলীতে কালোচিত পরিবর্তন স্বাভাবিক বলিয়া যতটা বিবর্তিত ও পরিমার্জিত হইয়া উঠিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থমধ্যে একান্তভাবে আবদ্ধ বলিয়া ততটা পরিমাণ পরিমার্জনা লাভের সুযোগ পায় নাই। আবার প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরবর্তীকালে রচিত বলিয়া এবং উক্ত সাহিত্যের সম্মুখে প্রাক্ চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবপদাবলীর ঐতিহ্য ছিল বলিয়া চৈতন্য-পরবর্তী যুগের চণ্ডীদাসের পদাবলী সেই ঐতিহ্যশাসিত পথের অনুবর্তন করিয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা পদাবলী সাহিত্য ভাব ও ব্যঞ্জনার দিক হইতে যে সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিবে তাহা স্বাভাবিক।

ভাষার দিক হইতে বিচার করিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব সহজেই ধরা পড়ে।

এই কাব্যে আদি-মধ্যযুগের ভাষা স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া গবেষকগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পদাবলীর ভাষা ইহার বহু পরবর্তী কালের বলিয়া উহার ভাষাকে অন্ত্য-মধ্যযুগের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। উভয় পর্যায়ের ভাষার নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়া পরস্পরের পার্থক্য দেখাইতেছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে :

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সক্কেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ ॥

এবং পদাবলীতে :

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥

ভাষা যে উভয় পর্যায়ে একটু স্বতন্ত্র শ্রেণীর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার মধ্যে আদি-মধ্যযুগের বাংলাভাষার লক্ষণ পরিস্ফুট। যেমন, 'এন' বিভক্তি 'এঁ' হইয়া 'এ'তে রূপান্তরিত হইয়াছে। আদিস্বরে শ্বাসাঘাত (আনুমতী, আসুখিলী), পদান্তস্থিত অকারের উচ্চারণ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। 'আউলাইলোঁ' এখানে শব্দের শেষে সংস্কৃত অহংজাত 'ওঁ' বিভক্তি বসিয়াছে। তাহা ছাড়া 'আহ্মার' 'তোহ্মার' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ বহুবার হইয়াছে। পদাবলীর ভাষার মধ্যে আমরা প্রকৃত আধুনিক বাংলাভাষার হৃৎস্পন্দন অনুভব করিতে পারি।

কেবল ভাষা নয় ভাবের দিক হইতেও উভয় পর্যায়ের সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্য-পরবর্তীকালের পদাবলীতে রাধাভাব ও রাধাবাদ যতটা পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ততটা নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে পদাবলী সাহিত্য চৈতন্যভাবকে প্রগাঢ়রূপে স্বীকার করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহার একান্ত অভাব। লীলাবিলাস এবং কামকলার প্রাধান্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বহুল পরিমাণে গ্রাস করিয়াছে বলিয়া সেখানে স্থূল রুচি ও গ্রাম্যতা যতটা প্রবল—পদাবলী সাহিত্যে তেমন নহে। চৈতন্যদেবের ধর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবনের পরিমার্জিত আধ্যাত্মিক রুচি পদাবলী সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া এই সাহিত্যে একটি পবিত্র এবং শিষ্ট রুচিবোধ সর্বদাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পদাবলীর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন কিংবা বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীর দর্শন যত তীব্রভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যে ততটা দেখা যায় না। কারণ ওই বিশেষ বৈষ্ণব বিশ্বাসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিচিত্ত নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। ফলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মানবতা ও বাস্তবতাবোধ বৈষ্ণবপদাবলীতে ততটা পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাসের রাধা পদাবলীতে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিকশিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি পূর্বপরিচয়হীন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তিম পর্যায়ের রাধা পদাবলীর

রাধার মতই। তবু তাহার পূর্ব পরিচয় এবং ক্রমিক বিবর্তনটুকু, এমন কি অন্তিম পর্যায়ের ভাববিহ্বলতার মধ্যেও বাস্তব জগতের মানবীর রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত হইয়াছে। সে কখনোই রক্তমাংসবর্জিত হয় নাই। ভাবসাগরে নিমজ্জিত হইবার বাসনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও কম নহে। কিন্তু তাহা বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় একান্তভাবে ভাবসর্বস্ব নহে। বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবপরিকল্পনায় যে আতিশয্য লক্ষিত হয় তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উৎকটভাবে কখনোই দেখা দেয় নাই।

চরিত্রবিন্যাসের দিক হইতে পদাবলী সাহিত্য তাই বৈচিত্র্যহীন। বাস্তবতার পটভূমিকায় মানবতার স্বীকরণে যে নাটকীয়তা দেখা দেয় তাহা চরিত্রসৃষ্টির পক্ষে খুবই অনুকূল। কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীতে ওই নাটকীয়তার অভাবের জন্যই চরিত্রগুলির আবেদন যেমনই হউক না কেন তাহাব মধ্যে সংঘাত-বৈচিত্র্য তেমন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে কাহিনীর প্রাধান্য ও ঘটনার ঘনঘটা থাকাব ফলে চরিত্রগুলির উত্থান পতন লক্ষিত হয়, তাই চরিত্রগুলি নাটকীয়। বড়াই, কৃষ্ণ, রাধা প্রভৃতি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য সেখানে সুস্পষ্ট। বিশেষ করিয়া রাধা চরিত্রের ক্রমবিবর্তনটি এবং তাহার পরিণত মহিমা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর লেখনীপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। তাম্বূলখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের গর্হিত প্রস্তাবে 'কোপে গবজিলী রাধা যেহ্ন কালসাপ', কিন্তু সেই রাধাই কৃষ্ণবিরহে 'আকুল শরীর মোর বেআকুল মন' বলিয়াছিল। কিন্তু পদাবলীতে কাহিনীর প্রাধান্য না থাকায় চরিত্রগুলি নাটকীয় হইয়া উঠে নাই। কৃষ্ণানুরাগ প্রকাশে রাধার চাতুর্যকৌশল চরিত্রের মধ্যে দোলাচলতা সৃষ্টি করে নাই, তবে হয়তো কিছুটা বৈচিত্র্য আনিয়াছে। তাই চরিত্রসৃষ্টির দিক হইতে দেখি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব যতটা তীব্র ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে পদাবলীর মধ্যে ততটা পায় নাই। পদাবলীর মধ্যে গীতিকাব্যের ধর্ম প্রাধান্য লাভ কবায় নাটকীয়তা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

সর্বশেষে রচনাশৈলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই তারতম্য বিচার কবা যাইতে পারে। অবশ্য আঙ্গিকের দিক হইতে উভয় পর্যায়ের কবিতায় তেমন কোনো স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় না। পয়ার ত্রিপদী একাবলী প্রভৃতি ছন্দ উভয় শ্রেণীর কবিতায় পাওয়া যায়। আবার অলঙ্কারের দিক হইতে বলা যায় যে উভয় পর্যায়ের চণ্ডীদাসের কবিতায় সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অলঙ্কার আহরণ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি উপমা লোকজীবন হইতে আহৃত এবং সেখানে কবি-কৃতিত্বের পরিচয় আছে। পদাবলীর চণ্ডীদাসেও যে লৌকিক জগতের বস্তুকে উপমারূপে ব্যবহার করা হয় নাই তাহা নয়, তবে সেখানে তাহার অবকাশ খুব কম। কবিতা রচনাকালে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রকেই তিনি পদে পদে অনুসরণ করিয়াছেন। আর এক দিক হইতে বলা যায় যে বাৎস্যায়নের কামসূত্র এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের উদ্ভট শ্লোকাবলী ও আদিরসাত্মক কবিতার উত্তরাধিকার অবলম্বন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত। চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলীতে সেই আদিরস বহুল পরিমাণে সংযত এবং তাহা মধুর ও শান্তরসের আস্বাদ্যমানতা লাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণবপদাবলী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ নহে। বিভিন্ন কবি রাধা-কৃষ্ণ বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন পর্যায়ের পৃথক পৃথক কবিতা রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি কবিতাই এক একটি ভাবে সম্পূর্ণ। কিন্তু বৈষ্ণব পদসংগ্রহকর্তারা একটা কাহিনীর ধারা বজায় রাখিয়া বিভিন্ন কবির পদ সংকলন করিতেন। পদকল্পতরুতে প্রথমেই রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগের পদগুলি গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণিত হয় নাই। বড়াইর মুখে রাধার রূপকীর্তন শুনিয়া কৃষ্ণের পূর্বরাগ জন্মিয়াছে। তাম্বূলখণ্ডে কৃষ্ণ বড়াইকে বলে :

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী॥ বড়ায়ি ল॥
দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে॥ বড়ায়ি ল॥

অপরদিকে যদুনন্দনের পদে :

সখি! রাধা নাম কি কহিলে।
শুনি কাণ মন জুড়াইলে॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে।
হেন হিয়া না করে আকুলে॥

আমরা এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন্ কোন্ প্রসঙ্গের সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর কোথায় কোথায় মিল অমিল রহিয়াছে তাহাই লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিতেছি। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াইর মুখে শ্রীরাধার রূপ-কথা শুনিয়া কৃষ্ণের পূর্বরাগ জন্মে; বৈষ্ণবপদাবলীতে সখীদের মুখে রাধা নাম ও তাহার বয়ঃসন্ধি-রূপের বর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণের মনে পূর্বরাগ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কৃষ্ণের এই অবস্থার কথা সখীরা রাধার নিকট গিয়া ব্যক্ত করে :

চম্পক-দাম হেরি চিত অতি কম্পিত লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানু-নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী স্বপনে না পাতয়ে কাণ॥

—গোবিন্দদাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী এখানে অন্যরূপ। কৃষ্ণ এখানে বড়াইর হাত দিয়া তাহার প্রেমপ্রস্তাবস্বরূপ তাম্বূলাদি প্রেরণ করে এবং রাধা তাহা সক্রোধে প্রত্যাখ্যান করে ও দূতীকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়। বৈষ্ণবপদাবলীতে পুরাণকে অনুসরণ করিয়াই রাধাকে বৃষভানু-নন্দিনী বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকার পিতামাতার নাম যথাক্রমে সাগর ও পদ্মা। এতদ্ব্যতীত বড়ু চণ্ডীদাস রাধার কোনো সখী বা শাশুড়ী ননদ কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই, কৃষ্ণেরও কোনো সখার নামের উল্লেখ নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে কবি কর্তৃক কৃষ্ণের রূপ বর্ণিত হইয়াছে (নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ—দ্রঃ)। এই প্রসঙ্গে অনন্ত দাসের একটি রূপবর্ণনাত্মক পদ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :

বিকচ সরোচ ভাণ মুখ মণ্ডল
দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরী হাসে উগারই
পি পি আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর।
বরণি না হয় রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন পুঞ্জ কিয়ে কুবলয়-দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সমস্ত খণ্ডের মধ্যে দানখণ্ডের পদসংখ্যা সর্বাধিক। মথুরার ঘাটে রাধা সখীদের সঙ্গে লইয়া দধি দুধ বিক্রয় করিতে যায়। পথে কৃষ্ণ দানী সাজিয়া বসিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডের সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর দানলীলার কাহিনীগত যথেষ্ট মিল আছে। বৈষ্ণবপদাবলীতেও রাধার পথরোধ করিয়া কৃষ্ণ নদীর ঘাটে দানী সাজিয়া বসিয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণের মতই বৈষ্ণবপদাবলীর কৃষ্ণও রাধাকে বলে, হয় আলিঙ্গন দাও নয় দধি দুধ পসরার সব দান চুকাইয়া দাও। তাহা ছাড়া দান কেবল ওই পসরাটুকুর জন্য নয়। রাধার দেহের প্রতিটি অঙ্গের জন্য কৃষ্ণ দান দাবি করিতেছে। জ্ঞানদাসের একটি পদ :

সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
না জান কানাই পথে দানী॥
সীঁথায় সিন্দুর তোমার নয়ানে কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর॥
হৃদয়ে কাঁচুলী গলে গজমোতি হার।
চারিলক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার॥
করেতে কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কণী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে :

নীল উতপল তোর নয়নে।
এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে॥
গরুড় সমান তোহোর নাশা।
এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা॥

কৃষ্ণের এই স্থূল কথাবার্তায় রাধা শঙ্কিত হইয়া উঠে, বড়াইকে বারবার দোষারোপ করিতে থাকে। তারপর নিজের মনেই প্রশ্ন করে—আজ তাহার কেন এই বিপদ, সে

কি পথে বাহির হইবার সময় কোনো অশুভ চিহ্ন দেখিয়াছিল ?

কমন আসুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা ॥

বৈষ্ণবপদাবলীতে জ্ঞানদাস রাধার এই মানসিকতার ছবিই অঙ্কন করিয়াছেন :

দানী দেখি কাঁপিছে শরীর।
মো যদি জানিতাম পাছে   এ পথে কণ্টক আছে
তবে ঘরের না হইতাম বাহির ॥
ঘরে হৈতে বারাইতে   ও চাল ঠেকিল মাথে
হাঁচি জেঠী পড়ি গেল বাধা।
হরিণী পালাঞা যাইতে   ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা ॥

রাধা শেষে কংসাসুরের নামে কৃষ্ণকে ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে। বৈষ্ণবপদাবলীতে :

এখনি মরণ হউ এ ছিল কপালে।
বৃষভানু-সুতা-তনু ছুঁইলে রাখালে ॥
একে সে তোমারে ভাল না বাসে কংসাসুর।
এ বোল শুনিলে হৈবে দেশ হৈতে দূর ॥

কিংবা, চাতুরী না কর কানাই চতুর সেয়ান।
কংস রাজা শুনিলে লইবে জাতি প্রাণ ॥

ইহার উত্তরে পদাবলীর কৃষ্ণ যে কথা বলিয়াছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণের মুখে সেই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। রাধা যখন বলে :

কথাঁ না বমসি কাহ্নাঞিঁ কথাঁ তোর ঘর।
মোর কংস নৃপতীক না করহ ডর ॥

তাহার উত্তরে কৃষ্ণের উক্তি :

কি করিতেঁ পারে তোর সে না কংস রাঅ।
দৈবকীনন্দন কাহ্ন কাহো না ডরাঅ ॥

যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডের শেষাংশে এবং বৈষ্ণবপদাবলীতে দানলীলার শেষ পর্যায়ে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হয়। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবকে অনুসরণ করিয়া রাধা-কৃষ্ণের মিলনলীলা অনাবৃত ভাষায় বর্ণনা করিলেন, অপর পক্ষে গোবিন্দদাস সহজ স্নিগ্ধ ভাষায় বলিলেন :

মিলন দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নৌকাখণ্ডের কোনো কোনো অংশের সহিত বৈষ্ণবপদাবলীর নৌকাবিলাসের কাহিনীগত কিছু কিছু মিল লক্ষিত হয়। মূল ঘটনাটি উভয় ক্ষেত্রেই

একরূপ—নৌকায় নদী পার করাইবার সময় কৌশলে কৃষ্ণের রাধার সহিত মিলন। বৈষ্ণবপদাবলীতে আছে :

তরঙ্গের রঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে।
হেরি সব সহচরী কাঁপয়ে অন্তরে॥
তরঙ্গ দেখিয়া থরহরি কাঁপে রাই।
কোলে করি বায় নৌকা কাণ্ডারী কানাই॥
রাই কোলে করি নাগর হরষিত চিতে।
এ পার হইল নৌকা দেখিতে দেখিতে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাঝনদীতে তরঙ্গ উঠিল, নৌকা দুলিল, দধিদুধের পসার ছড়াইয়া পড়িল :

তখন ছাড়ায়িল ঘৃত দধি ঘোল।
ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিকে মাঙ্গে কোল॥

শুধু দান ও নৌকাখণ্ডে নয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর মধ্যে আরও বিভিন্ন পর্যায়ে কাহিনীগত বহু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে রাসলীলা অংশ, কৃষ্ণের কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ, জলকেলি প্রভৃতি পর্যায়ের ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য। কেবল ঘটনাগত মিল নয়, বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ অংশে আশ্চর্যজনকভাবে সুরগত মিলও লক্ষিত হয়।

কাব্যের অন্তর্গত অন্যান্য খণ্ডের তুলনায় রাধাবিরহ অংশ অনেক বেশি ঘটনা নিরপেক্ষ। প্রতিটি খণ্ডের কাহিনীই ঘটনাপ্রধান এবং খণ্ড নামের মধ্যেই সে ইঙ্গিত বর্তমান। রাধাবিরহের পূর্ববর্তী বংশীখণ্ডেও বংশী অপহরণের কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—বিরহ বেদনার আবেদন তখনও গভীর এবং তীব্র নয়। বংশীখণ্ডে রাধা বংশী অপহরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, কিছু গর্বিতা; বড়াইয়ের সহায়তা তাহাকে আরও দাম্ভিক করিয়া তুলিয়াছে। বংশীখণ্ডে বরং কৃষ্ণকে দেখিয়াই আমাদের করুণা জন্মে। ঐ খণ্ডে কৃষ্ণ বড় অসহায়, বিপদগ্রস্ত। রাধা বাঁশিটি চুরি করিয়াও দিব্য অস্বীকার করে। কিন্তু বংশীখণ্ড-পরবর্তী রাধাবিরহ অংশে শ্রীরাধার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করি। রাধার বিরহব্যাকুলতা সমগ্র খণ্ডটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এখানে শ্রীরাধার বিরহবেদনা বৈষ্ণবপদাবলীর বিরহিণী রাধিকার প্রায় সমপর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে। এই খণ্ডে দেখি রাধার মুখনিঃসৃত পদের সংখ্যা বেশি। খণ্ডের প্রথমাংশ মুখ্যতঃ রাধা ও বড়াইয়ের কথোপকথন এবং খণ্ডের শেষাংশে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে কথোপকথন। এই পর্যায়ে রাধার চরিত্রে কোনো কপটতা বা চাতুর্য নাই। কৃষ্ণ রাধাকে গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিয়াছে, রাধার বিরহব্যাকুলতাকে দ্বিধাহীনভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছে; কিন্তু শত বেদনা ও আঘাত সত্ত্বেও রাধাকে কখনো কঠিন স্থূল অমার্জিত ভাষা প্রয়োগে নিযুক্ত হইতে দেখি না। রাধাকে কবি এখানে ভিতরে বাহিরে যেন বিশিষ্ট পদাবলীর সুরেই বাঁধিয়া লইয়াছেন। কৃষ্ণের শত প্রতিবাদেও রাধা এখানে স্থির শান্ত এবং মার্জিত। সে

এখানে গোপরমণী নয়—এখানে তাহার একমাত্র পরিচয় বিরহব্যাকুলা রাধিকা। রাধা এবং বড়াইয়ের কথোপকথনে দেখিতে পাই রাধা কৃষ্ণমিলনের জন্য অধীর। মিলনের এই ব্যাকুলতা অন্তরের আকুলতা হইতেই সঞ্চারিত। দানখণ্ডে কৃষ্ণের বিরহব্যাকুলতা এবং রাধাবিরহ অংশে রাধার বিরহব্যাকুলতার মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট। রাধাবিরহ অংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রমথনাথ বিশী তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার যেখানে শেষ, পদাবলীর রাধার সেখানে আরম্ভ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও পদাবলীর রাধাকে যথাক্রমে বৈষ্ণব কাব্যের পূর্ব-রাধা ও উত্তর-রাধা বলা চলিতে পারে।" এ উক্তি যথার্থ।

কাব্য-পরিকল্পনায় ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ-কাহিনীর প্রভাব

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটির উপর বিভিন্ন পুরাণ-কাহিনীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই দিক হইতে কাব্যের অন্তর্গত জন্মখণ্ডটি বিশেষভাবে মূল্যবান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল কাহিনীর সঙ্গে এই খণ্ডের বিশেষ কোনো যোগ নাই। কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড—তাম্বূল খণ্ড হইতে রাধা-কৃষ্ণ লীলা কাহিনীর সূত্রপাত। মূল কাহিনীর পূর্বে জন্মখণ্ডে বিভিন্ন পুরাণের অনুসরণে রাধা ও কৃষ্ণের জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবীতে কংসের অত্যাচার, দেবতাদের নিকট বসুন্ধরার নিবেদন, অবতাররূপে মর্ত্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ইত্যাদি কাহিনী বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে দেখা প্রয়োজন বড়ু চণ্ডীদাস জন্মখণ্ডের অন্তর্গত পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলি বিভিন্ন পুরাণ হইতে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডের অন্তর্গত প্রথম সংস্কৃত শ্লোকটি এই :

পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান্।
ততঃ সবভসং দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ॥

এই প্রসঙ্গটি বিষ্ণুপুরাণ পদ্মপুরাণ ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে রহিয়াছে। এই সকল পুরাণে বর্তমান প্রসঙ্গটি কিভাবে বর্ণিত হইয়াছে দেখা যাক।

বিষ্ণুপুরাণে আছে :

এতস্মিন্নেব কালে তু ভূরিভারাবপীড়িতা।
জগাম ধরণী মেরৌ সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্॥
স ব্রহ্মকান্ সুরান্ সর্বান্ প্রণিপত্যাহ মেদিনী।
কথয়ামাস তৎ সর্বং খেদাৎ করুণভাষিণী॥

—এই সময়ে পৃথিবী বহুতর ভারে নিপীড়িত হইয়া সুমেরু পর্বতে দেবগণের নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে প্রণাম করিয়া পৃথিবী ব্যথিতচিত্তে করুণ ভাষায় সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। পদ্মপুরাণের বর্ণনা :

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ।
পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্ত্বা ভবতে কথয়াম্যহম্॥

পুরা বসুন্ধরা হ্যাসীৎকংসাদিনৃপপীড়িতা।
স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদূতেন তাড়িতা ॥
ক্রন্দন্তী ক্রন্দন্তী সা তু যযৌ ঘূর্ণিতলোচনা।
যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ ॥
কংসেন তাডিতা নাথ ইতি তস্মৈ নিবেদিতুম্।
বাষ্পবারীণি বর্ষন্তী বিবর্ণা সাবমানিতা ॥

এবং ভাগবতের বর্ণনা :

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মানং শরণং যযৌ ॥
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত ॥

বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় পদ্মপুরাণ ও ভাগবতেও কংস-কর্তৃক নিপীড়িত বসুন্ধরার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং সর্বত্রই বসুন্ধরা কর্তৃক ব্রহ্মাকে স্মরণ করা হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্যরচনায় পুরাণের এই বর্ণনাগুলিই অনুসরণ করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে তিনি পুরাণ কাহিনীকে লঙ্ঘন বা পরিবর্তন করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে'—এই পদে যে-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ পুরাণভিত্তিক। এখানে কবি ভাগবত পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। এখানে উদাহরণ-স্বরূপ ভাগবত ও পদ্মপুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করি। ভাগবত :

ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥

পদ্মপুরাণের বর্ণনা :

দেবদেব জগন্নাথ পৃথিবীভারপীড়িতা।
রাক্ষসা বহবো লোকে সমুৎপন্না দুরাসদাঃ ॥
জরাসন্ধশ্চ কংসশ্চ প্রলম্ব ধেনুকাদয়ঃ।
দুরাত্মানঃ প্রবাধন্তে সর্বলোকান্ সনাতনান্।
ভারাবতরণং কর্তুং পৃথিব্যাস্ত্বমিহার্হসি ॥

—হে জগন্নাথ দেবদেব, পৃথিবী ভারপীড়িতা। বহু দুর্ধর্ষ রাক্ষস জগতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। জরাসন্ধ কংস প্রলম্ব ধেনুক ইত্যাদি দুরাত্মার দ্বারা জগতের সনাতন লোকসকল উৎপীড়িত হইতেছে। অতএব আপনি পৃথিবীর ভারাপনোদন করুন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই কাহিনীর পর আছে :

হেন শুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ॥

এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে॥

কংসাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত নারায়ণ যে দেবতাদের হস্তে শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণের দুইটি কেশ প্রদান করিয়াছিলেন—সে কথা বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত আছে।

মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-বনমালী ও হলধর-বলরামের জন্মকাহিনী বর্ণনায় পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডের কাহিনীকে বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডের বিবরণের সঙ্গে এক্ষেত্রে পদ্মপুরাণের কাহিনী মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে। এখানে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:

হিরণ্যাক্ষস্য ষট্পুত্রান্ সমানীয়াবনীতলে।
বসুদেবস্য পত্ন্যাস্তু দেবক্যাং সন্নিবেশয়॥
অনন্তাংশ সপ্তমোঽত্র সম্প্রবিষ্টস্তু মা চিরম্।
তস্যাঃ সপত্ন্যাং রোহিণ্যাং দদস্ব শুভদর্শনে॥
ততোঽষ্টমে মমাংশস্তু দেবক্যাং সম্ভবিষ্যতি।
নন্দগোপস্য পত্ন্যাস্তু যশোদায়াং সনাতনী॥

—পরমেশ নারায়ণী মায়াকে বলিলেন, তুমি হিরণ্যাক্ষের ছয় পুত্রকে অবনীতলে আনয়ন করিয়া বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে স্থাপন কর। হে শুভদর্শনে, দেবকীর সপ্তম পুত্র অনন্তের অংশ, সেই অনন্ত অচিরেই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিবেন। তাঁহাকে তুমি রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত করিবে। অনন্তর অষ্টম গর্ভে আমার অংশ দেবকী হইতে উৎপন্ন হইবে। নন্দগোপ পত্নী যশোদার গর্ভে তোমার অংশভূতা মহানিদ্রা আবির্ভূতা হইবেন।

এই সকল অংশ পাঠ করিলে বুঝা যায় বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্যের নায়ক কৃষ্ণের জন্মকথা বর্ণনায় পুরাণকে লঙ্ঘন করেন নাই।

জন্মখণ্ডের অন্তর্গত নারদ একটি উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক চরিত্র। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে নারদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে:

আয়িলা দেবের সুমতি গুণী।
কংসের আগক নারদ মূনী॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী॥

পুরাণে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পরবর্তী প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নারদকে যে ভাবে অঙ্কন করা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নারদ চরিত্র তাহা হইতে অনেক বিকৃত রূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

মূল এবং অর্বাচীন বিবিধ পুরাণে নারদের বর্ণনা আছে, রামায়ণ মহাভারতেও নারদের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস জন্মখণ্ডে নারদের যে রূপ অঙ্কন করিয়াছেন তাহা পুরাণভিত্তিক নয়। হরিবংশে নারদের নৃত্য কৌতুকাদির বিবরণ আছে বটে, কিন্তু জন্মখণ্ডের নারদ ও হরিবংশের নারদের মধ্যে রূপ ও প্রকৃতিগত কোনো সাদৃশ্য নাই।

কৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব তাহার নবজাত পুত্রকে যমুনার পরপারে নন্দ-যশোদার ঘরে রাখিয়া, যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাকে সকলের অলক্ষ্যে গৃহে লইয়া আসিল। অতঃপর কৃষ্ণ গোকুলে ক্রমেই বড় হইতে লাগিল এবং কংস যে-কোনো উপায়ে কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিল। কংসের প্রেরিত পুতনাকে কৃষ্ণ স্তন্যপানের ছলে সংহার করিল। অতঃপর একে একে যমল অর্জুন কেশী আদি অসুর আসিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণ তাহার প্রচণ্ড শক্তিবলে সকলকেই ক্রমে হত্যা করিল। এ কাহিনী পুরাণভিত্তিক। তবে যমলার্জুনের প্রসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কিছুটা ভিন্নরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বা ভাগবতে যমলার্জুন দুইটি বৃক্ষ রূপে বর্ণিত। কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দুইটি অর্জুন বৃক্ষে পরিণত হয়। কৃষ্ণের স্পর্শে ইহাদের শাপমুক্তি ঘটে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যমলার্জুন দুইটি অসুরবিশেষ, কৃষ্ণ-নিধনের জন্য কংস কর্তৃক ইহারা প্রেরিত হয় এবং কৃষ্ণের একটিমাত্র আঘাতেই উভয়ের মৃত্যু ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত পুরাণ-অনুসৃত হইলেও, রাধার জন্মকাহিনী পুরাণকে অনুসরণ করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। সকল প্রাচীন পুরাণে রাধার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। ভাগবত, হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণে রাধার প্রসঙ্গ নাই, অপর দিকে পদ্মপুরাণ বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার কাহিনী পাওয়া যাইতেছে। পদ্মপুরাণে রাধার মাতার নাম কীর্তিদা বা কীর্তিকা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বর্ণনা- রাধা বৃষভানুর মহিষী কলাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। রাধা যে কৃষ্ণের সম্ভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল—এমন কথা কোনো পুরাণে নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য স্বর্গের দেবতারা লক্ষ্মীকে মর্ত্যভূমিতে রাধারূপে অবতরণ করিতে নির্দেশ দিলেন। তাই রাধা পৃথিবীতে নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু কাহার ঘরে? বৃষভানু কলাবতী বা কীর্তিকার গৃহে নয়; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার পিতার নাম সাগর এবং মাতার নাম পদুমা বা পদ্মাবতী :

> কাহাঞির সম্ভোগ কারণে।
> লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে॥
> আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
> থির হউ সকল সংসার॥ আল রাধা॥
> তেকারণে পদুমা উদরে।
> উপজিলা সাগরের ঘরে॥ ল॥ আল রাধা॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী স্বতন্ত্র নয়। রাধারই আর এক নাম 'রাধা চন্দ্রাবলী'। দানখণ্ডে আছে, 'নাম তোর রাধা চন্দ্রাবলী', বাণখণ্ডে আছে, 'বড়ায়ির বচন শুনি রাধা চন্দ্রাবলী'। কিন্তু পুরাণ কাহিনীতে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন নয়। তবে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে

রাধাকে দুই এক স্থলে চন্দ্রাবলী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা বারবার বলিয়াছে, 'তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মেত মাউলানী', কিংবা, 'ভাগিনা তোহ্মাক জানী আহ্মে তোর মাউলানী'।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার সখীদের প্রসঙ্গ আছে বটে কিন্তু কোথাও তাহাদের নামোল্লেখ নাই। কৃষ্ণেরও কোনো সখার নাম উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু পদ্মপুরাণে রাধার সখী এবং কৃষ্ণের সকল সখার নামের উল্লেখ ও বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ভাগবতের উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়িয়াছে বৃন্দাবনখণ্ডে। এই খণ্ডের মূল বর্ণনীয় বিষয় 'রাস'। গীতগোবিন্দে আমরা বাসন্ত-রাস এবং ভাগবতে শারদ-রাসের চিত্র পাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডে যে রাসের চিত্র আছে তা—বাসন্ত। লক্ষণীয়, ভাগবত বা গীতগোবিন্দ—উভয়ত্রই কংসবিনাশের পরবর্তীকালের বৃন্দাবনে কৃষ্ণের রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কংসধ্বংসের পূর্বেই বৃন্দাবনখণ্ডে রাসলীলার বর্ণনা পাই। রাধাবিরহ অংশের সর্বশেষ ছত্রেও জানিতে পারি তখনও কংসের বিনাশ হয় নাই। কৃষ্ণ বড়াইকে বলিতেছে :

মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবো মো কংসের বিনাস॥

সুতরাং, যদিও গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন উভয় কাব্যের অন্তর্গত রাসই বাসন্ত-রাস, কিন্তু কালক্রমের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাস কংসবধের পূর্বে, গীতগোবিন্দের রাস কংসবধের পরবর্তীকালে। বস্তুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাসন্ত-রাস বাহিরের প্রসাধন কলায় গীতগোবিন্দকে অনুসরণ করিলেও, কালক্রমের দিক হইতে তা বিশেষভাবে গর্গসংহিতা বা ব্রহ্মবৈবর্তের অনুসারী। তবে তাহার অন্তরঙ্গ সাধনবেগ একান্তভাবেই ভাগবতের দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে' ইত্যাদি পদে জয়দেবের আক্ষরিক অনুবাদ থাকিলেও, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-বনবিলাস একান্তভাবেই ভাগবতীয় রাসের অনুকরণজাত। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের অনুসরণে বসন্তের উদ্বোধন করিলেও, কাব্য-মধ্যে যে রাস-নাট্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে তা নিতান্তই ভাগবতীয় শারদ-রাসের প্রকারভেদমাত্র, প্রকৃতিতে অভিন্ন।'

ভাগবতে কৃষ্ণলীলার ক্রমটি হইল—কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ, রাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ক্রম হইল—রাস (বৃন্দাবনখণ্ড) কালীয়দমন এবং শেষে বস্ত্রহরণ (যমুনাখণ্ড)। ভাগবতে রাসলীলার সময় ছিল জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে রাসলীলার বর্ণনা পাই তাহার সময় পূর্বাহ্ণ। কাহিনীর ক্রম ও সময়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকিলেও অন্য ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। ভাগবতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও দেখি রাসলীলা-কালে সকল গোপী রাধা অপেক্ষা আপনাকে অধিক কৃষ্ণপ্রিয় বলিয়া মনে করিতেছে, 'সহ্মে জানিল আপণে। রাধাতে আধিক কাহ্ন মণে॥' বৃন্দাবনখণ্ডে রাধার সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণ যেভাবে বিলাস করিয়াছে তাহাও কিছু পরিমাণে ভাগবত কাহিনীর অনুসারী।

গোপীগণের সহিত বিলাসের পর 'সংহরী সকলে দেহে। গোপী এড়ি কুঞ্জগেহে। বিকল গোবিন্দ মুরারী রাধার নেহে॥ গেলা রাধিকার পাশে। সুরতি রসের আশে।'—তখন রাধার সকল সখী কৃষ্ণবিরহে বিলাপ করিতে লাগিল, 'বিলাপিলা সকল যুবতী। লাগ না পাইআঁ দেব আধিপতি॥' এই সকল বর্ণনা মনে হয় ভাগবতের রাসলীলার কাহিনীকে অনুসরণ করিয়াই রচিত হইয়াছে।

'বৃন্দাবনখণ্ডের রাসলীলা মূলতঃ ভাগবতের অনুসরণে রচিত হইলেও কবি এখানে কৃষ্ণের লীলাবাসনার গভীরে একটি স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা উপস্থিত করিয়াছেন, যাহার ফলে বড়ু চণ্ডীদাস একই সঙ্গে ভাগবতকে অনুসরণ ও অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ রাধাবাক্যের আনুগত্যে রাসলীলায় ব্রতী হইয়াছে দেখা যায়। এ সংবাদ ভাগবত তথা গীতগোবিন্দ পাঠকের নিকট অভিনব। রাধার বাসনানুসারে গোপীসমাজে কৃষ্ণপ্রণয়িণী রাধাকে কলঙ্কভয়মুক্ত করিতে এবং সকল সখীকে রাধার অনুগত করিবার গূঢ়মানসে কৃষ্ণ রাসলীলায় অবতীর্ণ হয়। বৃন্দাবনখণ্ডে রাধার সম্পর্কে কবির বর্ণনা :

বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে।
আড় নয়নে দেখে কাহ্নাঞিঁক পাশে॥
খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার।
সঘন ছাড়িল রাধা হাথী আপার॥

কৃষ্ণও রাধাকে লইয়া নিভৃতে বিহার করিতে আগ্রহী :

তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আনুমতী।
তথাঁক না লইহ লোক কেহ সংহতী॥
সকল শরীর মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার।
তেহ্ন সব বন মাঝেঁ এ বন আহ্মার॥

কৃষ্ণের আহ্বানে রাধার আপত্তি নাই, বাধা আছে। রাধা কৃষ্ণকে জানায় :

তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে।
আর সংহতী এড়িব কেনমণে॥
যত দেখ মোর সখিগণে।
কাহারো ভাল নহে মণে॥ ল কাহ্নাঞি॥
তেহ্ন কর উপায় আপণে।
ভাল বোলে যেহ্ন সখিগনে॥

রাধার কথায় কৃষ্ণ প্রফুল্লচিত্তে সম্মতি জানাইয়া রাধাকে বলে :

রাধা ল।
আপনে কহিলে মোর মনের কথা।
সুণিআঁ খণ্ডিল সব বেথা॥

ষোল সহস্র তোর সখিগণ।
সভার তোষিব আহ্মে মন ॥
... ...
একেঁ একেঁ রাধা যত গোপীগণ দেখী।
আজি সে করায়িবোঁ তোর সখী ॥
কেহো কাহাকো যেন না করে উপহাস।
তেহ্নমতেঁ করিব বিলাস ॥

রাসলীলাকালে কৃষ্ণের এইরূপ অভিপ্রায় ভাগবতে দুর্লভ।

যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডে কৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের কাহিনীটি পৌরাণিক। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ কালীয়নাগ দমনে উদ্যোগী হইয়াছে তাহা পুরাণভিত্তিক নয়। সখীদের সহিত জলক্রীড়া করিবার উপযুক্ত স্থান কালীয়দহ। এই জল সম্পূর্ণ বিষমুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণ দহে ঝাঁপ দিল। কালীয়নাগের দংশনে কৃষ্ণ অচৈতন্য হইয়া পড়িল। তাহার আত্মজ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার জন্য বলরাম দশাবতারের স্তব করিল। কিন্তু এখানে পুরাণের দশাবতার স্তবের ক্রমটি সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই। বরাহপুরাণে আছে :

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ ॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বলরাম দশ অবতারের নাম এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছে—মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রামচন্দ্র বুদ্ধ কল্কী ও কৃষ্ণ। অর্থাৎ কৃষ্ণকে এখানে সকলের শেষে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পরিবর্তন কবি কাহিনীর প্রয়োজনেই করিয়াছেন।

শুধু কাহিনী নির্মাণে যে পুরাণের প্রভাব রহিয়াছে তাহা নয়, বিভিন্ন বর্ণনায় পাত্রপাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে উপমা নির্বাচনে ও নানা সাদৃশ্য আবিষ্কারে পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। সে ক্ষেত্রেও পুরাণ কাহিনীর প্রতি কবির আগ্রহ ও সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির আলোচনা করা যাইতে পারে।

দানখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের হাত হইতে নানাভাবে নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা করিয়াছে। রাধা কৃষ্ণকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছে :

পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।
দেখ যত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার ॥

'পরদারে পাপ নাহি'—এই কথাটি প্রমাণ করিবার জন্য বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে দিয়া পুরাণ হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কৃষ্ণের উক্তি :

পাঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।
পাঞ্চ পতী যার ভৈল সব লোকেঁ জাণী ॥

রম্ভা আদি বেশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।
হেন সব কণ্যা কেহ্নে সুরপুরে বসে॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরেঁ শিরে ধরে।
হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নরে॥
নারীর সম্ভোগে রাধা যদি পাপ বসে।
এ তিন ভুবনেঁ কেহ্নে সে গঙ্গা পরসে॥

ইহার বিপক্ষে রাধারও পুরাণের ঘটনা উল্লেখ কবিয়া অনেক কথা বলিবার আছে। রাধা বলে :

গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।
আজ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে॥
কপটে আহুল্যাক রমিল সুববরে।
সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে॥

কিংবা,

সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুঈ ভাই।
তিলোত্তমা হেতু দুঈ মযিলা এক ঠাই॥
সুম্ভ নিসুম্ভ দুই আসুর আছিলা।
পার্বতীর কাবণে দুঈ জন মৈলা॥

কাহিনীর এই সকল অংশে রাধা ও কৃষ্ণেব তীক্ষ্ণ ও চটুল উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলিকে চমৎকার ভাবে সমন্বিত করা হইয়াছে। এখানে পুরাণের এই প্রসঙ্গগুলি কাহিনীর পক্ষে অনাবশ্যক বা বাহুল্য বলিয়া বোধ হয় না। পরবর্তী কালে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও দেখি কাহিনীর মধ্যে নানা স্থানে পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে মুকুন্দরাম সর্বক্ষেত্রে বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় সার্থকভাবে পুরাণকথাকে কাহিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে কালকেতু উপাখ্যানে বিশ্বকর্মার দশাবতার লিখন, চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ, চণ্ডীপ্রসঙ্গে কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ, দেবীর শতনাম কথন এবং ধনপতি উপাখ্যানে উজানী বন্দনা, দেবকন্যাগণের পরিচয়, রমণ প্রসঙ্গে লহনার প্রতি খুল্লনার উত্তর ইত্যাদি অংশের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পুরাণ প্রসঙ্গকে যে বড়ু চণ্ডীদাস কত বিচিত্রভাবে কাহিনীর মধ্যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বাণখণ্ডে বড়াই রাধাকে বলিতেছে, কৃষ্ণের নিকট তুমি যদি ক্ষমা প্রার্থনা না কর তাহা হইলে সে এখনই পুষ্পশর দিয়া তোমাকে কঠিনভাবে আঘাত করিবে, তোমার প্রাণ হরণ করিবে। বড়াইয়ের কথায় রাধা বিন্দুমাত্র শঙ্কিত বা বিচলিত না হইয়া বলে :

হাতে ধরী ধনু বাণে কাহ্নু আসু বিদ্যমানে
তভোঁ তাক নাহিঁ মোর ডরে।

রাধা এতখানি সাহস কোথা হইতে পাইল? কংস কিংবা তাহার স্বামী আইহন আসিয়া কি তাহাকে রক্ষা করিবে? তাহা নয়, রাধা এখন নিজের মধ্যেই আপন সাহস ও শক্তির সন্ধান পাইয়াছে। তাই সে বলে:

সুণ বড়ায়ি ল
বোল গিআঁ গোবিন্দক বাতে। এআ।
তীন ভুবন বীর রাখএ যৌবন ধন
কি করিতেঁ পারে জগন্নাথে॥

বিনতানন্দন গরুড় নাসিকার, রাজা পাণ্ডু গণ্ডদেশের, বরুণ-পাশ কর্ণদ্বয়ের এবং গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্তবিম্বৌষ্ঠের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। কুচযুগে যুধিষ্ঠির, বাহুতে মনোহর দণ্ড এবং দেহে সুগ্রীব আনন্দে বাস করে। নাভিদেশে দৈত্যপতি বলি, নিতম্বযুগলে বেণপুত্র পৃথু এবং কটিদেশে সিংহের অবস্থান। গুরু জঘন দেশে নৃপ পুরু এবং পদনখে নক্ষত্ররাজির বসবাস। সুতরাং কৃষ্ণের নিকট রাধার আর ভীত হইবার কি আছে?

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রাচীন পুরাণ কাহিনী হইতে নানা উপাদান গ্রহণ করা হইলেও বড়ু চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কোনো নূতন পুরাণ কাহিনী বা কৃষ্ণমাহাত্ম্য কাব্য রচনা করিতে চাহেন নাই। বস্তুতঃ তিনি পুরাণের একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামোর উপর একটি বৃহৎ লৌকিক কাহিনী-কাব্য রচনা করিয়াছেন। বহু অপৌরাণিক কাহিনীর সমাবেশে পৌরাণিক গুরুত্ব কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেও কাব্যরস তাহাতে কিছুমাত্র তরল হয় নাই। তাম্বুলখণ্ডে কৃষ্ণের প্রেমপ্রস্তাব স্বরূপ তাম্বুলাদি প্রেরণ, দানখণ্ডে কৃষ্ণের দানী সাজিয়া রাধার নিকট মহাদান গ্রহণ, নৌকাখণ্ডে যমুনা পারকরণ ও জলমধ্যে রাধার সহিত মিলন, ভারখণ্ডে কৃষ্ণের মজুরিয়া সাজিয়া রাধার দধি দুধের পসার বহন, ছত্রখণ্ডে রাধার মাথায় ছত্রধারণ, যমুনাখণ্ডে বিভিন্ন সখী ও রাধা সহ কৃষ্ণের জলকেলি, হারখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার হার অপহরণ, বাণখণ্ডে কৃষ্ণের পুষ্পবাণ নিক্ষেপণ, বংশীখণ্ডে রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বংশী অপহরণ ও মিথ্যাচরণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঘটনা কোনো পুরাণের অন্তর্গত নয়। এগুলির কিছু কিছু কবির স্বকপোলকল্পিত এবং অধিকাংশই প্রচলিত লোককাহিনী হইতে সংগৃহীত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও তাহার পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত প্রায় প্রত্যেক খণ্ডেই বিভিন্ন পদের মধ্যে বিবিধ প্রসঙ্গে বহু পৌরাণিক চরিত্র বা নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সেই সকল প্রসঙ্গ একত্র সংকলন করিয়া পৌরাণিক নামগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হইল। সেই সঙ্গে পৌরাণিক পরিচিতিও প্রদত্ত হইল:

অর্জুন—তৃতীয় পাণ্ডব। স্বামী পাণ্ডুর ইচ্ছানুসারে কুন্তী ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া অর্জুনকে লাভ করেন। অর্জুন প্রথমে কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ

করেন। ইনি ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় ইনিই সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় চক্রমধ্যে মৎস্য লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়া ইনি দ্রৌপদীকে লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দানখণ্ডের অন্তর্গত একটি পদে রাধিকার রূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি, 'আঞ্চল চঞ্চল তোর নয়ন খঞ্জনে। আর্জ্জুনের বাণ জিণী তাহার সন্ধানে ॥'

অহল্যা—গৌতম ঋষির পত্নী। ব্রহ্মা তাঁহার সৃষ্ট মানসপুত্রী অহল্যাকে শুদ্ধচিত্ত ঋষি গৌতমের হস্তে দান করেন। গৌতমের সহিত অহল্যার বিবাহ হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র ঈর্ষান্বিত হন। একদিন গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া অহল্যার সহিত মিলিত হন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি, 'কপটে আহুল্যাক রমিল সুরবরে। সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে ॥' অর্থাৎ সুরনাথ ইন্দ্র কপটকৌশলে অহল্যাকে রমণ করেন এবং তাহার ফলে তাঁহার কলেবর সহস্র যোনিচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া যান।

আইহন—রাধার নপুংসক স্বামী। আইহনের পিতার নাম গোল, মাতার নাম জটিলা। ইহারা জাতিতে গোপ। আইহনের প্রকৃত নাম অভিমন্যু। আয়ান বা রায়ান নামেও ইনি পরিচিত। ইহার পিতা গোল কৃষ্ণের মাতামহীর ভ্রাতা। অর্থাৎ আইহন হইলেন কৃষ্ণের মামা। এই কারণে রাধা হইলেন সম্পর্কে কৃষ্ণের মামী। দেবাভিপ্রায়ে রাধা তাঁহার স্বামীকে ভজনা না করিয়া সমস্ত মনপ্রাণ কৃষ্ণে সমর্পণ করেন।

আগমপুরাণ—তন্ত্রাদি শাস্ত্র। দানখণ্ডে রাধার উক্তি, 'বিচারিআঁ চাহ কাহ্নাঞি আগম পুরাণে। কত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার মনে ॥'

কংস—মথুরার রাজা। 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।' পাপী, প্রজাপীড়ক, অসুররাজ কংসকে নিধন করিবার জন্য দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কংসাসুরের যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে আছে।

কালীয়—বিষধর সর্পরাজ। গরুড়ের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে ভয়ে সমুদ্র ত্যাগ করিয়া কালীয়দহে আসিয়া আশ্রয় লয়। সর্পরাজের বিষে হ্রদের জল বিষাক্ত হইয়া যায়। কৃষ্ণ এই হ্রদে ঝাঁপ দিয়া কালীয়নাগকে দমন করিলেন। সে প্রাণভিক্ষা চাহিলে কৃষ্ণ তাহাকে কালীয়হ্রদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় সমুদ্রে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কালিয়দমনখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক কালীয়দমনের বৃত্তান্ত আছে।

কুন্তী—পঞ্চপাণ্ডবের জননী। যদুবংশীয় রাজা শূরের কন্যা ও কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগিনী। 'পাঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।'—দানখণ্ড।

কৃষ্ণ—কংসকে নিধন করার জন্য পৃথিবীতে কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। কৃষ্ণের পিতার নাম বসুদেব, মাতার নাম দৈবকী। দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম হয়। দৈবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহকালে দৈবকীর ভ্রাতা কংস এক দৈববাণীতে শোনেন যে তাঁহার ভগিনী দৈবকীর অষ্টম গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন তিনি কংসের নিধনকারী।

কংস তাই দৈবকীর সকল পুত্রকে একের পর এক হত্যা করিয়া বিনষ্ট করিলেন। অষ্টম পুত্র কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা বসুদেব স্বীয় পুত্রকে ঘোর অন্ধকার রাত্রে যমুনার পরপারে গোকুলে নন্দের ঘরে তাঁহার স্ত্রী যশোদার কোলে রাখিয়া তাঁহার সদ্যোজাত শিশুকন্যাটিকে আনিয়া দৈবকীর পার্শ্বে রাখিয়া দেন। নূতন শিশুকন্যাটিকেই দৈবকীর গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া কংস তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কংস শিশুকন্যাটিকে বধ করিবার পূর্বেই সে কংসের বিনাশকারীর কথা ব্যক্ত করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। কৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য কংস তখন নানা ভাবে চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অবশেষে কংসকে কৃষ্ণের হাতে পরাজিত ও নিহত হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা এই : কেশব, গদাধর, গোবিন্দ, জগন্নাথ, দামোদর, মধুসূদন, মাধব এবং হরি।

কেশী—দানব। কংসাসুরের অনুচর। কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য কংস কর্তৃক প্রেরিত হয়। বৃন্দাবনে এই অশ্বরূপী দৈত্য নানা উপদ্রব আরম্ভ করে। কৃষ্ণ তাহাকে বধ করিতে গেলে সে কৃষ্ণকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন কৃষ্ণ দৈত্যের মুখগহ্বরের মধ্যে বিশাল বাহু ঢুকাইয়া তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করেন। 'কেশি আদি আসুর পাঠাইল আনন্তরে। তা সব মাইল কাহ্নু বিষম সমরে ॥'—জন্মখণ্ড।

গদা—কৌমোদকী। 'হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী। শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী ॥'—জন্মখণ্ড।

গরুড়—পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন। পিতা ঋষি কশ্যপ ও মাতা বিনতা। 'চঢ়িলা কালীয়নাগশিরে। গরুড়বাহন মাহাবীরে ॥'—কালিয়দমনখণ্ড।

গোকুল—যমুনার বামতীরবর্তী মথুরার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। নন্দ-যশোদা এইস্থানে বাস করিতেন। কৃষ্ণ ও বলরামের বাল্যকাল এখানে অতিবাহিত হয়। 'ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল। এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥' —রাধাবিরহ।

চক্র—সুদর্শন। 'হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী। শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী ॥'—জন্মখণ্ড।

তারা—দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী। 'গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে। আত্মাপিহো অপযশ তার পরচরে ॥'—দানখণ্ড।

দৈবকী—বসুদেবের স্ত্রী। কৃষ্ণ ইহার অষ্টম গর্ভজাত সন্তান।

নন্দ—কৃষ্ণের পালক পিতা। ইনি যশোদার স্বামী। মথুরার পরপারে গোকুলে নন্দের বাস। ইহারা জাতিতে গোপ।

নারদ—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে ইনি ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন। সংবাদ পরিবেশন, পরামর্শ প্রদান এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও বিবাহাদি সংঘটনে ইহার কর্মদক্ষতা অসাধারণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে নারদের প্রসঙ্গ আছে। 'আম্বিলা দেবের সুমতি গুণী। কংসের আগক নারদ মুনী ॥'—জন্মখণ্ড।

পঞ্চপাণ্ডব—পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। 'পাঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী। পাঞ্চ পতী যার ভৈল সব লোকেঁ জাণী॥'—দানখণ্ড।

পরাশর—ব্যাসদেবের পিতা ও কলিযুগের ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক ঋষি। 'পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল। তীন ভুবনে জানী তপস্থা যাহার॥'—দানখণ্ড।

পুতনা—মায়াবিনী দানবী। কংসাসুরের অনুচরী। বকাসুরের ভগিনী ও বালীর কন্যা। কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য পুতনা কংস-কর্তৃক গোকুলে প্রেরিত হইয়াছিল। পুতনা মায়ার বলে সুন্দরী স্ত্রীমূর্তিরূপে গোকুলে নন্দগৃহে উপস্থিত হয়। যশোদাকে মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া পুতনা কৃষ্ণকে কপট স্নেহ দেখাইয়া তাহার বিষাক্ত স্তন্য পান করাইতে চেষ্টা করে। কৃষ্ণ স্তনপানের ছলে পুতনার জীবনীশক্তি শোষণ করিয়া তাহাকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে আছে, 'প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল। তনপান ছলে কাহ্নু তাক সংহরিল॥'

পৃথু—বেন রাজার পুত্র। ঋগ্‌বেদের মধ্যে এই নামের উল্লেখ আছে। পৃথু ঋগ্‌বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইন্দ্র সম্বন্ধে ইনি কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। পৃথুর পিতা বেন অত্যন্ত অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক রাজা ছিলেন। বেনের রাজত্বকালে সকল ধর্মকর্ম বিলুপ্ত হইতে বসিলে ঋষিরা ক্রুদ্ধ হইয়া বেনকে নিহত করেন। বেনের বাম উরু নিষ্পেষণ করিয়া নিষীদ ও দক্ষিণবাহু মন্থন করিয়া পৃথু উদ্ভূত হন। পৃথুকে ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা পৃথিবীর রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করেন। পৃথু পৃথিবীকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথুর কন্যা বলিয়া বসুন্ধরার আর এক নাম পৃথ্বী। 'বলি বসে নাভীতলে পৃথু নিতম্ব যুগলে মাঝদেশে সিংহ বিগুমানে॥'—বাণখণ্ড।

বলভদ্র—পিতা বসুদেব ও মাতা রোহিণীর পুত্র এবং কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি বলরাম ও বলদেব নামেও পুরাণে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে আছে, 'দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল। সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল॥ মাএর গর্ব্ভপাত ছল করিআঁ। আপণে রহিলা রোহিণীগর্ব্ভ গিআঁ॥' বলভদ্রের এই জন্মবৃত্তান্ত পুরাণভিত্তিক। বিষ্ণুপুরাণে বলভদ্রের আর এক নাম সঙ্কর্ষণ। ইঁহার বাহন বা অস্ত্র হল। তাই ইনি হলধর বা হলায়ুধ নামেও পরিচিত। কালিয়দমনখণ্ডে জলমগ্ন অচৈতন্য কৃষ্ণের চেতনা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন এই বলভদ্র।

বলি—দৈত্যপতি। 'বলি বসে নাভিতলে।'—বাণখণ্ড।

বসুদেব—কৃষ্ণের পিতা, দৈবকীর স্বামী। বসুদেবের অপর স্ত্রীর নাম রোহিণী। দৈবকীর গর্ভে বসুদেবের অষ্টম পুত্র কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

বারাণসী—কাশী। হিন্দুদের পবিত্র প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। দানখণ্ডে রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি, 'তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরুপেসি জাণ। তোহ্মে মোর সব তীথ তোহ্মে পুণ্যস্থান॥'

বিশ্বকর্মা—দেবশিল্পী। বেদে ইহাকে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা বলিয়া উল্লেখ করা

হইয়াছে। দানখণ্ডে রাধার রূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি, 'কোণ বিশ্বকর্ম্মে নির্ম্মিল তুহ্মি তন। আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন ॥'

বিষ্ণুপুর—বৈকুণ্ঠ। তাম্বূলখণ্ডে রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি, 'যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হএ মুকতী। সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥'

বৃন্দাবন—রাধা-কৃষ্ণের লীলাভূমি।

বেদব্যাস—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে খ্যাত বেদবিভাগকর্তা। ইনি পরাশরের পুত্র ও শুকদেবের পিতা। ইনি বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস নামে অভিহিত হন। 'জলমাঝে মীনকণ্যা করিল গমন। তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন ॥'—দানখণ্ড।

ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্তা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে আছে কংসকে কিভাবে বিনাশ করা যায় তাহা নির্ধারণের জন্য স্বর্গের দেবতারা সকলে মিলিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। 'সক্ষেই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাঁএ।'

ভৈরবপতন—জহ্নু আশ্রম। হিমালয়স্থ গঢ়বাল প্রদেশের গঙ্গোত্রীর নিম্নদেশে এবং ভাগীরথী ও জাহ্নবী নদীর সঙ্গমস্থলে। 'আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াইলি গিআঁ। গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ ॥'—দানখণ্ড।

মথুরা—কংসের রাজধানী।

মদন—প্রেম ও কামের অধিদেবতা, কামদেব, কন্দর্প, অতনু, অনঙ্গ, মন্মথ, মনসিজ, মনোভব, পঞ্চশর, পুষ্পধন্বা, মকরকেতন, স্মর, রতিপতি। মদন ব্রহ্মার মন হইতে সৃষ্ট সৃষ্টিলীলার সহায়ক এক সুন্দর পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গে মদনের নাম বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার হৃদয় মদনের পঞ্চশরের দ্বারা আঘাত করেন। বাণখণ্ডে রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি, 'মারিবোঁ জুড়িআঁ মদন পাঁচ বাণে।'

মীনকন্যা—মৎস্যগন্ধা। প্রকৃত নাম সত্যবতী। পরাশরের ঔরসে ইঁহার গর্ভে বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম হয়। 'জলমাঝে মীনকণ্যা করিল গমন। তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন ॥'—দানখণ্ড।

যমলার্জুন—কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দুইটি অর্জুন বৃক্ষে পরিণত হয়। কৃষ্ণ ইহাদের ভগ্ন করেন। শিশু কৃষ্ণ অত্যন্ত উপদ্রব করিয়া বেড়ান দেখিয়া যশোদা পুত্রকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া এক উদূখলের সহিত বাঁধিয়া রাখেন। কৃষ্ণ সেই উদূখল টানিয়া টানিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিতে থাকেন। সেই উদূখল অকস্মাৎ অর্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মাঝে আটকাইয়া যায় এবং কৃষ্ণের টানে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। কৃষ্ণের স্পর্শে তাহাদের শাপমুক্তি ঘটে। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যমলার্জুনের এই কাহিনী আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে কৃষ্ণ-নিধনের জন্য কংস যমলার্জুনকে প্রেরণ করেন। 'তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল। একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল ॥'—জন্মখণ্ড।

যশোদা—নন্দের স্ত্রী। ইনি কৃষ্ণের পালিকা মাতা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কালিয়দমন-খণ্ডে কৃষ্ণ কালীদহে ঝাঁপ দিলে ব্যাকুল উদ্বেগে গোকুল হইতে নন্দ যশোদা কৃষ্ণকে

দেখিতে ছুটিয়া আসেন। 'নন্দ যশোদা ধায়িআঁ আইলা সেই থানে।' হারখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক হার অপহরণের কথা রাধা যশোদাকে বলিয়া দেন। 'রাধাবচনমাচম্য গাঢ়ং দরভরাতুরা। যশোদা রোষকলুষং রহসি প্রাহ কেশবং॥'

যুধিষ্ঠির—পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ। 'কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহু দণ্ড মনোহর সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে।'—বাণখণ্ড।

রম্ভা—স্বর্গরাজ্যের অপ্সরা। ক্ষীরোদসাগর মন্থনের সময় রম্ভার অবির্ভাব হয়। 'রম্ভা আদি বেশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে। হেন সব কণ্যা কেহ্নে সুরপুরে বসে॥'—দানখণ্ড।

রাধা—কৃষ্ণ-প্রেমিকা গোপবালিকা। পিতা বৃষভানু ও মাতা কলাবতী। নপুংসক আয়ান ঘোষের (আইহন) সহিত রাধার বিবাহ হয়। কিন্তু দেবাভিপ্রায়ে রাধা তাঁহার সকল মনপ্রাণ কৃষ্ণে সমর্পণ করেন। কংসাসুর বধের জন্য ভগবান কৃষ্ণ গোপ-বালকের বেশে মর্ত্যে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য স্বর্গের দেবগণ লক্ষ্মীকে রাধা রূপে প্রেরণ করেন। এই রাধা ও কৃষ্ণের বিরহ-মিলনের কাহিনী লইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত।

রাবণ—শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিহত লঙ্কাধিপতি, দশানন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে কৃষ্ণ রামরূপে রাবণকে বধ করেন। কালিয়দমনখণ্ডে বলভদ্রের উক্তি, 'শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।' কিংবা রাধাবিরহ অংশে রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি, 'রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম আহ্মার গুণ তোহ্মে কথা।'

রাম—রামায়ণের নায়ক চরিত্র। দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাতা রাণী কৌশল্যা। মিথিলারাজ জনকের হরধনু ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থে লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে লইয়া চৌদ্দ বৎসর বনবাসী হন। লঙ্কার যুদ্ধে ইনি রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত ও নিহত করেন। চৌদ্দ বৎসর পর অযোধ্যায় ফিরিয়া রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রামচন্দ্রের প্রসঙ্গ নানা স্থানে আছে। কালিয়দমনখণ্ডে বলভদ্র অচৈতন্য কৃষ্ণকে তাঁহার পূর্বজন্মের কীর্তির কথা স্মরণ করাইয়া একস্থানে বলিতেছেন, 'শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।' রাধাবিরহখণ্ডে রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি, 'রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম আহ্মার গুণ তোহ্মে কথা। সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা॥' রাধাবিরহখণ্ডেরই অপর একটি পদে রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, 'বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী। সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী॥' কৃষ্ণ রাধাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিলে রাধিকা সীতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন যে রামচন্দ্র বিনাদোষে সীতাকে ত্যাগ করিলে সীতা যতখানি বেদনা পাইয়াছিলেন তাহার অধিক কষ্ট ও যন্ত্রণা স্বয়ং রামচন্দ্রকেই সহ্য করিতে হইয়াছিল। রামায়ণে আছে, রামচন্দ্র বনবাস হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পর প্রজারা সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে। সীতা দীর্ঘদিন রাবণের গৃহে একাকী বন্দিনী থাকায় প্রজাদের মনে এই সন্দেহের ভাব জাগে। সতী জানিয়াও প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য রাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। লক্ষ্মণ

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামের আদেশ অনুযায়ী সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসেন।

রোহিণী—বসুদেবের স্ত্রী। ইনি বলভদ্রের মাতা ও কৃষ্ণের বিমাতা। 'মাএর গর্ব্তপাত ছল করিআঁ। আপণে রহিলা রোহিণীগর্ব্ভ গিআঁ॥'—জন্মখণ্ড।

লক্ষ্মী—নারায়ণের স্ত্রী। দেবনির্দেশে কৃষ্ণের সম্ভোগের নিমিত্ত লক্ষ্মী পৃথিবীতে রাধারূপে আবির্ভূত হন। 'কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে। লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে॥ আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার। থির হউ সকল সংসার॥'—জন্মখণ্ড।

শঙ্খ—পাঞ্চজন্য। 'হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী। শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী॥'—জন্মখণ্ড।

শান্তনু—চন্দ্রবংশীয় নরপতি, ভীষ্মের পিতা। 'ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরে শিরে ধরে। হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নরে॥'—দানখণ্ড।

শারঙ্গ—শার্ঙ্গধনু। মহিষ, শরভ ও রোহিত মৃগের শৃঙ্গনির্মিত ধনুক। 'হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী। শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী॥'—জন্মখণ্ড।

শুম্ভ-নিশুম্ভ—অসুর ভ্রাতৃদ্বয়। ইহারা স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে ও দেবতাদের বিতাড়িত করে। দেবী ভগবতী বা পার্বতীর হস্তে ইহারা নিহত হইলে দেবতারা পুনরায় স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পান। 'সুম্ভ-নিসুম্ভ দুই আসুর আছিলা। পার্বতীর কারণে দুঈ জন মৈলা॥'—দানখণ্ড।

সীতা—রামচন্দ্রের পত্নী, জনকনন্দিনী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার প্রসঙ্গে একাধিক স্থানে সীতার উল্লেখ আছে। তাম্বূলখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি বড়াইর উক্তি, 'আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি। সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী॥' রাধাবিরহখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি, 'বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী। সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী॥'

সুগ্রীব—কিষ্কিন্ধ্যাপতি বানররাজ। বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 'কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহু দণ্ড মনোহর সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে॥'—বাণখণ্ড।

সুন্দ-উপসুন্দ—দৈত্যরাজ নিকুম্ভের দুই পরাক্রমশালী পুত্র। ইহাদের একের হাতে অপরের মৃত্যু ঘটে। ব্রহ্মা ইহাদের সম্মুখে অপূর্ব সুন্দরী নারী তিলোত্তমাকে পাঠাইলে ইহারা প্রত্যেকেই তাঁহাকে আপন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে চায়। ফলে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ বাধে। এই বিরোধের ফলেই উভয়ের হাতে উভয়ের মৃত্যু হয়। 'সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুঈ ভাই। তিলোত্তমা হেতু দুঈ মরিলা এক ঠাই॥'—দানখণ্ড। 'পরদারে পাপ নাহিঁ মুনীর সমত'—কৃষ্ণ এই কথা রাধার নিকট প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিভিন্ন পুরাণ হইতে বহু প্রসঙ্গ উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করিলে রাধা তাহার প্রতিবাদ করিয়া এমন কতকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গের উদাহরণ দেন যেখানে 'পরদার' সম্পূর্ণ অমঙ্গল পাপরূপে নির্দেশিত আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সুন্দ-উপসুন্দ দৈত্যদ্বয়ের কথা উল্লেখ করেন।

সুববর—দেবরাজ ইন্দ্র। 'কপটে আহল্যাক রমিল সুববরে।'—দানখণ্ড।

হনুমান—রামের অনুচর। রাবণ-রাজ্য লঙ্কা হইতে সীতাকে উদ্ধারের কাজে হনুমান অসাধারণ কর্মদক্ষতার পরিচয় দেয়। তাম্বূলখণ্ডে কৃষ্ণের উক্তি, 'রাম কাজে হনুমন্তা। তেহেন আহ্মাব দূতা।'

হিবণ্যকশিপু—অসুরসম্রাট। মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী দিতির গর্ভে এই দৈত্যরাজের জন্ম হয়। ইহার অপব ভ্রাতার নাম হিরণ্যাক্ষ। এই দুই ভ্রাতা পূর্বজন্মে বৈকুণ্ঠে জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুর দ্বারপাল ছিল। পরে বিষ্ণুলোকে সনন্দাদি ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া জয় ও বিজয় প্রথমে হিবণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ রূপে, দ্বিতীয়বারে বাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে এবং তৃতীয়বাবে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ কবে। হিবণ্যকশিপুব স্ত্রীর নাম কযাধু। কনিষ্ঠ পুত্র প্রহ্লাদ। নরসিংহ-রূপধাবী বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেন। 'নরসিংহ রূপে হিবণ্য বিদারিলে। তোহ্মে না জানহ বাহী ॥'—দানখণ্ড।

নাটকীয় গুণ ও উপাদান

খণ্ডিত পদ সহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসংখ্যা চারিশতাধিক। এইগুলির মধ্যে গুটিকয়েক মাত্র পদ এবং কিছুসংখ্যক চরণ পৃথক করিয়া বাখিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে পুরাপুরি একটি নাট্যকাব্য বলিয়া উল্লেখ কবা চলিতে পারে। ইহার বিভিন্ন দিকে নাট্যরস নাট্যগুণ ও নাটকীয় উপাদান প্রচুর পবিমাণে বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-সম্পাদক বসন্তরঞ্জন বায গ্রন্থের ভূমিকায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত সতীশচন্দ্র বায় লিখিত 'চণ্ডীদাসেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কযেকছত্র উদ্ধৃত কবিযাছেন। তাহাতে আছে, "গীতগোবিন্দ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নাট্যকাব্যের ধবণে গ্রথিত হইলেও উহাতে নাটকীয ঘটনা অপেক্ষা মহাকাব্যোচিত স্বভাব বর্ণনারই একান্ত আধিক্য, কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনে নাটকীয ঘটনারই প্রাধান্য দেখা যায। কবি বাধা কৃষ্ণ ও বড়াইব সরস ও সতেজ উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বাবাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যেব ন্যায সকল রস ও ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকীয় উৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।' এ উক্তি যথার্থ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাটকীয় লক্ষণ বিচারপ্রসঙ্গে নাটকেব স্বরূপ কি তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয—নাটক একটি সম্পূর্ণাঙ্গ এবং জীবদেহেব ন্যায দৃঢ়পিনদ্ধ সাহিত্যিক রূপকল্প। তাই নাটকের তাৎপর্য ও সৌন্দর্য একটি অখণ্ড সমগ্রতায় বিধৃত। কযেকটি নাট্যদৃশ্যের পারম্পর্যময় গ্রন্থনমাত্র নাটকেব উদ্দেশ্য নয়। বিভিন্ন ঘটনা, চবিত্র, বিচিত্র নাট্যদৃশ্যের মধ্য দিযা একটি দ্বন্দ্বমুখর নাটকীয় action-কে রূপাভিব্যক্তি দান করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। সকল নাটকেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে নাট্যকার থাকিবেন প্রচ্ছদপটের অন্তরালে এবং তাঁহাব যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া পাঠকের নিকট ব্যক্ত করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রধানতঃ এই আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে। জন্মখণ্ডের পরে প্রায়

সমগ্র গ্রন্থই রাধা কৃষ্ণ ও বড়াইর কথোপকথন ও সংলাপে গঠিত। এবং ইহার ফলেই প্রকৃতপক্ষে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। সাগরনন্দীর তিনটি চরিত্রের দ্বারা অভিনেতব্য বীথি নামক যে নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহ্য লক্ষণ অনেকটা তদ্রূপ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে। তাম্বূলখণ্ড হইতেই মূল কাহিনীর শুরু। তাম্বূলখণ্ডের প্রথম দুইটি পদ কবির উক্তি। এই খণ্ডের তৃতীয় পদ (আচম্বিত বুঢ়া দেখি বৃন্দাবন মাঝে) হইতে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়া কবি কথা বলাইয়াছেন। কোনো পদ কেবল রাধার উক্তি, কোনো পদ কৃষ্ণের, কোনো পদ বড়াইর উক্তি। আবার কোনো পদে রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও বাদানুবাদ আছে, কোনো পদে কৃষ্ণ ও বড়াইর সংলাপ এবং কোথাও বড়াই ও রাধার কথোপকথন আছে। কিছুসংখ্যক পদে কবিও ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিবৃতি ও বর্ণনা দিয়াছেন। এখন কৃষ্ণ-বড়াই, বড়াই-রাধা এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রত্যেকেরই নাট্যগুণসমন্বিত উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কিছু পদের আলোচনা করা যাইতে পারে।

তাম্বুলখণ্ডের তৃতীয় পদের প্রথম দুই চরণ ভিন্ন সকল চরণই কৃষ্ণ ও বড়াইর উক্তি প্রত্যুক্তি সমন্বিত :

কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলাস কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে ॥
গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী ॥
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী ॥
পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি ॥
সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী।
কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ববাণী ॥
কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ ॥

বড়াই রাধাকে সঙ্গে লইয়া মথুরার পথে চলিয়াছিল। কিন্তু বনমধ্যে রাধা পথ হারাইয়া ফেলে। বৃন্দাবন মাঝে রাধাকে খুঁজিতে খুঁজিতে বড়াই রাখাল বালক কৃষ্ণের নিকট রাধার কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু রাধাকে কৃষ্ণ ইতিপূর্বে কখনো দেখে নাই, সে তাহার সন্ধান জানিবে কিরূপে? কৃষ্ণ তাই বড়াইর নিকট রাধার বর্ণনা শুনিতে চায়। বড়াই তখন কৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গের রূপ বর্ণনা করিতে বসে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিছক কাব্য হইলে রাধিকার রূপকথা বর্ণনা করিবার জন্য কৃষ্ণ-বড়াইর উক্তি-প্রত্যুক্তির প্রয়োজন হইত না এবং বৃন্দাবন মাঝে রাধা ও বড়াইর মধ্যে আকস্মিক বিচ্ছেদেরও প্রয়োজন ছিল না। কবি স্বতন্ত্রভাবেই শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন। বড়ু চণ্ডীদাস যে কোনো কোনো পদে রাধিকার রূপ বর্ণনা করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু সেই সকল পদের

সংখ্যা বেশী নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়িকাকে নায়ক কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য কবি যে নাটকীয় কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৃষ্ণের নিকট রাধার রূপ বর্ণনা করিবার প্রয়োজনে কবি পূর্ব হইতেই নাট্যগুণসমন্বিত যে পটভূমির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা স্বাভাবিক হইয়াছে এবং ইহার ফলে প্রথম হইতেই নাট্যরস জমিয়া উঠিয়াছে।

বড়াইর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনিয়া কৃষ্ণের পক্ষে প্রাণ ধারণ করা কঠিন হইল :

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাট্যগুণ আলোচনাপ্রসঙ্গে এই অতিরিক্ত 'বড়ায়ি ল' কথাটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবি দুই চরণের অন্ত্য মিল দিয়াই ক্ষান্ত নহেন, সংলাপ যাহাতে স্বাভাবিক এবং নাটকের উপযুক্ত হয় সম্ভবতঃ কবি সেদিকেও সচেতন ছিলেন।

কৃষ্ণ বড়াইকে দূতী করিয়া কর্পূর-তাম্বূল সহযোগে রাধার নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিল :

আইস রাধা কহোঁ তোক্ষারে কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।
বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা পাঠাইল তোক্ষা বেথাঁ ॥ ল রাধা ॥

রাধা এই কথা শুনিয়া পানপাত্র পদদলিত করিল। সে বড়াইকে সক্রোধে বলে :

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা ॥

... ...

ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে হএ স্থিতী ॥

বড়াই ও রাধার সংলাপগুলির মধ্য দিয়া প্রথম হইতেই রাধাচরিত্রের প্রবণতাটি বুঝা যায়। 'ধিক জাউ' কথাটির মধ্যে রাধার অভিমানের দিকটি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তেরটি খণ্ডের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক পদ আছে দানখণ্ডে—একশ বারটি পদ। এই দানখণ্ড ও ইহার পরবর্তী নৌকাখণ্ডে সংঘাতমূলক আখ্যান সংযোজনে চণ্ডীদাস ইহার নাটকীয় আবেদনকে আরও বেশী ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছেন। সরস ব্যঙ্গাত্মক উক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাটকীয়তা কি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে।

রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি :

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর।
প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥

কৃষ্ণের কথায় রাধার বিদ্রূপাত্মক উত্তর :

যার প্রাণ ফুটে বুক ধরিতে না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নির্বাচিত উপমা প্রয়োগে নাটকীয়তার স্ফুরণ ঘটিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে মূল সম্পর্ক মামী-ভাগিনেয়। এ সম্পর্কের মধ্যে নরনারীর মিলন ঘটিবার সুযোগ সমাজবিধিতে নাই। তাই কৃষ্ণ এ সম্পর্কের কথা স্বীকার করিতেছে না। কৃষ্ণ বলে, সে দেবরাজ এবং রাধা হইল তাহার রাণী। এ কথা শুনিয়া রাধা বলে :

এ বোল বুলিতে তোর মনে বড় সুখ।
পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥

কোন্ সাহসে সে এমন কথা বলে? যে চোর সে কি বুক ফুলাইয়া পরের ঘরে প্রবেশ করে?

কৃষ্ণ রাধার নিকট হইতে পুরা বার বৎসরের দান চাহিয়া বসিয়াছে। ইহার পর রাধিকার উক্তি :

এ হে। সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষেব দান চাহ মোর কিসে ॥

বড়ু তৎকালীন প্রচলিত প্রবচনগুলিকে উপমাব সাহায্যে প্রয়োগ করিয়া নাটকীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাধাব উক্তি :

বডার বহুআরী আহ্মে বডার ঝী।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী ॥
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥

এই প্রবচনগুলি তৎকালীন গ্রাম্য শ্রোতাদের সুপরিচিত। ইহার সার্থক ব্যবহারে কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাব 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বড়ু চণ্ডীদাস গ্রাম্য সমাজের জন্য তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহার মধ্যে নাটকীয়তা আরও তীক্ষ্ণভাবে প্রকট হইয়াছে—ইহার কাব্যগুণকে ছাড়াইয়া ইহার নাট্যগুণই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।"

নাটকের প্রধান গুণ বাস্তবধর্মিতা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নায়ক-নায়িকার দ্বন্দ্ব-কলহ, মনের ও মেজাজের উত্তাপ, প্রথমে দৃঢ় অসম্মতি ও পরিণামে আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া বড়ুর মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই নাট্যলক্ষণবহির্ভূত নয়। কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই—এই তিন চরিত্রের মধ্যে রাধা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাটকীয় চরিত্র। নাটকের চরিত্র নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বিবর্তিত হয় এবং সর্বোপরি বিভিন্ন প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘাত নাটকীয় চরিত্রকে নব নব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চূড়ান্ত পরিণতির অভিমুখে লইয়া যায়। বড়ু-পরিকল্পিত রাধাচরিত্র বিভিন্ন দিক হইতে নাট্যগুণসমন্বিত।

দানখণ্ডের অনেকগুলি পদে পুনরাবৃত্তি থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীর action বা গতি লক্ষ্য করিবার মত। তাহার বিচিত্র ঘটনা ও কাহিনী দ্রুত পট পরিবর্তন করিতে করিতে পরিণতি-অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। খণ্ডগুলির নাম হইতেই আভাস পাওয়া যায় খণ্ড হইতে খণ্ডান্তরে কাহিনী কতদূর আগাইয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাটকীয় পরিস্থিতির কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও মেলে। মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁহার 'বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই নাটকীয় পরিস্থিতি চৈতন্যদেবের সময় হইতে যে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় চৈতন্যদেব কর্তৃক একাধিকবার দানলীলার অভিনয় হইতে। রাধা ও তাঁহার সখীগণ বড়াইর সহিত মথুরায় দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণ তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া দান গ্রহণ করেন। এই অভিনয় হইয়াছিল শান্তিপুরে গঙ্গাতীরবর্তী এক উন্মুক্ত প্রান্তরে কদম্ববৃক্ষের সন্নিকটে। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে অবস্থানকালে তাঁহার ভক্ত চন্দ্রশেখরের গৃহেও ভক্তগণসহ এইরূপ অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।" এই তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে চৈতন্য ভাগবতের অষ্টাদশ অধ্যায় হইতে।

কাব্যে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধ-কথা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যবর্তী সম্পর্কের রহস্যটিকে কেন্দ্র করিয়া নাটকীয়তা বিশেষভাবে দানা বাঁধে। বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনার অবকাশ আছে।

বড়ু চণ্ডীদাস বিশেষ কারণে তাঁহার কাহিনীর অন্তর্গত একটি বড় সংবাদ নায়িকা রাধিকার অগোচরে রাখেন। এই কাব্যে কৃষ্ণের সঙ্গে তাহার যথার্থ সম্পর্কটি কি তা রাধার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ কাব্যের প্রথমাবধি কৃষ্ণ এ বিষয়ে সজ্ঞাত ও সচেতন। এইরূপ বৈপরীত্যের কারণ কি? এরই সূত্র অবলম্বন করিয়া বলা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নাটকীয় রস বিন্দু হইতে ক্রমে সিন্ধুতে পরিণত হইয়াছে।

জন্মখণ্ডে কৃষ্ণ ও রাধার জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

> ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
> স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে॥
> তোহ্মে নানা রূপেঁ কইলেঁ আসুরের খত্র।
> তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ॥

সুতরাং দেবতাদের একান্ত ব্যাকুলতা ও আগ্রহে কংসধ্বংসের নিমিত্ত কৃষ্ণের মর্ত্যভূমিতে আবির্ভাব।

নারায়ণ যখন মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন লক্ষ্মীরও সেই মর্ত্যভূমিতে উপস্থিতি আবশ্যক। তখন দেবগণ লক্ষ্মীকে বলিলেন, হে রাধা, তুমি শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের নিমিত্ত

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও, সকল সংসার স্থির হউক। ইহারই ফলে মর্ত্যে পদুমা উদরে সাগরের ঘরে শ্রীরাধার জন্ম। রাধা প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য :

দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী॥

যদিও রাধা কৃষ্ণের সম্ভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে তথাপি এই মর্ত্যভূমিতে কৃষ্ণের সহিত তাহার প্রকৃত সম্পর্ক কি, পূর্বজন্মে উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল তা রাধার অজ্ঞাত।

কাহিনীকে অধিকতর আকর্ষণীয় কৌতুহলোদ্দীপক ও নাটকীয় গুণসমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার প্রয়াসে বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্যনির্মাণ কালে এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কাব্যমধ্যে রাধাই কেবল তাহার পূর্বজীবনবৃত্তান্তের কথা জানে না, নতুবা মর্ত্যভূমিতে কৃষ্ণ লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্পর্কের কথা জানে, বড়াইও কৃষ্ণের স্বরূপ অবগত, পাঠকের নিকটও কবি কোনো সংবাদ গোপন রাখেন নাই।

বড়াই তাম্বূলখণ্ডে কৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিয়া রাধাকে বলে, যে দেবতাকে স্মরণ করিলে পাপ নাশ হয়, যাঁহাকে দেখিলে মুক্তি হয়, তাঁহার সহিত যে প্রেম করে বিষ্ণুলোকে তাহার স্থান ঘটে। ইহার উত্তরে রাধা বলে, পরপুরুষের প্রেম করিয়া যাহার বিষ্ণুলোক লাভ হয় সে নারীর জীবনে ধিক্। এমন রমণীর স্বামী জলে ডুবিয়া মরুক।

দানখণ্ডে রাধা বড়াইকে কৃষ্ণের সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া বলে, আমার স্বামী আইহন চিরজীবী থাকুন, কৃষ্ণের সহিত আমার কোনোই সম্পর্ক নাই, সে কেন অনর্থক আমার ঘৃত ঘোল নষ্ট করে।

পারস্পরিক সম্বন্ধের সত্যতা লইয়া রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কৃষ্ণ বলে, রাধা সত্য জানিও, তুমিই আমার গঙ্গা, তুমি আমার বারাণসী। হে রাধা, আমার সকল তীর্থ আমার সকল পুণ্যস্থান তোমারই মধ্যে অবস্থিত।

রাধা বলে, ছি ছি একথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় না। হে দেবরাজ, আমি যে তোমার মাতুলানী ইহা ভুলিও না।

কৃষ্ণের উক্তি, আমি দেবরাজ আর তুমি আমার রাণী। কেন মামী-ভাগিনার মিথ্যা সম্বন্ধ পাতাইতেছ?

রাধার উক্তি, কোন্ সাহসে এমন কথা বলিতেছ! যে চোর সে কি বুক ফুলাইয়া পরের ঘরে প্রবেশ করে?

একটি পদে কৃষ্ণ তাহার নিজ বংশের পরিচয় দিয়া বলে রাধার সহিত তাহার মামী-ভাগিনার কোনো সম্পর্ক নাই।

রাধা যে মামী-ভাগিনার কথা বলে তাহার পৌরাণিক ব্যাখ্যা হইল, যেহেতু আইহন শ্রীকৃষ্ণ-জননী যশোদার সহোদর, সুতরাং সম্পর্কের হিসাবে কৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাগিনেয়।

কিন্তু কৃষ্ণ এই যুক্তি মানিতে কোনমতেই সম্মত নয়। তাহার বক্তব্য :

বাপ বসুদেব মোর নান্দোঘরে জাণী।
কমন কারণে রাধা ঘোসসি মাউলানী॥
মাঅ দৈবকী মোর মামা কংসাসুর।
তোহ্মার সম্বন্ধ কথা আনেক দূর॥

তাহা হইলে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে সম্পর্কটি কি? কৃষ্ণের স্পষ্ট বচন :

নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।

কৃষ্ণ রাধাকে বেশ ক্রোধের ভঙ্গিতে বলে, তুমি বারবার মামী মামী বলিতেছ কেন? আমার মহাপাতক তোমার মাথায় পড়িবে। এমন কথা যদি আর বল তাহা হইলে তোমার মাথায় ভাঁড় ভাঙ্গিব। তোমাকে মামী-সম্পর্কের কথা কে বলিয়াছে? যে বলিয়াছে সে চোখ খাউক, তাহার দেহ অবশ হউক। শালী সম্বন্ধে আমাকে সম্বোধন কর।

এত বক্তৃতা সত্ত্বেও রাধা কৃষ্ণের কথা মানিয়া লইতে পারে না :

কেহ্নে তোহ্মে মোরে বোল শালী।
সম্বন্ধ না মান ভাগিনা বনমালী॥

অতঃপর কৃষ্ণ শালী সম্বন্ধের কথা উত্থাপন না করিয়া আরও গভীরতর যুক্তি উপস্থিত করে। সে রাধাকে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলে, তোমার আমার এই যে প্রণয় নিতান্তই তা দেবলোকের ইচ্ছার ফল। কৃষ্ণ বলে :

তোর নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী
তোর মোর শোভএ মীলনে।
কাহ্নাঞিঁ পাইবি বড় পুনে এহা পরিভাব মনে
কেহ্নে তেজ হাথের রতনে॥
কদমতলের থিতী তোর মোর হৈব রতী
এহা ভালেঁ জাণে দেবলোকে।
এবেঁ তোহ্মে আকারণে তেজ মোর বচনে
পাছে পাইবেঁ বিরহ শোকে॥

এই অংশে কৃষ্ণের মুখ দিয়া বড়ু চণ্ডীদাস পরবর্তী কাহিনীর আভাস ইঙ্গিতিত করিয়াছেন।

সমগ্র দানখণ্ড রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধের মীমাংসা লইয়া বিরোধ। রাধা বলে :

মোর দধি ঘৃতে কেহ্নে তোহ্মে মাহাদাণী।
তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মে ত মাউলানী॥

কৃষ্ণ পূর্ব জন্মের কথা উল্লেখ করিয়া বলে :

পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে।
তোহ্মে লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মে হরি কাহ্নে॥

কিন্তু রাধা কৃষ্ণের কোনো কথা বিশ্বাস করে না। সে বলে :

সকল পুরুবকথা মিছা কহ তোহ্মে।
কথাঁ কাহ্ন হবি তোহ্মে কথাঁ লক্ষ্মী আহ্মে॥

কৃষ্ণের উক্তি :

তোহ্মে ত না জাণ রাধা আহ্মার মায়া।
স্বগর্গ মর্ত্য পাতালে আহ্মার এক কায়া॥

রাধার প্রত্যুক্তি .

রাখোআল হআঁ বোল জগতনিবাস।
সুনিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস॥

বস্তুত কৃষ্ণের যথার্থ পরিচয় রাধার নিকট অজ্ঞাত থাকাতেই বিরোধ আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় রাধা যদি আগেভাগেই জানিয়া থাকিত, তবে কাব্যমধ্যে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কোনো অবকাশই ঘটিত না। কবি বড়ু চণ্ডীদাসও কাব্যপরিকল্পনায় মৌলিকতা দেখাইবার কোনো সুযোগ পাইতেন না।

কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ নিজের পরিচয় দিয়া রাধার নিকট তাহার স্বরূপ ব্যক্ত করে। একটি পদে কৃষ্ণ বলে :

শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরোঁ
আহ্মে দেব শ্রীবনমালী।
সব কলা সংপুনী আইহনের রাণী
নাম তোর রাধা চন্দ্রাবলী॥
পুরুব কালতে তোর পতি চক্রপাণি
তো এবেঁ পাসরিলি কেহ্নে।
তোহ্মার কারণে আহ্মে আবতার কৈল
দিআঁ যাহ আলিঙ্গন দানে॥

অপর দিকে রাধা বড়াইকে নালিশ করিয়া বলে কৃষ্ণের এ কী ব্যবহার! কৃষ্ণের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া বড়াইকে রাধা বলে :

তার মাঅ ননন্দ আহ্মার
সকল ভুবনে পরচার॥
আপণ খাআঁ বোলে ধামালী।
সম্বন্ধ না মানে বনমালী॥

রাধা পূর্বেও বারবার বলিয়াছে কৃষ্ণ তাহার ভাগিনা। রাধার স্বামী আইহনের ভগিনী যশোদা, এই অর্থে কৃষ্ণের জননী শ্রীরাধার ননদ।

কৃষ্ণ রাধিকার নিকট পরিচয় দিতে ব্যাকুল :

দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে।
করে গিরি ধরিআঁ মো রাখিলোঁ গোকুলে॥

বেদ উদ্ধারিতেঁ কৈলোঁ মীন অবতার।
পাতাল গিআঁ তার করিলোঁ উদ্ধার ॥
যৌবনগরবেঁ রাধা না চিহ্নসি মোরে।
শ্রীধররূপেঁ হরিআঁ নিবোঁ তোরে ॥

কৃষ্ণের এ সকল কোনো কথাই রাধার নিকট বিশ্বাসযোগ্য নয়। 'পরদার স্বরতী' যে অমঙ্গলজনক রাধা কৃষ্ণের নিকট তাহার ব্যাখ্যা করে। রাধা বলে তোমার কি ধর্মের ভয় নাই? কৃষ্ণ বলে :

তবেঁসি ধরমের ভয় রাধা ল
আল যদি মোএঁ হবোঁ পরনারী।
অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ
তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী ॥

কিন্তু রাধা বলে :

পুরুব জরমে কাহ্নাঞিঁ [ল]
[আল] আছিলোঁ বা তোর নারী।
ইহ জরমে কে বা পাতিআএ
অপণে বুঝহ মুরারী ॥

এই অবিশ্বাস অনীহা ও ঘোর আপত্তির মধ্যেই এক সময় অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া কৃষ্ণের সুখের সামগ্রী হিসাবে রাধার নিজের দেহলতাটিকে কৃষ্ণের সম্মুখে মেলিয়া ধরিতে হয়।

পরবর্তী নৌকাখণ্ডেও রাধা কৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করে নাই। সেখানেও রাধা ভাগিনা-মাতুলানী সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছে। কৃষ্ণকে বলিয়াছে :

ঘাটের ঘটিআল মোরে ঝাঁট কর পার।
তোর মায় যশোদায় ননন্দ আহ্মার ॥
তোহ্মেত ভাগিনা আহ্মে তোহ্মার মাউলানী।
পাপ বচন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥

কিংবা,

নিলজ কাহ্নাঞিঁ তোর বাপে নাহিঁ লাজ।
মাউলানীক বোলহ হেন কাজ ॥

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাধা 'হেন কাজ' না করিয়াও কৃষ্ণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

অতঃপর কাহিনীতে পরিবর্তন ঘটে। ভারখণ্ড বা পরবর্তী খণ্ডগুলিতে রাধা আর কৃষ্ণকে ভাগিনারূপে দেখে না, রাধাও আর নিজেকে মাতুলানী বলিয়া ঘোষণা করে না। রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে মামী-ভাগিনার সম্পর্ক লইয়া বিরোধ নৌকাখণ্ডেই সাঙ্গ হইয়া যায়। অতঃপর কালিয়দমনখণ্ডে রাধা সকলের সম্মুখে কৃষ্ণকে 'পরাণ পতি' বলিয়া সম্বোধন করিলে কাহিনী দ্রুত পরিণতির অভিমুখে অগ্রসর হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাট্যধর্ম প্রাধান্য লাভ করিলেও তাহার স্থানে স্থানে গীতিকবিতার স্থর অনুরণিত হইয়াছে। গ্রন্থের গোড়ার দিকে ঝুমুর শ্রেণীর লোকসংগীতের প্রভাব আছে। কিন্তু বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ অংশে সে স্থর গীতিকবিতার উচ্চ পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাণখণ্ড পর্যন্ত দেখি নাটকীয় ধর্মের প্রাধান্য। সংলাপের তীক্ষ্ণতায়, ঘটনার স্থান-পরিবর্তনে, আখ্যানের গতিময়তায় নাট্য-লক্ষণ প্রকটিত। কিন্তু শেষ পর্যায়ে দেখি সকল নাটকীয় চঞ্চলতা ও দ্রুততা গীতিকবিতার গভীরতার মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যায়ে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে আর সেই গ্রাম্য উক্তি-প্রত্যুক্তি নাই, মিলন-বর্ণনায় অসংযত ভাষার আতিশয্য নাই, উপমা ব্যবহারে পুনরাবৃত্তি নাই, বড়াই চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং রাধা একান্তই কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়াছে।

চর্যাপদে কিছু কাব্যগুণ থাকিলেও তাহা মুখ্যতঃ ধর্ম ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ক রচনা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই শ্রেণীর কাব্য নহে। ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য কবি বড়ু চণ্ডীদাসকে জটিল আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাক্‌চৈতন্য যুগের রচনা বলিয়া চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবতত্ত্ব তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই। তত্ত্বানুশাসিত কাব্য নয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মানবিক আবেদন চৈতন্যপরবর্তী পদাবলীর তুলনায় অধিক। এখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা অমার্জিত হইলেও মানবিক রসের দিক হইতে তাহার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। রাধাবিরহ অংশে গীতিরসের যে স্রোতোধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে পরবর্তী বৈষ্ণবপদসাহিত্যের মধ্যে।

কাব্যের শেষ পর্যায়ে গীতিরসের প্রাধান্য থাকিলেও গোড়ার দিকে যে কোনো কোনো অংশে গীতিকবিতার স্থর ধ্বনিত হয় নাই তাহা নয়। দানখণ্ডে রাধার রূপবর্ণনারত কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে মাঝে মাঝে কাব্যগুণের সন্ধান মেলে :

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুরা।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুরা॥

দানখণ্ডে কৃষ্ণের মুখে নিম্নোদ্ধৃত পদটিও কাব্যগুণোপেত :

কাল ভ্রমরে কমলবন শোহে।
কাল কাজলে নারী জগজন মোহে॥
কাল লাঞ্ছন কোলে ধরে শশধরে।
কাল আলকপাঁতী শোভএ কপোলে॥
কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী।
কাল সুন্দর দেহেঁ শোভে বনমালী॥

কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ।
এহ বুঝি না কর রাধা তোঁ মন মন্দ॥

বংশীখণ্ডের অনেকগুলি পদে গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। আধুনিক পাঠকের কাছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্বাধিক পরিচিত ও অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি' পদটি এই বংশীখণ্ডেরই অন্তর্গত। পদটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা চলে। এখানে রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ ভগবান। অনন্তকাল ধরিয়া ভগবান ভক্তকে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু ভক্ত তাঁহার আহ্বানধ্বনি শুনিতে পায় না। তবে ভক্তের মনে মাঝে মাঝে চমক লাগে। সে ভাবে কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে সংসারের আকর্ষণে ভক্ত আবার সে আহ্বানের কথা ভুলিয়া যায়। কিন্তু ভগবান কখনো ভক্তকে ভুলিতে পারেন না—তাই তিনি প্রবলভাবে ভক্তকে আবার আহ্বান করেন। ভক্তের মনে এবার সাড়া জাগে এবং অন্তরের ব্যাকুলতাও জাগ্রত হয়। সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং দীর্ঘদিন সাধনার পর ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করে।

এই পদে ভক্ত রাধিকার ব্যাকুলতা চমৎকারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিতেছেন, "কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া দিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়।" এ কথা যথার্থ, তত্ত্ব যদি এখানে সত্যই কিছু থাকে, তাহা হইলেও গীতিরসের প্রবাহে তত্ত্ব কোনো সময়ই কাব্যকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই পর্যায় হইতে বিরহব্যাকুলা রাধাচরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পদাবলীর শ্রীরাধাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। একটি পূর্ণ কাব্যের অংশ হিসাবে নয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত অনেকগুলি পদ স্বতন্ত্র গীতিকবিতা হিসাবেই মূল্যবান।

বংশীখণ্ডের অন্তর্গত :

কাহ্নাঞি বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন।
আঞ্চলে সোনা মোর কে না হ'র লআঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ॥

কিংবা,

ঘরতে বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞি
কোণ দিগেঁ সার নীসারে।
বাঁশীর শবদেঁ চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি
জাইবোঁ তার অনুসারে॥

ইত্যাদি পদে পদাবলীর সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। রাধাবিরহের অন্তর্গত একটি পদ :

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন স্থন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥

এই পদের সঙ্গে পদাবলীর চণ্ডীদাসের নিম্নোক্ত পদের আশ্চর্য মিল দৃষ্ট হয়:

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে ॥

কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিত্রকল্পে কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে:

আসাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী।

রাধাবিরহের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত পদে কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধা যে ক্রমে পদাবলীর দিকে আগাইয়া চলিয়াছে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাই:

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার ॥
মুছিআঁ পেঁলায়িবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর ॥
... ...
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর ॥
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥
কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী।
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥

উপসংহারে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি পদ ভাবগভীরতায় সমৃদ্ধ এবং সেই সকল পদে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিই সহজ ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তথ্যবন্ধন হইতে মুক্ত এই পদগুলিকে উচ্চশ্রেণীর গীতিকবিতার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

হাস্যরস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী হইলেও তাহা শুধুমাত্র মধুর রসের কাব্য নহে। জন্মখণ্ড হইতে রাধাবিরহ পর্যন্ত একাধিক রসের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে

শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র কোনো রসেরই অভাব নাই। বস্তুতঃ মানবজীবন সকল রসের সমন্বয়েই গঠিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য হইলেও তাহার নাট্যগুণের পরিমাণ অধিক এবং নাটক মানবজীবনের ছবিকেই ফুটাইয়া তোলে বলিয়া এখানেও দেখি সকল রসের সমাবেশ।

বিভিন্ন ঘটনা উক্তি-প্রত্যুক্তি ও বর্ণনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হাস্যরসের উপাদান লক্ষ্য করা যায়।

জন্মখণ্ডে নারদের অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া কবিই বলিতেছেন, 'তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ'। রঙ্গ হওয়াই তো স্বাভাবিক। অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতাই হইল হাস্যরসের মূল কথা। নারদ যদি পুরাণের সম্পূর্ণ মহিমায় এখানে উপস্থিত হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিয়া কে রঙ্গ করিত? সেনাপতি অশ্বারোহণ করিলে কাহারো হাসি পায় না, কিন্তু তিনি যদি গাধায় চড়িয়া যুদ্ধযাত্রা করেন তবে তাহা হাস্যরসের কারণ হয়। নারদের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণই এখানে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছে। নারদের বর্ণনা এইরূপ :

> পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ। বামন শরীর মাকড় বেশ॥
> নাচএ নারদ ভেকের গতী। বিকৃত বদন উমত মতী॥
> খণে খণে হাসে বিণি কারণে। খণে হএ থোড় খোণেকেঁ কানে॥
> নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ। তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ॥
> লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে। খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে॥
> উঠিআঁ সব বোলে আনচান। মিছাই মাথাএ পাড়এ সান॥
> মেলে ঘন ঘন জীহের আগ। রাত্র কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ॥

বড়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে একটি দূতী চরিত্র। বৃদ্ধা হইলেও তাহার কৌতুক-প্রবণতা সমগ্র কাব্যে ছড়াইয়া আছে। তাহার চেহারার সঙ্গে তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি কবি চমৎকারভাবে মিলাইয়াছেন। বড়াইয়ের "বিকট দন্ত কপট বাণী। ওঠ আধর উঠক জিণী॥ কাঠী সম বাহুযুগলে। নাভিমূলে দুই কুচ লুলে॥ কুটিল গমন ঘন কাশে।" বড়াইয়ের এই চিত্র তাহার চরিত্রেরই পূর্বাভাস।

তাম্বূলখণ্ডে বড়াইয়ের মুখে রাধার রূপ-কথা শুনিয়া কৃষ্ণের প্রেমভাবের উদ্রেক, বড়াইয়ের মারফত রাধার নিকট প্রেমপ্রস্তাব প্রেরণ, দানখণ্ডে কৃষ্ণের দানী সাজিয়া রাধাকে প্রতারণা, নৌকাখণ্ডে মাঝ যমুনায় কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাকে ভীতি প্রদর্শন, ভারখণ্ডে কৃষ্ণের দধিদুধ বহন, যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ, হারখণ্ডে হার অপহরণ, বংশীখণ্ডে রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বংশী অপহরণ ও মিথ্যাকথন, ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে সর্বত্রই একটা লঘুরসের প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়। দানখণ্ডে কৃষ্ণ যখন রাধার রূপযৌবনের গাণিতিক হিসাব দেয় তখন যমুনার ঘাট যে বেশ খানিকটা রসময় হইয়া উঠে তাহা বুঝা যায়। কৃষ্ণ বলিতেছে 'আহুঠ হাথ কলেবর তোর। দুই কোটি দান তাহাত মোর॥' রাধার সাড়ে তিন হাত দেহের জন্য সে দুই কোটি মুদ্রা দান চাহিয়া বসে।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য এক এক রকম মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে। রাধার মাথায় যে ফুলের মালাটি তাহার মূল্য লক্ষ মুদ্রা, কেশরাশি দুই লক্ষ, সীমন্তের সিন্দুর তিন লক্ষ, নির্মল মুখ চার লক্ষ, নয়ন পাঁচ লক্ষ, নাসিকা ছয় লক্ষ, কর্ণকুণ্ডল সাত লক্ষ, দশন আট লক্ষ, অধর নয় লক্ষ, কণ্ঠদেশ দশ লক্ষ, বাহু এগার লক্ষ, নখপংক্তি বার লক্ষ, স্তনদ্বয় তের লক্ষ, ত্রিবলী-চিহ্নিত কটিদেশ চৌদ্দলক্ষ, উরু পনের লক্ষ, আর চরণযুগলের মূল্য যোল লক্ষ মুদ্রা। দুই কোটির মধ্যে ইতিমধ্যে কত মুদ্রার দান চাওয়া হইল? হিসাব করিলে দেখা যাইবে একশত ছত্রিশ লক্ষ মুদ্রা। কৃষ্ণও এ ব্যাপারে বেহিসাবী নয়। তাহার গাণিতিক নিপুণতা দেখিয়া পাঠক খুশী হইবেন। দুই কোটি দানের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। হিসাব মিলাইতেই হইবে। তাই পদযুগলের জন্য ষোল লক্ষ মুদ্রা চাহিবার পর বিশ পঁচিশ কি পঞ্চাশ নয়, রাধার অবশিষ্ট অঙ্গটির জন্য একবারে চৌষট্টি লক্ষ মুদ্রা হাঁকিয়া বসা হইল। 'হেমপাট জিণি তোহোর জঘনে। চৌষাঠি লাখ তাত মোর দানে॥'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম দিকের অংশে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে বহুক্ষেত্রে চটুল কথাবার্তার আদানপ্রদান ঘটিয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয় দিক, বিশেষতঃ রাধার দিক হইতে গ্রাম্য গালিও বর্ষিত হইয়াছে। এই কলহমুখরিত গ্রাম্য কুরুচিপূর্ণ পরিবেশ আজিকার পাঠকের নিকট অশালীন বোধ হইলেও যাহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহারা যে ইহার মধ্য হইতে অনেক আনন্দরস আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। রাধা কৃষ্ণের গোত্র তুলিয়া গালি দিয়াছে, 'তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে। কিসকে বাথানে কাহ্ন মোর তুঈ তনে॥' (দানখণ্ড)। আর পিতৃ উচ্চারণ করিয়া বলে, 'কাহাক দেখাহ এ কাঠদাপে। বান্ধিতেঁ না পারে তোহ্মার বাপে॥' (দানখণ্ড)। কিংবা, 'আছুক তোহোর কথা হেন করিতেঁ নারে তোর বাপে॥' (দানখণ্ড)। অন্য দিক হইতেও পাল্টা জবাব আসিয়াছে। কৃষ্ণও রাধাকে 'পামরী ছেনারী নারী' বলিয়া কটু ভাষায় গালি দিয়া শোধ তুলিয়াছে। এই সকল গ্রাম্য গালাগালি, উক্তি-প্রত্যুক্তি ও কলহ কর্কশতা সহজেই সেকালের শ্রোতার মনোরঞ্জন করিত।

নৌকাখণ্ডে রাধা কেবল প্রাণরক্ষার জন্য কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ভারখণ্ডে সে অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছে। কৃষ্ণকে দিয়া দধিদুধের পসার বহাইয়াছে। কৃষ্ণকে রাধার ভার কাঁধে লইতে দেখিয়া স্বর্গের দেবতারা হাসাহাসি করিয়াছেন।—'লড়িলা জনার্দ্দন কান্ধে লআঁ ভার দধি বিকে মথুরার রাজে। দেখি সব দেবাগণ খলখলি হাসে ল ভাবে মজিলা দেবরাজে॥' অনভ্যস্ত হাতে ভার তুলিতে গিয়া বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিল। পসার টলিয়া 'ছাড়ায়িল কিছু দুধ দহী'। প্রতিশ্রুত পুরস্কার তো দূরের কথা সেই টলিত পসরা ও অপচিত দধিদুধের মূল্য স্বরূপ নায়িকার হাতে কৃষ্ণকে কিছু কিলচড় পরিপাক করিতে হইল।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি অসঙ্গতি হাস্যরসের মূল উপাদান। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের

বংশিধ্বনি শুনিয়া রাধার মন ব্যাকুল হইয়াছে। রন্ধনশালায় আজ তাহার কোনো শৃঙ্খলা নাই। অম্বল ব্যঞ্জনে সে ঝালমশলা দিল আর শাকের হাঁড়ি কানা পর্যন্ত জলে পূর্ণ করিল। এদিকে বিনা জলে চাল চড়াইয়াছে, পটোল বলিয়া কাঁচা সুপারি ঘিয়ে ভাজিয়াছে আর নিমঝোলে লেবুর রস নিংড়াইয়া দিয়াছে। এই চিত্র সকলের মনেই কৌতুকরস সঞ্চার করে। এই উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী যাহাকে পরিপাক করিতে হইল তাহার কথা গ্রন্থমধ্যে নাই। পাঠক আপন মনে একবার সেই মানুষটার কথা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

উপমা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত উপমাগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্যের অধিকাংশ উপমাই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কিছু উপমা পল্লীজীবনযাত্রা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উপমা নির্বাচনেই তাঁহার যাহা কিছু মৌলিকতা ও কবিকৃতিত্ব।

প্রথমে বড়ু কিভাবে প্রথাসিদ্ধ উপমাগুলি কাব্যে প্রয়োগ করিয়াছেন দেখা যাক। এই প্রসঙ্গে দেহোপমার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাম্বূলখণ্ডে কৃষ্ণের নিকট রাধার রূপবর্ণনা করিতে গিয়া বড়াইয়ের উক্তি :

কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুর॥
কনককমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে॥

কিংবা

কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে॥
কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।
অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে॥

এই রূপবর্ণনা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতানুসারী। বড়ু চণ্ডীদাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপবর্ণনায় সংস্কৃতরীতির অনুসরণ করিয়াছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রায় সকল কবির কাব্যেই এই রীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। শুধু প্রাচীন সাহিত্যে নয়, উনবিংশ শতাব্দীর রচনাতেও রূপবর্ণনা অংশে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস হইতে আশমানির রূপবর্ণনা অংশটি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :

আশমানির বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায়; ফণিনী সেই তাপে মনে ভাবিল, যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার

প্রয়োজনটা কি ! আমি গর্তে যাই। এই ভাবিয়া সাপ গর্তের ভিতর গেলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন প্রমাদ ; সাপ গর্তে গেলেন, মানুষ দংশন করে কে ? এই ভাবিয়া তিনি সাপকে লেজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলেন, সাপকে বাহিরে আসিয়া আবার মুখ দেখাইতে হইল, এই ক্ষোভে মাথা কুটিতে লাগিল, মাথা কুটিতে কুটিতে মাথা চেপ্টা হইয়া গেল, সেই অবধি সাপের ফণা হইয়াছে। আশমানির মুখচন্দ্র অধিক সুন্দর, সুতরাং চন্দ্রদেব উদিত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট নালিশ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, ভয় নাই, তুমি গিয়া উদিত হও, আজি হইতে স্ত্রীলোকদিগের মুখ আবৃত হইবে ; সেই অবধি ঘোমটার সৃষ্টি। নয়ন দুটি যেন খঞ্জন, পাছে পাখী ডানা বাহির করিয়া উড়িয়া পলায়, এই জন্য বিধাতা পল্লবরূপ পিঁজরার কবাট করিয়া দিয়াছেন। নাসিকা গরুড়ের নাসার ন্যায় মহাবিশাল ; দেখিয়া গরুড় আশঙ্কায় বৃক্ষারোহণ করিল, সেই অবধি পক্ষিকুল বৃক্ষের উপরেই থাকে। কারণান্তরে দাড়িম্ব বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পাটনা অঞ্চলে পলাইয়া রহিলেন ; আর হস্তী কুম্ভ লইয়া ব্রহ্মদেশে পলাইলেন ; বাকি ছিলেন ধবলগিরি, তিনি দেখিলেন যে, আমার চূড়া কতই বা উচ্চ, আড়াই ক্রোশ বই ত নয়, এ চূড়া অন্যূন তিন ক্রোশ হইবেক ; এই ভাবিতে ভাবিতে ধবলগিরির মাথা গরম হইয়া উঠিল, বরফ ঢালিতে লাগিলেন, তিনি সেই অবধি মাথায় বরফ দিয়া বসিয়া আছেন।

এখানে বঙ্কিমরচনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের সাহিত্য-প্রতিভার তুলনা করিতে চাহিতেছি না। আমাদের বক্তব্য,' রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে মূল সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিও সেই সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই তাঁহার কাব্যের বহু উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যমধ্যে রাধারূপের বর্ণনাই সর্বাধিক। কবি, কৃষ্ণ ও বড়াই—এই তিন দিক হইতেই উপমা সহযোগে রাধিকার রূপ বর্ণিত হইয়াছে। কখনো কখনো রাধা নিজেও স্বীয় রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধার দেহলতাটি বিভিন্ন অলঙ্কারে কিভাবে সজ্জিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা যাক :

মুখ—১। কনককমলরুচি বিমল বদনে ২। বদন সংপুন শশধরে ৩। কমল বদনী রাধা ৪। সংপুন্ন চন্দ্র তোহোর বদন ৫। মুখশশি ৬। নির্মল শশি তোর মুখ ৭। শরত উদিত চান্দ বদন কমল ৮। মুখ তোর আল রাধা বিকচ কমলে ৯। মুখকমল আতি শোভা করে ১০। সংপুন পুনমীচাঁদ তোমার বদন।

নয়ন—১। আলসলোচন দেখি কাজলে উজল। জলে পসি তপ করে নীল উতপল ২। রাধা হরিননয়নী ৩। কুরঙ্গনয়ন জিণী তোহ্মার নয়নে ৪। খঞ্জন জিণিআঁ তোর নয়নযুগল ৫। নয়ন তোর নীল উতপলে ৬। নয়ন বাণে (কামধনুর বাণ) ৭। নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে ৮। খঞ্জন নয়ন দুই।

ভ্রূ—১। ভ্রূহি কামধনু ২। ভ্রূহি কাল শাপ (সর্প) যুগল তাহাতে শোভএ নিচল হোই।

কটাক্ষ—১। কালকূট বিষহরি জাগল কটাক্ষ।

অধরোষ্ঠ—১। ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ২। বিম্বফলতুল তোর আধরে ৩। বিম্বফল জিনী তোর আধরের কলা ৪। বিম্বফল জিনী তোর আধরের কান্তী।

দন্ত—১। মাণিক জিণিআঁ দশন শোহে ২। মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা ৩। মাণিক জিণিআঁ দশনজ্যুতী ৪। মণিগণ শোভএ দশন ৫। দেখোঁ দশনের যুতী চন্দ্র পরকাশ।

নাসিকা—১। নাসা গরুড় সমান ২। নাসা ণালিক যন্ত্র সমানে ৩। নাসা তিল ফুল।

কান—১। গিধিনীসদৃশ তোর দেখোঁ দুঈ কান।

গণ্ড—১। কপোলযুগল তার মহুলের ফুল।

কপাল —১। আনত কপাল তার আধ শশি জিনী।

সিন্দুর—১। সিন্দুর সুর ললাটে ২। শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুরা প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুরা।

কেশপাশ—১। নীল জলদ সম কুন্তলভারা।

ললাটের তিলক—১। ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।

বক্ষ—১। ডাকর ডালিম দুঈ কুচে ২। কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে ৩। কনকপদ্মকোরক সম দুঈ তনে ৪। কমল কলিকাসম তার পয়োভারে ৫। তালফল জিণিআঁ তোহ্মার পয়োভার ৬। পাকিল শ্রীফল জিণিআঁ শোভে তোহ্মার দুহ তনে ৭। শ্রীফলযুগল তোহোর তনে ৮। কুচযুগ শোভে যেহ্ন শ্রীফলযুগল ৯। কুচযুগ রাধা যোড শ্রীফলে ১০। দুঈ কুচ তোর রাধা শম্ভুর আকার ১১। কুচ কোকযুগলা ১২। সুররাজ গজকুম্ভ কুচযুগল ১৩। হেমঘট পয়োভারে।

কণ্ঠ—১। কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে ২। কণ্ঠদেশ তোর কম্বু সমানে ৩। কম্বু সম তোর শোভএ গলে।

বাহু—১। বাহু মৃণাল।

করতল—১। কর উতপলে ২। কর রাতা উতপলা।

করাঙ্গুলি—১। আঙ্গুলীচম্পককলিকাজালে।

কটি—১। মাঝদেশ দেখি সিংহমাঝার আকার ২। সিংহ মধ্য সম।

নাভি : ত্রিবলী—১। নাভি তার নদ ঘাট ত্রিবলী ২। নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপমা ৩। তেলানী গভীর নাভি।

নিতম্ব—১। বর্ম।

উরু—১। উরু শোভে বিপরীত রামকদলী ২। উরু তোর রামকদলী সমানে ৩। দুঈ উরু রামকল জিনী ৪। উরুযুগ শোভে রামকদলী ৫। উরুযুগ রামকদলীতরুসমা।

জঘন—১। ঘন জঘন পুলিনে।

চরণতল—১। চরণযুগল থলকমল আকারে ২। থলকমল জিণী তোহ্মার চরণে ৩। রাতা উতপল তোর দুঈ চরণে।

বচন—১। বেকত আমৃত তোর মধুর বচন।

গতি—১। মত্তরাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে ২। করিরাজ জিণী রাধা করিল গমনে ৩। মন্থর গমনে থাসি ভাঁগিবার ডরে তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে ৪। তোহ্মার গমন দেখি রাজহংস গতি করিল সলিলে ৫। রাজহংস জিণী তোহ্মার গমনে।

দেহকান্তি—১। কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী ২। কনক নিকস সম তনুকান্তি লীলা ৩। কনক চম্পক সম শোভে কলেবরা ৪। কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ ৫। কাঞ্চ হলদি যেন তোহ্মার বরণ।

একই উপমা একাধিকবার ব্যবহৃত হওয়ায় পাঠকের নিকট কাব্যের আকর্ষণ ক্ষুন্ন হইয়াছে। যে স্থানে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনায় একটি উপমারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে সেই স্থান পাঠকের নিকট অধিকতর পীড়াদায়ক। 'কমল' উপমানটি মুখ চোখ হাত পা বুক সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন: কণক কমল রুচি বিমল বদনে, গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা, নেত্র উতপল তোর, কমল কলিকা সম তার পয়োভারে, কর কমল বাহু মৃণাল, পদ হেম কমল।

এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে কয়েকটি রূপবর্ণনাত্মক পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখা যাক সেগুলি কি পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট ঋণী। বৃন্দাবনখণ্ডে আছে:

> তমাল কুসুম চিকুরগণে। নীল কুরুবক তোর নয়নে॥
> সুপুট নাসা তিলফুলে। দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥
> আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে। কণ্ঠযুগ তোর এ বগহুলে॥

গীতগোবিন্দের দশম সর্গে আছে:

> বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধুকচ্ছবি-
> র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
> নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূন-পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
> প্রায়স্তন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বলা হইয়াছে নয়ন নীল কুরুবক সদৃশ। গীতগোবিন্দে আছে: চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্। কালিদাসের কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে পাই: প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যাঃ।

উপমা নির্বাচনে বড়ু চণ্ডীদাস অনেকক্ষেত্রে গীতগোবিন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আমরা এখানে কোন্ কোন্ উপমা অলঙ্কার চণ্ডীদাস গীতগোবিন্দ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পৃথকভাবে নির্দেশ করিতেছি না। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গীতগোবিন্দ অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

বংশীখণ্ডে বিরহী রাধা বডাইকে বলিতেছে :

বন পোড়ে আগ বডায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

অনেকে মনে করেন এটি বড়ুব মৌলিক উপমা। বস্তুতঃ তাহা নয়। ভবভূতির উত্তররামচরিতেও অনেকটা এইবকম চরণ পাইতেছি :

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ ঘনব্যথঃ।
পুটপাক-প্রতিকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥

কিন্তু বড়ু যে এ-ক্ষেত্রে ভবভূতিব নিকট ঋণী তাহা নয। ইহা বহু প্রাচীন কালের একটি লৌকিক প্রবচন হিসাবে নির্দেশিত হয়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় পাই 'কুমারের পনে যেন পোড়ে পোড়ে পোড়ে'। প্রাচীন প্রবচনটির আধুনিক রূপ হইল, 'বন পোড়ে সকলে দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না।'

কুমারসম্ভবে আছে :

মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা বলিত্রযং চারু বভার বালা।

সম্ভবতঃ এই চরণের প্রভাবেই বড়ু লিখিলেন :

ডমরু সদৃশ মধ্য নাভি গম্ভীরে।

যজ্ঞবেদী ও ডমরু এক বস্তু না হইলেও রূপগত বা বহিরঙ্গগত দিক হইতে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বেশী নাই।

কোনো কোনো সমালোচক বড়ু চণ্ডীদাসের উপর বিদ্যাপতির প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বড়ুর কাব্যরচনায় যথার্থ ই বিদ্যাপতির প্রভাব পড়িয়াছিল কি না আমরা এখানে সে প্রশ্নের গভীবে না গিয়া কেবল উপমা প্রযোগে বড়ু ও বিদ্যাপতির মধ্যে কোথায় কোথায় সাদৃশ্য বিদ্যমান তাহা দেখিব।

আমরা দেখিয়াছি মুখের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বড়ু মুখ্যতঃ পদ্ম ও চাঁদ এই দুইটিকেই উপমানরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন।[১] রাধাব মুখকে কেবল চাঁদেব সঙ্গে তুলনা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, সে চাঁদকে পূর্ণিমার চন্দ্র বা শরতের নির্মল চন্দ্র হইতে হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদে কমলের উল্লেখ থাকিলেও চন্দ্রের প্রাধান্যই বেশী। শরৎ, শীত, প্রতিপদ, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, ক্ষীণ, অর্ধেক, কলঙ্কিত—বিদ্যাপতির পদে নানারকম চন্দ্রের সমারোহ।

[১] বড়ু নয়নের সঙ্গে নীলোৎপল, খঞ্জন, হরিণ-চক্ষুর তুলনা করিয়াছেন। এই সকল উপমা প্রয়োগে কবির মৌলিকতা কোথাও নাই। প্রথাসিদ্ধ উপমাই এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতিও নয়নের সঙ্গে প্রথাসিদ্ধভাবে কমল, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী, খঞ্জন ইত্যাদির তুলনা করিয়াছেন। নয়নেব সঙ্গে গুণগত দিক হইতে কুন্দফুলের তুলনা করিয়া কিংবা নয়নকে দূত হিসাবে উল্লেখ করিয়া বিদ্যাপতি যে কবি-কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন বড়ুর মধ্যে তাহা পাই না।[১] এই তুলনা কিন্তু বড়ুর কবিপ্রতিভার ক্ষীণতা প্রমাণ করে না। কারণ বড়ু পদকর্তা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের ন্যায় গীতিকবিতা রচনা করেন

নাই। তিনি নাট্যধর্মী আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাই কৃষ্ণের মুখে তিনি কৃষ্ণের সংলাপই প্রয়োগ করিয়াছেন। গ্রাম্য, কামার্ত কৃষ্ণ যদি বৈষ্ণবপদকর্তার ভাষায় কথা কহিত তাহা হইলে গ্রন্থের নাট্যগুণ যে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইত তাহা সহজেই বোঝা যায়। তাই যে কোনো ক্ষেত্রে বৈষ্ণবপদকর্তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতার তুলনামূলক আলোচনা করিতে গেলে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। নাট্যকারের ভাষা আর গীতিকবির ভাষার মধ্যে প্রভেদ থাকাই স্বাভাবিক।

বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস উভয়েই ভ্রূ প্রসঙ্গে মদনবাণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বড়ু যখন বলেন রাধার ভ্রূ দুইটি নিশ্চল দুইটি কৃষ্ণসর্প, তখন কিছুটা নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়।

বড়ু রাধার কটাক্ষকে মহানাগিনীর কালকূট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর বিদ্যাপতি বলেন :

যঁহা যঁহা কুটিল কটাখ।
ততহিঁ মদন-শর লাখ॥

অধরের উপমায় কোনো বৈষ্ণব কবিই বিশেষ কোনো মৌলিকত্ব দেখান নাই। অধরের প্রচলিত উপমান বন্ধুলী ও বিম্বফল বড়ু ও বিদ্যাপতি উভয়ের রচনাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নায়িকার দাঁতের সঙ্গে মুক্তা, চন্দ্র প্রভৃতি প্রথাগত বস্তু উপমিত হইয়াছে। বিদ্যাপতিও প্রথাকে লঙ্ঘন করিয়া বিশেষ কোনো মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই।

নাক, কান, কপোল, কপাল, সিন্দূর, কেশ, তিলক ইত্যাদির উপমার ক্ষেত্রেও কবি-কৃতিত্ব বা মৌলিকতার দিক হইতে উভয় কবির মধ্যে কেহ যে কাহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা যায় না।

রমণীর বক্ষের বর্ণনায় কবিমাত্রই আগ্রহী। বড়ু রাধার বক্ষদেশ নানা উপমায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও বড়ু উভয়ের রচনাতেই পয়োধরের উপমায় বৈচিত্র্য দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বক্ষের সঙ্গে ডালিম, স্বর্ণপদ্ম, তালফল, বেল, শম্ভু, ঘট ইত্যাদি উপমিত হইয়াছে। বিদ্যাপতিতেও বেল, তাল, ঘট, বাটি, কলস, ডালিম, পদ্মকোরক, শম্ভু, গিরি ইত্যাদি প্রথাসিদ্ধ উপমা পাই।

বড়ু ও বিদ্যাপতির পদে কণ্ঠের একমাত্র উপমা কম্বু অর্থাৎ শাঁখ। বাহু প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথাসিদ্ধ মৃণালের উল্লেখ আছে ; বিদ্যাপতির পদে মৃণাল, পাশ ও বল্লরীর উল্লেখ পাইতেছি। করতল ও করাঙ্গুলির উপমা উভয় ক্ষেত্রেই প্রথাসিদ্ধ।

কটির উপমাতেও কোনো মৌলিকত্ব নাই।

রাধার নাভি ত্রিবলী ও জঘনের বর্ণনা কৃষ্ণের মুখ দিয়া করানো হইয়াছে। কৃষ্ণের বুদ্ধিদীপ্ত চটুল উক্তিতে উপমাগুলি কিছুটা প্রাণবন্ত হইয়াছে। উপমাগুলি এখানে কাহিনী ও সংলাপ প্রসঙ্গে আসিয়াছে। তাই বড়ু এক্ষেত্রে প্রথার দিকে ততটা মন দেন নাই।

উরু এবং চরণতলের উপমায় বড়ু ও বিদ্যাপতির মধ্যে কোনোই মৌলিকতা নাই।

বিদ্যাপতি রাধার বচন তথা কণ্ঠস্বরকে কোকিলতুল্য বলিয়াছেন। কণ্ঠস্বরের বর্ণনায় বিদ্যাপতির অস্বাভাবিক কোকিলপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বড়ু রাধার বচনকে কেবল অমৃত সমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ উপমা অবশ্য বিদ্যাপতিতেও পাই।

রাধিকার গতিভঙ্গির বর্ণনায় উভয় কবিই সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুবর্তী। রাজহংস বা করিরাজকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তবে বিদ্যাপতির কৃতিত্ব যে নায়িকার গতিভঙ্গির বর্ণনায় তিনি এক একটি আশ্চর্য চিত্র অঙ্কন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বড়ু রাধার দেহকান্তির সঙ্গে কাঁচা সোনা, কাঁচা হলুদ ও চাঁপা ফুলের তুলনা দিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদেও এ সকল উপমা পাই। তবে দেহকান্তি বর্ণনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি যে কিছু পরিমাণে মৌলিকতা দেখাইয়াছেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি পল্লী বা লোকজীবন হইতে সংগৃহীত উপমাতেই বড়ুর যাহা কিছু মৌলিকতা। সমকালীন জীবনধারা কবিজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। সমকালীন রুচি, বাগ্‌ভঙ্গি, প্রবচন এবং পল্লীজীবনের ছবি বড়ুর কাব্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে। রাধা বা কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় বড়ু সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, কিন্তু বড়াইয়ের রূপবর্ণনায় বড়ুর স্বাধীনতা লক্ষণীয়। এখানে কবি স্বাধীনতা বা মৌলিকতা প্রদর্শনের সুযোগও পাইয়াছেন। কারণ বড়াই হইল সম্পূর্ণ এক নূতন চরিত্র, যে এই কাব্যের নায়ক বা নায়িকা কেহই নয়, এমন কি সে যুবতী রূপবতীও নয়। তাই তাহার কেশপাশ প্রথাসিদ্ধ নীলজলদসম নয়, তাহার কপাল অর্ধচন্দ্রকে পরাজিত করে না, কপোলের সঙ্গে মহুলের ফুল উপমিত হয় না, তাহার গতিচ্ছন্দ দেখিয়া রাজহাঁস বা করিরাজ কেহই লজ্জায় মুখ লুকায় না। তবে বড়াইয়ের রূপটি কিরকম? এবং সেই রূপবর্ণনায় কি কি উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে? কবি জন্মখণ্ডে বড়াইয়ের রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন:

শেত চামর সম কেশে। কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি। কোটর বাটুল দুঈ আখি॥
মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে। উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী। ওঠ আধর উঠক জিণী॥
কাঠী সম বাহুযুগলে। নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

[বড়াইয়ের চুল শ্বেতচামরের ন্যায় সাদা, দুই পাশে কপাল বসিয়া গিয়াছে। ভ্রূযুগল দেখিতে যেন দুইটি চুনের রেখা। তার চোখ দুইটি গর্তে ঢুকিয়া গিয়াছে। নাকের মাঝখানটা বসা, গাল তোবড়ানো, গালের হাড় দুইটা উঁচু, দাঁতগুলো বীভৎস, ঠোঁট দুইটা উটের ঠোঁট অপেক্ষাও খারাপ আর কথাবার্তা কাপট্যপূর্ণ। তাহার দুই

বাহু কাঠির মত সরু, স্তনদ্বয় নাভিদেশ পর্যন্ত লম্বিত, পায়ে বল নাই তাই আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে।]

জন্মখণ্ডে নারদের বর্ণনাতেও লোকজীবনের স্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে। নারদ এখানে পুরাণবর্ণিত দেবর্ষিচরিত্রের মহিমা লাভ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নারদ গ্রাম্য হাস্যকর চরিত্র হিসাবে উপস্থিত হইয়াছেন। মহিমাহীন নারদের বর্ণনায় যে সকল উপমা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাও পল্লীজীবনপরিবেশ হইতেই গৃহীত। কবি নারদের বর্ণনা করিতেছেন :

পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ। বামন শরীর মাকড় বেশ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী। বিকৃত বদন উমত মতী॥
... ...
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ। রাও কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ॥

[নারদের মাথার চুল এবং দাড়ি পাকা, বামনের মত তাঁহার দেহ খর্ব আর বেশ মর্কটের মত। নারদ মুখ বিকৃত করিয়া উন্মত্তবৎ ভেকের গতিতে নৃত্য করিতেছেন। ঘন ঘন জিভ বাহির করিয়া বোকা ছাগলের মত শব্দ করিতেছেন।]

কৃষ্ণের কোনো কোনো চটুল উক্তির মধ্যে লোকজীবনের বিশিষ্ট বাক্-প্রবণতাটি ধরা পড়ে। কৃষ্ণ দানখণ্ডে রাধাকে বলিতেছে :

তোহ্মার যৌবন রাধা কৃপিণের ধন।
পোটলি বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন॥

কিংবা,

হেন স যৌবন রাধা সব আলপাউ।
যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ॥

রাধারও কিছু চটুল উক্তি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। দানখণ্ডে সে কৃষ্ণকে তির্যক্ ভঙ্গিতে বলে :

এ বোল বুলিতেঁ তোর মণে বড় সুখ।
পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক॥

আর ভারখণ্ডে তাহার উক্তি :

চুণ বিহনে যেহ্ন তাম্বূল তিতা।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা॥

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লৌকিক জীবন হইতে উপমা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুকুন্দরাম বোধ করি সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করিলেও কোথাও কোথাও তাঁহার ব্যবহৃত উপমাগুলি যেমন নূতন তেমনি চমকপ্রদ। এ ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ লোকজীবন হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের ব্যবহৃত লৌকিক উপমার সঙ্গে পরবর্তী কালের কবি মুকুন্দরামের লৌকিক উপমার তুলনামূলক বিচার চলিতে পারে। এই শ্রেণীর উপমার

মধ্য দিয়া সমকালীন সমাজজীবনের চিত্রেরও প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমার আলোচনাপ্রসঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল হইতেও কয়েকটি লৌকিক উপমা এখানে সংগ্রহ করা গেল :

চুবড়ি মেলায়ে দন্ত বেচেন ফুল্লরা।
কৃষাণে যেমন দেই মুলার পসরা ॥

কিংবা,

লেঙ্গুড় বাড়ায় সিংহ মাথার উপর।
কলার বাগুড়ি যেন কাঁপে কলেবর ॥

অথবা,

খরটাঙ্গি দিয়া বীর কাটে তার শুণ্ড।
গৃহস্থে যেমন কাটে ক্ষেতে ইক্ষুদণ্ড ॥

এই সকল উপমা নির্বাচনের মধ্যে লোকজীবনের প্রতি মুকুন্দরামের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচনার শেষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে আর একটি লৌকিক উপমা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :

রাধাবিরহ অংশে শ্রীরাধা বড়াইকে কৃষ্ণবিরহের কথা ব্যক্ত করিতেছে। রাধা বেদনাদগ্ধ চিত্তে ক্ষোভ করিতেছে :

দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর ডাল যেন তখনে পালাইল ॥

কৃষ্ণের কাছে সুখদুঃখের কথা বলা হইল না। যাদুকরের তৈয়ারি গাছের ডাল যেমন অকস্মাৎ দেখা দিয়া মুহূর্তমধ্যেই অন্তর্হিত হয়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি অন্তর্ধান করিলেন।

এই উপমাটির মধ্য দিয়া প্রাচীন বাংলার পল্লীজীবনের একখানি চিত্র চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাদুকরের সৃষ্ট গাছের ডালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া বড়ু চণ্ডীদাস একই সঙ্গে মৌলিকতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

প্রবাদ ও প্রবচন

প্রবাদ সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে তাঁহার 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন, "প্রাচীন সাহিত্যে প্রবাদের যে যথেষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে, তাহার সযত্ন ও সবিস্তার আলোচনা না হইলে, এগুলির লোকপ্রিয়তা, ব্যবহারের পারম্পর্য ও প্রাচীন রূপের নির্ণয় করা যাইবে না। Oxford Dictionary of English Proverbs নামক ইংরেজি প্রবাদের অভিধানে প্রায় দশ হাজার ইংরেজি প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইংরেজি সাহিত্যিকের আদি কাল হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত প্রত্যেক প্রবাদবাক্যের প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্যের দিক হইতে, বাংলা প্রবাদেরও এই

ধরণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভিধান সংকলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।" সুশীলকুমার দের এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আজও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে প্রবাদবাক্য ব্যবহারের কোনো ইতিহাস রচিত হয় নাই বা কোনো অভিধান সংকলিত হয় নাই। বিশেষ একটি প্রবাদবাক্য চর্যাপদ হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত কোন্ কোন্ কবির কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এখনও জানিবার কোনো সহজ উপায় নাই।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রায় সকল কবির রচনাতেই প্রবাদের কমবেশী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখন প্রশ্ন হইল, কবিরা তাঁহাদের রচনায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করিয়াছেন কেন? ইহার অন্যতম কারণ, কবিরা সম্ভবতঃ প্রবাদ-প্রবচনগুলিকে তাঁহাদের রচনায় বাক্যালঙ্কার হিসাবে প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছেন। তাহা ছাড়া ব্যাখ্যা বা দৃষ্টান্ত হিসাবে, কোনো বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, কিংবা স্বল্প কথায় একটি বৃহৎ অর্থ প্রকাশের প্রয়োজনে প্রবাদের যে একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে এ কথা সকল কালের লেখকই কিছু না কিছু অনুভব করিয়া থাকেন।

Wit হইল প্রবাদ-প্রবচনের প্রাণ। এই wit-ই প্রবাদ-প্রবচনগুলিকে লোকমুখে বা সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখে। প্রবাদের এক একটি কথা বিদ্যুৎচমকের মত উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। প্রবাদ বা প্রবচনে সাধারণতঃ কোনো নূতন তত্ত্ব প্রচার করা হয় না। জানা কথাই এখানে পুনরায় ভাল করিয়া জানাইয়া দেওয়া হয়। প্রবাদের মধ্যে কোথাও বিদ্রূপের খোঁচা থাকে, কোথাও ব্যঙ্গের আঘাত থাকে, আবার কোথাও বা সমবেদনার ইঙ্গিতও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

রুচির দিক হইতে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের বিচার চলিতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা আবশ্যক প্রবাদ-প্রবচনের উদ্ভব মুখ্যতঃ প্রাকৃত মানুষের নিতান্ত মুখের ভাষা হইতে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে কখনই শিক্ষিত মার্জিত রুচি আশা করা সঙ্গত নয়। প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে গ্রাম্যতা কিছুটা মানিয়া লইতেই হয়। তবে একটি কথা এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা এক বস্তু নয়। বাংলা প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও কিছু গ্রাম্যতা থাকিলেও অশ্লীলতা বিশেষ নাই।

বাস্তবপরায়ণতা বা বাস্তবধর্মিতা প্রবাদের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। জাতির জীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্য হইতে ইহার আবির্ভাব, তাই একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে জাতির মনস্তত্ত্ব আচারব্যবহার বা রীতিনীতি সংস্কার এই প্রবাদগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ভাষার দিক হইতে বলা যায় প্রবাদের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি তীক্ষ্ণ ও জোরাল হইয়া থাকে। দৈনন্দিন ব্যবহারে ইহার তীক্ষ্ণতা ও শক্তি ক্রমে বর্ধিত হয়। বিভিন্ন লেখকের রচনায় প্রবাদের রূপের ও প্রয়োগের যে কি বিচিত্র রূপান্তর ঘটিয়া থাকে তাহা একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখানো গেল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে:

চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল
নিজ মাঁসে জগতের বৈরী ॥

কিংবা,

আপণ গাএর মাসে হরিণি বিকলী।

এই প্রবাদটি চর্যাপদে ব্যবহৃত হইয়াছে :

অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।

বিদ্যাপতির পদে আছে :

হরিণী জাগায় ভাল কুটম্ব বিবাদ।

পরবর্তী কালে মুকুন্দরাম ব্যবহার করিয়াছেন :

অপনার মাংস আপনার হৈলা অরা।

কিংবা,

জগৎ হইল বৈরী আপনার মাংসে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রাচীন প্রবাদ-প্রবচন ও বিশেষার্থবোধক বাক্যের পরিমাণ কম নাই। রাধা কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের মুখে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রবাদ ও প্রবচনগুলি বসাইয়া কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে সময়ের রচনা সেইসময় বাংলার পল্লী অঞ্চলে কি ধরনের প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত ছিল রাধা কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের চটুল সংলাপের মধ্য হইতে সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাইতে পারে। জনসমাজে প্রচলিত প্রবচনগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং সেগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটাইয়া বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্য-কৃতির অসামান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবচনগুলি উপমা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল উপমাই সংলাপকে সজীব ও নাট্যগুণান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রবচনগুলি ব্যবহারের মধ্য দিয়া তৎকালীন লোকজীবন ও প্রচলিত বাগ্‌ধারার সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতার পরিচয় মেলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রবাদ-প্রবচন আলোচনাপ্রসঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন প্রবচনগুলি পরবর্তী কালে কোন্ রূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করা যাইবে।

তাম্বূলখণ্ডে কৃষ্ণ বড়াইকে বলিতেছে, 'যে থানে শুঁচী না জাএ। তথাঁ বাটিআ বহাএ॥' কৃষ্ণ বড়াইয়ের গুণকীর্তন করিতে গিয়া এই উক্তি করিয়াছে। কৃষ্ণের বক্তব্য, রামের কাজে যেমন হনুমান, তাহার বড়াইও সেইরকম। সে ভাঙ্গা প্রেম জোড়া লাগাইতে পারে। যেখানে সূচ প্রবেশ করে না সেখানে সে রজ্জু প্রবেশ করায়। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মধ্যে পাইতেছি, 'যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে বেটে চালান'। দামোদর মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার উপন্যাসে একটি নারীচরিত্রের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন 'যেখানে ছুঁই না চলে, আমরা সেখানে বেটে চালাই'।

রাধা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বড়াইকে বলিতেছে, কৃষ্ণের নিকট তাহার এই যে দুর্ভোগ ইহার জন্য তাহার কপালই দোষী। দানখণ্ডে আছে, 'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ'। এ প্রবাদ প্রাচীন সাহিত্যে অন্যত্রও মেলে। ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে পাইতেছি, 'ললাটের লিখন খণ্ডাতে পারে কেবা' কিংবা, 'না পারে খণ্ডিতে লোক কপালের লিখা'। মাণিক গাঙ্গুলীর পদে আছে, 'না যায় খণ্ডন কভু কপালের লেখা'।

দানখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধার চটুল উক্তি, 'বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী। মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী॥ দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে। আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে॥' ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। প্রবচনটি অত্যন্ত প্রচলিত। আজিও লোকের মুখে এই প্রাচীন প্রবাদ চলিতেছে। অনাধুনিক আধুনিক সকল সাহিত্যেই প্রবাদটি স্থান লাভ করিয়াছে। যেমন 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় আছে, 'কাকেতে খাইতে আশা যেন পাকা বেল'। দাশু রায়ের পাঁচালীতে 'বেল পাকিলে কাকের কিবা সুখ' পাইতেছি। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ আছে, 'তিনি ভাল জানেন বেল পাকলে কাকের কি'।

রাধা একই উদ্দেশ্যে দানখণ্ডের আর এক স্থানে কৃষ্ণকে বলিতেছে, 'আহ্মাকে বল কৈলেঁ তোর নাহিঁ কিছু ফল। মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল॥' চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত একটি পদে পাওয়া যায়, 'মাকড়ের হাতে নারিকল। খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল॥' দাশু রায়ে আছে, 'নারিকেল কি খেতে পারে বানরে'।

রাধার নিজের রূপযৌবনই তাহার বৈরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বড়াইকে গভীর দুঃখের সঙ্গে বলিতেছে, 'কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী। আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥' (দানখণ্ড)। আর এক স্থানে বলিতেছে, 'চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল নিজ মাঁসে জগতের বৈরী'॥ (দানখণ্ড)। আরও এক স্থানে আছে, 'আপণ গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী'। (দানখণ্ড)। চর্যাগীতিকায় ভুসুকপাদের পদে আছে, 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী'।

কামার্ত কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া রাধার তির্যক ভাষণ, 'ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞি দুই হাথে না খাইএ'। (দানখণ্ড)। বিদ্যাপতির পদে আছে, 'বড়েও ভুখল নহি দুহু করে খাএ'। ভবানন্দের 'হরিবংশে' আছে, 'দুই হস্তে কেবা খায় যদি লাগে ক্ষুধা'। আলাওলের 'পদ্মাবতী'তে পাই, 'ক্ষুধার্ত হইলে দুই হস্তে কেবা খায়'।

প্রবচনের সুষ্ঠু প্রয়োগে দানখণ্ডে রাধার সংলাপ তীক্ষ্ণতর হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি রাধা প্রবচনের মধ্য দিয়া কৃষ্ণকে গালি দিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে গালির আঘাত কৃষ্ণের গায়ে স্পর্শ করুক আর নাই করুক, পাঠক তাহার ধার অনুভব করে। দানখণ্ডে রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছে, 'মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী'। এখানে মাকড়ের সঙ্গে রাধা কাহার তুলনা করিয়াছে তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বিদ্যাপতির পদে পাই, 'বানর কণ্ঠে কি মোতিম মাল'।

দানখণ্ডের শেষ অংশে রাধার মুখে আরও একটি প্রচলিত প্রবচন শুনি। সে কৃষ্ণকে প্রবচনের সাহায্যে বুঝাইতেছে পরদারসুরতিতে কোনোই আনন্দ নাই। তাহার বলার ভঙ্গিটি এই, 'পরদারসুরতী করিতেঁ না জুআএ। ভাতের ভোখ কাহ্নাঞি ফলেঁ না পালাএ॥'

'বামন হয়ে চাঁদে হাত' বাংলা দেশের একটি অত্যন্ত প্রচলিত প্রবাদ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনেক কবির রচনায় এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারখণ্ডে রাধা

কৃষ্ণকে বলিতেছে, 'মজুরিআ হআঁ হেন না বোল কাহ্নাঞি। হাথ বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই ॥' কৃত্তিবাসের পদে আছে, 'বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে'। মাণিক গাঙ্গুলী লিখিতেছেন, 'বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন'। রামেশ্বরের 'শিবায়নে' আছে, 'বামন হইয়া হাত বাড়ায়েছি চাঁদে'। শুধু যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এই প্রবাদটির অস্তিত্ব মেলে তাহা নয় সংস্কৃত সাহিত্যেও মেলে। কালিদাস লিখিতেছেন, 'উদ্বাহুরিব বামনঃ'।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার কথাবার্তার মধ্যে যতগুলি প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, কৃষ্ণের সংলাপে সেই পরিমাণ প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ নাই। প্রবাদ বাংলাদেশের স্ত্রীলোকের ভাষায় একটি বড় সম্পদ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা যে ভাষায় কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলিয়াছে তাহা যথার্থই বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের স্ত্রীলোকের ভাষা। রাধা যে বাংলার পল্লী অঞ্চলেরই এক কন্যা, তাহার বাগ্‌ভঙ্গিমার মধ্য দিয়া সে কথা সহজেই বোঝা যায়।

বাণখণ্ডে কৃষ্ণের মুখে একটি প্রবচন পাইতেছি। প্রবচনটি বিশেষ প্রচলিত নয়। কৃষ্ণ কোনো প্রসঙ্গে রাধাকে বলিতেছে, বধোদ্যতকে যে না মারে পিতৃপুরুষ তাহার জল গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণের ভাষায়, 'মারন্তাক যে না মারে। তার পাণী না লএ পীতরে ॥' রাধাবিরহ অংশে কৃষ্ণ একটি প্রবচন উপমা হিসাবে ব্যবহার করিয়া রাধাকে তাহার কথা বুঝাইতেছে। কৃষ্ণ বলে, 'সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ আগুনতাপে। পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে ॥' সোনা ভাঙ্গিলে আগুনের তাপে তাহাকে জুড়িবার উপায় থাকে, কিন্তু পুরুষের প্রেম একবার ভাঙ্গিলে তাহাকে জুড়িবার ক্ষমতা কাহারও থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে কয়েকটি প্রবচন উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া দেখা গেল বড়ু চণ্ডীদাস্ তাঁহার কাব্যের মধ্যে লোকজীবন হইতে সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচনগুলি কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। আলোচনার শেষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য প্রবাদ-প্রবচনগুলি পদ ও খণ্ডের ক্রম অনুসারে একত্রে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

যে থানে শুঁচী না জাএ
তথাঁ বাটিআ বহাএ।—তাম্বূলখণ্ড
ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ।—দানখণ্ড
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে।—দানখণ্ড
জরুয়া দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল।—দানখণ্ড
পোএর মুখে পরবত টলে।—দানখণ্ড
লাজে সে হারায়ি কাজে।—দানখণ্ড
পরধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী।—দানখণ্ড
মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারীকল।—দানখণ্ড
চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল

নিজ মাঁসে জগতের বৈরী ।—দানখণ্ড
আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী ।—দানখণ্ড
এভোঁহো নাহিঁ ঘুচে তোর মুখে দুধবাস ।—দানখণ্ড
যাত খিধা বসে নাগরি রাধা
কিবা তার কাঁচ পাকাএ ।—দানখণ্ড
আপণ গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী ।—দানখণ্ড
জুড়ায়িলেঁ সোআদ লাগে তপত দুধ ।—দানখণ্ড
ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞি দুঈ হাথে না খাইএ ।—দানখণ্ড
মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী ।—দানখণ্ড
ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ ।—দানখণ্ড
আপণা রাখিএ আপণে ।—দানখণ্ড
মুদিত ভাণ্ডারে কাহ্নাঞিঁ না সাম্বাএ চুরী ।—নৌকাখণ্ড
সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী ।—ভারখণ্ড
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বূল তিতা ।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা ॥—ভারখণ্ড
হাথ বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই ।—ভারখণ্ড
গোপত কাজত কাহ্নাঞিঁ ছয় আখি বারী ।—ভারখণ্ড
আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ ।—ভারখণ্ড
দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পড়ী মরে ।—ভারখণ্ড
পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহিঁ দেহ ভাত ।—বৃন্দাবনখণ্ড
মারন্তাক যে না মারে
তার পাণী না লএ পীতরে ।—বাণখণ্ড
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী ।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ।—বংশীখণ্ড
আথায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ ।—বংশীখণ্ড
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ। সে মোর সুখাইল ল ।—রাধাবিরহ
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ আগুনতাপে ।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে ।—রাধাবিরহ
যে ডালে করো মো ভরে
সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে ।—রাধাবিরহ
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ।—রাধাবিরহ
কাটিল ঘাঅত লেম্বু রস দেহ কত ।—রাধাবিরহ
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী ।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী ॥

যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট।
তাহাব সে নেহা যেহু মাটির ঘট ॥—রাধাবিবহ

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী, মাণিক গাঙ্গুলী, বামেশ্বর, ভাবতচন্দ্র প্রভৃতির রচনায় অনেক প্রবাদবাক্যেব ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। মদনমোহন গোস্বামী তাঁহাব 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র' গ্রন্থে এবং পঞ্চানন চক্রবর্তী 'রামেশ্বর রচনাবলী' গ্রন্থে যথাক্রমে ভাবতচন্দ্র ও রামেশ্বরের ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনের মূল্যবান সংকলন করিয়াছেন।

আখ্যানভাগ

জন্মখণ্ড: কংসেব জন্য সৃষ্টির বিনাশ হইতেছে। বসুন্ধরা স্বর্গের দেবতাগণের নিকট আসিয়া তাঁহার দুঃখের কথা বলিলেন। তখন দেবতাগণ সকলে মিলিয়া স্বর্গের মধ্যে এক সভা পাতিলেন। সেই সভায় স্থিব হইল সৃষ্টিকে বক্ষার জন্য অবিলম্বে কংসকে বধ কবা প্রয়োজন। কিন্তু উপায় কি? তখন সকলে ব্রহ্মাকে এই কথা জানাইলেন। ব্রহ্মা নাবায়ণেব নিকট সকলকে লইয়া গেলেন। দেবতাদেব অভিযোগ শুনিয়া নারায়ণ ঈষৎ হাস্য কবিয়া একটি শ্বেত ও একটি কৃষ্ণকেশ তাঁহাদেব হাতে দিয়া বলিলেন, বসুদেবের গৃহে দৈবকীব উদবে এই দুইটিব একটি হলধব বলবাম রূপে আর একটি কৃষ্ণ বনমালী রূপে আবির্ভূত হইবে।

দেবতাগণের মন্ত্রণার কথা শুনিয়া নারদ মুনি কংসেব সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, দৈবকীর অষ্টম গর্ভে যাহার জন্ম হইবে সেই মহাবল বীর তাঁহাব কালস্বরূপ। নারদের কথা শুনিয়া কংস স্থির করিলেন, এখন হইতে দৈবকীর যখনই যে সন্তান হইবে তাহাকে বিনষ্ট কবা হইবে। সেখান হইতে নারদ বসুদেবের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকেও কংসের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা জানাইয়া নিবন্তর সতর্ক করিবাব জন্য নির্দেশ দিয়া গেলেন। কংসের হাতে দৈবকীর পব পর ছয়টি গর্ভ বিনষ্ট হইল। সেই সময় একদিন দেবতারা সকলে মিলিয়া দৈবকীব উদবে নারায়ণ-প্রদত্ত কেশ দুইটি সংবিষ্ট করিয়া দিলেন। যে শ্বেত কেশটি দৈবকীর উদরে প্রবিষ্ট হইল তাহাই মহাপরাক্রমশালী বলভদ্রের রূপ গ্রহণ করিল। ইনি জননীর গর্ভপাতের ছল কবিয়া রোহিণীর গর্ভে গিয়া আশ্রয় লইলেন। দৈবকীর উদরে অবস্থিত কৃষ্ণ কেশটি শ্রীকৃষ্ণের রূপ লইল। ইহাই দৈবকীর অষ্টম গর্ভ জানিয়া কংস তাহাকে বধের জন্য উদ্যত হইলেন।

রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথিতে এক ঘনবর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রে কৃষ্ণের জন্ম হইল। দেবতাদের সহায়তায় বসুদেব সেই রাত্রেই গোকুলে গিয়া নিদ্রাভিভূতা যশোদার কোলে কৃষ্ণকে রাখিয়া তাঁহার সদ্যোজাতা শিশুকন্যাটিকে গৃহে লইয়া আসিলেন। এই কন্যাকেই দৈবকীর সন্তান মনে করিয়া কংস তাহাকে পাথরে আছড়াইয়া হত্যা করিলেন। তখন সেই কন্যা অন্তরীক্ষ হইতে বলিল, তোমাকে যে বধ করিবে সেই বালক নন্দগৃহে

বাড়িতেছে। কংস ইহা শুনিয়া তাহাকে হত্যার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কংস-প্রেরিত পুতনা, যমলার্জুন, কেশী ইত্যাদি সকল অসুরকেই সংহার করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য দেবতাগণ স্বর্গ হইতে রাধারূপে লক্ষ্মীকে প্রেরণ করিলেন। সাগরের ঘরে পদ্মার উদরে অপূর্ব সুন্দরী শ্রীরাধার জন্ম হইল। দেবগণের ইচ্ছাতেই রাধার স্বামী হইল নপুংসক আইহন। আইহনের কথামত তাহার মা রাধার পরিচর্যার জন্য পদ্মার নিকট হইতে এক বৃদ্ধাকে লইয়া আসিলেন। এই বৃদ্ধা পদ্মার পিসী, রাধার বড়াই।

তাম্বুলখণ্ড : বড়াইয়ের সঙ্গে রাধা প্রতিদিন দধিদুধ বিক্রয় করিতে মথুরার হাটে যায়। একদিন বনপথে রাধা বড়াইকে হারাইয়া ফেলিল। রাধা তাহার সখীদের সহিত রঙ্গ-পরিহাস করিতে করিতে যখন বকুলতলায় আসিয়া পৌছে তখন দেখে বড়াই তাহাদের সঙ্গে নাই। বড়াইকে না দেখিয়া রাধা বিহ্বল হইয়া পড়ে।

অপরদিকে রাধিকাকে হারাইয়া বড়াই স্থানে স্থানে ঘুরিতে থাকে। অবশেষে বৃন্দাবনের মধ্যে গোপালক নাতি কানাইকে দেখিয়া তাহার নিকট রাধার সংবাদ জিজ্ঞাসা করে।

কৃষ্ণ রাধাকে কিরূপে চিনিবে? বড়াই তখন রাধা-রূপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়। রাধার অনুপম রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া কৃষ্ণ স্থির থাকিতে পারিল না। রাধাকে লাভ করিবার জন্য সে বড়াইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বড়াই সে সাহায্যদানে অসম্মত হয় না। সাহস পাইয়া কৃষ্ণ বড়াইকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করে। তাহার হাত দিয়া রাধার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ কিছু ফুল, ফুলের মালা ও কর্পূরমিশ্রিত তাম্বুল পাঠাইয়া দেয়। বড়াই ফুল পানের ডালি লইয়া রাধার উদ্দেশে যায়। কৃষ্ণ পথের নির্দেশ দিয়াছিল, সুতরাং বনের মধ্যে রাধাকে খুঁজিয়া পাইতে বিলম্ব হয় না। রাধার সহিত দেখা হইলে বড়াই তাহার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া প্রণয়প্রস্তাব স্বরূপ কৃষ্ণের প্রেরিত ফুল, পান তাহার হাতে দেয়। রাধা সে প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে। ফুল পান মাটিতে ফেলিয়া বাম পদে দলিত করিয়া বলে আইহন-পত্নী পরপুরুষের ভজনা করে না।

বড়াই কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া এই অপমানের কথা বলে। কিন্তু তাহাতে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয় না। মদনশরাতুর কৃষ্ণ মুহূর্তের জন্যও রাধা-বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছে না। কি নিদ্রায় কি জাগরণে কৃষ্ণের অন্তরে রাধিকা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নাই। তাই রাধার সঙ্গে দেখা করাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ বড়াইকে বারবার অনুনয় করিতে থাকে।

কৃষ্ণের অনুরোধে বড়াই পুনরায় রাধার নিকট আসিয়া তাহাকে কৃষ্ণের ব্যাকুলতার কথা বলে। কিন্তু রাধা বড়াইয়ের এই কুপ্রস্তাবে কর্ণপাত করে না। সে গালি দিয়া বুড়িকে তাড়াইয়া দেয়, রাগের বশে বড়াইয়ের পিঠে দুই চারিটা চড়চাপড় বসাইতেও ছাড়ে না।

আঘাত খাইয়া বড়াইয়ের রাগ হয়। সে কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সব কথা জানায়। বলে এ অপমানের দণ্ড দেওয়া চাই। তখন দুইজনে বসিয়া রাধাকে কিরূপে শাস্তি দেওয়া যায় তাহার উপায় চিন্তা করে।

শেষে স্থির হয়, বড়াই যমুনার তীরে কদম্বতলে বসিয়া থাকিবে আর রাধাকে দানের ছলে ধরিয়া কৃষ্ণ তাহার দধিদুধ নষ্ট করিবে, সাতেসরী হার কাড়িয়া লইবে, কাঁচুলি ছিঁড়িবে। দূতীকে অপমান করার সমুচিত শাস্তি না দিয়া কৃষ্ণ ছাড়িবে না।

দিনক্ষণও স্থির হইয়া গেল। যে দিন কৃষ্ণ যমুনার কুতঘাটে দানী সাজিয়া বসিবে তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যায় বড়াই আইহনের গৃহে গিয়া আইহনের মায়ের নিকট হইতে রাধার মথুরার হাটে দধিদুধ বিক্রয়ের অনুমতি কৌশলে চাহিয়া লয়। রাধা তখন হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

দানখণ্ড: যমুনার ঘাটে কৃষ্ণ দানী সাজিয়া বসিয়াছে। রাধা প্রতিদিন সখীদের সঙ্গে মথুরার হাটে দধিদুধের পসরা লইয়া যায়। এজন্য তাহাকে কোনো দিন কাহারো নিকট কোনো দ্রব্যের উপর দান দিতে হয় নাই। আজ কৃষ্ণ দানী সাজিয়া রাধার নিকট মহাদান চাহিয়া বসিল। শুধু যে পণ্যদ্রব্যের জন্য দান তাহা নয় রাধার সাড়ে তিন হাত দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের জন্যও কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ দান ধার্য করিয়া দুই কোটি দান দাবি করে। কৃষ্ণের হাত হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি পায় সে জন্য রাধা প্রথমে অনেক অনুনয়বিনয় করে। রাধার উক্তি, 'চরণে পড়িআঁ কাহ্নাঞি বোলোঁ তোহ্মারে। ছাড় একবার কাহ্নাঞি জাইতেঁ দেহ ঘরে॥' কিন্তু পায়ে পড়িয়াও কোনো ফল হয় না। কৃষ্ণ ক্রমাগতই রাধার প্রতিটি অঙ্গের উল্লেখ করিয়া তাহার রূপযৌবনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে থাকে। কৃষ্ণের মুখে একই কথা--হয় সব দান মিটাইয়া দাও নয় আলিঙ্গন দাও। রাধা কৃষ্ণের কথা শুনিয়া ভয় পায়। রাধা বলে, সে নিতান্তই অল্পবয়সী বালিকা, ননী দলের মত কোমল তাহার দেহ আর তাহা ছাড়া সুরতিভাব তো তাহার সম্পূর্ণই অজ্ঞাত। রাধার পক্ষে কৃষ্ণের প্রস্তাব মানিয়া লওয়া কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। কিন্তু এ যুক্তিতে কৃষ্ণ দমিত হয় না। তখন রাধা কংসাসুরের ভয় দেখাইয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। রাধা কৃষ্ণকে বলে কংস যদি এ সকল কথা শুনিতে পায় তাহা হইলে সে এখনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কৃষ্ণকে দণ্ড দিতে আসিবে। শুধু কংস কেন, রাধার ঘরে স্বামী আইহন আছে। সে বলবীর্যবান। তাহার কানে এ কথা গেলে সেও করাত দিয়া কৃষ্ণকে নিমেষে চিরিয়া ফেলিবে। কিন্তু কৃষ্ণ এ সকল কথায় ভয় পাইবার পাত্র নয়। কংস তাহার কি করিতে পারে? নপুংসক আইহনের তো কোনো কথাই নাই। কৃষ্ণ নিজেই নিজের বীরত্বের উল্লেখ করিয়া রাধাকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু রাধা পরপুরুষের বীরত্বে মুগ্ধ হইবে কেন? আরো একটি কারণ উল্লেখ করিয়া রাধা বলে কৃষ্ণের সহিত তাহার মিলিত হইবার কোনই সুযোগ নাই। সম্পর্কে রাধা হইল কৃষ্ণের মাতুলানী আর কৃষ্ণ তাহার ভাগিনা। মামী-ভাগিনার মিলন কি সম্ভব? কৃষ্ণ

কিন্তু এই সম্পর্কের কথায় কান দেয় না। কৃষ্ণের মতে রাধার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ সে তো অনেক দূরের—'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী'। সুতরাং তাহাদের মধ্যে মিলনে কোনো বাধা নাই। কিন্তু এ সকল কোনো কথাই রাধা কানে তুলিতে রাজি নহে। কৃষ্ণ কাছে আসিলেই সে তাহাকে বাধা দেয়, আঘাত করে। কৃষ্ণ রাধাকে তাহাদের পূর্বজন্মের সম্বন্ধকথা মনে করাইয়া দিতে চেষ্টা করে, 'পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে। তোহ্মে লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মে হরি কাহ্নে॥' কৃষ্ণ আরও বলে, 'পুরুব কালতে তোর পতি চক্রপাণি তো এবেঁ পাসরিলি কেহ্নে'। কিন্তু পূর্বজন্মের এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্পর্কের কথা রাধার মনে পড়ে না। তাই কৃষ্ণকে সে মানিয়া লইতে রাজি হয় না। কৃষ্ণের হাত হইতে পলাইতে পারিলেই তাহার রক্ষা। বড়াইয়ের সঙ্গে তাই রাধা পরামর্শ করিতে বসে। বড়াই যুক্তি দেয় অন্যপথ দিয়া তাহারা মথুরার হাটে যাইবে। কিন্তু রাধার তাহাতেও সংশয় ঘুচে না। সেই পথেও তো কৃষ্ণ তাহাকে বাধা দিতে পারে। তখন বড়াই বলে, তবে তুমি কৃষ্ণকে চুম্বন আলিঙ্গন দিয়া শান্ত কর। আর তাহা ছাড়া কৃষ্ণের প্রেম যে লাভ করে সে তো মহা পুণ্যবান। তাহার মৃত্যু হইলে হয় সে মুক্তিলাভ করে নয় স্বর্গে যায়, 'কাহ্নাঞির নেহ রাধা বড় পুনে পাইএ। মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ॥'

রাধা যখন কৃষ্ণকে এড়াইবার জন্য বনের অন্য পথ দিয়া পলাইতে থাকে তখন কৃষ্ণ আগাইয়া গিয়া তাহার পথরোধ করে। কুট্টিনী বড়াই ইহা দেখিয়া মূল পথে সরিয়া পড়ে। রাধার বাধাদান ও ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণ তাহার সহিত বনমধ্যে মিলিত হয়।

নৌকাখণ্ড: মথুরার পথে এই ঘটনা ঘটিবার পর হইতে রাধা আর দধিদুধ বেচিতে যায় না। আইহনের জননীও পুত্রবধূকে মথুরায় যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এদিকে দীর্ঘদিন রাধাকে না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণের মন ব্যাকুল। রাত্রিদিন নিদ্রা নাই। তাহার পক্ষে প্রাণ স্থির রাখা কঠিন। একদিন সুযোগ পাইয়া কৃষ্ণ বড়াইকে তাহার ব্যাকুলতার কথা বলিলে বড়াই কৃষ্ণের নিকট রাধাকে যমুনার ঘাটে আনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গেল।

গৃহে ফিরিয়া বড়াই বারবার রাধাকে মথুরার হাটে যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতে থাকে। রাধা কৃষ্ণের দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া ভীত হইলে বড়াই বলে, কৃষ্ণ যে পথে দানী সাজিয়া বসে তাহারা এবার সে পথে না গিয়া অন্য পথে যাইবে। এখন রাজা যমুনায় নৌকা রাখিয়াছে, তাহাতেই লোকে পারাপার হয়। নানা কৌশলে বড়াই আইহনের মায়ের অনুমতিও সংগ্রহ করিয়া লইল।

রাত্রি প্রভাত হইলে ষোলশত গোপীকে সঙ্গে লইয়া রাধা মথুরা অভিমুখে চলিল। যমুনার ঘাটে আসিয়া সকলে পসরা নামাইল। ঘাটের নিকটে একটি ছোট নৌকা দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু ঘাটোয়াল গেল কোথায়? রাধার ডাকাডাকিতে ঘাটোয়ালের

বেশে স্বয়ং কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণ বলে, তাহার নৌকা ছোট, তাহাতে দুই জনের বেশী তিন জনের ভার সহিবে না। তাই কৃষ্ণ রাধার সকল সখীকে একে একে পার করিয়া দেয়। বড়াইও কৃষ্ণের নৌকায় ওপারে গেল। শেষে রাধা এপারে নিজেকে একলা দেখিয়া বড় ভয় পাইল।

কৃষ্ণ এবারেও রাধার নিকট মহাদান চাহিয়া বসিয়াছে। সাতেসরী হার দাও, সরস বাক্য বল, আলিঙ্গন দান কর, নতুবা নৌকায় পার করিব না। অধর্মে মন না দিয়া তাহাকে পার করিয়া দিবার জন্য রাধা কৃষ্ণকে অনুনয় করিতে থাকে। কৃষ্ণের আহ্বানে রাধা ভীত চিত্তে তাহার নৌকায় উঠিয়া বসে, দধিদুধের পসরাও সঙ্গে লয়। রাধা মনে ভাবে কথা কাটাকাটি করিয়া আর কত বেলা করিবে, হাট ভাঙ্গিয়া গেলে সকল দধিদুধই যে নষ্ট হইবে।

মাঝ যমুনায় নৌকা আসিলে বড ঝড় উঠিল। পর্বতের ন্যায় উঁচু উঁচু ঢেউ আসিয়া নৌকায় আঘাত করিতে লাগিল। এদিকে পাটাতনের মধ্য দিয়া নৌকায় জল ঢুকিতেছে। রাধা দেখিল এ অবস্থায় প্রাণ রক্ষা করা দুরূহ। নিরুপায় হইয়া সে কৃষ্ণকে বলে, তুমি যাহা চাও তাহাই দিব, দ্রুত পার করিয়া দাও।

কৃষ্ণ বলে, নৌকা কিছুটা হাল্কা করিতে না পারিলে এখনই তাহা যমুনার জলে ডুবিবে। এই ক্ষুদ্র নৌকার এত ভার বহিবার সামর্থ্য নাই। রাধার নিতম্ব জঘন পয়োধরযুগল বড়ই গুরুভার। তাহার উপর আবার আছে দেহের আভরণ, গজমোতির হার, দধিদুধের পসার। নৌকাকে হাল্কা করিবার জন্য বক্ষের কাঁচুলি, গজমোতির হার, দধিদুধের পসরা—এগুলি যমুনার জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। ভয়াতুরা রাধিকাও কৃষ্ণের কথামত যমুনার জলে দেহের বসন-ভূষণ ফেলিয়া দেয়। কৃষ্ণ তখন 'হিঅ হিঅ' বলিয়া অধিকতর উৎসাহে নৌকা ছুটাইয়া চলে। নদীর অর্ধেক যাইতে না যাইতে আবার খরবেগে বাতাস বহে। রাধা ঢেউ দেখিয়া যত ভীত হয়, কৃষ্ণ ততই নৌকা আরো বেশী করিয়া দোলাইতে থাকে। নৌকার দোলায় রাধার পসরা উলটিয়া দধিদুধ সব ছড়াইয়া পড়ে। তখন 'ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিঁকে মাঙ্গে কোল'। রাধা ভয়-ব্যাকুল চিত্তে নিতান্তই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কৃষ্ণের নিকট আত্মদানে সম্মত হয়। মথুরার হাটে বড়াই, রাধা ও ষোলশত সখী দধিদুধ বিক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য পুনরায় যমুনার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহার বড় নৌকায় এবার সকল গোপীকেই একসঙ্গে পার করিয়া দেয়। রাধা কৃষ্ণের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া রাধার সকল আভরণ ফিরাইয়া দিল। সখীরাও সকলে হৃষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিয়া গেল।

ভারখণ্ড: 'অথ রাধারসাবেশবশীকৃতমনা' কৃষ্ণ রাধাকে পুনরায় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় বৃদ্ধা বড়াইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসে। স্থির হয় বড়াই গৃহে ফিরিয়া রাধাকে বলিবে, এখন শরৎ কাল, মথুরার পথে সদাই লোকজন যাতায়াত করিতেছে,

এবার আর দুষ্ট কৃষ্ণের জন্য ভয়ের কোনো কারণ নাই। বড়াই রাধার কাছে এই কথাই গুছাইয়া বলে। আইহনের মায়ের নিকট হইতেও কৌশলে অনুমতি লয়।

মথুরার হাটে বিক্রয়ের জন্য রাধা 'পসার সজাআঁ নৈল ঘৃত ঘোল দহী'। এবার আর পথে তাহাকে কেহ বাধা দিল না। প্রফুল্লচিত্তে রাধা যমুনা পার হইয়া গেল। কিন্তু শরতের এই প্রখর রৌদ্রে তাহার পক্ষে এত ভার বহন করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া মথুরা নগরে যাইবার পথটাও তো কম নয়। তাই সে একটা 'মজুরিআ' সংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকে। ভারী হিসাবে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত। কানাই পূর্ব হইতেই ডাল কাটিয়া ভারদণ্ড নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ভার বহিতে কৃষ্ণের বড়ই সংকোচ হইতে থাকে। সে বলে, 'কংস বধিবারেঁ মোএঁ কৈলোঁ আবতার। এবেঁ কি বহিব আহ্মে তোর দধিভার।' কিন্তু এত কথায় রাধা সময় নষ্ট করিতে চায় না। সে কৃষ্ণকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলে, দেখ কানাই তুমি যদি ভার না বহ তাহা হইলে আমি অন্য ভারী সংগ্রহ করিব। রাধার এই কথার পর কৃষ্ণ আর বিলম্ব না করিয়া ভার তুলিয়া লয়। ভার বহন করা তাহার কোনোদিনই অভ্যাস ছিল না। তাই পথে যাইতে যাইতে কিছু দধিদুধ পাত্র হইতে উছলিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণের 'বুকে ঘাঅ দিল রাহী'। কৃষ্ণ তখন ভার বহন করিতে অসম্মত হইল। রাধা শাসাইয়া বলে, দেখো মুরারি আজ যদি তুমি ভার কাঁধে না তোলো তাহা হইলে আমার আশা চিরদিনের জন্য ছাড়িতে হইবে। তারপর যখন 'ইঙ্গিতেঁহে দেউ রাধা সুরতীর আশে' তখন কৃষ্ণ ভার তুলিয়া লইতে আর কালবিলম্ব করিল না।

ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড: মথুরা নগরে দধিদুধ বেচিয়া গৃহে ফিরিবার পথে রাধা ও বড়াই পথশ্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ তরুতলে বসিয়াছে। শীতল বাতাস বহিলে 'চারিপাশ চাহে রাধা তরল নয়নে দেখিল কোপিল কাহ্নাঞিঁ রহিলছে পাশে'। রাধার আচরণে কৃষ্ণ বড়ই নিরাশ হইয়াছে। মথুরা নগরে রাধার হাতে তাহাকে অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইয়াছে। মিলনের আশায় সে ভার বহন করিল, কিন্তু এখন রাধা তাহাকে নিরাশ করিতেছে। রাধা এবার ছল ধরিয়াছে 'ছত্র ধর কাহ্নাঞিঁ দিবোঁ সুরতী'। বড়াইও কৃষ্ণকে অনুরোধ করিল 'ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে। কথো দূর গেলেঁ রতি পাইবেঁ জগন্নাথে॥' এ সকল কথা শুনিয়া কৃষ্ণ রাধার নিকটে গিয়া অনুযোগের সুরে বলে 'আহ্মা ছাতী ধরাইআঁ কি সাধিবেঁ মান। সহিতেঁ না পারিবোঁ এত বড় আপমান॥' [ছত্রখণ্ডের শেষ অংশের পুথি পাওয়া যায় নাই। তবে কৃষ্ণ সম্ভবতঃ ছত্র ধরিয়াছিল, কাহিনীর অনুসরণে তাহাই বোধ হয়।]

বৃন্দাবনখণ্ড: দীর্ঘ দিন রাধা মথুরার হাটে দধিদুধ বেচিতে আসে নাই। রাধার অদর্শনে কৃষ্ণ ব্যাকুল হইলে বড়াই রাধা-কৃষ্ণ মিলনে পুনরায় সচেষ্ট হইতে থাকে। বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের বিরহযাতনার কথা বলিলে রাধারও ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

কি করিয়া শাশুড়ীর অনুমতি পাওয়া যায় এবার রাধা নিজেই তাহার উপায় বাহির করে। সকল গোপিনী আইহনের মায়ের কাছে গিয়া বলে, দেখো, গোয়ালাজাতি হইয়া যদি ঘরের বৌকে দধিদুধ বেচিতে না পাঠাও তবে 'তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব'। 'এ বোল শুণিআঁ ডরে আইহনের মাএ। প্রণাম করিআঁ বুইল তা সহ্মার পাএ॥ কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর।'

মাথায় পসরা লইয়া রাধা সখীদের সঙ্গে মথুরার হাটে চলিয়াছে। আজ বৃন্দাবনে বসন্তের মহাসমারোহ। পুষ্পে-পল্লবে কোকিলের কুহুতানে বৃন্দাবন মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বড়াইয়ের মুখে বৃন্দাবনের কথা শুনিয়া সকল গোপযুবতী 'বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলা একমতী'।

এই বৃন্দাবনে রাধা 'আড় নয়নে' ও নানা দেহভঙ্গিতে কৃষ্ণের কামনাকে উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের মিলনের পথে এই ষোলশত গোপিনীর বাধা কম নয়। তাহাদের আগে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন। বিবিধ বিলাসে সখীদের খুশি করিবার জন্য 'কাহ্নাঞিঁ মণের উল্লাসে গেলা সব গোপীগণ পাশে'। বিলাস সাঙ্গ করিয়া কৃষ্ণ রাধার নিকটে আসিলে দেখা গেল সে বড়ই অভিমান করিয়াছে। শেষে কৃষ্ণের মধুর বচনে রাধার মান ভাঙ্গিলে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল।

যমুনান্তর্গত কালীয়দমনখণ্ড : কৃষ্ণ এইবার সখীদের সহিত জলক্রীড়ায় উৎসাহী হইল। গভীর কালীদহই জলকেলির পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু সেখানে কালীয়নাগ সপরিবারে বাস করে। তাহার জন্যে সেই জল হইয়াছে সম্পূর্ণ বিষাক্ত ও অব্যবহার্য। জল বিষমুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণ দহে ঝাঁপ দিল। ইহা দেখিয়া বনমধ্যে রাখাল বালকেরা ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহাদের মুখে কৃষ্ণের এই অবস্থার কথা শুনিয়া রাধা বিলাপে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সংবাদ পাইয়া নন্দ যশোদা বলরাম সকলে ছুটিয়া আসে। বলরাম দশাবতারের স্তব করিলে অচৈতন্য কৃষ্ণ পুনরায় আত্মজ্ঞান ফিরিয়া পায়। কালীনাগের পত্নীর স্তবে সদয় হইয়া কৃষ্ণ তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়া দক্ষিণ সাগরের জলে পাঠাইয়া দেয়। জল হইতে কৃষ্ণ উঠিয়া আসিলে সখীরা আনন্দে অধীর হইয়া উঠে; যশোদার স্তন হইতে ক্ষীরধারা ঝরিয়া পড়ে, আর লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধা সকলের সমক্ষে নিমেষহীন দৃষ্টিতে সজল নয়নে কৃষ্ণের মুখপানে তাকাইয়া থাকে। নন্দ-যশোদাকে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিল। শেষে রাধিকার নিকট আসিয়া বলিল, 'এহার পাণী খায়িতেঁ সব জনে। এ কারণে কৈলোঁ কালী দমনে॥' তাহার পর সকলের অনুমতিক্রমে কৃষ্ণ কালীদহে একটি ঘাট বাঁধাইয়া দেয়।

যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ড (যমুনাখণ্ড): রাধা তাহার সখীদের সঙ্গে লইয়া জল ভরিতে আসিয়াছে। কৃষ্ণ রাধাকে জল তুলিতে অনুমতি দেয়, কিন্তু অপর সকল সখীর সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ? কৃষ্ণ বলে 'কমন গুণে এহা পাণি নিব সকল যুবতীগণে'। শেষে

রাধার আশ্বাস পাইলে কৃষ্ণ সকল গোপীকেই জল লইবার অনুমতি দেয়।

যমুনার জলে রাধা ও তাহার সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণ জলকেলিতে মাতিয়াছে। স্নানলীলায় যখন সকলে মত্ত সেই সময় কৃষ্ণ জলের মধ্যেই একস্থানে নিজেকে লুকাইল। কৃষ্ণকে না পাইয়া রাধা বড়াইকে শুধায়, 'আকাশে উঠিল কিবা পসিল পাতালে। কিবা মরি গেল কাহ্নাঞি যমুনার জলে॥' কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, এই অন্ধকারে কৃষ্ণকে কোথায় আর মিলিবে? 'কালী সন্ধে হয়িআঁ এক ঠায়ি। ভালমর্তে চাহিব কাহ্নাঞি॥' সকলে ঘরে ফিরিলে সেই অন্ধকারে কৃষ্ণ জল হইতে উঠিয়া একটি কদম্ব গাছের চূড়ায় রাত কাটাইয়া দেয়। পরদিন সকালে 'কুলত কাপড় থুয়িআঁ' রাধা সকল সখীর সঙ্গে কৃষ্ণের অনুসন্ধানে জলে নামে। কৃষ্ণ সেই অবকাশে কদম্ববৃক্ষে বসিয়া বস্ত্রহরণ করিয়া লয়। শেষে রাধার অনুনয়ে বসন ফিরাইয়া দেয় বটে কিন্তু বুকের হারটি লুকাইয়া রাখে।

যমুনান্তর্গত হারখণ্ড: হার না পাওয়ায় রাধা যশোদার নিকটে গিয়া অভিযোগ করে। রাধার কথা শুনিয়া যশোদা কৃষ্ণকে তিরস্কার করিলে কৃষ্ণ আত্মরক্ষার জন্য কিছু মিথ্যা কথা বানাইয়া বলে।

বাণখণ্ড: রাধা যশোদার নিকট কৃষ্ণের সকল কীর্তিকাহিনী প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অপমান ও জ্বালার কথা ব্যক্ত করিয়া বড়াইকে সে বলে, 'আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে'। বড়াই কৃষ্ণের কথায় সায় দিয়া বলে, 'শুণহ কাহ্নাঞি তোহ্মে আহ্মার বচনে। রাধাক হাণ ফুলের পাঁচ বাণে॥' এই উপদেশে সম্মত হইয়া 'ফুলের ধনু হাথে করী কাহ্ন গেলা বৃন্দাবন পাশে'। অপর দিকে বড়াই কৌশলে দধিদুধ বিক্রয়ের ছলে রাধাকে বৃন্দাবনে লইয়া আসে। রাধাকে আনিয়া বড়াই গোপনে কৃষ্ণকে বলে, অনেক কষ্টে রাধাকে আনিয়াছি। আর বিলম্ব নয়, 'জুড়িআঁ মদন পাঁচ বাণে। আজি লঅ রাধার পরাণে॥' কিন্তু কৃষ্ণ তবুও কিছু সময় দেয়। রাধা যাহাতে অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে সেইজন্য বড়াইকে পুনরায় পাঠায়। কিন্তু রাধা কৃষ্ণের পুষ্পবাণের কথায় কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বড়াইকে জানাইয়া দেয়, 'হাথে ধরী ধনু বাণে কাহ্ন আসু বিদ্যমানে তভোঁ তাক নাহিঁ মোর ডরে'। রাধা সাহস করিয়া এ কথা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু কৃষ্ণের হাতে পুষ্পবাণ দেখিয়া তাহার সে সাহস অন্তর্হিত হইল। ভীত-কম্পিত রাধিকা আকুল হইয়া বলে, 'না জানিআঁ রুথ বুইলোঁ তোহ্মার চরণে। পুরিবোঁ তোহ্মার আশ না জুড়িহ বাণে॥' কিন্তু 'বিপরীতমতির্বৃদ্ধা' দূতী বাণ মারিবার জন্য কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে থাকে। অবশেষে কৃষ্ণের বাণনিক্ষেপে রাধা মূর্ছিত হইয়া পড়ে।

সত্যসত্যই কৃষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করায় বড়াই তাহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। তিরস্কার করিয়া বলে, 'শতেক ব্রাহ্মণ আর মারিলেঁ গোকুল। যে পাপ সেহো নহে

তিরীবধতুল ॥ রাধা যেহ্ন সতী তাক জগতে বাখানী। হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল চক্রপাণী ॥···রাধা জিআইবারে কাহ্নাঞিঁ কর পরকার। তবেঁসি হয়িব কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার নিস্তার ॥' রাধার অবস্থা দেখিয়া তাহার রোরুদ্যমানা সখীরা কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে থাকে। অবশেষে 'কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার' অমনি 'ধীরেঁ ধীরেঁ গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী।' তাহার পর তালপাতার পাখায় বাতাস করিয়া কৃষ্ণ রাধাকে যমুনার নির্মল জল পান করায়। এই বৃন্দাবনেই পরিশেষে রাধা-কৃষ্ণের পুনরায় মিলন হয়।

বংশীখণ্ড: রাধা তাহার সখীদের সহিত যমুনার ঘাটে স্নান করিতে যায়। কৃষ্ণ তীরে বসিয়া তাহাদের দেখিয়া রঙ্গ করে। কখনো করতাল বাজায় কখনো বা মৃদঙ্গ বাজায়। সখীরা এসব দেখিয়া আহ্লাদিত হয় কিন্তু রাধার মন কিছুতেই ভুলানো যায় না। তখন কৃষ্ণ একটি মোহন-সুন্দর বাঁশি গড়িল। সোনা ও হীরার অপূর্ব কারুকার্যখচিত সেই বংশিধ্বনি শুনিয়া রাধার মন কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। বড়াইকে রাধা বলে, 'কে না বাঁশী বায়ে বড়ায়ি সে না কোন জনা। দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥' কালিন্দী নদীর তীরে কে ওই বাঁশি বাজায়? কৃষ্ণের সন্ধানে রাধা কলসী হাতে যমুনার তীরে আবার জল আনিতে যায়। কিন্তু আজ কৃষ্ণের দেখা মিলিতেছে না, বাঁশির শব্দও আর শোনা যায় না। কৃষ্ণ রাধাকে ব্যাকুল করিয়া কোথায় চলিয়া গেল কে বলিতে পারে? বড়াইকে বারবার রাধা অনুরোধ করিয়া বলে, 'এবেঁ আণিআঁ দেহ নান্দের নন্দন পুর ত আহ্মার আশে।' বড়াই তখন নাতিনীকে কাছে ডাকিয়া বলে, উচ্চ গোপকুলে জন্মিয়াও তুমি পরপুরুষের সঙ্গ কামনা করিতেছ কেন? পূর্বে যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে। আবার নূতন করিয়া পাপে মগ্ন হইবার কি প্রয়োজন? বড়াই আরো বলে, সে বুড়া হইয়াছে। এখন এই বয়সে সে বৃন্দাবনে কোথায় গিয়া কৃষ্ণের খোঁজ করিবে? কিন্তু রাধা করুণভাবে জেদ করিতে থাকিলে বড়াইকে অবশেষে সম্মত হইতে হয়। 'হেন বেলে মাঝ বৃন্দাবনে। কাহ্নাঞিঁ বাঁশীত দিল সানে ॥' এমন সময় মাঝ বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণের বংশিধ্বনি শোনা যায়। এই বাঁশির স্বরে পুলকিত হইয়া রাধা বড়াইকে আবার ধরিয়া বসে। বড়াই বলে, দেখো রাধা, বুড়া মানুষের প্রতি তোমার এতটুকুও দয়া নাই। কৃষ্ণের সন্ধানে আমি এই বয়সে আর কত ঘুরিতে পারি বল তো? কিন্তু রাধার ব্যাকুলতা প্রশমিত হইবার নয়। কৃষ্ণের সেই মোহন-বাঁশির সুর তাহাকে বিরহজ্বালায় দগ্ধ করিতেছে। ঘরের কাজে তাহার আর মন বসে না। সে নিমঝোলে লেবুর রস নিংড়াইয়াছে। রাধা ব্যাকুল হইয়া বড়াইকে বলে, 'আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ। কেলি কৈল যেহ্ন বৃন্দাবনত পসিআঁ ॥ নাগর কাহ্নাঞিঁ সমে বিবিধ বিধানে। এবেঁ লআঁ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে ॥' তখন দুইজনেই কৃষ্ণের সন্ধানে বৃন্দাবনে গেল। কিন্তু সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানাভাবে খোঁজ করিয়াও কৃষ্ণের দর্শন মিলিল না। কাল সকালে আবার সন্ধান

করা যাইবে—এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসে। রাত্রি গভীর হইলে আইহন যখন ঘুমাইয়া পড়িল তখন দূর হইতে গোবিন্দের সুমধুর বংশিধ্বনি রাধার কানে আসিয়া বাজিল। 'উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে। বিরহেঁ বিকলী হঞাঁ গোআলিনী কান্দে॥' রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে আইহনকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন দেখিয়া কৃষ্ণ-মিলন-পিয়াসী রাধিকা পথে বাহির হইল। 'চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে। কথাঁহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে॥' সারারাত্রি নানা উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়া প্রভাতে বিরহশোকে রাধা মূর্ছিত হইয়া পড়ে। তখন 'মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি করায়িল চেতন'। চেতনা ফিরিয়া আসিলে বড়াই রাধার কাছে বংশিহরণের যুক্তি দিল। কৃষ্ণ যমুনার তীরে কদম্বতলে বাঁশি বাজাইতেছিল, বড়াই নিন্দাউলী মন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিলে রাধা সুযোগ বুঝিয়া কৃষ্ণের বাঁশিটি চুরি করিয়া লয়। বাঁশি হারাইয়া কৃষ্ণ ব্যাকুলভাবে বিলাপ করিতে থাকে। বড়াই বলে, তুমি এত ব্যাকুল হইতেছ কেন, বাঁশি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে। তুমি গোপীদের অপমান করিয়াছ, আমার মনে হয় তাহারাই তোমার বাঁশি লইয়াছে। কৃষ্ণ যখন করযোড়ে বাঁশিটির জন্য গোপযুবতীদের কাছে প্রার্থনা করে তখন রাধা মুখ ফিরাইয়া হাসিতে থাকে। কৃষ্ণ বুঝে বাঁশি রাধাই লইয়াছে। তখন উভয়ের মধ্যে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হইয়া যায়। রাধা কিছুতেই তাহার অপরাধ স্বীকার করে না। রাধা বলে, আমাকে কেন ধরিতেছ, দেখো, তোমার বাঁশি ওই বড়াই বুড়িই লইয়াছে। কৃষ্ণ বুঝিয়াছে রাধা ছাড়া আর কেহই তাহার বাঁশি চুরি করিতে পারে না। বাঁশি চুরির কথা বারংবার অস্বীকার করায় কৃষ্ণ নিরুপায় হইয়া বড়াইর সাহায্য প্রার্থনা করে। বড়াইর কথামত রাধার নিকট কৃষ্ণ করযোড়ে মিনতি করিলে রাধা বাঁশিটি ফিরাইয়া দেয়। কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়া বলে কোনোদিন 'না লঙ্ঘিব বচন রাধার'। বাঁশি ফেরত পাইয়া কৃষ্ণের মন খুশিতে ভরিয়া উঠে। রাধার সকল অপরাধ কৃষ্ণ ক্ষমা করিলে বড়াইর সঙ্গে রাধা ঘরে ফিরিয়া আসে।

রাধাবিরহ : কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে কৃষ্ণ আর রাধাকে দেখা দিল না। চৈত্র মাস আসিয়া পড়িল, চারিদিকে বসন্তের সমারোহ, এই অবস্থায় বিরহী রাধার পক্ষে জীবন ধারণ করা কঠিন। সে দূতী বড়াইর নিকট বিলাপ করিয়া বলে :

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই আসার
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।

কিন্তু বৃদ্ধা বড়াই কৃষ্ণের সন্ধান কোথায় পাইবে? নটরূপী কৃষ্ণ যে বহুমূর্তি ধারণ করে। কোন্ চিহ্ন দেখিয়া তাহার উদ্দেশ মিলিবে? রাধা তখন বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ করিয়া তথায় কৃষ্ণের সন্ধান করিতে বলে। বড়াই বোঝে এত পরিশ্রম এ বুড়া বয়সে পোষাইবে না। এখন একমাত্র উপায় রাধা যদি চণ্ডীকে মানত করে তাহা হইলে কৃষ্ণের দর্শন পাইতে পারে। তাহার পর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া রাধা ও বড়াই কৃষ্ণ-সন্ধানে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করে। কৃষ্ণ-অদর্শনে রাধার বিরহবিলাপ কিছুতেই

থামে না দেখিয়া বড়াই সান্ত্বনা দিয়া বলে, তুমি আমার প্রিয় নাতিনী, অত কাতর হইও না ; চল কদমতলায় নিশ্চয় কৃষ্ণের দর্শন মিলবে। রাধা মোহিনীবেশ ধারণপূর্বক কিশলয়শয্যা রচনা করিয়া কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু দৈবদোষে কৃষ্ণের দর্শন মিলিল না। তখন তাহারা বৃন্দাবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল সেখানে কৃষ্ণ গরু চরাইতেছে। দীর্ঘদিন পর কৃষ্ণদর্শনে বিহ্বল হইয়া রাধা মূর্ছা গেল। বড়াই ব্যস্তসমস্ত হইয়া চোখেমুখে জল দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলে রাধা কাতরভাবে কৃষ্ণের নিকট অতীত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং বিরহব্যাকুলতা নানাভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু রাধিকার এই ব্যাকুলতার উত্তরে কৃষ্ণের মুখে একটি মাত্র কথা :

> 'অহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে মোকে না কৈলে যতনে।
> এঁবে আকুলী হঞাঁ কাম বাণে আহ্মারে চাহসি কেহ্নে ॥
> হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা না দিল সরস বাণী।
> ছারেঁ থারেঁ এবে যাউক যৌবন সুণ আয়িহনের রাণী ॥

কৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছে :

> ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস তেজহ আহ্মার আস।

এবং,

> এবে রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন।

রাধা কৃষ্ণকে বুঝাইয়া বলে :

> 'আছিলোঁ মো শিশুমতী। না বুঝিলোঁ মো সুরতী।
> তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী ॥
> এবেঁ মো ভরযুবতী। তোহ্মা ছাড়ি নাহিঁ গতী।
> এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী ॥

'রাধার এই ব্যাকুল বচনে কৃষ্ণের মন আজ আর টলিতেছে না। সে কঠিন ভাবে রাধার সকল অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে দুঃখ দিতে লাগিল। তবে সংক্ষেপে কৃষ্ণ এই আভাস দিল যে বড়াই যদি কোনো সময় আদেশ দেয় তবে সে রাধার সঙ্গে মিলিত হইতে পারে। রাধা তখন বড়াইর নিকট গিয়া কৃষ্ণের সকল কথা জানাইল। বড়াইও রাধাকে তাম্বুলদলনের কথা উল্লেখ করিয়া তিরস্কার করে। কিন্তু রাধার ক্রন্দনধ্বনি বড়াইকে কৃষ্ণানুসন্ধানে বাহির করিল। তাহারা দুইজনে বৃন্দাবনে গিয়া ইতস্ততঃ কৃষ্ণের খোঁজ করিল কিন্তু পাইল না। ফলে রাধা আবার কাঁদিতে বসে। সেই সময় মুনিবর নারদ আসিয়া জানায় যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কদমতলায় কুসুমশয্যা রচনা করিয়া বসিয়া আছে। রাধা কদমতলায় কৃষ্ণকে সত্যই দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া মূর্ছা যায়। বড়াই চেতনা ফিরাইয়া আনিলে তাহার মুখ দিয়া রাধা কৃষ্ণের নিকট নিজের আর্তি প্রকাশ করে। বড়াই কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহব্যথার কথা জানায়। বড়াই কৃষ্ণের মুখচুম্বন করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া হাত ধরিয়া অনেক

কাকুতি করিলে কৃষ্ণ বলে, বেশ, রাধা মনোহর বেশভূষা ধারণ করিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসুক এবং মধুক্ষরা বাণী বলুক। বড়াই তখন শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া রাধাকে মনোহর বেশে সজ্জিত করিয়া কৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দেয়। সুন্দরী রাধিকাকে অধিকতর মনোহারিণী দেখিয়া কৃষ্ণ রাধাকে সাদরে গ্রহণ করিল।

বিহারান্তে রাধা শ্রান্ত হইয়া কৃষ্ণের উরুর উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে কৃষ্ণ বড়াইকে হাতে ধরিয়া বলে, আমি মথুরায় চলিলাম, আমার একান্ত অনুরোধ তুমি রাধাকে নিজের মত করিয়া যত্নে রাখিও। রাধা জাগিয়া দেখে তাহার পার্শ্বে কৃষ্ণ নাই। তখন শ্রীমধুসূদনকে আনিয়া দিবার জন্য বড়াইকে সে মিনতি করিতে থাকে। বড়াইও চতুর্দিকে কৃষ্ণের সন্ধান কম করিল না। কিন্তু তাহার আর কোথাও কোনো খোঁজ মিলিল না। কৃষ্ণ-অদর্শনের দিনগুলি ক্রমে দীর্ঘতর হইতে লাগিল। এদিকে বড়াইর কাছে রাধার বিলাপেরও অন্ত নাই :

কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥

শেষে বড়াই কৃষ্ণের সন্ধানে মথুরায় গিয়া উপস্থিত হয়। বড়াইকে কৃষ্ণ বলে, রাধা বড়ই প্রগল্‌ভা। তাহাকে দেখিলে আমার হৃৎকম্প হয়। তাহার নিকট যাইতে ভয় লাগে। তাহার মুখদর্শনে আমার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। বড়াই কৃষ্ণের এই চরিত্র দেখিয়া অবাক হইল :

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত॥
আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী॥

কৃষ্ণ বলে, আমাকে আর রাধার জন্য অনুরোধ করিও না। তাহার নাম শুনিয়া আর আমার যাইতে ইচ্ছা হয় না। আমি মনঃস্থির করিয়াছি আর তাহাকে দেখিব না। গোকুলের বাস ত্যাগ করিয়া আমি মথুরায় আসিয়াছি। স্থির করিয়াছি কংসাসুরকে বিনাশ করিব। [পুঁথি এইখানে খণ্ডিত।

কাল-পটভূমি

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যে কাল-নির্দেশক এমন কিছু কিছু পদ রহিয়াছে যাহা সংগ্রহ করিলে কাহিনীর কাল-পটভূমি অনুধাবন করা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল-কাহিনীর সূত্রপাত তাম্বূলখণ্ড হইতে। সুতরাং প্রথমেই তাম্বূলখণ্ডের প্রসঙ্গে আসা যাক। এই খণ্ডের অন্তর্গত একটি পদ হইতে বুঝা যায় ইহার ঘটনা বসন্তকালে সংঘটিত হইয়াছিল। বড়াইয়ের মুখে রাধিকার রূপ-কথা শুনিয়া কৃষ্ণ মদনশরাহত হয়। কৃষ্ণ বড়াইকে বলে শুধু যে রাধার রূপ-বর্ণনা শুনিয়াই সে কাতর

হইয়াছে তাহা নয়, চতুর্দিকে বসন্তের এই মনোরম শোভাও তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। বড়াইয়ের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি :

কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধু পীএ ॥
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।
তেকারণে থীর নহে মনে ॥

রাধার রূপ ও বসন্তের শোভা—এই দুই কারণের জন্যই কৃষ্ণ বলে :

আতিশয় বাঢ়ে মোর মদনবিকার।

তাম্বূলখণ্ডের মূল ঘটনা প্রত্যুষের। বসন্তের যে চিত্র পাওয়া গেল তাহা সকাল অথবা সন্ধ্যা যে-কোনো সময়েরই হইতে পারে। এখন প্রশ্ন, তাম্বূলখণ্ডে রাধার পথ হারাইয়া ফেলিবার যে ঘটনা তাহা পূর্বাহ্ণের না অপরাহ্ণের? অনুমানে সহজেই বলা যাইতে পারে, রাধা তাহার সখীদের সহিত বৃন্দাবন হইতে যখন মথুরার হাটে দধিদুধ বিক্রয় করিতে বাহির হইয়াছে তখন সময়টা নিশ্চয় পূর্বাহ্ণেই হইবে। শুধু অনুমান নয়, কাব্যের মধ্যেই একাধিক স্থানে বলা হইয়াছে রাধা তাহার গোপীদের সঙ্গে লইয়া 'বড়ই বিহানে' অর্থাৎ অতি প্রত্যুষে মথুরা যাত্রা করিত। তাম্বূলখণ্ডের মধ্যেও এ কথা আছে।

দানখণ্ডের ঘটনা ঠিক কোন্ কালের তাহা কাব্যের মধ্যে স্পষ্টতঃ কোথাও বলা হয় নাই। তবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী খণ্ডের দিকে তাকাইয়া অনুমান করা যায় এই খণ্ডের মূল ঘটনা গ্রীষ্মকালে ঘটিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি তাম্বূলখণ্ডের ঘটনা বসন্তকালের, পরেই লক্ষ্য করিব নৌকাখণ্ডের ঘটনা বর্ষাকালের। সুতরাং মধ্যবর্তী দানখণ্ডের ঘটনা বসন্ত ও বর্ষার মধ্যে কোনো সময়ের। বসন্ত ও বর্ষার মধ্যবর্তী সময় হইল গ্রীষ্ম। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে দানখণ্ডের ঘটনা ঠিক কোন্ কালের তাহার যখন কোনো স্পষ্ট নির্দেশক-পদ কাব্যমধ্যে নাই, তখন এই খণ্ডটির ঘটনা যে বসন্ত এবং বর্ষারই মধ্যবর্তী কোনো সময়ে ঘটিয়াছে, বসন্তকালে বা বর্ষাকালেই যে ঘটে নাই—এমন যুক্তি কোথায়?

তাম্বূলখণ্ড বসন্তকালের ঘটনা। এই খণ্ডের শেষাংশের ঘটনা—কৃষ্ণের উপদ্রবের জন্য রাধা অনেকদিন আর ঘরের বাহির হয় না। অপরদিকে—

কালক্ষেপাসহঃ শুচি রাধামাধায় মাধবঃ।
উপেত্য জরতীমাহ মনোজশরকাতরঃ ॥

রাধার বিরহে মদনশরাহত কৃষ্ণ অসহনীয় বেদনায় কাতর হইয়া বৃদ্ধা বড়াইয়ের নিকট গিয়া বলিল :

এত দিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআশে।
রাধা চিন্তিআঁ মোর চোখে নিন্দ না আইসে ॥
বচন আহ্মারে দিআঁ ভাণ্ডহ কেহ্নে।

এভোঁ না করাইলেঁ মোর রাধা দরশনে ॥
রাধিকা লঞাঁ চল মথুরার হাটে ।
মাহাদাণী হঞাঁ আহ্মে রহি গিআঁ বাটে ॥

এখন বুঝা যাইতেছে তাম্বূলখণ্ডের মূল ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কাটিয়াছে এবং তাহার পরেই কৃষ্ণ রাধিকা-সন্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া কদমতলায় বা কুতঘাটে মহাদানী সাজিয়া বসিবার পরিকল্পনা লইয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, দানখণ্ডের ঘটনা বসন্ত-পরবর্তী গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালের কোনো সময়ে ঘটিয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে নৌকাখণ্ড বর্ষাকালের ঘটনা। এই খণ্ডের প্রথম পদেই বড়াই কৃষ্ণকে বর্ষার আবির্ভাবের কথা বলিয়াছে :

উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ ॥
আহ্মে রাধা লঞাঁ যাইব মথুরার হাটে ।
নাঅ লঞা থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে ॥

নৌকাখণ্ডে এই পদটিরই অন্যত্র লক্ষ্য করা যাইতেছে কৃষ্ণ রাধাবিরহে ব্যাকুল হইয়াছে। কারণ দানখণ্ডে কৃষ্ণ-কর্তৃক বিপর্যস্ত হইবার পর রাধা কিছুদিন হইল দধিদুধ বিক্রয়ে আর বাহির হইতেছে না। তাই কিরূপে পুনরায় রাধার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে সেজন্য কৃষ্ণ নৌকাখণ্ডের গোড়ায় বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করে।

আমরা দেখিয়াছি দানখণ্ড বসন্তকালের ঘটনা নয়, ইহাও দেখিয়াছি যে নৌকাখণ্ডের কাহিনী বর্ষার সূচনার সঙ্গে শুরু হইয়াছে এবং আরও লক্ষ্য করিয়াছি যে নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ডের ঘটনার মধ্যে বেশ কয়েকটা দিন কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন বলা যাইতে পারে দানখণ্ডের ঘটনা বসন্ত ও বর্ষার মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে ঘটিয়াছে।

তাম্বূল দান ও নৌকাখণ্ডের পর ভার ও ছত্রখণ্ডের প্রসঙ্গে আসা যাক। ভার ও ছত্রখণ্ড একই দিনের পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্নের ঘটনা। ভারখণ্ডের অন্তর্গত একটি পদে কৃষ্ণের মন্তব্য :

উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ।

অপর একটি পদে রাধার উক্তি :

শরদ সমএ রৌদ সহিতেঁ না পারী।

এই দুই উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে ভার ও ছত্রখণ্ড শরৎকালের ঘটনা। ভারখণ্ড রাধার মথুরা যাইবার পথের ঘটনা, সুতরাং সকাল বেলার ঘটনা। রাধা একস্থানে বলিয়াছে :

প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে।
কত খনে জায়িব আহ্মে মথুরার হাটে।

ছত্রখণ্ডে রাধার মথুরাহাট হইতে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ছত্রখণ্ড অপরাহ্নের ঘটনা।

ছত্রখণ্ড ও বৃন্দাবনখণ্ডের মধ্যে কাহিনীতে কয়েক মাসের ছেদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে

হয়। কারণ ছত্রখণ্ডে শরৎকালের উল্লেখের পর বৃন্দাবনখণ্ডের যে চিত্র পাই তাহা দেখিয়া মনে হয় উক্ত খণ্ড বসন্তকালের ঘটনা।

এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল।
মনমথক জাগাএ॥ ল॥
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল।
ফুটি বিরহিহৃদয়ে॥ ল॥

অন্যত্র :

বহে সুশীতল বাএ কোকিল পঞ্চম গাএ
রএ আর নানা পক্ষিগণে।

সুশীতল বাতাস এবং কোকিলের পঞ্চম স্বরে স্বভাবতঃই প্রভাতের চিত্র ফুটিয়া উঠে। বৃন্দাবনখণ্ডে কবির বর্ণনা :

প্রভাত সময় ভৈল সব সখিজনে।
একচিত্ত যুগতী করিল সাবধানে॥
দধি দুধ ঘৃত ঘোল সাজিআঁ পসারা।
রাধা সঙ্গে চলি জাই হাট মথুরা॥

এই প্রভাতেই রাধা সখীসহ বৃন্দাবনকুঞ্জে প্রবেশ করে এবং রাধা-কৃষ্ণের মিলন হয়।

কাহিনী অনুসরণে বুঝা যায় বৃন্দাবনখণ্ড ও কালীয়দমনখণ্ড একই দিনের ঘটনা। কারণ বৃন্দাবনখণ্ডে বনের ভিতর বিলাস সাঙ্গ করিয়াই কালীয়দমনখণ্ডে

জলকেলি করিবারেঁ কাহ্নু কৈল মন।

এবং এ কথা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই

কদম্বতরুত চঢ়ী দহে দিল ঝাঁপ।

বৃন্দাবনখণ্ড ও কালীয়দমনখণ্ডের ঘটনা যদি একই দিনের হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কৃষ্ণকর্তৃক কালীয়দমন বসন্তকালেই ঘটিয়াছিল।

যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ডের (যমুনাখণ্ড) প্রধান তিনটি ঘটনা হইল জলাকর্ষণ জলকেলি এবং বস্ত্রহরণ। ঘটনার সূত্রে অনুমান করা যায় তিনটি ঘটনা পর পর তিন দিনে ঘটিয়াছে। বস্ত্রহরণখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে বলিয়াছে :

হরিষেঁ আইলা রাধা তোহ্মে এহা তীরে।
আজি সফল হৈব যমুনার নীরে॥
উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ।
শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখাএ॥

সুতরাং বুঝা যাইতেছে বস্ত্রহরণখণ্ডের অন্তর্গত ঘটনাগুলি গ্রীষ্মকালে ('গিরীশ সমএ') ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে জলকেলি দিবসের বা অপরাহ্নের ঘটনা এবং মূল বস্ত্রহরণের ঘটনা প্রত্যুষের।

জলকেলির পর যমুনার জলে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে রাধা এবং তাহার সখীরা জলের

মধ্যে কৃষ্ণকে অনেক খুঁজিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সারাদিন খুঁজিয়াও তাহাকে মিলিল না। তখন রাধার প্রতি বড়াইয়ের উক্তি :

কালী সন্ধে হয়িআঁ এক ঠায়ি।
ভালমর্তে চাহিব কাহ্নাঞি ॥

বড়াইয়ের কথামত পরদিন প্রত্যুষে কৃষ্ণ-অনুসন্ধানে সকলে জলে নামিলে কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষ হইতে তাহাদের বস্ত্র এবং সেই সঙ্গে রাধার কণ্ঠহার অপহরণ করিয়া লয়।

মূল পুঁথিতে হারখণ্ডের অনেকগুলি পৃষ্ঠা নাই। তথাপি বুঝা যায় বস্ত্রহরণখণ্ডের অব্যবহিত পরের ঘটনা হইল হারখণ্ড। হারখণ্ডে কোনো কাল-নির্দেশক পদ পাওয়া না গেলেও সহজেই বলা চলে উহা গ্রীষ্মকালের ঘটনা। কারণ পূর্ববর্তী বস্ত্রহরণখণ্ডও গ্রীষ্মকালের ঘটনা।

বাণখণ্ডের মধ্যে যে বর্ণনা পাই তাহাতে অনুমিত হয় উহার ঘটনা বসন্তকালে ঘটিয়াছে :

শীতল সমীর জন মনোহর
কোকিল পঞ্চম গাএ।
সব তরুগণ বিকাস কুসুম
ভ্রমর কাঢ়এ রাএ ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণের বাণনিক্ষেপ সকাল বেলার ঘটনা। তবে রাধাকে পুনর্জীবিত করিতে সকাল ('বিহাণ') হইতে দুপুর গড়াইয়া যায় :

বিহাণ আইলাহো হৈল দুঅজ পহর।

বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহও বসন্তকালের ঘটনা।

বংশীখণ্ডে রাধার উক্তি :

চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।

রাধাবিরহে রাধার উক্তি :

ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে ॥
... ...
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ ॥

এই আলোচনার উপসংহারে দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের শুরু এক বসন্তে, শেষ আর এক বসন্তে। কাব্যের সূচনায় 'কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ' কৃষ্ণ মদন-শরাহত হইয়াছিল, কাব্যের শেষে 'মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ' রাধা কৃষ্ণের বিরহচিন্তায় ব্যাকুল। অর্থাৎ বলা চলে কৃষ্ণ-বসন্তে এই কাব্যের সূচনা রাধা-বসন্তে এই কাব্যের পরিসমাপ্তি।

চরিত্র বিশ্লেষণ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান চরিত্র তিনটি—রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। যশোদা, বলভদ্র, আইহনের মাতা, আইহন ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্র। রাধার ষোলশত গোপীর উল্লেখ আছে, তবে কাহারও নাম বা স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের উল্লেখ থাকিলেও রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইকে লইয়াই এই কাব্য। জন্মখণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণের জন্ম এবং এই খণ্ডেই বড়াই আসিয়া রাধার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে যোগ দেয়। জন্মখণ্ড হইতে সর্বশেষ রাধাবিরহ পর্যন্ত এই তিন চরিত্রকে লইয়া কাহিনী গড়িয়া উঠে। তিনটি চরিত্রই আপন বিশিষ্টতায় পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল।

রাধা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরিত্র রাধা। শুধু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নয়, সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাধাচরিত্রের তুলনা বেশী মিলিবে না। একটি পূর্ণাঙ্গ নারীচরিত্র অঙ্কনে ও তাহার প্রেমচেতনার পরিণতির প্রত্যেকটি স্তরে নিপুণ আলোকসম্পাতনে বড়ু চণ্ডীদাস যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। নামশ্রবণ বা রূপদর্শনজনিত প্রথাসিদ্ধ পূর্বরাগ ব্যতীত নিতান্ত দেহমিলনের দ্বারা পুরুষের প্রতি নারীর প্রেম কিভাবে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন বড়ু চণ্ডীদাস। এই দিক হইতে রাধাচরিত্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

বর্তমানে রাধাচরিত্রের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

রাধাচরিত্রের প্রথম পর্যায়ে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রবল বিরূপতা ও বিতৃষ্ণার ভাব লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবপদাবলীতে সখীর মুখে কৃষ্ণের কথা শুনিয়াই রাধা অভিসারিকা হইয়াছিল :

সখীর বচনে ধনী থির করি চিত।
করইতে গমন ভেল উপনীত ॥
পদ দুই চারি চললি সখী মেলি।
ধস ধস অন্তর ধাধস ভেলি ॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা প্রেম-উপহার স্বরূপ প্রেরিত কৃষ্ণের ফুলতাম্বুলাদি প্রত্যাখ্যান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। হইবেই বা কেন? সে তো প্রথাসিদ্ধ নায়িকা নয়। সে সামাজিক কন্যা। ঘরে সর্বাঙ্গসুন্দর স্বামী আছে, শাশুড়ী আছে, সামাজিক সংস্কারের অনুশাসনে সে চালিত। তাহা ছাড়া কৃষ্ণের প্রতি তাহার আকর্ষণই বা কি? সে এক সামান্য রাখাল বালকের প্রেমপ্রস্তাব গ্রহণ করিবে কেন? রাধা বড়াইকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেয় :

ঘরের সামী মোর সর্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।

নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা ॥

দানখণ্ডে কৃষ্ণ পথের মধ্যে দানী সাজিয়া রাধার দেহের প্রতিটি অঙ্গের জন্য দান চাহিয়া বসে। কৃষ্ণ নির্লজ্জভাবে রাধার রূপের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার আলিঙ্গন প্রার্থনা করিলে রাধা নানাভাবে দানীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। কৃষ্ণ বার বৎসরের দান চাহিলে রাধা বলে :

এহে।
সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥

তাহার পর সে আইহনের বীরত্বের কথা উল্লেখ করে, কংসেব নাম করিয়া কৃষ্ণকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে :

ডুকবার কংস নরপতী।
এহা জাণী ছাড়হ বিমতী ॥
যবেঁ তোরে মারিহে পরাণে ॥
তবেঁ তোকে রাখিব কোণ জণে ॥

কৃষ্ণ এ সকল কথায় ভয় পায় না :

কি করিতেঁ পারে তোর সে না কংস রাঅ।
দৈবকীনন্দন কাহ্ন কাখো না ডরাঅ ॥

তখন রাধা সামাজিক সম্পর্কের কথা উত্থাপন করিয়া কৃষ্ণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করে। রাধা বলে :

তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মে ত মাউলানী।

মামী-ভাগিনার সম্পর্ক যেখানে, সেক্ষেত্রে কি সমাজে পুরুষ নারীর মধ্যে মিলন সম্ভব? রাধা ভাবিয়াছিল অন্ততঃ এই সম্পর্কের কথাটুকু চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ তাহাকে মুক্তি দিবে। কিন্তু ইহার উত্তরে কৃষ্ণ যখন জানাইল :

নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী

তখন রাধা নিজের অপ্রাপ্তবয়স্কতাজনিত বাধার কথা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণকে সতর্ক করিয়া দেয় :

প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার
তাত না সম্বাএ চুরী।
আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী ॥

কিন্তু এত করিয়াও কোনো ফল হয় না। রাধা জানে বাহুবলের দ্বারা তো আর পুরুষকে বাধা দেওয়া যাইবে না, তাই সে নানা যুক্তি-তর্ক অনুরোধ-উপরোধ অনুনয়-বিনয়ের সাহায্যে কৃষ্ণকে পাপকর্ম হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সকল

প্রচেষ্টাই কৃষ্ণের অত্যাচারের সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া যায়। একসময় কৃষ্ণের বর্বরতার নিকট রাধাকে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। কিন্তু আত্মদানের পূর্বে রাধা কৃষ্ণকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয় :

মাথার মুকুট কাহ্নাঞি ভাঁগি জুনি জাএ।
যোড় হাথ করি কাহ্নু বোলোঁ তোর পাএ॥
ছিণ্ডি জুনি জাএ কাহ্নাঞি সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে॥

এই উক্তির মধ্য দিয়া কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রবল অনাসক্তির কথাই আরো প্রকট হইয়া উঠিল। যে রাধা একদিন ঘৃণায় অপমানে নিজের দেহটা কৃষ্ণের নিকট সমর্পণ করিয়াছিল সেই রাধার মনেই আর একদিন কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমের সঞ্চার হয় এবং অনেকগুলি মানসিক পরিবর্তনের পর সে যখন কৃষ্ণ-প্রেমে ব্যাকুল হইয়া বলে, 'ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার' তখন পাঠককে বিস্মিত হইতে হয় না।

দানখণ্ডে কৃষ্ণকে আত্মদান করিয়া অপমানে ক্ষোভে কান্নায় রাধা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বড়াই জিজ্ঞাসা করিলে রাধা কৃষ্ণের সকল আচরণের কথা অকপটে ব্যক্ত করিয়া দেয়।

নৌকাখণ্ডে রাধার কিছুটা মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই খণ্ডেও কৃষ্ণের অত্যাচারের সম্মুখে রাধাকে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। দানখণ্ডে রাধা বলিয়াছিল, দেখিও হার যেন না ছিঁড়ে, মাথার মুকুট যেন না ভাঙ্গে, দেহে যেন আঘাত না পাই। কিন্তু এবারে কৃষ্ণের সহিত মিলনে রাধার মনে ভয় ও লজ্জার সমাবেশ হইয়াছে। এখন হার ছিঁড়ুক, মাথার মুকুট নষ্ট হউক, ক্ষতি নাই, কিন্তু এ সকল যদি সখীরা দেখিয়া ফেলে তাহা হইলে রাধা মুখ দেখাইবে কিরূপে? তাই সে বলে :

যে কর সে কর তুঞি কাহ্নাঞিঁল
মোরে জলের ভিতর।
হোর সব সখিজন কাহ্নাঞিঁল
দেখে তাক মোর ডর॥

দানখণ্ডে কৃষ্ণের সহিত মিলনে রাধা নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়াছে কিন্তু নৌকাখণ্ডে দ্বিতীয়-মিলনকালে 'রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন'। এইখানেই রাধা প্রথম দেহসুখ উপভোগ করে এবং এই দৈহিক সম্পৃক্তিই কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমকে প্রথম অঙ্কুরিত করিয়া তোলে। ইহার পূর্বে রাধার প্রেমচেতনার কোনো প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। দানখণ্ডে বড়াইর নিকট কৃষ্ণের অত্যাচারের কথা রাধা অকপটে বলিয়াছে, কিন্তু নৌকাখণ্ডের শেষাংশে কৃষ্ণের আচরণকে তাহার আর অত্যাচার বলিয়া বোধ হয় না। এবার বড়াইকে রাধা সকল কথা গোপন করে। এখানেই রাধার মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের ইঙ্গিতটুকু মিলে। সে বড়াইকে বলে :

আচম্বিত খরতর বাহিলেক বাঅ।
মাঝ যমুনাত ডুবিআঁ গেল নাঅ॥
ডুবিআঁ মরিতোঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে।
আহ্মা লআঁ সাম্ভরিআঁ রাখিল পরাণে॥
এবার কাহ্নাঞিঁ বড় কৈল উপকার।
জনমেঁ সুঝিতেঁ নারেঁা এ গুণ তাহার॥

ভার ও ছত্রখণ্ডে রাধা প্রেম-ব্যাপারে বেশ খানিকটা উন্নতি লাভ করিয়াছে বোঝা যায়। এখন সে মিলনের আশা দিয়া কৃষ্ণকে দধি-দুধের ভার গ্রহণ করায়, ছত্র ধারণ করায়।

ভারখণ্ডে কেবল ইঙ্গিত : উলটি উলটি রাধা কাহ্ন পানে চাহে।

কিন্তু ছত্রখণ্ডে রাধা নিজমুখেই বলে :

ছত্র ধর কাহ্নাঞিঁ দিবোঁ সুরতী।

বৃন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেম গভীরতায় আসিয়া পৌছে। এতদিন দূতী বড়াই কৃষ্ণের অভিলাষে রাধাকে কৌশলে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু এবার বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য রাধা নিজেই বড়াইর নিকট ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে। শাশুড়ী যাহাতে বৃন্দাবনে যাইবার সম্মতি দেয় রাধা সেজন্য নূতন কৌশল ফাঁদে। এই বৃন্দাবনেই রাধার মনে প্রথম ঈর্ষা বা মান দেখা দেয়। এই ঈর্ষা বা মানই হইল প্রেমের পরিপক্ক অবস্থা। প্রেম সম্পর্কে নিশ্চয়তা বা অধিকারবোধ না জন্মিলে মান জন্মিতে পারে না। বৃন্দাবনখণ্ডে রাধার সেই অধিকারবোধ জন্মিয়াছে।

কালীয়দমনখণ্ডে রাধা সকলের সমক্ষে কৃষ্ণকে 'পরাণ পতী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। কালীয়-বিষে কৃষ্ণ জর্জরিত হইলে রাধার বিলাপোক্তি :

কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।
কাহ্ন তোহ্মা বিণি সব নিফল মোরে॥

বস্ত্রহরণ (যমুনাখণ্ড) ও হারখণ্ডে রাধার আচরণ ও মনোভাব আপাতদৃষ্টিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বিপরীতমুখী বলিয়া বোধ হইলেও আসলে তাহা মানেরই আর এক পর্যায়। রাধা যদিও বলে :

বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।
আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত কী॥

কিন্তু তাহার পর কাহ্ন পানে 'উলটি রাধা চাহিল নয়নে'—সেটুকুও লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রেমিকের প্রতি বিশ্বাসবোধ যখন দৃঢ় হইয়া জন্মে তখনই কপটরাগ বা অভিমান সম্ভব। রাধা বড়াইকে বলে :

বড় দুষ্টমতী সে জে কাহ্ন।
আহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জাণে আন॥

এ উক্তি দানখণ্ডের বিদ্রোহিণী রাধার নয়, ইহা প্রেম-লীলায় অভিজ্ঞা শ্রীরাধিকার

নিতান্তই বিলাসবচন। কিন্তু গ্রাম্য রুচিহীন রাখাল কৃষ্ণ রাধিকার প্রেমরঙ্গের গভীরতা বুঝিল না। এই সকল বিলাসবচনকে প্রকৃত বিরূপতা মনে করিয়া কৃষ্ণ রাধার বক্ষে অকারণে নিষ্ঠুরভাবে পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করিল। যাই হোক, বাণখণ্ডের শেষাংশে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের মধ্য দিয়া পুরাতন প্রেম পুনরায় নবীন হইয়া উঠিল।

বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের পরিণতি ঘটিয়াছে। এইখানেই প্রথম রাধার মধ্যে বিরহজনিত গভীর ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে অতিরিক্ত দেখা দিয়াছে চোখের জল। কৃষ্ণের বাঁশির স্বরে রাধিকার চিত্ত উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন সে নিকট হইতে কৃষ্ণের রূপ দেখিয়াছে, এইবার দূর হইতে সে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিল। কৃষ্ণের বংশিধ্বনি শ্রবণে রাধা ব্যাকুল হইয়া বলে :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

পরিশেষে কেবল কৃষ্ণকে কাছে পাইবার জন্যই বড়াইর পরামর্শে রাধা কৃষ্ণের মোহনবাঁশিটি লুকাইয়া রাখিল।

দিন গেল মাস গেল, তথাপি কৃষ্ণ ধরা দিল না। রাধাবিরহ অংশে রাধার বিরহ-ব্যাকুলতা পদাবলীর বিরহিণী রাধিকাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে রাধার আর সেই চপলতা নাই চঞ্চলতা নাই রাগ নাই হাসি নাই সেই পুলক নাই। রাধার উক্তিতে আজ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ পরিহাস শ্লেষ সকলই অন্তর্হিত। রাধা কেবল জাগরণে বা শয়নে নয়, স্বপ্নের মধ্যেও কৃষ্ণের ছবিই দেখিতেছে। এই পর্যায়ে রাধার বিলাপ-বেদনা অনেকাংশে বৈষ্ণবপদাবলীর মাথুর বা ভাবসম্মেলনের সমগোত্রীয়। রাধার বিরহের স্বরূপ :

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর॥

কৃষ্ণবিরহে রাধার মনের অবস্থা :

এবেঁ মোর মণের পোড়নী।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী॥

বিরহজনিত আর্তনাদ :

চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥

ব্যর্থ যৌবনের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস :

এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসার
আনল সরণ হৈবে দূতা রে।

শেষে পূর্বজন্মের প্রতি দোষারোপ :

পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল।
তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল ॥

রাধাবিরহ অংশে রাধার যে বেদনা তাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত বেদনা নয়। সে বেদনার সুর ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সর্ব কালের সর্ব দেশের বিরহ-বেদনার সুরের সহিত মিলিত হইয়াছে। পদাবলীর রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার পার্থক্য এইখানে যে পদাবলীর রাধায় কেবল ভক্তিরসটুকু উদ্রিক্ত হয় আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা আমাদের মনে সমগ্র মানবরসের সঞ্চার করিয়া থাকে।

কৃষ্ণ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাচরিত্রের যেমন পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে, কৃষ্ণচরিত্রের সেরূপ কোনো প্রকার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্বের সবটুকু আত্মসাৎ করিয়াছে রাধা। যাহার নাম কীর্তন করিতে কাব্যটির রচনা সেই শ্রীকৃষ্ণই উহার দোষের আশ্রয়। কাব্যটির যত কিছু দুর্নাম কৃষ্ণের জন্য।"—(মধ্যযুগের কবি ও কাব্য)। এ কথা ঠিক যে রাধাচরিত্রের ন্যায় কৃষ্ণচরিত্রও যদি সঙ্গতিপূর্ণ আচরণে, স্নেহ প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক গুণে সমৃদ্ধ হইয়া বিকাশ লাভ করিত, তাহা হইলে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানি আধুনিক পাঠকের নিকটেও উৎকৃষ্ট কাব্য হিসাবে নিঃসন্দেহে অধিকতর সমাদৃত হইতে পারিত।

'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে' -এই কংসাসুরের হাত হইতে সৃষ্টিকে রক্ষা করিবার জন্য স্বর্গালোকের দেবতারা শ্রীকৃষ্ণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। জন্মখণ্ডে এই তথ্যটুকু বিবৃত হইলেও সমগ্র কাব্যে কোথাও কৃষ্ণের কর্তব্য পালনের চিহ্নমাত্র নাই। 'কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে' লক্ষ্মী পৃথিবীতে রাধারূপে দেখা দিয়াছেন। এই রাধা ও কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলা কিংবা সম্ভোগলীলাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ু চণ্ডীদাস বর্ণনা করিয়াছেন।

জন্মখণ্ডে পৌরাণিক প্রসঙ্গের আভাস থাকিলেও সমগ্র কাব্যে কৃষ্ণের সেই দেবমহিমার কোনো প্রকাশ লক্ষিত হয় না। সে নিতান্ত স্থূলরুচিসম্পন্ন গ্রাম্য রাখাল বালক। রাধিকার সহিত মিলনে কৃষ্ণের মনে কোনো সময়েই প্রেমচেতনা জাগ্রত হয় নাই, কেবল কামনা ও লোলুপতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র।

তাম্বূলখণ্ডে বড়াইয়ের মুখে রাধার বর্ণনাটুকু শুনিয়াই কৃষ্ণের পক্ষে প্রাণ ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সে বলে :

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥

ইহা বৈষ্ণবপদসাহিত্যের সখী-মুখে নামশ্রবণজাত পূর্বরাগ নহে। এখানে রাধার রূপবর্ণনা শুনিয়াই কৃষ্ণের মনে কামোন্মত্ততা জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রেমের মধ্য দিয়া নয়,

কেবল ছল বল ও কৌশলের দ্বারা কিভাবে আইহন-পত্নী রাধিকার দেহসম্ভোগ করা যায় তাহারই জন্য কৃষ্ণ বড়াইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করে

দানখণ্ডে কৃষ্ণ মথুরার ঘাটে দানী সাজিয়া রাধার কাছে মহাদান চাহিয়া বসে এবং অন্যায় ভাবে আলিঙ্গন প্রার্থনা করে। কৃষ্ণের প্রেমবচন গীতগোবিন্দ বা বৈষ্ণবপদাবলীর কৃষ্ণের মত নয়। রাধার মনে প্রেমচেতনা জাগাইবার জন্য কৃষ্ণ রাধার প্রতিটি অঙ্গের কদর্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে থাকে। রাধিকার প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও কৃষ্ণ তাহার সহিত বলপূর্বক মিলিত হইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। নৌকাখণ্ডে মাঝনদীতে নৌকা দোলাইয়া রাধিকাকে ভয় দেখাইয়া কৌশলে তাহার সহিত মিলিত হয়। এই দৈহিক সম্পৃক্তির ফলেই রাধার মনে ধীরে ধীরে প্রেমচেতনা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের মুকুলটুকুও লক্ষ্য করা গেল না। ভারখণ্ড ও ছত্রখণ্ডে মিলনের আশায় কৃষ্ণ রাধার দধিদুধের ভারগ্রহণ এবং মস্তকে ছত্রধারণ পর্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইল না। বৃন্দাবনখণ্ডে কেবল রাধার সঙ্গে নয়, অন্যান্য সখীদের সঙ্গেও সে যে-ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করে তাহাও অভিনন্দনযোগ্য নহে। শুধু স্থলবিহারে নয় জলবিহারেও কৃষ্ণ তাহার স্বাভাবিক পারদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছে যাহার নিদর্শন বস্ত্রহরণ (যমুনা) খণ্ডে আছে। হারখণ্ডে রাধা যশোদার নিকট কৃষ্ণকর্তৃক তাহার হার অপহরণের কথা বিবৃত করিয়া দিলে কৃষ্ণ কেবল প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই বাণখণ্ডে রাধার বক্ষে নিষ্ঠুরভাবে পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করে। কৃষ্ণ বড়াইকে বলিতেছে :

আহ্মার করিল রাধা বড়য়ি খাঁখার।
আবসি করিবোঁ প্রতিকার ॥
আপণে করিব আহ্মে তেহেন উপাএ।
যেহ্ন রাধা পড়ে মোর পাএ ॥
মরমেঁ হাণিবোঁ তারে মনমথবাণে।
নিবেদিলেঁা তোহ্মার চরণে ॥
সব লোকেঁ হাসে যেহ্ন দিআঁ করতালী।
তেহ্ন তারে করায়িবোঁ বিকলী ॥
আহ্মার মনত জাগে আতি বড় রোষে।
তোহ্মে মোক নাহিঁ দিহ দোষে ॥

এই নিষ্ঠুরতা কৃষ্ণের মানবিক চেতনাহীনতারই পরিচায়ক। সমগ্র কাব্যে একাধিকবার দৈহিক সম্পৃক্তি সত্ত্বেও রাধার প্রতি কৃষ্ণের মানবিক চেতনা জাগ্রত হয় নাই। বাণের আঘাতে রাধা মূর্ছিত হইলে কৃষ্ণ যে বিলাপ করিয়াছিল তাহাতে সত্যই কোনো আন্তরিকতার সুর ছিল কিনা সন্দেহ। কৃষ্ণই যত্ন করিয়া পুনরায় রাধার চেতনা জাগ্রত করিয়াছে। কিন্তু কেন? রাধার প্রতি করুণা বা মমত্ববশতঃ? তাহা নয়। রাধাকে বধ করিলে বড়াই তীব্রভাবে কৃষ্ণকে তিরস্কার করে :

শতেক ব্রাহ্মণ আর মারিলে গোকুল।
যে পাপ সেহো নহে তিরীবধতুল॥
রাধা যেহ্ন সতী তাক জগ.ত বাখান।।
হেন .াধা মারিলে চাণ্ডাল চক্রপাণী॥
... ...
মোরে নাহি ছো কাহ্নাঞি বারাণসি যা।
অঘোর পাপে তোর বেআপিল গা॥
তিরী বধ কইলি কাহ্নাঞি আপন মনে।
আপযশ থাকিল তোর তীন ভুবনে॥

রাধার সখীরাও কাঁদিতে কাঁদিতে বলে·

যবে তো হ্ম রাধাক জিআঅ এখনে।
ত বসি পাপসাগরে তোহ্মার ভবণে॥

রাধার প্র.ত স্বীয় অনুরাগবশতঃ নয়, এত কথায় নিতান্ত· ভীত হইয়া কৃষ্ণ মূর্ছিতা রাধিকার কাছে আসিয়া বলে:

মুখ তুলী চাহ মোর পালাউক পাপ।
আঅর খণ্ডক মোর বিরহ সন্তাপ॥

বংশীখণ্ডে রাধা বাঁশি লুকাইলে কৃষ্ণ তাহাকে 'নটকী গোআলা ছিনারী পামরী' ইত্যাদি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, 'পরাণ তোর লৈবোঁ অ বচারে' বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে। শেষে শুধু যে 'হাপুসনয়নে' শিশুর মত কাঁদিয়াছে তাহাই নয়, ষোলশত যুবতী গোপীর সামনে 'যোড়হাতে বাকুত' কৈল বনমালী'। অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণচরিত্রটিকে মূল্যহীন করিয়া দিয়াছে।

রাধাবিরহ অংশে রাধিকার সকল প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া আসে। রাধা যখন বিরহে ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিতেছে, মুরারিশূন্য একটি মুহূর্তও যখন তাহার পক্ষে অতিক্রম করা কষ্টকর, তখন কৃষ্ণ মথুরায় পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বলে, রাধার 'দুসহ বচনতাপ' তাহার পক্ষে সহ্য করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। 'জায়িতেঁ না ফুরে মন শুম শুণী তারে'—রাধার নিকট ফিরিয়া যাইতে তাহার এখন আর কোনো বাসনাই নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র হিসাবে কৃষ্ণ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, সে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি চিত্রের নায়ক হিসাবেই কাব্যে উপস্থাপিত হইয়াছে। রাধাচরিত্রের যে অপূর্ব ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়, কৃষ্ণচরিত্র সেভাবে কোনো সময়েই গড়িয়া উঠে নাই। মানবিক গুণবর্জিত নিতান্ত গ্রাম্য বর্বর স্থূল দেহলোলুপ কুটিল চরিত্র হিসাবে সে কাব্যমধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কৃষ্ণচরিত্র সৃষ্টি করিয়া বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

বড়াই :- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াই একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সমগ্র কাব্যমধ্যে তাহার চরিত্রের যে পরিচয় পাই তাহাতে উহাকে প্রাচীন কামশাস্ত্রাদির অন্তর্গত দূতী বা কুট্টিনী শ্রেণীর চরিত্রের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। বড়াই কেন সাধারণ দূতী বা কুট্টিনী শ্রেণীর নয় চরিত্রটি বিশ্লেষণ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

রাধাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইহনের মা বড়াইকে পদ্মার নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছে। বড়াইয়ের পরিচয় হইল সে পদুমা অর্থাৎ রাধার মায়ের পিসী। বড়াইয়ের বয়স অনেক হইয়াছে তাহার

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে ॥
ভ্রূহি চুনবেথ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুই আখি ॥

বড়াইয়ের নাকের মাঝখানটা বসা, গাল তোবড়ানো, গালের হাড় উঁচু, বিকট দাঁত, উটের ন্যায় ঠোঁট, কথাবার্তা কাপট্যপূর্ণ। তাহার দুই বাহু কাঠির মত শীর্ণ, স্তনদ্বয় নাভিদেশ পর্যন্ত লম্বিত। ইহাই হইল বড়াইয়ের বাহিরের আকৃতি। এই চিত্র জন্মখণ্ডেই কবিকর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। জন্মখণ্ডের শেষ সংস্কৃত শ্লোকে বড়াই ও রাধার মধ্যে যে উক্তি-প্রত্যুক্তি হয় তাহাতে বড়াইয়ের প্রতি রাধার উক্তি :

ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিতা।
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে ॥

মধুর ব্যবহারে নিপুণা হে বড়াই, তুমি আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছ ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।

বড়াই সম্পর্কে কবির উক্তি হইল, 'বিকট দন্ত কপট বাণী' কিংবা, 'কুটিল গমন ঘন কাশে'; অপর দিকে 'মধুরাচারকোবিদে' বলিয়া রাধা বড়াইকে আহ্বান করিতেছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে কাব্যের সূচনাতেই কবি যে দৃষ্টিতে বড়াইকে দেখিতেছেন, রাধার দৃষ্টি তাহা হইতে ভিন্ন।

রাধাকে সঙ্গে লইয়া বড়াই প্রত্যহ মথুরার হাটে দধিদুধ বিক্রয় করিতে যায়। একদিন পথে যাইতে যাইতে বনের মধ্যে বড়াই রাধাকে হারাইয়া ফেলে।

রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে।
ভালমনে পথক না দেখে নয়নে ॥
নাতিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে।
কমণ উপায় করোঁ জাওঁ কোণ দিশে ॥

নাতি কৃষ্ণ বৃন্দাবনের মধ্যে গরু চরাইতেছিল। রাধার বর্ণনা দিয়া বড়াই কৃষ্ণের নিকট রাধার সন্ধান করে। বড়াই বারবার কৃষ্ণকে বলে :

বোলহ সুন্দর কাহ্ন রাধার উদ্দেশে।

কিংবা,

বিলম্ব না কর বোল রাধার উদ্দেশে।

এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায়, রাধাকে বনমধ্যে হারাইয়া ফেলিয়া বড়াই নিতান্তই ব্যাকুল হইয়াছে। রাধাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য সে কৃষ্ণের সকল রকম প্রস্তাবেই সম্মত হয়। কারণ বড়াই জানে কৃষ্ণ কেবল তাহার নাতি রাখাল বালকমাত্র নয়, সে হইল 'দেব সংসারের সার'। যাই হোক, বড়াইয়ের মুখে রাধার বর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণ তাহাকে রাধার সন্ধান বলিয়া দেয়। নাতির প্রতি স্নেহবশে বড়াই কৃষ্ণের প্রেমপ্রস্তাব স্বরূপ ফুলতাম্বুলাদি রাধার নিকট লইয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে বড়াইয়ের এই আচরণ নিতান্ত লঘু বা কপট বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ বড়াই নিছক রঙ্গ রসিকতা বা কৌতুক সৃষ্টির জন্য দুইটি কিশোর-কিশোরীর মিলসাধনে উদ্যোগী হয় নাই। কৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াই বড়াই রাধাকে ফুলতাম্বুলাদি গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেয়। বড়াইয়ের উক্তি :

যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিল হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥

কিন্তু রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বড়াইকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়। বড়াই রাধার মঙ্গলের জন্যই এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু রাধা যখন কৃষ্ণ-প্রেরিত পানপাত্র পদদলিত করিল তখন বড়াই অত্যন্ত অপমানিত হইয়া কৃষ্ণের নিকট তাহার সকল আচরণের কথা ব্যক্ত করিল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াইয়ের পরামর্শ ও প্ররোচনাতেই অধিকাংশ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। কৃষ্ণের ইচ্ছা :

কদমের তলে বসী যমুনার তীরে
দান ছলেঁ রাখিবোঁ রাধারে।

সুতরাং ইহার সকল ব্যবস্থা বড়াইকেই করিতে হয়। কবির বিবৃতি :

আধায় সাদরং চিত্তে দামোদরসমীহিতং।
মধুরং রাধিকামাহ বৃদ্ধা কপটকোবিদা॥

কৃষ্ণের বাসনার কথা কপটকুশলা বড়াই রাধাকে বলিল :

বিমতী তেজিআঁ কাহ্নাঞি গেল নিজ ঘর।
চল ঝাঁট জাই বিকে মথুরা নগর॥

কিন্তু রাধার সম্মতি হইলেই হইবে না, তাহার শাশুড়ীর অনুমতিও প্রয়োজন। বড়াই কৌশলে তাহাও সংগ্রহ করিয়া লইল। দানখণ্ডে বড়াইয়ের সাহায্যের ফলেই কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলনের সুযোগ পাইল। কবির বর্ণনা :

বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ।
আগুছিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞিঁ রহাএ॥
তাক দেখি বড়ায়ি পালটি অথবেথে।
অতিবড় ঠেঁঠালি রহিলী মূল পথে॥

এই ছত্রকয়টিতে বড়াইয়ের চরিত্র ও প্রকৃতি চমৎকার ফুটিয়াছে। কবি বড়াইকে 'ঠেঁঠালি'—চতুর কুটিল কৌশলী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বনের মধ্যে কৃষ্ণ যখন রাধার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল বড়াই তখন কৌশলে অন্য পথে সরিয়া গেল। বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের সম্মুখে একা রাখিয়া অন্য পথে সরিয়া গেলে কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পায়।

নৌকাখণ্ডের ঘটনা সম্পূর্ণ বড়াইয়ের পরিকল্পিত। কৃষ্ণের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া রাধা আর ঘরের বাহির হইতে চাহে না। দীর্ঘদিনের অদর্শনে কৃষ্ণও এদিকে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। রাধাকে পুনরায় দেখিবার জন্য কৃষ্ণ বড়াইকে পীড়াপীড়ি করে। তখন

মধুরাং মথুরাং নেতুং জরতী কপটে পটুঃ।
কৃষ্ণস্য বচসা প্রাহ শীঘ্রং রাধামিদং বচঃ॥

কৃষ্ণের অনুরোধে কপটপটু বৃদ্ধা বড়াই মথুরায় যাইবার জন্য রাধিকাকে নানা ভাবে উৎসাহিত করিতে লাগিল। রাধা বলিল মথুরায় যাইতে তাহার শাশুড়ী নিষেধ করিয়াছে, শাশুড়ীর অনুমতি না পাইলে সে ঘরের বাহির হইবে না। সুতরাং বড়াইয়ের এবার রাধার শাশুড়ীর নিকট যাওয়া প্রয়োজন।

তবেঁ তার থান গিয়া বুইল সত্বরে।
কি কারণে দধি দুধ নঠ কর ঘরে॥
হেনক কুমতীএঁ হয়িবেঁ ভিখারী।
বুঝি রাধিকা পাঠাহ মথুরা নগরী॥
হেনমতেঁ নানা পরকার করিআঁ।
বুঢ়ি দিল রাধিকারে আনুমতী লআঁ॥

রাধার অনুমতি মিলিলে বড়াই তাহাকে দধিদুধ বিক্রয়ের ছলে কৃষ্ণের নিকট লইয়া আসে। রাধার মন পাইবার জন্য ইহার পরেও কৃষ্ণ বহুবার বড়াইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করে। বড়াইও এ ব্যাপারে তাহার সাধ্যমত কৃষ্ণকে সাহায্য করে এবং প্রয়োজনমত নানা পরামর্শ ও উপদেশ-নির্দেশ দেয়। ছত্রখণ্ডে রাধার মস্তকে ছত্র ধারণ করিলে কি লাভ হইবে সে কথা বড়াই কৃষ্ণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। কারণ পূর্ববর্তী ভারখণ্ডে রাধা কৃষ্ণকে দিয়া ভার বহন করাইতে চাহিলে কৃষ্ণের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল। কৃষ্ণ বলিয়াছিল :

কংস বধিবারে মোএ কৈলোঁ আবতার।
এবেঁ কি বহিব আহ্মে তোহ্মার দধিভার॥

ছত্রখণ্ডে ছত্রধারণের কাজে কৃষ্ণ হয়তো আবার আপত্তি তুলিতে পারে তাই বড়াই

কৃষ্ণকে বুঝাইয়া বলে :

তোর ভাগেঁ দিল রাধা রতি আনুমতী।
হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী॥
আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ।
এহাত না করিহ কাহ্ন মণে কিছু লাজ॥
... ...
ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে।
কথো দূর গেলেঁ রতি পাইবেঁ জগন্নাথে॥

বস্ত্রহরণ (যমুনা) খণ্ডে কৃষ্ণ সখীদের সহিত জলক্রীড়া করিবার সময় জলের মধ্যে লুকাইয়া রহিলে সখীসহ রাধা ও বড়াই সকলেই কৃষ্ণের সন্ধান করিতে থাকে। সেদিন রাত্রি গভীর হওয়ায় পরদিন সকালেই বড়াই কৃষ্ণের খোঁজে তাহাদের লইয়া আসে। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে পুষ্পবাণে আহত করিয়াছে বড়াইয়ের প্ররোচনা ও সম্মতিতেই বড়াই স্পষ্টতঃ কৃষ্ণকে বলিয়াছে :

শুনহ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মার বচনে।
রাধাক হাণ ফুলের পাঁচ বাণে॥

কিংবা,

জুড়িআঁ মদন পাঁচ বাণে।
আজি লঅ রাধার পরাণে॥

এই বাণখণ্ডেই বড়াই চরিত্রের একটা বড় পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এ পর্যন্ত বড়াই মুখ্যতঃ কৃষ্ণের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বাণখণ্ডে কৃষ্ণের শরের আঘাতে রাধা মূর্ছিত হইয়া পড়িলে বড়াই কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করে।' ড়াইয়ের উক্তি :

বিচার না করী কাহ্না কেহ্নে হেন কৈলেঁ।
তিরীবধপাপেঁ আপণা মজায়িলেঁ॥

কিংবা,

মোরে নাহিঁ ছো কাহাঞিঁ বারাণসি যা।
আঘোর পাপেঁ তোর বেআপিল গা॥
তিরী বধ কইলি কাহ্নাঞিঁ আপণ মনে।
আপযশ থাকিল তোর তীন ভুবনে॥

বড়াইয়ের অভিশাপ ও তিরস্কারে ভীত হইয়া কৃষ্ণ নানাভাবে চেষ্টা করিয়া রাধার চেতনা ফিরাইয়া আনে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়াইকে সর্বাধিক কর্মব্যস্ত চরিত্র বলা চলে। রাধা-মাধবের মিলনে তাহার কর্মতৎপরতার সীমা নাই। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার চেতনা ফিরিলে বৃন্দাবনকুঞ্জে নবকিশলয়শয্যা রচিত হয়। সেখানে—

রাধা মাধব দুঈ করি এক ঠাই।
আতি দূর গিআঁ রহিলা বড়ায়ি॥

বংশীখণ্ডে এবং বিশেষ করিয়া রাধাবিরহ অংশে রাধার প্রতি বড়াইয়ের আচরণ অত্যন্ত মধুর। বিরহব্যাকুলা রাধার নিকট কৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বড়াইয়ের চেষ্টার ত্রুটি নাই। রাধা যাহাতে কৃষ্ণকে পুনরায় ফিরিয়া পায়, বড়াই সেজন্য রাধার নিকট কৃষ্ণের বংশিহরণের পরামর্শ দেয়। বড়াই নিজেই কদম্বতলে 'নিন্দাউলী মন্ত্রে'র সাহায্যে কৃষ্ণকে নিদ্রাভিভূত করিলে রাধা বড়াইয়ের সাহায্যে কৃষ্ণের বংশী অপহরণ করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম কয়েকটি খণ্ডে দেখিয়াছি বড়াই নানাভাবে রাধাকে ছলনা করিয়াছে এবং সযত্নে মথুরায় লইয়া যাইবার অজুহাতে সে মাঝবৃন্দাবনে কৃষ্ণের হাতে তাহাকে তুলিয়া দিয়াছে। বংশীখণ্ডে ইহার ঠিক বিপরীত চিত্র দেখি। এখানে বড়াই রাধার পক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকে ছলনা করিতেছে। রাধার ষোলশত সঙ্গিনীর সামনে কৃষ্ণকে জোড়হাত করাইতে বড়াই কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। রাধার নিকট হইতে বাঁশিটি ফিরাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ বড়াইকে বারবার অনুরোধ করিলে বড়াই তাহাকে বলে :

ষোল শত রাধার সঙ্গিণী। আল।
তার থান চলহ আপুণী॥ ল কাহ্নাঞিঁ।
একেঁ একেঁ কর যোড়হাথে। আল।
তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥

আর এক স্থানে কৃষ্ণকে বলিয়াছে :

যোড়হাতে বুলিহ বচনে।
সুখী হইব রাধার মণে। ল কাহ্নাঞিঁ॥
কেহ্নে তোঞঁ কাজ না বুঝসি।
তণ্ডী কয়িলেঁ না পাইবে বাঁশী॥

অতঃপর কৃষ্ণ করযোড়ে মিনতি করিলে বড়াইয়ের পরামর্শে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি ফিরাইয়া দেয়।

রাধাবিরহ অংশে বড়াই যদিও বারবার রাধাকে বলিয়াছে :

এবেঁ বলহীন আহ্মে চলিতে না পারী।
কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী॥

তথাপি এই খণ্ডে বড়াইয়ের কর্মতৎপরতার অভাব নাই। বিরহিণী রাধার বেদনা তাহার চিত্তে ব্যথা ও করুণার সৃষ্টি করিয়াছে। বলহীনা হইয়াও রাধাকৃষ্ণ মিলনে তাহার সক্রিয়তা লক্ষ্য করিবার মত। একদিন রাধার নিকট গিয়া বড়াই কৃষ্ণের বিরহব্যাকুলতার কথা বলিয়াছিল, আজ কৃষ্ণের নিকট সে রাধার বিরহব্যথার কথা জানায়। ড়াইয়ের উক্তি :

তনের উপর হারে। আল মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে॥
সরস চন্দন পঙ্কে। আল দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে॥
আল তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে॥

ইহা ছাড়াও কৃষ্ণকে বড়াই বহুবার কাতরভাবে অনুরোধ জানাইয়াছে, সে যেন রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় না চলিয়া যায়।

জন্মখণ্ডে বড়াইয়ের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে প্রথম দৃষ্টিতেই একটি নিতান্ত কপট গ্রাম্য কুট্টিনী বা দূতী চরিত্র বলিয়া বোধ হইতে পারে। মনে হয়, কবির নিজেরও বড়াইচরিত্র সৃষ্টিতে কোনো স্থিরনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। হয়তো প্রথমে তিনি একটি কুট্টিনী চরিত্ররূপেই বড়াইকে অঙ্কন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তাই তিনি কাব্যের সূচনায় একাধিক স্থানে তাহাকে 'কুটিল' বা 'কপটকুশলা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র কাব্য পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, বড়াইচরিত্রে যে কপটতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নিতান্তই তাহার বাহিরের রূপ। বড়ু চণ্ডীদাস বড়াইকে একটি কুট্টিনী চরিত্ররূপে শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু স্নেহ-প্রীতি-মমতায় পরিপূর্ণ একটি মানবিক চরিত্ররূপে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বড়াইচরিত্রের এইখানেই সার্থকতা আর উক্ত চরিত্রসৃষ্টিতে বড়ু চণ্ডীদাসেরও এইখানেই কৃতিত্ব।

সমাজচেতনা ও জীবনরসবোধ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রাচীন বঙ্গদেশ ও তাহার সমাজজীবনের কতখানি ছবি ফুটিয়াছে তাহা বর্তমানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য। সমগ্র ভারতে বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য রচনার বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। *গীতগোবিন্দ* তাহারই একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। রাধা ও কৃষ্ণই যে-কাব্যের প্রধানতম উপজীব্য সেখানে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের নরনারীর জীবনযাত্রার ছবি ফুটিয়া উঠিবে ইহা সাধারণতঃ আশা করিবার কথা নয়। বড়ু চণ্ডীদাস যদি কেবল পুরাণ-অবলম্বনেই কাব্য রচনা করিতেন তাহা হইলে কাব্যরচয়িতা এবং তাঁহার দেশ ও কালের ছবি সেখানে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পাইবার কোনো সুযোগ থাকিত না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিছক পুরাণ অনুসৃত কাব্যগ্রন্থ নহে, এখানে কবি স্বাধীনভাবে বহু কাহিনী সংযোজিত করিয়াছেন বহু নূতন ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যাহার মধ্য দিয়া কবির আপন দেশ ও কালের কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা আইহনের পত্নী এবং অত্যন্ত শিশুকালেই যে তাহার বিবাহ

হইয়াছিল এ তথ্য জন্মখণ্ডেই বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম পর্বেই জানিতে পাই রাধা এগার বৎসর বয়সের বহু পূর্ব হইতেই আইহনের ঘর করিতেছে। বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধার বয়সের এরকম স্পষ্ট উল্লেখ বিশেষ নাই। বাল্যবিবাহ যে প্রাচীন বঙ্গদেশের একটি সাধারণ রীতি ছিল রাধিকার বাল্যবিবাহের মধ্য দিয়া সেকথা সহজে জানিতে পারি।

রাধা, স্বামী আইহন, শাশুড়ী, বৃদ্ধা বড়াই প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া বেশ একটি পারিবারিক পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে। রাধার যখন 'দিনে দিনে বাঢ়ে তনু লীলা' তখন তাহাকে সর্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য আইহন মায়ের নিকট গিয়া বড়াইকে আনিবার পরামর্শ দেয়। আইহনের মাতাও পুত্রবধূর পরিচর্যার জন্য বড়াইকে নিয়োগ করে।

এই বড়াইয়ের নেতৃত্বেই রাধা তাহার সখীদের সঙ্গে লইয়া মথুরার হাটে দধিদুধ বেচিতে যায়। তৎকালে সকল স্ত্রীলোকই যে ঘরের বাহির হইত তাহা নয় তবে গোপজাতের কন্যারা আপন ব্যবসা ও জীবিকার কাজে দধিদুধের পসরা লইয়া হাটে বেচিতে যাইত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গোপজাত ব্যতীত কুমার, তেলী, নাপিত প্রভৃতি আরও কয়েকটি জাতি বা বৃত্তির পরিচয় পাই। কুমারের প্রসঙ্গ :

মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণা।

কিংবা,

এবেঁ মোর মনে পোড়নী।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী ॥

তেলী বা তেলিনী প্রসঙ্গ :

কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে যাএ।

অথবা,

ঘরের বাহির হৈলেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ।

গ্রন্থমধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতির প্রসঙ্গও আছে।

বৃন্দাবনখণ্ডের অন্তর্গত দুই একটি পদে গ্রাম-বাংলার সমাজ-জীবনের বেশ একটি সুন্দর ছবি ফুটিয়াছে দেখিতে পাই। শাশুড়ী বধূকে সর্বদা ঘর হইতে বাহির হইবার স্বাধীনতা দেয় না। কোনো উপলক্ষ থাকিলে সখীদের সঙ্গে লইয়া একটু আধটু আনন্দ কর আপত্তি নাই, কিন্তু সব সময় কেন ঘরের বধূ বাহিরের পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইবে? এদিকে রাধাকে বৃন্দাবনে যাইতেই হইবে, সেখানে কৃষ্ণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাই বধূ নূতন সুযোগ খোঁজে শাশুড়ীর হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য। রাধার পরিকল্পনা অনুযায়ী বড়াই প্রত্যেক সখীর শাশুড়ীর কাছে গিয়া নূতন করিয়া মথুরার হাটে দধিদুধ বেচিবার প্রস্তাব তোলে। দধিদুধ বেচিয়াই তো গোপজাতিকে জীবনধারণ করিতে হয়। আইহনের মায়ের জন্যই কিছুদিন ধরিয়া সখীদের হাটে যাইবার ব্যবস্থা বন্ধ হইয়াছে। বড়াইর কথামত প্রত্যেক শাশুড়ীই তাহার ঘরের বধূটিকে হাটে পাঠাইতে

সম্মত হয় এবং তাহারা আইহনের মায়ের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া শাসাইয়া বলে :

আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পানি না খাইব॥

অর্থাৎ, আমাদের ঘরের বধূমাতারা সকলে মিলিয়া দধিদুধ বেচিতে হাটের পথে চলিয়াছে, তুমি যদি তোমার বধুটিকে তাহাদের সঙ্গে যাইবার অনুমতি না দাও তাহা হইলে আমরা আর তোমার ঘরে কোনোদিন অন্ন-জল স্পর্শ করিব না।

এ বোল সুণিআঁ ডরে আইহণের মাএ।

একঘরে হইবার ভয়ে আইহনের মা কালবিলম্ব না করিয়া রাধাকে মথুরার হাটে যাইবার অনুমতি দিয়া দেয়। কাহাকেও বা কোনো পরিবারকে একঘরে করিয়া দণ্ডদানের প্রথা শুধু যে সে যুগেই ছিল তাহা নয়, এ কালেও বঙ্গদেশের গ্রামের কোনো কোনো অঞ্চলে পাড়াপ্রতিবেশী এইভাবে তাহাদের ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। একঘরে করিয়া দেওয়াকে বঙ্গদেশের সমাজ একটি বড় দণ্ডদান বলিয়া মনে করে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকে আমরা যে আইহনের বধূ হিসাবে দেখিতে পাই, সে আইহন যে খুব ধনী পরিবারের সন্তান ছিল তাহার কোনো বিশেষ পরিচয় নাই। বড়ু তাঁহার চোখের সামনে বঙ্গদেশের নিম্নমধ্যশ্রেণীর যে মানুষগুলি দেখিয়াছিলেন তাহারই প্রভাব পড়িয়াছে আইহন পরিবারের উপর। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের জন্য মনটি পড়িয়া থাকিলে কি হইবে ঘরের সকল কাজকর্ম রাধাকে নিজের হাতেই সারিতে হয়। বংশীখণ্ডের দুই একটি পদে রাধিকার রন্ধনশালার চিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। রাধা রান্নাঘরে আইহনের জন্য প্রত্যহ কি কি রাঁধিয়া-বাড়িয়া রাখে? ভাত তো আছেই, তাহা ছাড়া শাক, একটা ভাজা, ঝোল, অম্বল ইত্যাদি নানারকম। রন্ধনকার্যে রাধার অখ্যাতি ছিল না, কারণ সে প্রতিদিনই যত্ন করিয়াই রাঁধিয়া-বাড়িয়া আইহনকে খাইতে দেয়। কিন্তু আজ দূর হইতে সুমধুর বংশিধ্বনিশ্রবণে রাধার রন্ধনকার্যে আর মন নাই, 'রান্ধনের জুতী' সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। রাধা নিজেই বলিতেছে 'বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন'। সে ভুল করিয়া পটল ভাজিতে গিয়া কতকগুলা কাঁচা সুপারি ঘিয়ে ভাজিয়া ফেলিয়াছে। হাঁড়িতে জল না দিয়া চাল চড়াইল, কিন্তু শাকে দিল 'কানাসোআঁ পাণী'। অম্বল ব্যঞ্জনে সে ঝালমশলা দিয়াছে আর নিমঝোলে লেবুর রস নিংড়াইয়া ফেলিয়াছে।

কতকগুলি পদে সেকালে কি কি গ্রামীণ সংস্কার নরনারীর মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহার পরিচয় আছে। যেমন :

কমণ আসুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা॥

কিংবা,

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।

আগেঁ সুনা ঘটে নারী   হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলেঁ৷ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥

উপরের উদ্ধৃতি দুইটি দানখণ্ডের অন্তর্গত। অযাত্রা কুযাত্রা সম্পর্কে প্রাচীন প্রচলিত সংস্কারের আরও কিছু পরিচয় পাই বংশীখণ্ডের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য দুইটি পদে। পদ দুইটি হইতে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :

কোণ আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলেঁ৷।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলেঁ৷॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাএঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ॥
...   .
কথো দূর পথে মোঁ৷ দেখিলেঁ৷ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী॥
কান্ধে কুরুআ লঞাঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ॥

অপর একটি পদে :

ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।
জল মাঝেঁ দেখিলেঁ৷ মো কি নিশাপতী॥
পূর্ন্ন কলসে কিবা ভরিলেঁ৷ হাথে।
তেকারণে বাঁশী চুরি দোষসি জগন্নাথে॥
...   .
গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলেঁ৷।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলেঁ৷॥
খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলেঁ৷ গাএ।
তেকারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ॥

যাত্রাকালে শুভাশুভ বিষয়ক পদ বহু প্রাচীন গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে এই বিষয়ক পদ পাওয়া যায়। এখানে উদাহরণস্বরূপ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে দুই একটি পদ উদ্ধৃত করা গেল। কালকেতুর উপাখ্যানে কালকেতুর বনযাত্রা প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম যে শুভ ও অশুভ লক্ষণগুলির বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই :

কালকেতু দেখে সুমঙ্গল।
দক্ষিণে গো-মৃগ-দ্বিজ   বিকশিত সরসিজ
বামে শিবা পূর্ণবটজল॥

চৌদিকে হুলুই ধ্বনি কেহ জ্বালে গৃহমণি
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী।
দেখিল সুচারু তনু বৎসের সহিত ধেনু
পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি॥
দূর্বাধান্য পুষ্পমালা হীরা নীলা মোতি পলা
বামভাগে বার-নিতম্বিনী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় কেহ নাচে কেহ গায়
শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি॥
দেখি বীর সুললিত আনন্দে সরস চিত
প্রবেশ করিল বন-ভাগে।
দেখিল রুচির তনু রূপে জিনি হেমভানু
সুবর্ণ-গোধিকা সর্ব আগে॥
সুবর্ণ-গোধিকা দেখি চিত্তে বীর হৈল দুখী
অযাত্রিক-পাপ দরশনে।
দেখিনু মঙ্গল যত সকলি হইল হত
দৈব দুঃখ বিধির লিখনে॥

ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে ধনপতির সিংহলযাত্রা অংশে মুকুন্দরামের বর্ণনা :

ঘরে হৈতে সদাগর করিলা গমন।
আকুল খুল্লনা নারী করয়ে রোদন॥
পথে যাইতে সদাগর লাগিল উছটা।
পরিধান বাসে লাগে সিঙা কুল কাঁটা॥
যাত্রার সময়ে ডোমচিল উড়ে মাথে।
কাঠুর‍্যা কাষ্ঠের ভার লয়া জায় পথে॥
সুখান ডালেতে বস্যা ডাকে জোম কাউ।
যোগীনি মাগয়ে ভিক্ষা হাথে অর্ধ লাউ॥
চলিলেন সদাগর মনে কুতুহলি।
বামদিগে জায় সাপ দক্ষিণে শ্রীগালি॥
দেখিল কচ্ছব কেহো ধরি লয়্যা যায়।
তৈল লবে তৈল লবে তেলি জে বোলায়॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাত্রাকালে শুভাশুভের যে সংস্কার তাহা যে বঙ্গদেশে কেবল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনাকালেই বর্তমান ছিল তাহা নয়, বরং বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত একই বিষয়ক পদ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে প্রাচীন বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর সংস্কার দীর্ঘকাল ধরিয়াই বাসা বাঁধিয়াছে। আজও বঙ্গভূমির গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় কোনো কোনো মানুষ এই সব সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

রাধা ও কৃষ্ণের কটু উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে তৎকালীন গ্রাম্য পরিবেশটি ধরা পড়ে। কৃষ্ণ বলে, 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী'। এই সম্বন্ধের কথা যে বলে তাহার সম্বন্ধে রাধার অভিশাপ :

তুঈ আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ।

কৃষ্ণ রাধাকে 'পামরী ছেনারী নারী' বলিয়া গালি দিয়াছে। রাধা কৃষ্ণের পিতৃদেবকে স্মরণ করিয়া বলে :

বান্ধিতেঁ না পারে তোহ্মার বাপে।

কিংবা,

আছুক তোহোর কথা হেন করিতেঁ
নারে তোর বাপে।

শুধু বাপ নয়, বড়াইয়ের নিকট কৃষ্ণের গোত্র তুলিয়াও সে গালি দেয় :

তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে।
কিসকে বাখানে কাহ্নু মোর তুঈ তনে॥

রাধার দুই একটি শপথবাক্যের মধ্যে বঙ্গদেশের গ্রামের স্ত্রীলোকের নিজস্ব ভাষাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বংশীখণ্ডে রাধাই বাঁশি চুরি করিয়াছে—কৃষ্ণ এইরূপ সন্দেহ করিলে রাধা তাহাকে বলিতে থাকে :

চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী॥
যবেঁ মো চুরী কৈলোঁ হআঁ নারী সতী।
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী॥

তৎকালীন মানুষের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে ভগবানের বিচারে পাপীর দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার আছে। রাধাবিরহ অংশের একটি পদে রহিয়াছে :

পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ
পাপেঁ হএ নরকের ফল॥

শুভকার্যে হাত দিবার পূর্বে লোক শুভ তিথি, বার, ক্ষণ প্রভৃতি ভাল করিয়া বিচার করিয়া লইত। তাম্বুলখণ্ডে আছে :

শুভ তিথি বার শুভক্ষণে। আতিশয় উল্লসিত মণে॥
বন্দিআঁ সব দেবগণে। বড়ায়ি শ্রীরামচরণে॥
মনে ধরি কাহ্নাঞিঁর বচনে। চলি ভৈল রাধিকার থানে॥

অভীষ্টসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় লোকে কি কি করিত তাহার উল্লেখ আছে বৃন্দাবনখণ্ডের অন্তর্গত একটি পদের নিম্নোদ্ধৃত চরণে :

কে না কুশক্ষেত্রে বিধিবতেঁ কৈল দান।
কাহার ফলিল পুষ্কর পুন্য সিনান॥

কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী।
কারেঁ হাথেঁ হাথেঁ নিআঁ বিধি দিল নিধী ॥
কে না কেদারশির পরসিল করে।
কে না তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে ॥
কে গাঅ তেজিল গঙ্গাসঙ্গত সাগরে।
যা লআঁ কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে ॥

স্থতীর্থে তপস্যা বা স্নান করিলে প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। বৃন্দাবনখণ্ডে :

কেন না স্থতীথে তপ কৈল ভাগ্যমতী।
কে নারী কাহ্নের সঙ্গে করে স্থরতী ॥

অথবা রাধাবিরহ অংশে :

কে না স্থতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।
যা লআঁ স্থখরতি ভুঁজয়ে মুরারী ॥

তৎকালীন মানুষ স্বকৃত পাপকর্মের কি ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিত তাহারও পরিচয় আছে বিভিন্ন পদের মধ্যে। দানখণ্ডে রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছে :

আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ।
গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ ॥
হেন যদি কর কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে।
তবেঁ তোর হএ পাপ সাগরে মোচনে ॥

বাণখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে নিষ্ঠুরভাবে বাণের দ্বারা আঘাত করিলে বড়াই কৃষ্ণকে সক্রোধে বলে :

মোরে নাহিঁ ছো কাহ্নাঞিঁ বারাণসি যা।
আঘোর পাপেঁ তোর বেআপিল গা ॥

অর্থাৎ বারাণসীতে গিয়াই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব।

'সব মোর করমের ফল', 'পুরুব জনমে কৈল করমের ফলে' কিংবা 'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ' ইত্যাদি উক্তির মধ্য হইতে বোঝা যায় কবির সমকালের বাঙালী জন্মান্তর, কর্মফল ও অদৃষ্টবাদে বেশ বিশ্বাসী ছিল।

মন্ত্র-তন্ত্রেও লোকের বিশ্বাসের অভাব ছিল না। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ মূর্ছিতা রাধাকে ঝাড়ফুঁকের দ্বারা পুনরায় জাগ্রত করিয়া তোলে :

ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।
ধীরেঁ ধীরেঁ গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী ॥

বংশীখণ্ডে রাধার প্রতি বড়াইয়ের পরামর্শ :

নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আহ্মি।
তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুহ্মি ॥

নারীহত্যাই তৎকালে সর্বাধিক নিন্দনীয় পাপকর্ম বলিয়া গণ্য হইত। বাণখণ্ডে সেকথা বিবৃত আছে। নারীহত্যা এমনই পাপজনক যে, 'শতেক ব্রহ্মবধ নহে যার তুলে'।

রাধার রূপবর্ণনাত্মক বা ঐ শ্রেণীর কোনো কোনো পদের মধ্যে প্রাচীন বাংলাদেশের স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ব্যবহার ও প্রসাধনচর্চার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কবি রাধাকে যে বিচিত্র অলঙ্কারসম্ভারে সজ্জিত করিয়াছেন, সাধারণ মানুষ তাহা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার না করিলেও কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে ব্যবহার করিত তাহা অনুমান করা যায়। রাধার 'হৃদয়ে কাঞ্চুলী গজমুকুতার হার' এবং 'শ্রবণে শোভএ· · রতনকুণ্ডল'। আর 'আঙ্গদ ভুজ যুগলে' কিংবা 'কনক যূথিকা মালা বাহু যুগলে'। রাধার কটিদেশ 'কনক কিঙ্কিণী'তে বেষ্টিত। করাঙ্গুলিতে 'আঙ্গুঠী' ও পদাঙ্গুলিতে 'পাসলী'। ইহা ছাড়া রাধার 'কানড়া খোপা'টিও লক্ষ্য করা আবশ্যক। কানড়ী শব্দটি কর্ণাটিকা হইতে আসিয়াছে। সে যুগের বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলেও কর্ণাটি খোপা যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল তাহা অনুমান করা যাইতেছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও আমরা কর্ণাটি খোপার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই।

ভারখণ্ডে রাধার ভারবহনের জন্য কৃষ্ণ অনেক পরিশ্রম করিয়া ভারদণ্ড (বাঁক) তৈয়ারী করিয়াছে। বঙ্গদেশের ভারবাহকেরা যে পদ্ধতিতে ভারদণ্ড প্রস্তুত করিয়া থাকে কৃষ্ণের ভারদণ্ড রচনার প্রণালীও ঠিক তদ্রূপ। এই প্রসঙ্গে ভারখণ্ডের অন্তর্গত 'মাঝ বৃন্দাবন গিআঁ কাহ্নাঞি গোআল' পদটি দ্রষ্টব্য।

রাজকর আদায়ের প্রথা যে তৎকালে প্রচলিত ছিল তাহারই কিছুটা প্রমাণ মিলিতেছে দানখণ্ডে কৃষ্ণের দানী সাজিয়া বসিবার মধ্যে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশে শাক্তপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। শক্তিদেবী চণ্ডী সে যুগে বিশেষভাবে পূজিত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যদিও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য তথাপি এই কাব্যের কবি বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি যে শক্তির উপাসক বা শাক্ত ছিলেন তাহার অনুকূলেই অধিক প্রমাণ মিলে। প্রথমে চণ্ডীদাস নামটিই-লক্ষণীয়। এই নামের মধ্যেই কবির পিতৃপুরুষও যে শাক্ত ভক্ত ছিলেন তাহা বুঝা যায়। যাঁহারা বিশেষভাবে বৈষ্ণব ভক্ত তাঁহাদের পরিবারে কাহারও নাম বৈষ্ণবদাস বা কৃষ্ণদাস ব্যতীত চণ্ডীদাস বা কালিদাস হইবে না। চণ্ডীদাস শাক্ত হইয়া বৈষ্ণবকাব্য রচনা করেন, ইহার ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্ত মুকুন্দরাম (মুকুন্দ = কৃষ্ণ)। তিনি বৈষ্ণব পরিবারের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের কালে শক্তিদেবীর পূজা যে প্রচলিত ছিল তাহার আরও একটি প্রমাণ মিলিতেছে। রাধাবিরহ অংশে বড়াই রাধাকে বলিতেছে, যত্ন সহকারে চণ্ডীকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই কৃষ্ণের সন্ধান মিলিবে :

বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে ॥

অপরদিকে মুকুন্দরাম নিজে বৈষ্ণব বলিয়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিলেও সেখানে

মাঝে মাঝে ভাগবত ইত্যাদির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থসমাপ্তি কালে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন :

সর্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত।
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত ॥

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হরিকথার এত ছড়াছড়ি সেই কালের উপর বৈষ্ণব প্রভাব অথবা বৈষ্ণব শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কবির নিজের ধর্মমতের জন্যই হওয়া বেশী সম্ভব বলিয়া আমার অনুমান।"

রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে আমরা তৎকালীন সমাজ-জীবনের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র সংগ্রহ করি পরিমাণে তাহা অধিক না হইলেও বিভিন্ন দিক হইতে সেইটুকুর মূল্যও নিতান্ত কম নহে। তুলনায় চর্যাপদ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই বঙ্গদেশ ও বাঙালীর মনের ছাপটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুভব করা যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই বাঙালী ভাবচেতনা ও জীবনরসবোধের প্রথম উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়াছে বলা চলে।

সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার মূল পাঠ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা ১৬১। জন্মখণ্ডে ৩, তাম্বূলখণ্ডে ৭, দানখণ্ডে ৪৬, নৌকাখণ্ডে ১৩, ভারখণ্ডে ১১, ছত্রখণ্ডে ৭, বৃন্দাবনখণ্ডে ১১, কালীয়দমনখণ্ডে ১, বস্ত্রহরণ (যমুনা) খণ্ডে ১১, হারখণ্ডে ৩, বাণখণ্ডে ৯, বংশীখণ্ডে ১৯ এবং রাধাবিরহে ২০টি শ্লোক আছে। প্রাপ্ত শ্লোকের মধ্যে ২৮টি পুনরাবৃত্ত। বসন্তরঞ্জন রায় শ্লোকগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, "আরম্ভসূচক এবং পূর্বাপর সম্বন্ধ রক্ষার নিমিত্ত মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক আছে; উহার কয়েকটি অতি চমৎকার। 'চতুরে চতুরো মাসান্' কবিতাটিতে উত্তরমেঘের 'মাসানেতান্ গময়ঃ চতুরঃ' শ্লোকের স্বর কানে বাজে। প্রাচীন মৈথিলী ও অসমীয়া গীতি-নাট্যে উপরিউক্ত রীতি অনুসৃত হইত।" বসন্তরঞ্জন আরও বলিয়াছেন, "শ্লোকের অন্যত্র আকর-কল্পনা যুক্তিতে আসে না।" এই মন্তব্য হইতে আবিষ্কর্তা-সম্পাদকের মত হিসাবে কেবল এইটুকু জানা গেল যে শ্লোকগুলি অন্য কোনো গ্রন্থ বা আর কাহারও রচনা হইতে উদ্ধৃত করা হয় নাই। শ্লোকগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিরই রচনা এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্যই এগুলি রচিত হইয়াছিল। বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে এই মতই একরকম মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকগুলিকে বিষয়বস্তু হিসাবে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) কবির উক্তি এবং (২) গ্রন্থোক্ত যে কোনো চরিত্রের উক্তি। উল্লিখিত দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর শ্লোকসংখ্যাই অধিক। এই শ্রেণীর শ্লোকের উদাহরণ :

নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং॥
—তাম্বূলখণ্ড

রাধার বাক্য শ্রবণান্তর সুভাষিণী বড়াই দ্রুতগতিতে গমন করিয়া মধুসূদনকে বলিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক মূল কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কাব্যের মধ্যে এমন অনেক সংস্কৃত শ্লোক আছে যেগুলিকে কাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সেই সকল সংস্কৃত শ্লোকের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাংলা পদের মধ্যে কোনো সঙ্গতি থাকে না। কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোক বিভিন্ন খণ্ডের গোড়ায় বা শেষেও রহিয়াছে দেখা যায়। তাহা কাব্যমধ্যে নিতান্তই দুইটি পদের সংযোগ রক্ষার জন্য প্রযুক্ত হয় নাই। দুইটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

জন্মখণ্ডের শেষে একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। শ্লোকটি এই:

অভিমন্যুজনন্যাহং নিযুক্তা তব রক্ষণে।
রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ॥
ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিতা।
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে॥

ইহা উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক শ্লোক। প্রথম দুই ছত্র বড়াইয়ের উক্তি, শেষ দুই ছত্র রাধার উক্তি। কাব্যের মধ্যে এই শ্লোকেই প্রথম বড়াইয়ের মুখে রাধার মথুরায় যাইবার প্রসঙ্গ ওঠে। বড়াইকে রাধা কি ভাবে গ্রহণ করে তাহাও এই শ্লোকেই প্রথম ব্যক্ত হয়। বড়াইয়ের সঙ্গে মথুরায় যাইবার সম্মতিও এই শ্লোকেই রাধা সর্বপ্রথম দেয়।

নৌকাখণ্ডের প্রথমেই বড়াইকে কৃষ্ণ বলিয়াছে:

রাধাক না পাআঁ মোর বেশাকুল মনে।
রাতি দিন নিন্দ না আইসে তাহার কারণে॥
উনমত ভৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিরহে।
তার দরশন বিনি প্রাণ না রহে॥

অথচ দানখণ্ডে যেখানে সমাপ্ত হইয়াছে সেখানে এমন কথা নাই যে রাধা দীর্ঘ দিন ঘরের বাহির হইতেছে না। রাধা-কৃষ্ণের মিলনে দানখণ্ডের সমাপ্তি। দানখণ্ডের যেখানে শেষ এবং নৌকাখণ্ডের বাংলা পদ যেখান হইতে শুরু, তাহার মধ্যে কাহিনীগত কোনো সঙ্গতি বা ঐক্য নাই। কিন্তু নৌকাখণ্ডের একেবারে সূচনায় বাংলা পদের পূর্বে যে সংস্কৃত শ্লোক রহিয়াছে তাহা পাঠ করিলেই কাহিনীর আর অসঙ্গতির প্রশ্ন উঠিবে না। সংস্কৃতে রচিত ছত্রগুলি উদ্ধৃত হইল।

রাধিকাধিকবিশুদ্ধমানসা কামিকৃষ্ণকরতঃ কথঞ্চনঃ।
প্রাপ্য বুদ্ধিবিভবন্ময়া সহ ত্রাণমেণনয়নাগতা গৃহং॥
সাভিমন্যুজননীতি বৃদ্ধয়া ভাষিতং হৃদি নিধায় রাধিকাং।
বিক্রয়ায় দধিতক্রসর্পিষাং গন্তুমেব মথুরাং ন্যবারয়ৎ॥

তন্নিশম্য জরতী স রাধিকা তক্রবিক্রয়নিষেধকম্ম চঃ।
সংবিহায় মথুরাপুরীগতিং সা চিরস্থবসতৌ তদাবসৎ ॥

এই সংস্কৃত শ্লোকের প্রথম দুইটি ছত্র বড়াইয়ের উক্তি। এখানে বড়াই আইহন জননীকে বলিতেছে, বুদ্ধিবলে কোনরূপে কৃষ্ণের হস্ত হইতে রাধাকে উদ্ধার করিয়া গৃহে লইয়া আসিয়াছি। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠছত্র কবির উক্তি। কবি বলিতেছেন যে, বড়াইয়ের কথা শুনিয়া অভিমন্যুজননী দধিদুধ বিক্রয়ের জন্য রাধাকে মথুরায় যাইতে নিষেধ করিয়া দিল। বড়াই ও রাধা সেই নিষেধবাক্য শুনিয়া মথুরায় যাওয়া পরিত্যাগ করিল এবং দীর্ঘকাল স্বগৃহে বসিয়া রহিল।

এই সংস্কৃত শ্লোকে যে কথা বিবৃত হইল, তাহার পর যদি কৃষ্ণ বলে—'রাধাক না পাআঁ মোর বেআকুল মনে' তাহা হইলে কাহিনীর দিক হইতে আর কোনো ফাঁক বা অসঙ্গতি থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ সংস্কৃত শ্লোকই অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। গুটি কয়েক শ্লোক প্রমিতাক্ষরা, রথোদ্ধতা, তোটক, ইন্দ্রবজ্রা, মালিনী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত শ্লোকগুলির ছন্দ নির্দোষ। কবির মাতৃভাষার উপর অধিকার যেমনই থাক, সংস্কৃতের উপর যে বিশেষ অধিকার ছিল তাহার প্রমাণ এইখানে পাওয়া যায়। অনুষ্টুপ ব্যতীত যে সকল শ্লোক অন্যান্য ছন্দে রচিত সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু কাব্যরসের পরিচয় মিলে। রাধাবিরহের অন্তর্গত শ্লোক :

অধুনাপি কিন্নু সদয়ং হৃদয়ে কুরুষে মনোহন্যরমণীকরণে।
গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে সুতনস্তনোতি মদনঃ কদনং ॥

প্রমিতাক্ষর ছন্দে রচিত এই শ্লোকটি বড়াইর উক্তি। বিরহিণী রাধার বেদনা বর্ণনা করিয়া বড়াই কৃষ্ণকে রাধিকার প্রতি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছে, হে কৃষ্ণ, রাধার প্রতি তোমার অনুরাগ হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু তোমার বিরহে পঞ্চশরের আঘাতে সুতনু রাধিকা কাতর। এমন অবস্থায় সদয় হৃদয়ে অন্য রমণীর মনোরঞ্জনে ইচ্ছুক হইয়াছ কেমন করিয়া?

রাধাবিরহের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি রথোদ্ধতা ছন্দে রচিত :

রাধিকাং মনসিজজ্বরাতুরাং মণ্ডনদ্বিগুণরামণীয়কাং।
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো হরির্বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাতঃ ॥

মদনপীড়ায় কাতর এবং প্রসাধনহেতু দ্বিগুণ রমণীয় শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া মন্মথ-শরাহত শ্রীকৃষ্ণ ক্রমানুসারে বিলাস করিলেন। 'বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাতঃ'—এই বাক্যটি পড়িলেই স্পষ্ট বোঝা যায় কবি কোনো কামশাস্ত্র অনুসরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের বিহারবর্ণনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

অশরীরশর ক্লশিতাঙ্গলতা বিততাধিযুতা গতসাততিঃ।
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি হরেরভিমন্যুজনী জরতীমবদৎ ॥

রাধাবিরহের অন্তর্গত এই শ্লোকটি তোটক ছন্দে রচিত। অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত না

হইলেও শ্লোকটির বিষয়বস্তু প্রথমোক্ত শ্রেণীর ন্যায়। শ্লোকটির অর্থ মদনশরে শীর্ণকলেবর বেদনাকাতর নিরানন্দচিত্ত রাধিকা কৃষ্ণচরিত্র চিন্তা করিয়া বড়াইকে বলিলেন।

বৃন্দাবনখণ্ডের অন্তর্গত দুই একটি শ্লোকের মধ্যেও কিছু কাব্যরসের পরিচয় আছে।

বৃন্দাবনীয়প্রসবপ্রকপ্তাং পশ্যামি রাধে ভবতীং পুরস্তাৎ।
বিশ্রাণয় ত্বং কুসুমন্নবামে বামেথবা মোদবিধায়ি দেহং॥

শ্লোকটি কৃষ্ণের উক্তি। বৃন্দাবনের নানা জাতীয় ফলের সহিত রাধিকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণ রাধার আলিঙ্গন প্রার্থনা করিতেছে। 'তমাল কুসুম চিকুরগণে' পদটির ভূমিকা হিসাবে সংস্কৃত শ্লোকটি এস্থলে খুব উপযোগী হইয়াছে। এই শ্লোকের ছন্দ ইন্দ্রবজ্রা।

বিভিন্ন দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচনার যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোকে রাধা কৃষ্ণ বা বড়াইয়ের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে ছোট ছোট অথচ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মন্তব্য বা বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেগুলি বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

রাধা সম্পর্কে :

আধিমতী কৃশাঙ্গী (দান), ভয়ভরাতুরা (দান), সলজ্জা আভীরকৌতুকা (দান), অতি বিশুদ্ধচিত্তা মৃগনয়না (নৌকা), ভয়বিহ্বলা (নৌকা), সরসমানসা (ছত্র), অনুরাগবতী (বৃন্দাবন), রামরম্ভাবিনিন্দিতা জঘনবিশিষ্টা ও প্রবল কন্দর্প-বাণে জর্জরীভূতা (বস্ত্রহরণ), কুরঙ্গনয়না অলসাঙ্গলতা (বংশী), মদন-জ্বরকাতরা (বংশী), বিগলিত হৃদয়া ও চঞ্চল কটাক্ষবতী (বংশী), রূপসরোবরের হংসী (বংশী), কৃষ্ণগতপ্রাণা (রাধাবিরহ), পঞ্চশরাতুরা হরিণী-হারিনয়না (রা. বি), জগতরম্যা (রা. বি)।

কৃষ্ণ সম্পর্কে :

রসতৃষ্ণ (তাম্বূল), মনোজশরকাতর (তাম্বূল), চতুর সতৃষ্ণ (দান), মহাপরাক্রমশালী (দান), প্রমোদমন্থর (বংশী)।

বড়াই সম্পর্কে :

মধুর ব্যবহার সুনিপুণা (জন্ম), বচনচতুরা (তাম্বূল), কপটকুশলা (তাম্বূল), বচনপণ্ডিতা (বস্ত্রহরণ), বিপরীতমতি (বাণ), চতুরা (বংশী)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকগুলির পাঠ সম্পর্কে অদ্যাবধি কেহ তেমন মনোযোগ দেন নাই। বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পড়িলে মনে হয় পুঁথির লিপিকরের যতকিছু ভুলভ্রান্তি ঘটিয়াছে বাংলা পদগুলিতেই, আর সংস্কৃত শ্লোকগুলি সম্পূর্ণ নিখুঁত—তাহাতে লিপিকরের ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছুমাত্র নাই। বাংলা পদে বসন্তরঞ্জন অশুদ্ধ পাঠের স্থানে শুদ্ধ পাঠ বসাইয়াছেন এবং সর্বত্র পাদটীকায় পুঁথির অশুদ্ধ পাঠটির উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন :

পুঁথির পাঠ	সংশোধিত পাঠ
চিন্তির	চিন্তিল
আন চাচানে	আনচানে
হেম রূপ	হেন রূপ
কানড়ি খোঁপা	শ্রীফল যোড়
হোতিত	হাথত
পরাণে	পুরাণে
জঘনে বসে মুপুরু	জঘনে বসে নৃপুরু
শোষিল	শোধিল
শ্রীরঘুনন্দন	শ্রীনন্দনন্দন
বাসলী	বসিলা
ডাল	জল

বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের বাংলা পদে এ-রকম শতাধিক সংশোধন আছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাদটীকায় বিস্তারিত উল্লেখ আছে। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকগুলি সম্পাদন কালে তিনি এই রীতি অবলম্বন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকগুলি তিনি অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু পাদটীকায় কোথাও উল্লেখ করেন নাই পুঁথির পাঠে যথার্থ কি ছিল। এতকাল সকলে তাই বসন্তরঞ্জন-সংশোধিত সংস্কৃত শ্লোকের পাঠগুলিকে পুঁথির পাঠ হিসাবেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু পুঁথিতে যথার্থ কি পাঠ আছে তাহা কেহ লক্ষ্য করেন নাই। এখানে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়, বসন্তরঞ্জন তাঁহার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের 'পাঠ-বিবৃতি'তে যে-কয়েকটি (অধিকাংশের নয়) সংস্কৃত শ্লোকের মূল পাঠের উল্লেখ করিয়াছিলেন দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সে উল্লেখও পরিহার করেন। ইহার ফল হইল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোকগুলি যে সম্পাদক-কর্তৃক পরিবর্তিত, সম্পাদিত-গ্রন্থ হইতে এ তথ্য জানিবার আর কোনো উপায় থাকিল না।

আমরা এখানে সংস্কৃত শ্লোকগুলির পুঁথির পাঠ যথার্থ কি তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি হইতে উদ্ধার করিয়া বসন্তরঞ্জন সেই স্থলে কি পরিমাণ সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়াছেন দেখাইব :

পুঁথির পাঠ	পবিবর্তিত পাঠ
সরভসন্দেবাঃ—পুঁথি ৩ | পৃ ১, জন্ম	সরভসং দেবাঃ
মধুসূদনং—১১ | ১ তাম্বূল	মধুসূদনম্
রাধানিহতচিত্তস্য—১২ | ১ তা	রাধানিহিতচিত্তস্য
কালক্ষেপসহস্থচি—১৪ | ২ তা	কালক্ষেপাসহঃ শুচি
মথুরাগতিং—১৫ | ১ তা	মথুরাগতিম্
ভয়ভয়াতুরা—২৬ | ১ দান	ভয়ভরাতুরা

জরতী—২৬ | ১ দা	জরতীং
বসৌযেস্মিতে—৩৬ | ১ দা	বশগোঽস্মি তে
ততো বিতত—৩৬ | ১ দা	ততো বিতর
শুধাং—৩৬ | ১ দা	সুধাং
বাধাঞ্জরতি—৩৬ | ২ দা	বাধাং জরতী
প্রাণপুরুষাং—৩৬ | ২ দা	প্রাণপরুষাং
রোষাদোষাধরসব্যংসন—৩৬ | ২ দা	রুষা হ্যস্যা রোষব্যসন
মম কিং—৩৬ | ২ দা	মম কিম্
সুধাসারাধনস্তন—৩৬ | ২ দা	সুধাসারাধারস্তন
প্রণয়িন—৩৭ | ১ দা	প্রণয়িনং
মা কুরু—৩৭ | ১ দা	মাং কুরু
কৃষ্ণঃ—৫৭ | ২ দা	কৃষ্ণ
কৃষ্ণঃ—৬৩ | ১ দা	কৃষ্ণ
অদরস্মস্থচঃ—৬৪ | ১ দা	অথ স্মরস্তচঃ
দুস্বনং—৬৪ | ১ দা	দুঃস্বনং
সর্ব্ববর্ন্ননা—৬৪ | ১ দা	সর্ব্ববর্ণনা
ভয়ং কংশাভিমন্যুভ্যোন্মনুযে—৬৫ | ২ দা	ভয়ং কংসাভিমন্যুভ্যো মন্যসে
কংশ—৬৬ | ২ দা	কংস
চরিতমীদৃশং—৬৭ | ১ দা	চরিতুমীদৃশম্
শম্বরারিশরদূনমানসঃ—৬৯ | ১ দা	সম্বরারিশরদূনমানসঃ
কথঞ্চনঃ—৭১ | ২ নৌকা	কথঞ্চন
বুদ্ধিবিভবন্ময়া—৭১ | ২ নৌ	বুদ্ধিবিভবান্ময়া
দধিতক্রসর্প্পিষাং—৭১ | ২ নৌ	দধিতক্রসর্পিষাং
ন্যবারয়ত—৭১ | ২ নৌ	ন্যবারয়ৎ
কর্ম্ম চঃ—৭১ | ২ নৌ	কর্ম্ম চ
চিরস্যবসতৌ—৭১ | ২ নৌ	চিরাৎ স্ববসতৌ
জরতীঞ্চিরাৎ—৭১ | ২ নৌ	জরতীং চিরাৎ
যমুনানীরপুরস্য—৭৫ | ২ নৌ	যমুনানীরপুরস্য
পুরুন্দরব্যগ্রাৎ—৭৫ | ২ নৌ	পুরুন্দরব্যগ্রা
পুরোভব—৮১ | ২ নৌ	পুরোদ্ভব
বিলোক্য জ রাধা—৮৪ | ২ নৌ	বিলোক্য জরতী রাধা
ততোভিমন্ন্যনা—৮৫ | ২ নৌ	ততোঽভিমন্যুনা
রাধাবশাবেশবশীকৃত—৮৬ | ১ ভার	রাধারসাবেশবশীকৃত
সামগ্রীবচনাযোগচক্রমে—৮৬ | ২ ভা	সামগ্রীরচনায়োপচক্রমে

বচসাভরণাবৃদ্ধে—৯২ | ২ ভা	বচসো ভরণাদ্‌বৃদ্ধে
রুষিতাং—৯৩ | ১ ভা	রুষিতো
রসসাধিকাং—৯৪ | ১ ভা	রসসাধিকাম্‌
পরীহাস—৯৬ | ১ ভা	পরিহাস
কালক্ষেপাসহকৃষ্ণঃ—৯৭ | ২ ভা	কালক্ষেপাসহঃ কৃষ্ণঃ
সলজ্জানয়না—৯৭ | ২ ভা	সলজ্জনয়না
প্রমোদতর—৯৯ | ১ ভা	প্রমোদভর
পুরক্ষার—১০০ | ১ ছত্র	পুরস্কারং
সরভসমর্ত্তি—১১৩ | ২ বৃন্দাবন	সরভসমার্ত্তি
আদিদেশ তরো—১১৪ | ১ বৃ	আদিদেশ ততো
সখিজন—১১৫ | ১ বৃ	সখীজন
অশরীররশাবেশবসাঙ্গীক্ষ্য—১১৭ | ১ বৃ	অশরীররসাবেশবশাঙ্গীক্ষ্য
রশালসঃ—১১৭ | ১ বৃ	রসালসঃ
ক্ষোভি পরং কৃষ্ণ পরস্পরা—১২০ | ১ বৃ	ক্ষোভং পরং কৃষ্ণে পরস্পরম্‌
ন কিঞ্চিন—১২২ | ১ বৃ	ন কিঞ্চন
বিহিত—১২২ | ১ বৃ	বিহিতং
মাহারোষমতী—১২২ | ২ বৃ	মহারোষবতী
রাধিকামাধিবতী—১২২ | ২ বৃ	রাধিকামাধিমতী
ততোবদৎ—১২২ | ২ বৃ	ততোঽবদৎ
মাধব—১২৩ | ২ বৃ	মাধবঃ
কুসুমন্ববামে—১২৫ | ২ বৃ	কুসুমান্ববায়ে
বশাভবাদশাবাশু—১২৭ | ১ বৃ	বশাভবদসাবাশু
কুসুমাসুগসঙ্গতা—১২৭ | ১ বৃ	কুসুমাশুগসঙ্গতা
কালীয়ে হ্রদে—১২৮ | ২ কালীয়দমন	কালিয়ে হ্রদে
সংচিন্ত্য—১৩২ | ২ বস্ত্রহরণ	সঞ্চিন্ত্য
পরুষম্বাচ—১৩৫ | ১ ব	পরুষাং বাচং
বিধুরৌহ—১৩৫ | ১ ব	বিধুরোহ
রাধিকামধিকামর্ষ | ১৩৯ | ১ ব	রাধিকামধিকামর্ষা
পুরস্মরং—১৪০ | ১ ব	পুরঃসরং
সখিবৃতাং রাধাং—১৪২ | ১ ব	সখীবৃতা রাধা
জগামগারমাগারং—১৪২ | ১ ব	জগামাগারমাগারং
অধিরজনীবিরামং—১৪২ | ২ ব	অধিরজনিবিরামং
রামরম্ভারিপুরু—১৪২ | ২ ব	রামরম্ভারিপুরু
মাধবোন্বেষণায়—১৪২ | ২ ব	মাধবান্বেষণায়

যমুনায়া—১৪২ | ২ ব	যমুনায়াঃ
পরীধানংভূষণং[১]—১৪৩ | ২ ব	পরিধানভূষণং
তামেরোপহসন্—১৪৪ | ১ ব	তামেবোপহসন্
সম্পদঃ—১৫২ | ২ হার	সম্পদং
জরতীতস্যাঃ—১৫৪ | ১ বাণ	জরতীং তস্যাঃ
কৃষ্ণোন্নুমতি—১৫৪ | ২ বা	কৃষ্ণোঽনুমতি
মতিং—১৫৫ | ১ বা	মতিম্
জরতিত্বদ্দুদীরিতং—১৫৬ | ২ বা	জরতী ত্বদুদীরিতং
মদ্বচঃ—১৫৬ | ২ বা	মদ্বচঃ
তাং—১৫৭ | ১ বা	তাম্
তাং —১৫৮ | ২ বা	তাম
আলসাঙ্গলতা—১৬৮ | ২ বংশী	অলসাঙ্গলতা
বেদিতুম্বাদকন্তস্যাজ্জগাদ—১৬৯ | ১ বং	বেদিতুং বাদকন্তস্য জগাদ
স্মরজ্বরতুরাতুরা—১৬৯ | ২ বং	স্মরজ্বরভরাতুরা
রূপ—১৭৪ | ১ বং	রূপ
মধুরাভারতীং—১৭৪ | ১ বং	মধুরাং ভারতীং
রাধায়া প্রেরিত—১৭৪ | ১ বং	রাধয়া প্রেরিতা
রাধিকামাধিকাতরাং—১৭৪ | ১ বং	রাধিকামাধিকাতরাম্
রাধা পুরো—১৭৭ | ২ বং	রাধাং পুরো
নিদ্রালু বিদধে—১৭৮ | ১ বং	নিদ্রালুং বিদধে
মন্ত্রৈর্ব্বংশা—১৭৮ | ১ বং	মন্ত্রৈর্বংশা
কৃষ্ণঃ—১৮০ | ১ বং	কৃষ্ণো
পুন—১৮১ | ১ বং	পুনঃ
রাধা—১৮৪ | ১ বং	রাধে
কংশারি—১৮৫ | ১ বং	কংসারি
নিরাসসবনেনাহং রাধায়া—১৮৬ | ২ বং	নিরাশসবনেনাহং রাধয়া
কৃষ্ণগতঃ—১৮৯ | ২ রাধাবিরহ	কৃষ্ণগত
অশরীরশর—১৯৬ | ১ রা	অশরীরশরৈঃ
জননীং—১৯৬ | ২ রা	জনী
রাধামাধব—২০০ | ২ রা	তদামাধব
গন্তুমুচ্যতাং—২০১ | ১ রা	গন্তুমুচ্যতাম্

১. পুঁথিতে লিপিকর প্রথমে 'পরি—' পর্যন্ত লেখেন। তারপরেই স্থির করেন 'রী' হইবে এবং 'পরীধানং' লেখেন। কিন্তু লেখার শেষে পূর্ববর্তী 'f' কারটি কাটিতে ভুলিয়া যান।

চিরাদমধুরাং—২০৫ | ১ রা	চিরাদমধুরং
সখিগণ—২১৪ | ১ রা	সখীগণ
মাধবং—২১৪ | ১ রা	মাধব
স্তুতনস্ত—২১৬ | ২ রা	স্তুতনোস্ত
কদনং—২১৬ | ২ রা	কদনম্
প্রমোদিতঃ—২১৭ | ১ রা	প্রমোদিতা
ক্রমাতঃ—২১৭ | ২ রা	ক্রমাৎ
রাধেক্লষ্ণোচিরাদেত্য—২২৩ | ২ রা	রাধে কৃষ্ণোঽচিরাদেত্য
নাগরোপরমাক্ষরং—২২৫ | ২ রা	নাগরঃ পরমাক্ষরম্

সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'নবতম' সংস্করণ মদনমোহন কুমারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংস্করণের সম্পাদক লিখিয়াছেন, "বসন্তরঞ্জনের জীবদ্দশায় তাঁহার সম্পাদিত চারটি সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া তাঁহার ধৃত পাঠ এবং যেখানে যেখানে পুথির পাঠের সহিত তাঁহার গৃহীত পাঠের বিভিন্নতা আছে বা তিনি পাঠ সংস্কার করিয়াছেন তাহা বর্তমান সংস্করণে যথাসম্ভব উল্লেখ করা হইয়াছে।"

সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় এ-কথা ঘোষণা করিলেও কার্যতঃ তাহা পালিত হয় নাই। আমরা উপরে শতাধিক উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি বসন্তরঞ্জনের ধৃত পাঠ পুঁথির পাঠ নয়। বসন্তরঞ্জনের গৃহীত পাঠ যে পুঁথির পাঠ নয়, তাহা পুঁথির সঙ্গে সতর্কতা সহকারে না মিলাইলে কেমন করিয়া ধরা পড়িবে? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবম সংস্করণের সম্পাদক পুঁথির পাঠ মিলান নাই বলিয়াই মুদ্রিত পাঠ ও পুঁথির পাঠের মধ্যে যে কী পরিমাণ বিভিন্নতা আছে তাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। সমগ্র পুঁথির কথা দূরে থাকুক, নবম সংস্করণে পুঁথির যে-কয়টি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, সেই পৃষ্ঠাগুলির পাঠও মুদ্রিত পাঠের সহিত মিলাইয়া দেখা হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকগুলি লক্ষ্য করিলেই দেখিব পুঁথিচিত্রের পাঠ ও গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ একরূপ নয়, এবং কেন যে পুঁথির পাঠ ও মুদ্রিত পাঠ দুই রকম—তাহার উল্লেখ সমগ্র গ্রন্থমধ্যে কোথাও নাই। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থে মুদ্রিত পুঁথির ৩।১ (জন্ম), ১১।১ (তাম্বুল), ১৫৮।২ (বাণ), ১৬৯।২ (বংশী), ২১৭।২ (রাধাবিরহ) পৃষ্ঠার আলোকচিত্র লক্ষণীয়। পুঁথির ৩।১ পৃষ্ঠার আলোকচিত্রের দ্বিতীয় ছত্রে আছে 'সরভসন্দেবাঃ', গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ 'সরভসংদেবাঃ'। পুঁথিচিত্র ১১।১, ছত্র ৮ : পুঁথিপাঠ 'মধুস্দনং' > মুদ্রিত পাঠ 'মধুস্দনম্'। পুঁথিচিত্র ১৫৮।২, ছত্র ১ : 'তাং' > 'তাম্'। পুঁথিচিত্র ১৬৯।২, ছত্র ৭ : 'স্মরজ্বরতুরাতুরা' > 'স্মরজ্বরভরাতুরা'। পুঁথিচিত্র ২১৭।২, ছত্র ৬ : ক্রমাতঃ > ক্রমাৎ।

রাগরাগিণী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট ৩২টি রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। যথা: আহের, কফু, কহু, কহুগুজ্জরী, কেদার, কোড়া, কোড়াদেশাগ, গুজ্জরী, দেশবরাড়ী, দেশাগ, ধান্নুষী, পটমঞ্জরী, পাহাড়ীআ, বঙ্গাল, বঙ্গালবরাড়ী, বরাড়ী বসন্ত, বিভাষ, বিভাসকহু, বেলাবলী, ভাটিয়ালী, ভৈরবী, মল্লার, মালব, মালবশ্রী, মাহারঠা, রামগিরী, ললিত, শৌরী, শ্রী, শ্রীরামগিরী, সিন্ধোড়া। গ্রন্থে পাহাড়ীআ রাগযুক্ত পদের সংখ্যা সর্বাধিক—৫৭। তাহার পরেই রামগিরী ৫৪, গুজ্জরী ৩৯, কোড়া ৩৪, ধান্নুষী ৩২, দেশাগ ২৯, মালব ১৮, ভাটিয়ালী ১৭, মল্লার ১৪, দেশবরাড়ী ১৩, বেলাবলী ১১, আহের ১০, ভৈরবী ৮, শৌরী ৭, শ্রী ৭, কহু ৭, কেদার ৬, বসন্ত ৬, বিভাষ ৬, কহু গুজ্জরী ৫, ললিত ৫, বরাড়ী ৪, মালবশ্রী ৪, মাহারঠা ৪, কোড়াদেশাগ ৩। অবশিষ্ট রাগরাগিণীর প্রত্যেকটির একটি করিয়া পদ আছে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দে নিম্নলিখিত রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে: কর্ণাট, গুর্জ্জরী, গোণ্ডকিরী, দেশবরাড়ী, দেশাগ, বরাড়ী, বসন্ত, বিভাষ, ভৈরবী, মালব, রামকিরী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্ণাট ও গোণ্ডকিরী ব্যতীত গীতগোবিন্দের অপর সকল রাগিণীর উল্লেখ আছে। গীতগোবিন্দের রামকিরী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত রামগিরী সম্ভবতঃ একই রাগ।

চর্যাগীতিকায় নিম্নলিখিত রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে: অরু, কহ্নু গুঞ্জরী, কামোদ, গউড়া, গবড়া, গুঞ্জরী, গুর্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ধনসী, পটমঞ্জরী, বঙ্গাল, বরাড়ী, বলাড্ডী, ভৈরবী, মল্লারী, মালশী, মালসীগবড়া, রামক্রী, শবরী। চর্যাপদের অন্তর্গত গুর্জরী, পটমঞ্জরী, বঙ্গাল, বরাড়ী, ভৈরবী ইত্যাদি রাগের নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও পাই। চর্যায় কহ্নু গুঞ্জরী সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কহুগুজ্জরী। এই রকম আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে:

চ. দেশাখ > কৃ. দেশাগ
চ. ধনসী > কৃ. ধান্নুষী
চ. রামক্রী > কৃ. রামগিরী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে সকল রাগরাগিণী এবং সুর ও তালের উল্লেখ আছে তাহার কিছু কিছু প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়: এই প্রসঙ্গে আহের (আভীর) কফু বা কহু (ককুভ), রামগিরী (রামক্রি), ধান্নুষী (ধনাশ্রী), দেশাগ (দেশাখ্য) ইত্যাদি রাগের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে অধিকাংশ নামের মধ্যেই কোনও দেশীয় বা স্থানীয় রীতির পরিচয় আছে বলিয়া মনে করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ৭টি পদের মাথায় শৌরীরাগের নামোল্লেখ আছে। গৌরী রাগের উল্লেখ কোথাও নাই। বসন্তরঞ্জন তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থে সর্বত্রই শৌরী কাটিয়া গৌরী করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "পুথিতে শৌরীরাগ"।

পুঁথিতে সর্বত্র শৌরীরাগ দেখিয়া একটি প্রশ্ন মনে জাগে। চর্যায় আছে শবরীরাগ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শৌরী কি চর্যার শবরী হইতে আসিয়াছে? এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সত্যব্রত দে। ধ্বনিতত্ত্বের বিচারে শবরী হইতে শৌরী আসা সম্ভব বলিয়া মনে করি।

অলঙ্কার ও ধ্বনি

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যমধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস অনেক অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু সেখানে অলঙ্কার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্যোচিত ধ্বনিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কবি অযথা অলঙ্কারভারে কাব্যভাষাকে পীড়িত করেন নাই। তাঁহার অলঙ্কার অনাড়ম্বর, সহজ সুন্দর ও মাধুর্যবোধের পরিচায়ক এবং ঐগুলি জীবনসমুদ্র মন্থন করিয়াই সংগৃহীত। অবশ্য তিনি অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। সে সব ক্ষেত্রে বর্ণনা কতকটা গতানুগতিক হইয়াছে। তথাপি তাঁহার মৌলিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অলঙ্কার ও চিত্রকল্পগুলি গ্রহণ করিয়া কাব্যে প্রয়োগ করিবার সময় বড়ু চণ্ডীদাস উহাকে এমন ভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উহারা স্বাঙ্গীকরণের (assimilation) পর্যায়ে পড়ে।

মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে
ঝরে তার পাণী নয়নে গো।।

মেঘের বর্ণনার সঙ্গে অশ্রুবর্ষণের সাদৃশ্যের সংশয়বশতঃ যে বাচ্য-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ এখানে দেখিতে পাওয়া যায় সেই সাদৃশ্যের পরিকল্পনা যে সংস্কৃত সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ তাহা নয়। তথাপি কবি ইহার মধ্যে আষাঢ় শ্রাবণ মাসের ঘন কৃষ্ণ মেঘের ছায়ায় রাধিকার সজল আর্দ্র নয়ন যে অঙ্কন করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। এখানেই বড়ু চণ্ডীদাসের বিশিষ্টতা।

অলঙ্কার যে কাব্যশোভাবর্ধনকারী (কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলঙ্কারং প্রচক্ষ্যতে—দণ্ডী, কাব্যাদর্শ) তাহা তিনি জানিতেন। আচার্য বামন বলিয়াছেন, সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ এবং কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ। সৌন্দর্যই হইল অলঙ্কার এবং অলঙ্কারই হইল কাব্যের প্রাণ। অলঙ্কারিকগণ বলেন, কেয়ূর কঙ্কনাদি অলঙ্কার যেমন রমণীদেহের সৌন্দর্য বর্ধন করিয়া থাকে তেমনি অনুপ্রাস যমক ইত্যাদি অলঙ্কার কাব্যদেহের সৌন্দর্য বর্ধন করিতে পারে। সৌন্দর্যবস্তু স্বভাবগত—ইহা আরোপিত নয়। কোনো শ্রীহীন বস্তুর উপর যদি কতকগুলি সুদর্শন অলঙ্কার আরোপ করা যায় তবে ঐ শ্রীহীন বস্তুটা নিশ্চয়ই শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিবে না। প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কারের সম্যক বিন্যাস স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বর্ধন করিয়া থাকে। কাব্য প্রসঙ্গেও এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয়।

আলঙ্কারিকদের মতে কাব্যের শ্রেষ্ঠ আবেদন ধ্বনিব্যঞ্জনা। যেখানে শব্দ ও অর্থ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে তাহাকে ধ্বনি বলে। এই

ধ্বনি অলঙ্কারের সহায়তায় পরিস্ফুট হয়।

রাধার রূপবর্ণনায় কবি বলিয়াছেন :

শিরীষকুসুম কোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী॥

এই উদ্ধৃতির মধ্যে কোঁঅলী ও অদভুত সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। সৌন্দর্যের কোমলতা শিরীষ কুসুমের মাধ্যমে, এবং কনকপুতলী—এই চিত্রকল্পের সহায়তায় সৌন্দর্যের কাঠিন্য প্রকাশিত হইয়াছে। একই রাধার চরিত্রের উপরে এই উভয় অভিধা প্রযুক্ত হওয়ায় চরিত্রটির কোমল-কঠোর সৌন্দর্যের পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ফলে চরিত্রটির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে সেই দ্বন্দ্বটি নাটকীয় চরিত্রের পক্ষে খুবই উপযোগী। এই সাদৃশ্যবাচক অলঙ্কারের সাহায্যে কবি কেবল নায়িকার রূপ বর্ণনাই করেন নাই, তাহার চরিত্রের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে আলোকসম্পাত করিয়াছেন।

বংশীখণ্ডের অন্তর্গত 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে' পদটির সমাসোক্তি অলঙ্কার রহিয়াছে। খণ্ড বিখণ্ড শব্দ প্রয়োগে রাধাবিরহের আর্তি প্রকাশিত। 'আ' ধ্বনির প্রাচুর্যে সেই বেদনার গভীরতা ও ব্যাপকতা লক্ষণীয় পরিবেশে বলা হইয়াছে :

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

চরণ দুইটিতে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা প্রযুক্ত হইয়াছে। এই পদটিতে 'আ' ধ্বনির প্রাচুর্য যে বিস্তৃতি ও গভীরতাব্যঞ্জক তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোকে।

প্রসঙ্গক্রমে উপরে উদ্ধৃত পদের 'আউলাইলোঁ' শব্দটি আলোচনা করা যাইতে পারে। কেবল 'আ' ধ্বনির প্রাচুর্য নয়, ইহার অধিক কিছু। ভাষাতত্ত্বের বিচারে 'আউলাইলোঁ' শব্দটির মূলে রহিয়াছে 'আকুলায়িত', মতান্তরে 'আলুলায়িত'; অর্থাৎ শ্রীরাধার হৃদয়ের আকুলতা এবং বিরহক্লিষ্ট চিত্তের শিথিল আলুলায়িত বা অবিন্যস্ত ভঙ্গীটি এই শব্দের মাধ্যমে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রীতিবিচারে চণ্ডীদাস বৈদর্ভী রীতির কবি। গৌড়জন হইয়াও তিনি গৌড় রীতি বর্জন করিয়াছেন—কাব্যের প্রসাদগুণ রক্ষার জন্যে। 'কোপে গরজিলী রাধা যেহ্ন কাল সাপ' পদটির মধ্যে তেজস্বী রাধার আক্রমণোদ্যত ভঙ্গীটি যেন চিত্রসম হইয়া উঠিয়াছে।

বড়ুর কাব্যে উৎপ্রেক্ষা প্রশংসনীয়ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে :

মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।

কিংবা,

নন্দের নন্দন কাহ্ন আঢ় বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুয়া॥

ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের আভাস পাওয়া যায় :

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী॥

ইহা ছাড়া ড্রামাটিক আইরনির পরিচয়ও বড়ুর কাব্যে পাওয়া যায়। একদা রাধা যমুনাখণ্ডে বলিয়াছিল :

বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।
আহ্মে পাণি তুলি তোহ্মাত কী॥

কিন্তু বিরহ পর্যায়ে সেই রাধার কণ্ঠেই ধ্বনিত হইয়া উঠে :

বড়ার বৌহারী আহ্মি বড়ার ঝী।
কাহ্নু বিণি মোর রূপ যৌবনে কী॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অলঙ্কারের অভাব নাই :

কে বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশীতল।
আহ্মার মনত ভাএ যেহেন গরল॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।
ঘাঅত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান॥

এখানেও দেখি অলঙ্কার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্যোচিত ধ্বনিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বাচ্যার্থটি ব্যঙ্গার্থের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছে। কৃষ্ণবিরহে কাতরা রাধার অন্তরে আজ সকলই শূন্য। যে চাঁদ ও চন্দন অতি সুশীতল বলিয়া পরিচিত, বিরহকাতরা রাধার দগ্ধপ্রাণ আজ তাহাতেও শীতল হইতেছে না। বরং দুঃখের জ্বালা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। নবকিশলয়শয্যা তাহার নিকট আগুনের মত বোধ হইতেছে। এই পীড়িত হৃদয় বাঁশির স্বর শুনিয়া আরও দগ্ধ হইতেছে। প্রিয়াবিরহে বিরহিণীর হৃদয় যে কিরূপ ব্যথিত হয় কবি তাহা নিপুণ কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া আরও একটি পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে :

কাহ্নু বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥

একটি উপমার সাহায্যে পদটি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। বিষযুক্ত তীর যেমন হরিণের হৃদয়কে দগ্ধ করে তেমনি কৃষ্ণের বিরহে রাধার হৃদয় সর্বদা পুড়িয়া যাইতেছে। এখানে 'হরিণী' হইল রাধা ও 'বিষাইল কাণ্ড' হইল মদনের বাণ। অর্থাৎ প্রেমের জ্বালা রাধার অন্তরকে যে কিভাবে দগ্ধ করিতেছে এই সুন্দর উপমার সাহায্যে কবি তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন।

কাব্যের ভূখণ্ডচিত্র

বর্তমান অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের একটি ভূখণ্ডচিত্র উদ্ধারের চেষ্টা করা গেল
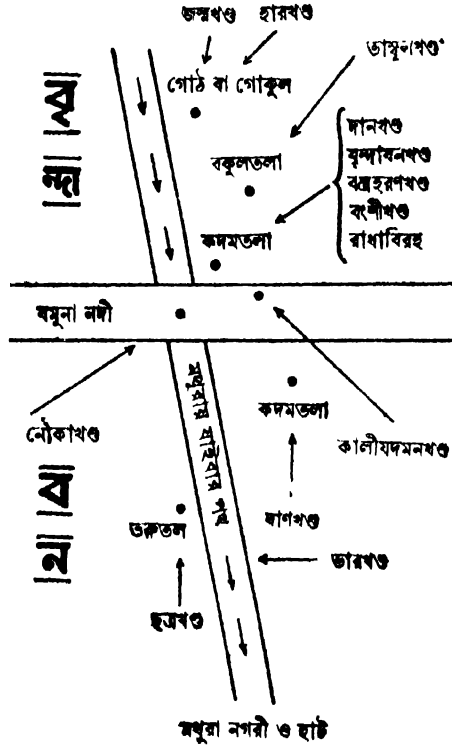
এই কাব্যের মূল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে 'বৃন্দাবন' ও 'মথুরা নগরে'। যদিও কাহিনীর যথার্থ সূচনা তাম্বুলখণ্ড হইতে, তথাপি জন্মখণ্ডের শেষ সংস্কৃত শ্লোকটি এ ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য নয়। উক্ত শ্লোকেই বড়াই ও রাধার মথুরা যাইবার প্রসঙ্গ প্রথম দেখিতে পাই :

রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ ॥

বড়াই বলিতেছে—হে রাধা, হৃষ্টমনে আমার সহিত মথুরায় চল। এবং

তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে ॥

রাধার উক্তি—হে বড়াই, মধুর ব্যবহার সুনিপুণা, অতএব চল মথুরায় যাই।

এখন প্রথম প্রশ্ন, রাধা বা বড়াইয়ের আবাসস্থল কোথায়। স্বয়ং কৃষ্ণই রাধিকাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছে :

কথাঁ না বসসি কথা তোর ঘর
জাইবেঁ কোমণ দেশে ॥ ল রাধা ॥

এই প্রশ্নের জবাবে রাধার উত্তর :

গোকুলে থাকোঁ মো গোআল জাতী

এবং

ষোল শত গোপী পসার সাজিআঁ
মথুরা জাওঁ মো বিকে ॥

বড়াইয়ের উক্তি হইতে জানা যায় বড়াইয়ের নিবাসও সেই গোকুলেই :

গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'গোঠ' গোকুলেরই নামান্তর। উদাহরণ স্বরূপ বংশীখণ্ডের অন্তর্গত 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে' ছত্রটি উদ্ধৃত করা যায়।

শুধু রাধিকা কিংবা বড়াই নয়, কৃষ্ণের বাসস্থানও ওই গোকুলে :

থাকোঁ মো গোকুলে নান্দোযশোদার ঘরে।

তাম্বূলখণ্ডের প্রথমেই বলা হইয়াছে একদিন 'বনপথে মথুরা নগরী' যাইবার কালে

বকুলতলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী ॥

অপর দিকে

রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে

এবং

কথো দূর পথগিআঁ দেখিল বড়ায়ি।
বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই ॥

এই 'বৃন্দাবন মাঝে' বা 'মাঝ বৃন্দাবনে' বড়াইয়ের সহিত রাখাল বালক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণের নিকট বড়াই রাধার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ বলে :

বকুলতলাত আছে সে সুন্দরী সতী ॥

অতঃপর বড়াই

মনে ধরি কাহ্নাঞিঁর বচনে।
চলি গেল রাধিকার থানে ॥

... ...

চারি পাশে চাহী বৃন্দাবনে।
পাইল রাধার দরশনে ॥

অর্থাৎ বৃন্দাবনের বকুলতলা অঞ্চলে বড়াই পুনরায় রাধার সন্ধান পাইল।

এই বকুলতলার কথা কাব্যের শেষের দিকে রাধাবিরহ অংশেও পাই। সেখানে কৃষ্ণকে সন্ধান করিবার প্রসঙ্গে রাধা বড়াইকে বলে :

চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার তীতে।
বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে ॥

এবং বড়াই কৃষ্ণের সন্ধান করিতে করিতে

পুন গেলী বকুলের তলে ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সুবৃহৎ কাব্য, কবি হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসের অন্যতম কৃতিত্ব—এত বড় একটি কাব্যের স্থানপটভূমি রচনায় তিনি কোথাও অসতর্কতা বা অসঙ্গতির পরিচয় দেন নাই। সমগ্র কাব্যটি পাঠ করিলে বৃন্দাবন ও মথুরার এক ত্রুটিহীন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডচিত্র আমাদের নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, এই ভূখণ্ডচিত্র যথার্থই তৎকালীন ব্রজমণ্ডলের ভৌগোলিক চিত্র কিনা তাহা আমাদের বিচার্য নয়। 'The Geographical Dictionary of Ancient And Mediæval India' গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "The identification of modern Brindaban with the Brindaban of the Puranas is extremely doubtful." কারণ বিভিন্ন পুরাণেই বৃন্দাবনকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি-কল্পিত ব্রজভূমির ভৌগোলিক চিত্রটির প্রতিই বর্তমানে আমাদের আকর্ষণ। এই ভূখণ্ডের চিত্র রচনায় বড়ু চণ্ডীদাস কোনো অসঙ্গতির পরিচয় দিয়াছেন কিনা তাহা আমাদের বিচার্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছত্রখণ্ড পর্যন্ত ভূখণ্ডের অবস্থান একরকম এবং ছত্রখণ্ড-পরবর্তী ভূখণ্ডের অবস্থানটি অন্যবিধ বলিয়া তারাপদ মুখোপাধ্যায় মনে করেন (বিশ্বভারতী পত্রিকা—১৩৬৮)। আমরা এ-বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করি। বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে বিচার আবশ্যক।

আমাদের সিদ্ধান্তে সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভূখণ্ডচিত্র একটিই—এ প্রসঙ্গে বর্তমান অধ্যায়ের সূচনায় মুদ্রিত মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৃন্দাবন একটি বৃহৎ বনস্থলী। এই বৃন্দাবনের মধ্য দিয়া যমুনা নদী প্রবাহিত। গোকুল হইতে মথুরা নগরে যাইতে হইলে যমুনা নদী অতিক্রম করিয়া ওপারে পৌঁছাইতে হয়। যমুনার দুই পারে দুই ঘাট। উভয় ঘাটের নামই 'যমুনা ঘাট'। যমুনার ঘাটকে যমুনার 'তীর' বা যমুনার 'কূল'ও বলা হইয়াছে। গোকুল প্রান্তের যমুনা তীরে 'কদম্বতল' বা 'কদমতলা' আছে। কাব্যের অধিকাংশ ঘটনা নদীর এপারে এই কদমতলায় সংগঠিত হইয়াছে। তবে মথুরা প্রান্তের যমুনা তীরেও কদমতলার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার হৃদয়ে বাণনিক্ষেপণের ঘটনাটি বৃন্দাবনের ওপারের অর্থাৎ মথুরাপারের কদমতলে ঘটিয়াছে। বৃন্দাবনের ওপারের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিলে তবে মথুরা নগরে বা মথুরা হাটে পৌঁছান যায়। রাধা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

নিতি জাএ সর্বাঙ্গসুন্দরী
বনপথে মথুরা নগরী ॥

অর্থাৎ রাধাকে প্রতিদিনে পথ-পরিক্রমা কম করিতে হয় না। প্রথমে গোকুল হইতে যমুনা। তাহার পর যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনের সুদীর্ঘ বনপথ অতিক্রম করিয়া মথুরায়,

এবং একই পথে মথুরার হাট হইতে পুনরায় গোকুল।

নৌকাখণ্ডে রাধার একটি উক্তি :

ও কুলে মথুরা মাঝে যমুনার নদী।
ও আরিতেঁ পার হঞাঁ বিকণিবোঁ দধী ॥

এই পদ অবলম্বনে তারাপদ মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "যমুনার এক পারে গোকুল বৃন্দাবন, অপর পারে মথুরা।" তাঁহার বক্তব্য, "ছত্রখণ্ড পর্যন্ত কবি যে ভূখণ্ড রচনা করেছেন তার অবস্থান এক রকম, ছত্রখণ্ডপরবর্তী ভূখণ্ডের অবস্থান ভিন্ন রকম।" লেখক বলিতেছেন, "এইটুকু শুধু লক্ষণীয় যে প্রথম মানচিত্রে [ছত্রখণ্ড পর্যন্ত] মথুরার অবস্থান বৃন্দাবন পেরিয়ে নয়। কাহিনীর প্রথম স্তরে [ছত্রখণ্ড পর্যন্ত] যমুনা পেরিয়ে রাধা মথুরার হাটে আসে, দ্বিতীয় স্তরে [ছত্রখণ্ড পরবর্তী] যমুনা পেরিয়ে রাধা বৃন্দাবনে আসে।"

রাধা বলিয়াছে—'ও কুলে মথুরা মাঝে যমুনার নদী।' ইহার অর্থ কখনই এই নয় যে ওপারে যমুনা সংলগ্ন তীরটিই মথুরা। মূল ভাবটি হইল, মথুরায় যাইতে হইলে যমুনার ওপারে পৌছিতে হইবে। যদি রাধা মথুরায় দাঁড়াইয়া বলে—ও কূলে গোকুল মাঝে যমুনার নদী—তাহা হইলে কি এই অর্থ বুঝাইবে যে যমুনার অপর পারে বৃন্দাবন বলিয়া কোনো ভূখণ্ডই নাই, এবং গোকুল যমুনার নিতান্ত তীর সংলগ্ন একটি অঞ্চল! তা যদি না বুঝায়, তাহা হইলে 'ও কুলে মথুরা' বলিলে এ কথা কখনই অর্থ করা যায় না যে যমুনার ও প্রান্তের তীরলগ্ন ভূখণ্ডটিই মথুরা। তাহা ছাড়া ছত্রখণ্ডপূর্ববর্তী ভারখণ্ডেই তো স্পষ্ট বলা হইয়াছে :

হরিষেঁ পাইল রাধা যমুনার পার।
আতি বড় শ্রম পাআঁ নাম্বায়িল পসার ॥
সাবধানে স্থন বড়ায়ি বচন আহ্মার।
বহিতেঁ না পারোঁ এহা গরুঅ পসার ॥
শরতে সমএ রৌদ সহিতেঁ না পারী।
এভোঁ বড় দূর আছে মথুরা নগরী ॥
এক মজুরিআ আন বহু দধিভার।
দুই ভাগ করি লউ আহ্মার পসার ॥
তবেঁসি চলিতেঁ পারোঁ মথুরা নগর।

অর্থাৎ যমুনার পার হইতে মথুরা নগরী পৌছাইতে এখনও অনেক পথ। তাই 'মজুরিআ'র প্রয়োজন, নতুবা এই সুদীর্ঘ পথ রাধা কিভাবে একা ভার বহন করিবে?

সুতরাং আমাদের বক্তব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছত্রখণ্ডের পূর্ববর্তী যে ভূখণ্ড চিত্র পাই তাহার সহিত ছত্রখণ্ড পরবর্তী ভূখণ্ডচিত্রের কোনো গড়মিল বা অসঙ্গতি নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের স্থান নির্দেশের দিকে তাকাইয়া একখানি মাত্র ভূখণ্ডচিত্রই রচনা করা সম্ভব—দুইখানি নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মথুরা, মথুরা নগর বা নগরী, কিংবা মথুরা হাট ইত্যাদির উল্লেখ পুনঃ পুনঃ থাকিলেও মথুরা নগর এই কাব্যের কোনো অংশেই পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। বৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মুখ্য পটভূমি। এই ভূমণ্ডলকে অবলম্বন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীটি সংঘঠিত হইয়াছে। প্রদত্ত মানচিত্রটি অনুসরণে আমরা এখন দেখিতে চেষ্টা করিব কাব্যের বিভিন্ন খণ্ডের ঘটনাগুলি ভূখণ্ডের কোন্ কোন্ স্থলে গড়িয়া উঠিয়াছে।

তাম্বুলখণ্ডেই কৃষ্ণ বড়াইকে বলিয়াছে :

কদমের তলে বসী যমুনার তীরে
দান ছলেঁ রাখিবোঁ রাধারে।

এবং

তোর আনুমতী লআঁ বলে রাধাক ধরিআঁ
লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে॥

এখন প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'মাঝ বৃন্দাবন' কি বিশেষ স্থান-নাম, নাকি বৃন্দাবনের গভীরে কোনো নিভৃততর অঞ্চল? আমাদের মনে হয় 'মাঝ বৃন্দাবন' কোনো বিশেষ স্থান-নাম নয়, বনের মধ্য অঞ্চল বা গভীরাঞ্চলকেই সম্ভবতঃ মাঝ বৃন্দাবন বলা হইয়াছে। কারণ 'মাঝ বৃন্দাবন' ও 'বৃন্দাবন মাঝ'---দুই প্রকার ব্যবহারই কাব্যে আছে। যেমন

তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ বৃন্দাবনে।
কেলি করি সেহি গোপীগণে॥
ষোলহ সহস্র গোপী লয়িআঁ।
বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ॥

তবে লক্ষণীয়, 'বৃন্দাবন মাঝ' অপেক্ষা 'মাঝ বৃন্দাবন' কথাটির ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশি। নৌকাখণ্ডে যমুনার মধ্যে বুঝাইতে 'মাঝ যমুনা'র ব্যবহার আছে একাধিকবার। এখানে 'মাঝ যমুনা'র অর্থে নদীর বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট অংশকে নির্দেশ করিতেছে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যমুনার তীরে কদম্বের তলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অধিকাংশ ঘটনা ঘটিয়াছে। দানখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে বলে :

কদমতলের থিতী তোর মোর হৈব রতী
এহা ভালেঁ জাণে দেবলোকে।

কিংবা

কদম তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ
নাকে মুখে বাঁশী বাএ।
দধি খাএ কাহ্নাঞিঁ আর ভাণ্ড ভাঁগে
বলে আলিঙ্গন চাহে॥
নাকড়ি তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ
বলে কাঢ়ী খাএ খীরে।

মনে হয় কদমতলার গায়েই 'নাকড়িতলা'। কদমতলায় বসিয়া কৃষ্ণ ভাণ্ড' ভাঙে ও দধি খায় এবং নাকড়িতলায় বসিয়া ক্ষীর খায়।

কৃষ্ণ কদমতলায় বসিয়া শুধু দধি দুধ সেবন করে তাহাই নয়—

বসি থাকে কদমের তলে।
বল করে দাণের ছলে॥

তাম্বুলখণ্ডে কৃষ্ণ বড়াইকে বলিয়াছিল—তোমার অনুমতি লইয়া রাধাকে সবলে 'মাঝ বৃন্দাবনে' লইয়া যাইব। এবং দানখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক পর্যুদস্ত হইয়া রাধা বড়াইকে বলিয়াছে :

কাহ্নাঞি বুইল মোরে অনেক বিরূপ।
তোর থানে আকপট কহিলোঁ সরূপ॥
তোহ্মে আহ্মা এড়ি বড়াযি মাঝ বৃন্দাবনে।
কোণ কাজেঁ কথাঁ ছিলা তাক কে বা জাণে॥

অর্থাৎ বোঝা যাইতেছে 'মাঝ বৃন্দাবনে' কৃষ্ণ রাধাকে 'অনেক বিরূপ' কথা বলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠক মাত্রেই জানেন কৃষ্ণ কেবল বচনবাগীশ মাত্র নয়, তাহার ক্রিয়াকর্মও নিতান্ত অনাগরিক। রাধা যে স্থানকে মাঝ বৃন্দাবন বলিয়াছে, কবি সেই স্থানটি 'মাঝ বন' বলিতেছেন :

বড়ায়ি বড়ায়ি বুলি অঝর নয়নে।
কান্দএ একসরী রাধা মাঝ বনে॥

একই পদে উক্ত 'মাঝ বন'কে কৃষ্ণ 'ঘোর বন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।—

লোহ মুছিআ কাহ্ন আপণ বসনে।
না করিহ ভয় রাধা বুলিল বচনে॥
এবেঁ দেখ মোর মুখ তুলী তুয়ি আখী।
এহা ঘোর বনে রাধা কেহো নাহিঁ সাখী॥

নৌকাখণ্ডের মুখ্য ঘটনা যমুনা নদীর মধ্যে ঘটিয়াছে। এই খণ্ডের প্রথমাংশে

রাধার বচনে কাহ্নাঞিঁ হরষিত মনে।
ঝাঁট পার করায়িল সব সখিগণে॥

অতঃপর কৃষ্ণ বড়াইকেও নৌকাযোগে নদী পার করাইয়া দিল। শেষে বাকি রহিল রাধা। তাহাকে নৌকায় তুলিয়া কৃষ্ণ বলে :

যমুনানীরপুরস্য তরৌ স্তবনিরীক্ষণাৎ।
রাধে পুরুদরব্যগ্রাৎ ভব মা কুরু মে বচঃ॥

অর্থাৎ যমুনার জলপ্রবাহ নৌকায় ভর করিয়াছে। হে রাধা, ভয়ে অধীর হইও না, আমার কথা শোনো।

এই ঘটনার পরবর্তী দৃশ্যে দেখি :

যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ।
হে হে লহে।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ॥
হে হে লহে লহে॥

ইহার পর রাধার উক্তি :

যে কর সে কর তুহ্মিঁ
মোরে জলের ভিতর।
হোর সব সখিজন
দেখে তাক মোর ডর॥
কিবা সুখ পাইলেঁ তোহ্মে
এহা জলের ভিতর॥

ভারখণ্ডের মূল ঘটনা যমুনা অতিক্রমের পর যমুনার ঘাট হইতে মথুরায় যাইবার এই সুদীর্ঘ পথটিতে ঘটিয়াছে।

আগেঁ আগেঁ বড়ায়ি জাউ মাঝেঁ জায় রাহী।
পাছেঁ ভার লআঁ জাউ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ॥

অবশেষে দীর্ঘ পথ ভার বহন করিয়া

মথুরা নিকটে নাম্বায়িআঁ দধিভার।
কাহ্নাঞিঁ রুইল চাহী বদন রাধার॥
ভার বহিল এবেঁ দেহ আলিঙ্গন।

এই খণ্ডের শেষ পদে আছে :

হাটে নাম্বাইল দধিভার।
বিকী ভৈল সকল পসার॥
রাধার বুঝী গোকুলগতী।
কৃষ্ণ ভৈলা বেআকুলমতী॥
সুন ভার পেলাইআঁ হাটে।
রাধা সঙ্গে জাএ বাটে বাটে॥
রতী আশেঁ না ছাড়এ পাশে।

এবং ছত্রখণ্ডের প্রথম পদে আছে :

হরষিত মনে জাএ চন্দ্রাবলী ঘর।
কাহ্নাঞিঁকে বিড়ম্বিআঁ মথুরা নগর॥
শরতের রৌদ্রে রাধা বড়য়ি বিকলী।
বাটে এক তরুতলে থাণিএক বসিলী॥

দেখিল কোপিল কাহ্নাঞিঁ রহিলছে পাশে

কৃষ্ণকে বড়াই অনুনয় করিয়া বলিল :

ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে।
কথো দূর গেলেঁ রতি পাইবেঁ জগন্নাথে ॥
রৌদেঁ বিকলী রাধা চলিতেঁ না পারে।
এখনে করিতেঁ যোগ্য তার উপকারে ॥
ছাতী ধরিআঁ তার তোষিআঁ মনে।
আপণার সুখেঁ তাক নেহ কুঞ্জবনে ॥

বৃন্দাবনখণ্ডের ঘটনা গোকুলপারের বৃন্দাবনে অর্থাৎ যমুনানদীর এপারে সংঘটিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের মধ্যে কৃষ্ণ রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলে :

রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে।
আজি সে সফল হউ জীবন যৌবনে ॥
... ...
এহা বনে আদভুত আছে থানে থানে।
আহ্মা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জাণে ॥
তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আনুমতী।
তথাঁক না লইহ লোক কেহো সংহতী ॥
সকল শরীর মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার।
তেহ্ন সব বন মাঝেঁ এ বন আহ্মার ॥
এহাত উচিত হএ তোহ্মার বিলাস।

কালীয়দমনখণ্ডের প্রথম পদে বলা হইয়াছে :

বৃন্দাবন মাঝেঁ যমুনা নদী বহে।
তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহে ॥

এই কালীদহের জল নির্মল করিয়া তাহাতে কৃষ্ণের জলকেলি করিবার ইচ্ছা—

হেন মনে চিন্তি গেলা দেব দামোদর।
কালীয়দহের কূল কদমের তল ॥
কদম্বতরুত চড়ী দহে দিল ঝাঁপ।

অর্থাৎ যমুনা নদীর মধ্যে এই কালীদহটি কদম্বতরুর গায়েই অবস্থিত। কিন্তু এই কদম্বতরু বলিতে কোন্ পারের কদমতরুর নির্দেশ করা হইতেছে? গোকুলপারের না মথুরাপারের? স্পষ্টতঃই গোকুলপারের। কারণ কবির বিবৃতিতেই পাই, গোপযুবতীরা বৃন্দাবনের পথ দিয়া মথুরায় দধি-দুধ বিক্রয়ে চলিয়াছিল, এমন সময় যমুনার কূলে তাহারা কিছু রাখাল বালককে বিহ্বল অবস্থায় দেখিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল কৃষ্ণ কালীদহে ঝাঁপ দিয়াছে।

হেনই সম্ভেদে সব গোপযুবতী।
বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী ॥

বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখোআলগণে।
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে।
সব গোপ রাখোআল গোপীগণ থানে।
বুইল কালীদহে ঝাঁপ দিল দেব কাহ্নে॥

গোঠগোকুল হইতে কৃষ্ণ যমুনা নদীর ওপারে গিয়া গোরু চড়াইয়া থাকে—এমন উল্লেখ কাব্যে নাই। সুতরাং কদম্বতরু বলিতে গোকুল প্রান্তের কদমতরুকে গ্রহণ করাই বেশি সঙ্গত।

কালীদহ যে গোকুল প্রান্তেই অবস্থিত তাহার সমর্থন পাই কালীয়দমনখণ্ডের ঠিক পরবর্তী খণ্ডেই—বস্ত্রহরণখণ্ডে। প্রথম পদটিতে বলা হইয়াছে

যাই যমুনার পাণিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে॥

রাধার এই কথার পর কবি বলিতেছেন—এইরূপ বলিয়া রাধা কলস হস্তে লইয়া গজগতি-ছন্দে যাত্রা করিল।

এখন প্রশ্ন, রাধা কোথা হইতে কলস হস্তে যাত্রা করিল? স্বভাবতই গোকুল হইতে। অতঃপর

পাইল রাধা কালীদহ কূল
লইআঁ সখি সমাজে।
ঘাটত ভেটিল নান্দের পো
কাজ না বুঝিল লাজে॥
হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপ নারীগণ
লাগিলা যমুনাতীরে।
কাহ্নাঞিঁর মুখ কমল দেখিআঁ
কেহো না ভরিল নীরে॥

অর্থাৎ বস্ত্রহরণখণ্ডের সমস্ত ঘটনাই ঘটিয়াছে গোকুলপ্রান্তের যমুনাতীরে। রাধা বা তাহার সখীদের যমুনা নদী পার হইবার কোনো সংবাদ বর্তমান খণ্ডে নাই।

পরবর্তী হারখণ্ডের অধিকাংশ পদই পাওয়া যায় নাই। হারখণ্ডেই ১৪৫ হইতে ১৫১ সংখ্যক পুঁথির পাতা নাই। যতটুকু অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা গোকুল ধামের পটভূমিতে রচিত বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণ কর্তৃক হার অপহরণের কথা রাধা যশোদার গৃহে আসিয়া নালিশ করিয়া বলে। যশোদার প্রতি রাধার উক্তি :

তেকারণে আয়িলোঁ তোহ্মার থানে॥

রাধার সকল কথা শুনিয়া যশোদা কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিয়া বলে :

গোকুল নগরমাঝেঁ বসোঁ চিরকাল।
আহ্মা ভাল করী জাণে সকল গোআল॥

ভাল পুত্র হৈলা তোহ্মে কুলের নন্দন।
তোহ্মাত লাগিআঁ হয়িব আহ্মার মরণ॥

অতঃপর বাণখণ্ডের ঘটনা। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বাণখণ্ডের ঘটনা যমুনার ওপারের বৃন্দাবনে, অর্থাৎ মথুরাপারের বৃন্দাবনে ঘটিয়াছে। ইহার প্রমাণ, বাণখণ্ডে কবির বিবৃতি :

আগু বড়ায়ি জাএ পাছে জাএ রাধা।
মথুরাক জাইতেঁ কেহো না কৈল বিরোধা॥
কথো দূর গিআঁ যমুনাত পার হআঁ।
বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ॥
দেখিল কদমতলে বসে কাহ্নাঞিঁ।
ধীরে বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাই॥

বংশীখণ্ডের ঘটনা যমুনার গোকুলপারের পটভূমিতে ঘটিয়াছে।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥

বংশীখণ্ডের ঘটনা যে গোকুলপারেই ঘটিয়াছে তাহার আরও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। রাধার উক্তি :

ঘরেত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞিঁ
কোণ দিগেঁ সার নীসারে।

অর্থাৎ এই বাঁশির সুর যে নিকটবর্তী কোনো অঞ্চল হইতে আসিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কবির বর্ণনা হইতে আরও জানা যায়—রাধা এবং তাহার সকল সখী ঘর হইতে যমুনায় জল লইতে আসিয়া কদমতলায় কৃষ্ণকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিল।

সকল সখিগণে যমুনাক গেলা আণিবারেঁ পাণী।
কদম তলাত নিন্দ গেল কৃষ্ণ দেখিল আইহনরাণী॥
ধীরে ধীরে তার নিকট গিআঁ বাঁশী চোরায়িআঁ সত্বরে।
কাখের কুম্ভত ভিতর থুয়িআঁ রাধা লড়িলা ঘরে॥

রাধাবিরহ অংশে রাধার বিরহব্যাকুলতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, বিশেষ কোনো ঘটনা নয়। রাধা গোকুলে বসিয়াই তাহার বিরহযন্ত্রণার কথা বড়াইকে বলিতেছে। বড়াই সান্ত্বনা দিয়া রাধাকে বলে :

হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে।
আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহ্নে॥
আইস মোর সঙ্গে রাধা যাই বৃন্দাবনে।
চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে॥

এখন প্রশ্ন, কৃষ্ণের সন্ধানে রাধা কি যমুনা পার হইয়াছিল? এমন ইঙ্গিত রাধাবিরহ অংশে নাই। বড়াইয়ের নির্দেশে রাধা গোকুল হইতে কিছু দূর গিয়াই বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে

গোচারণরত অবস্থায় দেখিয়া মূর্ছিত হইল। ইহার পরের বার নারদের কথায় জানা গেল কৃষ্ণ কদমতলায় রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও যমুনা অতিক্রম করিবার কোনো কথা উঠে নাই। রাধাবিরহ পর্যায়ের শেষাংশে দেখি রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করে। রাধার অনুনয় রক্ষা করিতে বড়াই কৃষ্ণের সন্ধানে মথুরায় গিয়া উপস্থিত হয়। এদিকে কৃষ্ণবিরহে রাধা গোকুলে একাকী বসিয়া থাকে। বড়াই কৃষ্ণকে বলে :

রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে॥

ইহা কেমন কথা ?

বড়াইয়ের কথার উত্তরে কৃষ্ণের সর্বশেষ উক্তি :

মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস॥

অর্থাৎ খণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির শেষাংশে কাব্যের নায়িকা রাধিকাকে গোকুলে তাহার স্বগৃহে এবং কাব্যের নায়ক কংশারি কৃষ্ণ ও দূতী বড়াইকে মথুরাখণ্ডে কথোপকথন অবস্থায় দেখি।

'রাধাবিরহ' কি প্রক্ষিপ্ত

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্বশেষ খণ্ড 'রাধাবিরহ' নামের সঙ্গে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত না থাকায় কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন কাব্যের এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত। বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন (ক) "ইহার পূর্বে কাব্যের প্রত্যেক অংশকে খণ্ড বলা হইয়াছে, কিন্তু 'রাধাবিরহে'র বেলায় উহাকে খণ্ড বলা হয় নাই। খুব সম্ভব এটি একটি স্বতন্ত্র কাব্য।" এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিমানবিহারী আরও কিছু কিছু যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। (খ) রাধাবিরহে রাধা বড়াইকে কৃষ্ণ আনিয়া দিতে বলিলে বড়াই বলিয়াছে, 'কেমনে বেড়াএ কাহ্ন কিবা রূপ ধরে। একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ তোহ্মারে॥' এই ছত্র দুইটি প্রসঙ্গে বিমান-বিহারীর বক্তব্য, "যে বড়াই প্রথম হইতে রাধাকৃষ্ণের মিলনে দূতীগিরী করিতেছিলেন, এ বড়াই যেন সে বড়াই নহে। এ বড়াই কৃষ্ণ 'কিবা রূপ ধরে', তাহাও জানেন না। স্বভাব-চরিত্রেও দেখি, এ বড়াই রাধার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশালিনী; পূর্ব পূর্ব খণ্ডে তিনি কৃষ্ণের কুটিনী মাত্র।" (গ) রাধাবিরহ অংশে রাধা কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের উক্তি দেখিয়া মনে হয় না যে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে ইতিপূর্বে দৈহিক মিলন ঘটিয়াছে একাধিকবার। রাধাবিরহে রাধা কৃষ্ণের নিকট পূর্বকৃত সকল দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছে, 'যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ। সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ॥' এই ছত্র দুইটি উদ্ধৃত করিয়া বিমানবিহারী মন্তব্য করিয়াছেন, "নৌকা পার হইবার সময় রাধা আর কৃষ্ণকে দুঃখ দিলেন কি? তিনি তো শেষপর্যন্ত দেহদান করিয়াছিলেন;

সে কথার ইঙ্গিত আভাস 'রাধাবিরহে'র কোথাও নাই। কৃষ্ণ যে সব অভিযোগ করিতেছেন, তাহাতে পূর্বে যে উভয়ের অন্ততঃ পাঁচ বার রতিসম্ভোগ হইয়াছে, সে কথার কোন আভাস পাওয়া যায় না।" এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণের নিম্নলিখিত উক্তিগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে—'হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা না দিল সরসবাণী।' 'দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার। লাজে পিঠ দিআঁ মো বহিলোঁ দধি ভার॥ দুসহ মদন বাণে বড় দুখ পাইল।' 'যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী। তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালি॥' কৃষ্ণের এই সকল কথায় রাধাও স্বীকার করিয়াছে, 'না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন।' আর "রাধাবিরহের বড়াইয়ের কথার ভাবেও মনে হয় যে, রাধার সঙ্গে পূর্বে কখনও কৃষ্ণের বিহার হয় নাই।" এই প্রসঙ্গে নিম্নের পদটি উদ্ধৃত, 'কাকুতী করিল কাহ্নু তোবে। মোক পাঠায়িল বারে বারে॥ তভোঁ তার না কৈলেঁ সমানে (= সম্মান)। তেকারণে কৃষ্ট ভৈল কাহ্নে॥' (ঘ) বিমানবিহারীর মতে রাধাবিরহের ভাষা পূর্ব পূর্ব অংশের ভাষা অপেক্ষা অনেক আধুনিক। উদাহরণ স্বরূপ তিনি একটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "ইহাতে 'রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে'র মতন আধুনিক ভাষাও পাওয়া যাব।" (ঙ) রাধাবিরহের আর্থিক পটভূমিকা বিভিন্ন। দানখণ্ডে কড়ির হিসাব চলিতেছিল 'নব লক্ষ কড়ী', কিন্তু রাধাবিরহে রাধার উক্তি, 'শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল। প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল॥' এই প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য, "রাধা বড়াইকে আত্মীয়রূপে না দেখিয়া, নিছক কুট্টনিরূপে দেখিতেছে বলিয়াই এক শত ভরি সোনা বকশিস দিবার কথা বলিতে পারিয়াছে।" (চ) রাধাবিরহ অংশে যে-সকল ভণিতা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিমানবিহারীর মতে এমন আটটি ভণিতা পাওয়া যায় যাহা পূর্ববর্তী কোনো খণ্ডে নাই, কেবল রাধাবিরহের আটটি পদে এই ভণিতাগুলির ব্যবহার হইয়াছে। ভণিতাগুলি হইল 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ল।', 'বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ।', 'গাইল চণ্ডীদাসে।', 'বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।', 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী।', 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী চরণে।' 'বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে।', 'বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।'

আমাদের মতে রাধাবিরহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেরই অচ্ছেদ্য অংশ, উহা প্রক্ষিপ্ত বা স্বতন্ত্র কাব্য নয়। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করি।

(ক) রাধাবিরহ অধ্যায়ের সঙ্গে পুঁথিতে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত হয় নাই বলিয়া পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি হইতে ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার কোনো কারণ নাই। প্রথমতঃ লিপিকরের অনবধানে 'খণ্ড' শব্দটি ছাড় পড়িতে পারে। এ-রকম ছাড় পুঁথিতে বহু আছে। যেমন কালীয়দমনখণ্ডের পর যে খণ্ডটি—তাহার নাম পুঁথিতে ছাড় পড়িয়াছে। শুধু খণ্ডের গোড়ায় নয়, খণ্ডের শেষেও নাম ছাড় পড়িয়াছে। আমরা উহার নাম দিয়াছি 'যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ড', বসন্তরঞ্জন-প্রদত্ত নাম 'যমুনাখণ্ড'। রাধাবিরহের শেষের পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই। তাহাতে 'খণ্ড' শব্দটি থাকিতেও পারিত। কিন্তু

শেষে যদি শুধু 'ইতি রাধাবিরহঃ সমাপ্তঃ' থাকিত, তাহা হইলে রাধাবিরহ অধ্যায়টি যে যথার্থই 'খণ্ড' নাম বিবর্জিত, সে কথা জোর করিয়া বলিবার উপায় থাকিত।

শুধু অধ্যায়ের সূচনায় 'খণ্ড' শব্দটি নাই বলিয়া যদি রাধাবিরহকে স্বতন্ত্র কাব্য বলি, তাহা হইলে আমাদের প্রদত্ত নামে চিহ্নিত 'বস্ত্রহরণখণ্ড'টিকেও বর্তমান কাব্যের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। দানখণ্ড হইতে সকল খণ্ডের সমাপ্তি বাক্য এইরূপ—'ইতি দানখণ্ডঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি নৌকাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি ভাবখণ্ডঃ সমাপ্তঃ', (পুঁথিতে ছত্রখণ্ডের শেষের পাতা নাই), 'ইতি বৃন্দাবনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি যমুনান্তর্গত কালীয়দমনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ', (কালীয়দমনখণ্ডের পরবর্তী খণ্ডের নাম পুঁথিতে নাই), হারখণ্ডের শেষে 'ইতি যমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি বাণখণ্ডঃ সমাপ্তঃ' এবং 'ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ'। কিন্তু জন্ম ও তাম্বুলখণ্ডে আছে, 'ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং' ও 'ইতি তাম্বুলখণ্ডং সমাপ্তং'। যদি রাধাবিরহে খণ্ড শব্দটি নাই বলিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র কাব্যরূপে কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই যুক্তিতে বাকি সকল খণ্ড হইতে জন্ম ও তাম্বুলখণ্ডের শেষে এই পৃথক পাঠ দেখিয়া এই দুইটি খণ্ডকেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হয়। আর জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, বা বস্ত্রহরণখণ্ডকে যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত বলিতে বাধা না থাকে তাহা হইলে 'খণ্ড' শব্দটি ছাড় পড়িয়াছে বলিয়া রাধাবিরহকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বহির্ভূত কোনো স্বতন্ত্র কাব্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

(খ) রাধাবিরহ অংশে বড়াইয়ের চরিত্রে কোনো অসঙ্গতি নাই। বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে বলিয়াছে, কিন্তু তাহার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে বড়াই কৃষ্ণকে জানে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি সুযোগ পাইলেই রাধা বা কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কখনো কবি স্বয়ং, আবার কখনো বা বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়া বিভিন্ন চরিত্রের রূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যে নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণনায় বড়ু চণ্ডীদাসের বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তাম্বুলখণ্ডে কৃষ্ণের নিকট বড়াই রাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়াছে। রাধাকে হারাইয়া বড়াই খুঁজিতে খুঁজিতে কৃষ্ণের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে কৃষ্ণ বলে, 'কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ। আহ্মার থানত বুঢী কহিআর সরূপ ॥' এখানে প্রশ্ন, কৃষ্ণ কি রাধিকাকে পূর্ব হইতে চেনে? যদি চিনিয়া থাকে তবে বড়াইয়ের নিকট সে রাধার রূপ জানিতে চাহিবে কেন? বড়াই কৃষ্ণকে বলিয়াছে, 'দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী। বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী। কোঁঅলী পাতলী বালী স্থন বলমালী।' কিন্তু কৃষ্ণ কি চন্দ্রাবলীকে চেনে না? না চিনিলে সে কেমন করিয়া জানিল এই চন্দ্রাবলীরই অপর নাম রাধা? কৃষ্ণ বলিয়াছে, 'বোলা এক বোলোঁ তোকে যবেঁ ধর মনে। তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা দরশনে ॥' অথচ কৃষ্ণের নিকট বড়াই 'চন্দ্রাবলী'র কথাই বলিয়াছে, 'রাধা' নামটি সে তখনো উচ্চারণও করে নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় রাধিকাকে কৃষ্ণ বেশ ভাল করিয়াই চিনিত। তথাপি কৃষ্ণের মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন, 'উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে। তবেঁ ভালমতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে ॥' এই সুযোগটুকু লইয়া

কবি বড়াইয়ের মুখ দিয়া শ্রীরাধার রূপবর্ণনা করিয়াছেন পরের পদেই। কবি যেখানেই অবকাশ পাইয়াছেন সেখানেই রূপবর্ণনা করিয়াছেন, আর যেখানে অবকাশ নাই সেখানে নিজেই কোনো না কোনো ভাবে সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন—প্রাসঙ্গিকতার খুঁটিনাটি বিচার তিনি করেন নাই। সুতরাং রাধাবিরহে বড়াইয়ের প্রশ্নের উত্তরে রাধার মুখ দিয়া কবি কৃষ্ণের রূপবর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া, এ কথা বোঝায় না যে বড়াই কৃষ্ণকে ইতিপূর্বে দেখে নাই বা চেনে না।

চরিত্রের বিচারেও রাধাবিরহের বড়াই ও রাধাবিরহের পূর্ববর্তী বড়াইয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। পূর্ব পূর্ব খণ্ডগুলিতে বড়াই 'কৃষ্ণের কুটিনী মাত্র' আর রাধাবিরহ অংশে সেই বড়াই অকস্মাৎ 'রাধার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশালিনী' হইয়া উঠিয়াছে—এ কথা সঙ্গত মনে করি না। এই প্রসঙ্গে বাণখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি বড়াইয়ের উক্তি স্মরণীয়: 'শতেক ব্রাহ্মণ আর মারিলেঁ গোকুল। যে পাপ সেহো নহে তিরীবধতুল॥ রাধা যেহ্ন সতী তাক জগতেঁ বাখানী। হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল চক্রপাণী॥ কাহ্নাঞিঁ মোবে নাহিঁ ছো॥ তিরীবধিআ কাহ্নাঞিঁ ল কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহি ছো॥' এই বড়ায়ি বংশীখণ্ডে রাধাকে বলিয়াছে, 'আহ্মার অধিক তোর কে করিবে হিত। সব খন তোর কাজে জাগে মোর চিত॥' আরো লক্ষণীয় এই বংশীখণ্ডে রাধা বড়াইয়ের নিকট হইতেই কৃষ্ণের বংশী অপহরণের মন্ত্রণা লাভ করিয়াছিল। 'বাঁশী হারায়িআ কাহ্ন মনে খেদ' করিলে এবং 'মাথাত হাত দিআঁ' কাঁদিতে থাকিলে, কপটকুশলা বড়াই কৃষ্ণকে বলে, 'বাঁশীর উদ্দেশ তোক কহিল মুরারী। গোপী মাঝেঁ বাঁশী তোর কেহো কৈল চুরী॥ ষোল শত যুবতীক কর যোড় হাথ। তবেঁ বাঁশী পায়িবেঁ শুন জগন্নাথ॥' সুতরাং রাধাবিরহের পূর্ববর্তী খণ্ডে রাধার প্রতি বড়াই স্নেহশালিনী ছিল না—এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়; এবং বড়াই কেবল কৃষ্ণেরই কুটিনীর কাজ করিয়াছে—ইহাও স্বীকার করিবার উপায় নাই।

(গ) বিমানবিহারী মজুমদারের মতে রাধাবিরহ অংশে রাধা কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় না যে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে ইতিপূর্বে একাধিকবার মিলন ঘটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি যে-সকল চরণ রাধাবিরহ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই রূপ ছত্র বাণখণ্ডের মধ্যেও যথেষ্ট পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বাণখণ্ডে বড়াইয়ের প্রতি কৃষ্ণের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি: 'বোল রাধিকারেঁ বড়ায়ি আহ্মার বচনে। তাহাক করিল আহ্মে আনেক যতনে॥ তভোঁ আহ্মমতী মোক না দিলেক ভালে। তাহার মণ থীর নহে কোণ কালে॥'

(ঘ) রাধাবিরহ পর্বের ভাষা কি পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি হইতে আধুনিক? ইহার একমাত্র উত্তর না। রাধাবিরহের ভাব ও সুর পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও সংযত, কিন্তু ভাবের গভীরতা তো ভাষার আধুনিকতা প্রমাণ করে না। বিমানবিহারী আধুনিক ভাষার উদাহরণ হিসাবে 'রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে' উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু 'কাহ্নাঞিঁ' শব্দটি কেমন করিয়া আধুনিক ভাষার নিদর্শন হইল? কৃষ্ণ, কান, কানু, কানাই, কেষ্ট—এ সকলের পরিবর্তে যে-বাক্যের মধ্যে বিশেষভাবে

'কাহ্নাঞিঁ' শব্দটি আছে, তাহাকে কেমন করিয়া আধুনিক ভাষার নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা যাইবে?

(ঙ) দানখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে একস্থলে বকেয়া দান হিসাবে 'নব লক্ষ কড়ী' চাহিয়াছে। অপরদিকে রাধাবিরহে রাধা বড়াইকে 'শত পল সোনা' উপহার দিয়াছে। বিমানবিহারী এখানে কড়ি শব্দের অনুল্লেখ দেখিয়া রাধাবিরহকে পৃথক করিতে চান। কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন খণ্ডে স্বর্ণের ব্যবহার আছে এবং রাধাবিরহে রাধিকা বড়াইকে শত পল সোনা অর্থাৎ চারিশত ভরি স্বর্ণ উপহার হিসাবে দিয়াছে, যেমন বাণখণ্ডে রাধার উক্তিতে পাই, 'এবার রাখহ বড়ায়ি আহ্মার পরাণ। লাখেকের মূদড়ী দিবোঁর হাথ দাণ॥' মুদ্রা হিসাবে কড়ির ব্যবহার থাকিলে স্বর্ণোপহার দেওয়া যাইবে না—এ কথা কে মানিবে? আমাদের কালে কি একদিকে সোনা রূপা, অন্যদিকে টাকা পয়সা সিকি আধুলি চলিতেছে না?

(চ) বিমানবিহারী তাঁহার গ্রন্থে যে অংশে রাধাবিরহের ভণিতার আলোচনা করিয়াছেন সেই অংশটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। তিনি রাধাবিরহের বিভিন্ন ভণিতা উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন—রাধাবিরহে কোনটি কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সেই সেই ভণিতা পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে কতবার ব্যবহার হইয়াছে। কেবল রাধাবিরহের যে আটটি ভণিতা বিমানবিহারী সবশেষে উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলি অন্য খণ্ডে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা কোনো উল্লেখ নাই। সুতরাং বুঝিতে হয় সেগুলি পূর্ববর্তী-খণ্ডে ব্যবহৃত হয় নাই। এই আটটি ভণিতা সম্পর্কে বিমানবিহারীর মন্তব্য, 'নিম্নলিখিত ভণিতাগুলি রাধাবিরহে একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।' এই উক্তির দ্বারা সমালোচক এ কথাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, যে খণ্ডের ভণিতা অন্যান্য সকল খণ্ড হইতে পৃথক সে খণ্ড কাব্যের অঙ্গীভূত নহে। আমাদের বক্তব্য, বিমানবিহারী যে আটটি ভণিতা রাধাবিরহ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলি ছাড়াও ওই খণ্ডে এমন ভণিতা আছে যাহা সমগ্র কাব্যে কেবল একবার ব্যবহার হইয়াছে, দুইবার নহে। যেমন, 'বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে', কিংবা 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে'। আর বিমানবিহারী যে আটটি ভণিতা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে পাঁচটি ভণিতা অন্যান্য খণ্ডেও ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ' এই ভণিতার পূর্ববর্তী খণ্ডে দশবার ব্যবহার আছে।

কাহিনীর ধারাবাহিকতা, চরিত্র, ভাষা, ভণিতা কোনো দিক হইতেই রাধাবিরহকে স্বতন্ত্র বা পৃথক ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার উপায় নাই। রাধাবিরহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ, স্বতন্ত্র কাব্য নহে।

এ ছাড়াও কাব্যের গঠনের দিকটি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। অন্যান্য খণ্ডেও সংস্কৃত শ্লোক আছে, এখানেও সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার আছে। পদের মাথায় রাগরাগিণীর উল্লেখও অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় একই রকম। বিরামচিহ্নগুলিও একই প্রকার।

মনে হয় 'রাধাবিরহ' প্রক্ষিপ্ত কিনা এ প্রশ্ন আদৌ উঠিত না যদি আবিষ্কর্তা মহাশয়

'অথ রাধাবিরহঃ' ইহার পর 'খণ্ডঃ' শব্দটি তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে বসাইয়া দিতেন। যেমন তৃতীয় বন্ধনীর (তৃতীয় বন্ধনীর অর্থ কল্পিত) মধ্যে যমুনাখণ্ড নামটি চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহা লইয়া কেহ আর চিন্তা ভাবনার অবকাশও পান না। মনে রাখিতে হইবে আবিষ্কর্তা প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটিই তো তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত।

পুঁথির নামকরণ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাম সম্পর্কে সংশয়ের প্রধান কারণ এই যে এ পুঁথির অগ্রপশ্চাৎ খণ্ডিত। কবি তাঁহার কাব্যে কি নাম দিয়াছিলেন তাহা এখন প্রত্যক্ষভাবে জানিবার কোনো উপায় নাই। নামহীন পুঁথির আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন নাম দিয়া কাব্যটি প্রকাশ করেন।

প্রথম সংস্করণে তিনি লেখেন, "দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস-বিরচিত কৃষ্ণকীর্তনের অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এতদিনে তাহাব সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুঁথিই কৃষ্ণকীর্তন এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দেশ করা হইল।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির নামকরণ সম্পর্কে প্রথম সংশয় প্রকাশ করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ষাট বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি লেখেন, "পুঁথির সঙ্গে রক্ষিত একটি আলগা কাগজের লেখায় বোধ হয়, পুঁথিখানি বিষ্ণুপুরের রাজাদের গ্রন্থাগারে ছিল এবং তাহার নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। কিন্তু বসন্তবাবু পুঁথি সম্পাদনকালে তাহার নামকরণ করিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।" আরও পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নামকরণ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।—ইহারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামের সমর্থক।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের মতে, "আর কোনো প্রবলতর প্রমাণ না পাইলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনকে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ না বলিব কেন?" অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "যতদিন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ নাম আবিষ্কৃত না হইতেছে ততদিন ইহাকে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।"

আমরা প্রথমে পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত রসিদটিতে কি লেখা আছে উদ্ধার করি :

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্বের ৯৫ পচানই পত্র হইতে একসত্ত দস পত্র পর্যন্ত একুনে ১৬ শোল পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্রীমহারাজা হজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন— সন ১০৮৯
তাং ২৬ আশ্বিন

সন ১০৮৯
তাং ২১ আগ্রহায়নে
গুং কৃষ্ণপঞ্চানন কৃষ্ণসন্দর্ব্ব
১৬ পত্র দাখিল হইল।

পুঁথির অভ্যন্তরে প্রাপ্ত এই রসিদটি বসন্তরঞ্জন রায়ের চোখেও পড়িয়াছিল, তাঁহার সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা হইতে তাহা জানিতে পারি। "পুথির সহিত প্রাপ্ত একখণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া" সম্পাদকের অনুমান হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ-লীলাত্মক কীর্তনের এই অপূর্ব গ্রন্থ ২৫০ বর্ষ পূর্বে বিষ্ণুপুর রাজার পুঁথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। বসন্তরঞ্জনের এই বক্তব্য হইতে বোঝা যায় তিনি পুঁথি-সংলগ্ন রসিদটির গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আর উক্ত রসিদটির গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেই শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামটিও আসিয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নাম গ্রহণে সম্পাদকের কোনো আগ্রহ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির নামকরণ প্রসঙ্গে সম্পাদকের বক্তব্য, "পুথির আদ্যন্তবিহীন খণ্ডিতাংশে কবির দেশকালাদির কথা দূরে থাকুক, পুথির নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কথিত হয়, চণ্ডীদাস 'কৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেন। খেতরীর এক বার্ষিক উৎসবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গীত হইয়াছিল, অবশ্য কীর্তনাঙ্গে। আলোচ্য পুথির প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন, তাহাতে তর্কের অবসর নাই। অতএব গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণ অসমীচীন হয় নাই।" নামহীন প্রাপ্ত পুঁথিটির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি যুক্ত করিয়া দিবার আকুলতা সম্পাদকের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নামপত্রটিও এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেখানে বড়ু চণ্ডীদাসের নাম নাই, তৎপরিবর্তে আছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন / মহাকবি চণ্ডীদাস বিরচিত'। প্রথম সংস্করণের 'মুখবন্ধ' লিখিয়া ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। কিন্তু তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতাকে বড়ু চণ্ডীদাস নামেই উল্লেখ করিয়াছেন, শুধু চণ্ডীদাস বলিয়া নয়। মুখবন্ধের পর সম্পাদকের বক্তব্য। কিন্তু বসন্তরঞ্জন কেবল নাম-পত্রে নয় তাঁহার সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনায় কোথাও কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ 'বড়ু চণ্ডীদাস' এই নামটি তাঁহার আলোচনায় একবারও ব্যবহৃত হয় নাই। বসন্তরঞ্জন বড়ু চণ্ডীদাসের বর্তমান পুঁথিটিকে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রূপেই প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। যাই হোক, পরবর্তী কালের সংস্করণের ভূমিকায় বড়ু চণ্ডীদাস নামই ব্যবহার করিয়াছেন চণ্ডীদাসের স্থলে।

বসন্তরঞ্জন যে পুঁথির অন্তর্গত স্মারকলিপিটি লইয়া বড়ই সংশয় ও দ্বিধায় পড়িয়াছিলেন তাহা বোঝা যায়। জীবিতকালের সর্বশেষ সংস্করণের (১৩৫৬) ভূমিকায় এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য উদ্ধৃত করি :

"পুথির সহিত প্রাপ্ত স্মারকলিপি হইতে অনুমান হয়, লীলাকীর্তনের এই অপূর্ব সামগ্রীটি ২৫০ বর্ষ পূর্বে বিষ্ণুপুর রাজ-পুথিশালার সম্পত্তি ছিল, কোন প্রকারে উহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির সহিত জড়াইয়া গিয়া থাকিবে।" এই উদ্ধৃতির শেষাংশটি (কোন প্রকারে···গিয়া থাকিবে।) প্রথম সংস্করণে ছিল না।

শেষ ছত্রটির কি অর্থ? যদি এই স্মারকলিপিটির সঙ্গে পুঁথির কোনো যোগ না-ই থাকে, তবে পুঁথির প্রাচীনতা নির্ণয়েও পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত এই রসিদের কোনো গুরুত্ব নাই। কিন্তু বসন্তরঞ্জন তাঁহার জীবিতকালের সর্বশেষ সংস্করণেও পুঁথিটি যে আড়াই শত বর্ষ পূর্বেও বর্তমান ছিল সে কথা প্রমাণ করিতে গিয়া পুঁথির অন্তর্গত স্মারকলিপিটিই অবলম্বন করিয়াছেন।

পুঁথির প্রাচীনতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রসিদটির গুরুত্ব দিব, রসিদের সন-তারিখকে স্বীকার করিব, আর নামকরণকালে রসিদে প্রাপ্ত পুঁথির নামটিকে অস্বীকার করিব—তাহা হয় না।

পুঁথি আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জন 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নাম পরিত্যাগ করিয়া কেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামকরণে আগ্রহী হন?

বসন্তরঞ্জন কর্তৃক বর্তমান পুঁথি আবিষ্কারের বহু পূর্ব হইতেই একটি কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, চণ্ডীদাস পদাবলী ব্যতীত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দে জগবন্ধু ভদ্র লিখিয়াছিলেন, "পদাবলী ব্যতীত চণ্ডীদাসের আর কোনো গ্রন্থ আছে কি না জানা যায় না কেবল কৃষ্ণকীর্তন নামে একখানি গ্রন্থ ছিল, কোনো কোনো পুস্তকে এই আভাস পাওয়া যায়।" (মহাজন পদাবলী)। ১৩০০ বঙ্গাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী লেখেন, "তাঁহার [চণ্ডীদাসের] পূর্ণ গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাওয়া যায় নাই, কয়েকটি খণ্ড কবিতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে।" (নব্যভারত, ১৩০০ ফাল্গুন)। ১৩০১ বঙ্গাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য লিখিয়াছিলেন, "তিনি [চণ্ডীদাস] কৃষ্ণকীর্তন নামে যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, তাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।" (বিদ্যাপতি)। ১৩১১ বঙ্গাব্দে ব্রজসুন্দর সান্যাল লেখেন, "চণ্ডীদাসের পুস্তকের নাম গীতচিন্তামণিই হউক বা কৃষ্ণকীর্তনই হউক, তিনি যে ধারাবাহিকরূপে কৃষ্ণচরিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" (চণ্ডীদাসচরিত)।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন বড়ু চণ্ডীদাস রচিত যে নামহীন পুঁথিটি আবিষ্কার করেন তাহাকেই তিনি চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামের সঙ্গে চিহ্নিত করিলেন। তারাপদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "অতি প্রবল সাক্ষ্যের পক্ষেও বলা অসম্ভব বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক রচনা বসন্তবাবুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।" এতদ্‌সত্ত্বেও তারাপদবাবুর বক্তব্য, "পুথির আনুমানিক নাম 'কৃষ্ণধামালী' বা 'রাধাকৃষ্ণরতিবিলাপ'

বা 'রাধাকৃষ্ণ প্রেমামৃত' না হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হওয়ায় গুরুতর অন্যায় হয়নি। গুরুতর অসঙ্গতি বা প্রবল বিরুদ্ধ প্রমাণ না পেলে সম্পাদক প্রদত্ত এবং পণ্ডিতজন স্বীকৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম পরিবর্তনের কোনো হেতু নেই।" (অমৃত, ৪ ভাদ্র ১৩৭৭)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি যে পণ্ডিতজন স্বীকৃত নয় তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহা ছাড়া কোনো বিষয় পণ্ডিতজন স্বীকৃত হইলেই যে সে বিষয়ে অনুসন্ধান গবেষণা বা সিদ্ধান্ত করা যাইবে না--এমন নহে। আর সম্পাদক প্রদত্ত নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত পুঁথিটির মূল নাম—তাহাও কোনো ভাবে প্রমাণিত হয় না বলিয়া হারাপদ মুখোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং স্বয়ং আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক পুঁথির কোনো একটি নামকরণ করিয়াছেন বলিয়াই যে তাহা চূড়ান্ত -একথা ঠিক নহে।

আমাদের বক্তব্য, পুথির মধ্যে যে রসিদ পাওয়া গিয়াছে তাহার গুরুত্ব কোনো প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না; স্বয়ং আবিষ্কর্তা বলিলেও নয়। বস্তুতঃ বসন্তরঞ্জন যে এই রসিদের গুরুত্ব অস্বীকার করেন নাই তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। যে পুঁথির মধ্যে রসিদটি ছিল সেই পুঁথিটি হইল শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কাব্য। রসিদের মধ্যে যে নামটি পাইতেছি তাহা হইল শ্রীকৃষ্ণ নামযুক্ত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। দ্বিতীয়তঃ রসিদের গোড়ায় 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ' কথাটি লক্ষণীয়। বর্তমান পুঁথিটি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কাব্য। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ কথাটি পুঁথির সঙ্গে রসিদের আত্মীয়তার ইঙ্গিতই বহন করে। তৃতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটি যদি ৮০ বা ৯০ পত্রে সম্পূর্ণ হইত তাহা হইলে রসিদটিকে সহজেই অস্বীকার করা যাইত। কিন্তু রসিদে পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ আছে ৯৫ হইতে ১১০। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পুঁথির পত্র ২২৬। এবং এই ২২৬ পত্রের মধ্যে কেহ ৯৫ হইতে ১১০ এই ষোল পত্র লইয়া গিয়াছিলেন, এই নির্দেশ যদি পুঁথির মধ্যে কোনো কাগজে পাই তবে সেই কাগজ পুঁথির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় একথা কেমন করিয়া মানিয়া লইব?

আর একটি কথা। রসিদে যে তারিখের উল্লেখ আছে (১০৮৯ সাল), প্রাপ্ত পুঁথিটি তাহা অপেক্ষা প্রাচীন। সুতরাং রসিদটি যে এই পুঁথির সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত সেদিকের প্রতি সম্ভাবনার উজ্জ্বল আলোক নিক্ষেপ করে।

৯৫ হইতে ১১০—এই ষোল পত্র কে লইয়াছিলেন এবং কেন?

মনে হয় পুঁথি নকলের জন্য এইভাবে কয়েকটি করিয়া পৃষ্ঠা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা ছিল। পুঁথির মালিক সম্ভবত সমগ্র পুঁথিটি লিপিকরদের হস্তে তুলিয়া দিতে চাহেন নাই। কয়েক পৃষ্ঠা নকলের পর মূল কপি ফেরত আসিলে আবার কয়েকটি পৃষ্ঠা দেবার ব্যবস্থা ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির মাঝের কোনো কোনো পত্র আমরা পাই নাই। লিপিকরদের হাত হইতে কোনক্রমে সেইসব পৃষ্ঠা হারাইয়াছে, হইতে পারে। বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৭৯র মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপিকর' শীর্ষক আলোচনায় লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণকীর্তন পুঁথির মাঝে মাঝে দুই-চারি পৃষ্ঠা হারাইয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই একাধিক পুঁথি ছিল। পুঁথি নকল করিতে গিয়া কোনো কারণে

মূল পুঁথির দুই-এক পৃষ্ঠা হারাইয়া গেলে কিংবা নষ্ট হইয়া গেলে পুথির মালিক হয়তো পুঁথি না দিয়া সেই হারানো বা খোয়া-যাওয়া পাতা নকল করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, এমনও তো হইতে পারে।"

যাই হোক রসিদ হইতে জানা যাইতেছে যে পুঁথির ষোল পৃষ্ঠা যিনি লইয়া ছিলেন তিনি প্রায় দুই মাস পর ফেরত দিয়া যান। এই রসিদ হইতে প্রমাণিত হয় ১০৮৯ সনে এই পুঁথির ৯৫ হইতে ১১০ পত্রগুলি ছিল। পরবর্তী কালে ৯৮।০ এবং ১০৪ হইতে ১১১ পত্রগুলি হারায়।

আমরা পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত রসিদের গুরুত্ব স্বীকার করি এবং উপসংহারে বলি যে এই রসিদ যখন লিখিত হয় তখন সম্ভবত পুঁথির প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠাও ছিল। যদি নাও থাকে তাহা হইলেও পুঁথির প্রকৃত নামটি পাণ্ডুলিপি মালিকের অবশ্যই জানা ছিল। রসিদে যে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামটি পাই তাহা যে পুঁথির আসল নাম নয়—সে কথা প্রমাণ করা কঠিন। সম্পাদক প্রদত্ত নাম অপেক্ষা পুঁথি। অভ্যন্তরে প্রাপ্ত নামটিকে গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

চণ্ডীদাস সমস্যা

১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রী) বসন্তরঞ্জন রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ইহা আবিষ্কর্তার সম্পাদনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকা সংবলিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরই বাংলাদেশে বিশেষ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যরসিক মহলে চণ্ডীদাস সম্পর্কিত সমস্যাটির উদ্ভব হয়। এই সমস্যা আরও প্রবলতর হইয়া উঠে যখন মণীন্দ্রমোহন বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা হইতে দীন চণ্ডীদাসের পদ আবিষ্কার করেন।

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে চণ্ডীদাস এক। যৌবনে যে চণ্ডীদাস তীব্র আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন পরবর্তী বয়সে তিনিই আধ্যাত্মিক রসসমৃদ্ধ পদাবলী রচনা করেন। তাঁহার ভাষায়, "কবি চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই।"

চণ্ডীদাস সমস্যার মূল কথাটি হইল, চণ্ডীদাস নামে কয়জন কবি ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কে কে চৈতন্যপূর্ববর্তী এবং কে কে চৈতন্যপরবর্তী। আরও বিচার্য হইল চৈতন্যদেব কি বড়ু চণ্ডীদাসের পদের রসাস্বাদন করিতেন? বড়ু চণ্ডীদাস কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ব্যতীত বিচ্ছিন্ন কোনো বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন?

প্রথমে দেখা যাক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ আস্বাদন করিয়াছিলেন কি না? সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষিণীর টীকায় আছে, "শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।" কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে:

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

এই সকল উক্তি অবলম্বনে অনেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরই দান ও নৌকাখণ্ডের পদের রসাস্বাদন করিয়া 'পরম আনন্দ' উপভোগ করিতেন।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের রচনা। কিন্তু চৈতন্যদেব যথার্থই বড়ু চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিয়াছেন কি না তাহাতেই আছে সংশয়। চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দান ও নৌকাখণ্ডের পদ আস্বাদন করিয়াছেন—ইহার পক্ষে চৈতন্যচরিতামৃতের একটি শ্লোক বা সনাতন গোস্বামীর টীকার একটি চরণকে বড় প্রমাণ হিসাবে কোনোমতেই গ্রহণ করা যায় না। তাহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত দান ও নৌকাখণ্ডের স্থূলতা চৈতন্যদেবের পক্ষে গ্রহণ করাও অস্বাভাবিক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। চৈতন্যদেব যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করিতেন, তাহা হইলে ভক্ত বৈষ্ণবেরা এই কাব্যকে শিরোধার্য করিয়া রাখিতেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদ্যাপতির পদাবলী, রামানন্দ রায়ের নাটকসমূহ এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বৈষ্ণব ভক্তজনে বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন মহাপ্রভু কর্তৃক আস্বাদিত রচনাসমূহ বলিয়া। চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করিয়া থাকিলে এ কাব্য বৈষ্ণব সমাজে এতকাল বিস্মৃত ও অনাদৃত থাকিল কেন? তাল শিখিবার পুঁথিতে মাত্র দুই একটি পদ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আর কোনো পুঁথি বা কোনো পদ পাওয়া গেল না কেন? বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদি-মধ্যযুগের রচনা হইলেও চৈতন্যদেব এই কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে গবেষক মহলে গভীর সংশয় রহিয়াছে।

এইবার বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ব্যতীত অপর কোনো বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য করা যাক। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। সম্পাদকদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ব্যতীত অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন পদকেও বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত পদ বলিয়া চিহ্নিত করেন। কিন্তু তাঁহারা কোন্ সূত্র অবলম্বনে বড়ু চণ্ডীদাসের পদবিচার করিয়াছেন তাহার কোনো নির্দেশ ভূমিকায় দেন নাই। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (ত্রিচত্বারিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা) 'বড়ু চণ্ডীদাসের পদ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নাই।...বড়ু চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত কবিতা হিসাবে পদাবলী রচনা করেন নাই।"

পরবর্তীকালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (ষষ্টিতম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা) মুহম্মদ

শহীদুল্লাহ 'চণ্ডীদাস সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন কোন্ কষ্টি-পরীক্ষায় বড়ু চণ্ডীদাস ও অপরাপর চণ্ডীদাসকে পৃথক করিব। পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে "(১) ক. কোনও স্থানে 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস বা 'দীন' চণ্ডীদাস নাই। খ. সর্বত্র 'গাএ' বা 'গাইল' আছে, কোথাও 'ভণে', 'কহে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নাই। গ. ভণিতা কখনও উপান্ত চরণে হয় না। (২) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীমতী রাধিকার পিতামাতার নাম সাগর ও পদুমা বলিয়াছেন। (৩) বড়ু চণ্ডীদাস রাধার কোনও সখী বা শাশুড়ী ননদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি 'বড়ায়ি' ভিন্ন কোনও সখীকে সম্বোধনও করেন নাই। (৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী, প্রতিনায়িকা নহেন। (৫) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখার নাম উল্লেখ করেন নাই। (৬) বড়ু চণ্ডীদাস সর্বত্র প্রেম অর্থে 'নেহ' বা 'নেহা' ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল চারি স্থলে 'পিরিতী' শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ। (৭) বড়ু চণ্ডীদাস কুত্রাপি শ্রীমতী রাধিকার বিশেষণে 'বিনোদিনী' এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'শ্যাম' ব্যবহার করেন নাই। (৮) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকা গোয়ালিনী মাত্র, রাজকন্যা নহেন। (৯) অধিকন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের নিকট ব্রজবুলি অপরিচিত। এইগুলির কষ্টি-পরীক্ষায় চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেক পদ যে বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।" যুক্তি ও প্রমাণের দিক হইতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্যই অধিকতর সমর্থনীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের মতে পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভণিতায় 'বড়ু' উপাধি থাকিলেও তাহাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না, তাহা পরবর্তী কালের অন্য কোন কবির রচনা, বা পদাবলীর চণ্ডীদাসের নামে ভ্রমক্রমে 'বড়ু' উপাধি যুক্ত হইয়া গিয়াছে।"

ইহার পর আমরা এই প্রশ্নে আসিয়া উপস্থিত হই যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে যে চণ্ডীদাসের নামোল্লেখ আছে তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা না হইয়া থাকেন তবে তাঁহার অপর কি পরিচয় আমরা পাই। ইহার উত্তর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত— চৈতন্যপূর্ববর্তী এই চণ্ডীদাসের পরিচয় প্রমাণাভাবে আজও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

পরিশেষে দীন চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদের আলোচনা শেষ করিব। মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে, পদাবলীর চণ্ডীদাস বলিতে দীন চণ্ডীদাসকেই বুঝিতে হইবে। বিভিন্ন পদসংগ্রহগ্রন্থে চণ্ডীদাসের নামে যে সকল উৎকৃষ্ট পদ সংকলিত হইয়াছে তাহা এই দীন চণ্ডীদাসেরই রচিত। তিনি পুরাণাশ্রিত কৃষ্ণলীলার এক বিরাট পালাগানও রচনা করিয়াছিলেন। মণীন্দ্রমোহনের মতে বাঙালী পাঠকের নিকট যে চণ্ডীদাস আজ এত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত দীন চণ্ডীদাস।

দীন চণ্ডীদাস সম্পর্কে মণীন্দ্রমোহন বসুর বক্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানিয়া

লওয়া যায় না। চৈতন্যপরবর্তী যুগে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দীন চণ্ডীদাস নামক একজন পদকর্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা ঠিক, কিন্তু তিনি যে চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত সকল উৎকৃষ্ট পদের রচয়িতা এই অভিমত যুক্তিযুক্ত নয়। এ সম্পর্কে কোনো বলিষ্ঠ প্রমাণও মণীন্দ্রমোহন বসু উপস্থাপিত করেন নাই। আমরা যে দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিলাম তিনি রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক বিরাট পালাগানের রচয়িতা এবং স্বল্পশক্তিসম্পন্ন কবি ছিলেন।

চণ্ডীদাস-সম্পর্কিত সমস্যাটির কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল। দীর্ঘ অর্ধশত বৎসর কাল পূর্বে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল আজও তাহা সমস্যাকারেই রহিয়াছে। সম্প্রতি সুখময় মুখোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়' শীর্ষক গ্রন্থে চণ্ডীদাস সমস্যা সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। নূতনতর তথ্য সংগ্রহের দ্বারা এই সমস্যার সমাধানের পথ অধিকতর সুগম হইয়া উঠুক, প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী সকল পাঠকের ইহাই আকাঙ্ক্ষা।

আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ

আদি মধ্য ও আধুনিক—বাংলা ভাষাকে এই তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা হইয়াছে। মধ্যযুগের স্থিতিকাল আনুমানিক ১৩৫০ হইতে ১৮০০ অবধি। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মধ্যযুগের আদিপর্বের ভাষার লক্ষণ বিদ্যমান। চর্যাপদের পরেই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "The languages of the Caryas and of the 'Srikrishnakirtana' have been preserved only because they were fortunately locked up in old MSS., which were not replaced by later copies in which the language would certainly have been altered The next great landmark in the study of Bengali, after the Caryas, is the 'Srikrishnakirtana' of Chandidasa. This work, from point of view of language, is of unique character in Middle Bengali literature. ...There is no Middle Bengali work dating from before 1500 which is preserved in a contemporary MS.; except one, and that is the 'Srikrishna-kirtana'. The MS., from the style of script it employs, according to expert opinion, belongs to the latter half of the 14th century. It gives us the genuine West Bengali as used in literary composition in the middle of that century. The genuineness of the work is borne out by the remarkably archaic character of the forms,

which agree with such widely distant dialects as North Bengali and Assamese, and some of its expressions are found in Early Oriya. ...The MS. of the Srikrishnakirtana' has been almost miraculously preserved, to be discovered by Basanta Ranjan Ray and edited by him in a style rarely attained in the edition of an old text in India (V S Pd., San 1323). The work seems to have been lost sight of from the 17th century, and it is in this way that the language could not be altered, from the original form in which it was composed, to late Middle Bengali, or even Modern Bengali, in the hands of subsequent copyists. The grammar of the speech of the Srikrishnakirtana' gives a clue to many of the forms of New Bengali. ...The 'Srikrishnakirtana' belongs to what may be called the Early Middle Bengali stage: and its importance in the study of Bengali, in the absence of other genuine texts, is as great as that of the works of Layamon, Orm and Chaucer in English."

এখন আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার মৌলিক লক্ষণ ও ব্যাকরণের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যাক

১। আ-কারের পরে ই-কার বা উ-কার ধ্বনি থাকিলে তাহা ক্ষীণ হয় এবং পাশাপাশি স্বরধ্বনি দুইটি দ্বিস্বরতা প্রাপ্ত হয়। যথা—আইলাহোঁ, আইহন গাইল, জিআইবাবে, মাইলোঁ, আউলাইল।

২। আনুনাসিকের সঙ্গে যুক্ত মহাপ্রাণ লুপ্ত বা ক্ষীণ হয়। যথা—আহ্মি > আমি, কাহ্ন > কান, তেহ্ন > তেন, যেহ্ন > যেন।

৩। সর্বনামের কর্তৃকারকের 'রা' বিভক্তি দিয়া একবচনের বহুবচনে পরিবর্তন হয়। যথা—আহ্মারা, তোহ্মারা, তারা।

৪। '—ইল'-অন্ত অতীতের এবং '—ইব'-অন্ত ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ হয়। যথা—আহ্মাক বুইল কাহ্নে, কাহ্নাঞিঁ কইল চুম্বনে, কাহ্নাঞিঁ লৈল দধিভার, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস, ডুবিল রাধার সকল পসার, পাঞ্চ সঙ্গতি কাহ্ন করিল আহ্মার, দধিভার লইব আহ্মে, ভার বহিবে গদাধর, মজিব তিন লোক, হাসিব সব লোক।

৫। '—ইল'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের সহিত 'আছ্' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যথা—নানা ফুল ফুটিলছে বৃন্দাবনে, দেখিল কোপিল কাহ্নাঞিঁ রহিলছে পাশে, বাস পাআঁ রহিলছে কেহ্নে।

৬। অসমাপিকার সহিত 'আছ্' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যথা—লইছে।

৭। ষোড়শমাত্রিক পাদাকুলক-চতুষ্পদী হইতে চতুর্দশাক্ষর পয়ারের বিকাশ লক্ষিত হয়। যথা—

হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে।
কুসুম সমূহে শোভে সব তরুগণে ॥

৮। পয়ার ছন্দের উদাহরণ হইতে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অ-কারান্ত পদের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হইত।

৯। শব্দের আদ্য অ-কার অনেক সময়ই আ-কারে পরিণত হইয়াছে। যথা—আঅর, আকারণ আতিশয় ইত্যাদি।

১০। কোনো কোনো তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে আদ্য অক্ষর অ-কারের স্থানে অ-কারই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—কপুর (<কর্পূর)।

১১। ই, ঈ এবং উ, ঊ র ব্যবহারে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম অনুসৃত হইত না। যথা—আখি আখী, উজল উজ্জল ইত্যাদি।

১২। অল্পপ্রাণ বর্ণ কখনো কখনো পরবর্তী হ-কারের সহিত মিলিত হইয়া মহাপ্রাণ হইয়াছে। যথা—এখো (<একহো), তভোঁ (<তবহোঁ) ইত্যাদি। মধ্যে স্বরবর্ণের ব্যবধান সত্ত্বেও।

১৩। দন্ত্য ন-কার ও মূর্ধন্য ণ-কারের ব্যবহারে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম অনুসৃত হইত না। যথা—মন মণ, কেমনে কেমণে, পুনী পুণা ইত্যাদি।

১৪। শ ষ স—ইহাদের যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষিত হয়। যথা—শীতার (সীতার), শলিল (সলিল), ষেষ (শেষ), সশুর (শ্বশুর), সস্য (শস্য) ইত্যাদি।

১৫। য-কারের ও জ-কারের ব্যবহারে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসৃত হইত না। যথা—জান যান।

১৬। চন্দ্রবিন্দুর যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষিত হয়।

১৭। ছন্দের দিক হইতে বিচার করিলে অনুমান করা যায় হ-কারের উচ্চারণ ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। যথা—বারহ (বার) বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী।

১৮। আদিস্থিত ই-কার কোনো কোনো সময় এ-কার হইয়া গিয়াছে ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে।

১৯। কয়েকক্ষেত্রে আদিস্থিত উ-কার ও-কারে পরিণত হইয়াছে। যথা—বুলে বোলে, তুলি তুলিঞাঁ তুলিআঁ তোলী, গুপতে গোপত ইত্যাদি।

২০। কয়েকস্থলে আদিস্থিত ও-কার উ কার হইয়াছে। যথা—গোআলী গুয়ালি।

২১। **শব্দরূপ :** বিশেষ্যের বিভিন্ন বিভক্তিতে নিম্নলিখিত বিভক্তিচিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়।

কর্তা (প্রথমা)—শূন্য বিভক্তি এবং এ য় এঁ ঞে ঞঁ।

কর্ম (দ্বিতীয়া)—শূন্য বিভক্তি এবং ক কে রেঁ এ।

করণ (তৃতীয়া)—শূন্য বিভক্তি এবং এ এঁ ঞঁ এত এঁহে।

সম্প্রদান (চতুর্থী)—শূন্য বিভক্তি এবং ক কে রে রেঁ এরে।

সম্বন্ধ (ষষ্ঠী)—র এর আর কের কার।

অধিকরণ (সপ্তমী)—এ এঁ এত এতে ক ত তে থ।

২২। সর্বনামের নিম্নলিখিত বিভক্তি-চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়।

কর্তা—এ এঁ ঞ বহুবচনে শূন্য বিভক্তি এবং রা।

কর্ম—এ এঁ ক কে ত রে।

করণ—এ এঁ।

সম্প্রদান—এ ক কে কেঁ ত তে র রে রেঁ।

সম্বন্ধ—ক র।

অধিকরণ—এ ত তা তে।

২৩। বিশেষ্যের শব্দরূপের উদাহরণ—

কর্তা—চণ্ডীদাস বিধাতাএ দেবেঁ রাধাঞঁ।

কর্ম—গঙ্গা রাধাক দেবকে লোকেরেঁ।

করণ—উপাএ হাথেঁ রতিঞঁ হাথেত।

সম্প্রদান—হাট যশোদাক কংসকে রাধিকারে কাহ্নেরেঁ।

সম্বন্ধ—বড়ার গাএর আজিকার।

অধিকরণ—দেহে দহেঁ কংসেত মুখেতে দেহত লোকতে।

২৪। সর্বনামের রূপের উদাহরণ—

কর্তা—তো তোঁ তোএ তোএ তোঞিঁ তোঞঁ তোঞেঁ তোহ্মে তুহ্মি তেহেঁ তেহোঁ সে কে কেহো এহি সহ্মে। বহুবচনে—আহ্মারা তোহ্মারা আহ্মেসব তোহ্মেসব।

কর্ম—তাএ মোক তাক তোকে তোহ্মারে।

করণ—তেঁ তেঁ তেএঁ।

সম্প্রদান—কাএ মোক তাকে তোরে।

সম্বন্ধ—মোর তোর।

অধিকরণ—তোহ্মাএ আহ্মাত তোহ্মাতে।

২৫। ধাতুরূপের আদর্শ:

(ক) কর্ ধাতু

বর্তমান সামান্য—

উত্তম পুরুষ—করোঁ করো করি।

মধ্যম পুরুষ—করসি করসী করহ।

প্রথম পুরুষ—করে করন্তি করিএ।

বর্তমান অনুজ্ঞা—

উত্তম পুরুষ—করিউ করিউ।

মধ্যম পুরুষ—করহ কর।

প্রথম পুরুষ—করু।

অতীত—

উত্তম পুরুষ—করিলোঁ কইলোঁ কইল কৈলোঁ কৈলো কৈল।

মধ্যম পুরুষ—করিলি করিলেঁ কইলি কইলে কৈলী কৈল কৈলে কৈলেঁ।

প্রথম পুরুষ—করিল করিলে করী কইল কইলে কৈল কৈলে করিলান্ত।

ভবিষ্যৎ সামান্য—

উত্তম পুরুষ—করিবো করিব।

মধ্যম পুরুষ—করিবেহে।

প্রথম পুরুষ—করিবেঁ করিবে করিবেক।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—

মধ্যম পুরুষ—করিহ করিহলি।

অসমাপিকার রূপ—করিতেঁ করিণাঁ করিলেঁ করিবাক।

(খ) হো ধাতু

বর্তমান সামান্য—

উত্তম পুরুষ—হও হইণ

মধ্যম পুরুষ—হওসি হসি হঅ হস।

প্রথম পুরুষ—হএ হয়ে।

বর্তমান অনুজ্ঞা—

মধ্যম পুরুষ—হ।

প্রথম পুরুষ—হউ হউ হউক।

অতীত সামান্য—

উত্তম পুরুষ—হইলোঁ হইলো হযিলাহোঁ হযিল হৈলাহোঁ হৈলোঁ ভৈলোঁ ভইলোঁ ভযিলোঁ।

মধ্যম পুরুষ—হইলা হযিলাহা হৈলা ভৈলা।

প্রথম পুরুষ—হযিল হৈল ভইল ভৈল ভৈলা ভযিলা হযিলী ভইলী ভৈলী।

অতীত নিত্যবৃত্ত—

প্রথম পুরুষ—হৈত।

ভবিষ্যৎ—

উত্তম পুরুষ—হৈবোঁ হযিব।

মধ্যম পুরুষ—হইবেঁ হইবি।

প্রথম পুরুষ—হইব হয়িব হয়িবে হৈব হৈবে হৈবেঁ হৈবের।

অসমাপিকার রূপ—হইতে হয়িতেঁ হৈলেঁ হয়িলে ভৈলেঁ হইআঁ হুআঁ হয়ি।

(গ) জা ধাতু

বর্তমান সামান্য—

উত্তম পুরুষ—জাওঁ জাই জাইএ যাই যাওঁ।

মধ্যম পুরুষ—জা যাহা।

প্রথম পুরুষ—জাএ জাইএ যাএ।

বর্তমান অনুজ্ঞা—

উত্তম পুরুষ—জাইউ জাইউ যাইউ যাইউ।

মধ্যম পুরুষ—জাহ জাহা।

প্রথম পুরুষ—জাউ জাউ যাউক।

অতীত নিত্যবৃত্ত—

উত্তম পুরুষ—যাইতোঁ।

ভবিষ্যৎ সামান্য—

উত্তম পুরুষ—জাইবোঁ জাইব যাইবোঁ।

মধ্যম পুরুষ—জাইবি যাইবেঁ জাইবেঁ।

প্রথম পুরুষ—জাইবে জাএব।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—

মধ্যম পুরুষ—জাইহ।

অসমাপিকার রূপ—জাইতে যাইতে জাইতেঁ যাইতেঁ জাইবারে জাই জাইবার যাইবাক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির বানানপদ্ধতিও লক্ষ্য করিবার মত বিষয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা' দ্বিতীয় বা ১৯৭০ সংখ্যায় 'প্রাচীন বাংলা ভাষার বানান পদ্ধতি' শীর্ষক প্রবন্ধে।

পাঠপরিচয়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুঁথিটি বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম হইতে আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট পদের সংখ্যা (খণ্ডিত পদসহ) ৪১৮।[১] পুঁথির প্রথম দুইখানি পাতা পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত শেষ পৃষ্ঠার সংখ্যা ২২৬।২। জন্মখণ্ডের ৩।১ পৃষ্ঠা

১. বসন্তরঞ্জন জানাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসংখ্যা (খণ্ডিত সহ) ৪১৫। তাহারপর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ সকল গবেষকেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসংখ্যা ৪১৫ বলিয়া উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। এই সংখ্যা ঠিক নহে। সতর্কতার সহিত পুঁথির পদগুলি গণনা করিলে দেখা যাইবে খণ্ডিত সহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসংখ্যা ৪১৮। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই (১৯৬৬ খ্রী) আমরা

হইতে রাধাবিরহের ২২৬।২ পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত পাতা বা পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই: ৯, ১৬, ১৭।১, ১৯।১, ৪১, ৮৮।২, ৯৩।২, ৯৮।১, ১০৪—১১১ এবং ১৪৫—১৫১।

জন্মখণ্ডের পদসংখ্যা ৯। তাহার মধ্যে প্রথম পদের আদি খণ্ডিত। তাম্বূলখণ্ডের পদসংখ্যা ২৬। পুঁথির ৯ সংখ্যক পাতাটি পাওয়া যায় নাই বলিয়া একটি পদের শেষ খণ্ডিত ও অপর একটি পদের আদি খণ্ডিত। দানখণ্ডের পদসংখ্যা ১১২। পুঁথির ১৬'র পাতা ও ১৭।১ এর পৃষ্ঠা নাই বলিয়া একটি পদের শেষ খণ্ডিত ও অপর একটি পদের আদি খণ্ডিত। দানখণ্ডের ১৯।১ এর পৃষ্ঠা না থাকায় একটি পদের মধ্যের খানিকটা অংশ মিলিতেছে না। দানখণ্ডের ৪১ এর পাতাটি নাই। ফলে একটি পদের শেষ ও অপর একটি পদের প্রথম অংশ মিলিতেছে না। নৌকাখণ্ডের পদসমষ্টি ৩০। ভারখণ্ডে আছে ২০টি পদ। ভারখণ্ডের ৮৮।২ এর পৃষ্ঠাটি নাই। ফলে দানখণ্ডের ১৯।১ এর পৃষ্ঠার ন্যায় একটি পদের মাঝের কিছুটা অংশ মিলিতেছে না। ভারখণ্ডের ৯৩।২ ও ৯৮।১ পৃষ্ঠা না থাকায় দুইটি পদের শেষ অংশ ও দুইটি পদের প্রথম অংশের পাঠ পাওয়া গেল না। ছত্রখণ্ডে ৯টি পদ আছে। পুঁথির ১০৪—১১১ সংখ্যক পাতার অভাব থাকায় ছত্রখণ্ডের শেষ পদটির শেষাংশ খণ্ডিত রহিল। বৃন্দাবনখণ্ডের পদসংখ্যা ৩০। পুঁথির ১০৪—১১১ পাতার মধ্যে কোনো একটি পৃষ্ঠায় বৃন্দাবনখণ্ডটি আরম্ভ হইয়াছিল। ১১২।১ পৃষ্ঠায় বৃন্দাবনখণ্ডের যে পদটি পাইতেছি তাহা খণ্ডিত। প্রথম অংশ নাই। কালীয়দমনখণ্ডে ১০টি পদ আছে। বস্ত্রহরণখণ্ড (যমুনাখণ্ড) ২২টি পদে সম্পূর্ণ। হারখণ্ডে ৫টি পদ আছে। বাণখণ্ডের অন্তর্গত ১৪৫—১৫১ পাতা পাওয়া যায় নাই। ফলে একটি পদের শেষাংশ ও অপর একটি পদের প্রথমাংশ পাইলাম না। বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের পদসমষ্টি যথাক্রমে ২৭, ৪১ ও ৬৯। সুতরাং হিসাব করিলে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসমষ্টি (খণ্ডিত পদসহ) ৪১৮।

সমগ্র পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক রহিয়াছে ১৬১টি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির ২২৬ পাতা অর্থাৎ ৪৫২ পৃষ্ঠার মধ্যে মাঝের মোট ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই। ৪৫২ হইতে ৪৫ পৃষ্ঠা বাদ গেলে ৪০৭ পৃষ্ঠা থাকে। এই ৪০৭

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পদের সংখ্যা ৪১৮ বলিয়া জানাই ("আমরা গণনা করিয়া দেখিতেছি খণ্ডিত পদসহ এই কাব্যগ্রন্থের পদসংখ্যা ৪১৫ নহে, ইহার পদসংখ্যা হইল ৪১৮।" ১ম সংস্করণ, পৃ ৯৫)। অতঃপর তারাপদ মুখোপাধ্যায় 'The Bengali Text Srikrishnakirtana' শীর্ষক প্রবন্ধে (দ্রঃ Bulletine of the School of Oriental and African studies, University of London, 1968) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসংখ্যা ৪১৮ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'ভারতকোষে'র পঞ্চম খণ্ডে (১৯৭৩ খ্রী) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসংখ্যা ৪১৭ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সংখ্যা ঠিক নহে।

পৃষ্ঠায় আমরা ৪১৮টি পদ পাইতেছি। সুতরাং যে ৪৫টি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই তাহাতে যে ৪০—৫০টি পদ ছিল এরূপ অনুমান করা যায়।

পুঁথির লেখা তিন হাতের। পুঁথির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৭। ইহার মধ্যে তৃতীয় হাতের লেখা ৪ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় হাতের ২০ এবং বাকি সবই অর্থাৎ ৩৮৩ পৃষ্ঠা প্রথম হাতের।

পুঁথির লিপি বিচার করিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপিকাল' প্রবন্ধে জানাইয়াছেন, "ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 'কৃষ্ণকীর্তনে'র যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল।" অবশ্য 'The Origin of the Bengali Script' গ্রন্থে তিনি ইহার লিপিকাল পঞ্চদশ শতক বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বিষ্ণু-পুরাণের পুঁথির লিপি (১৪৯৬ খ্রী) হইতে প্রাচীনতর বলিয়াছেন।

রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি ১৪৫০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুলিখিত।

যোগেশচন্দ্র রায় পুঁথির লিপিকাল ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করেন। সুকুমার সেনের মতে, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি প্রাচীন নয় তবে ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ আছে, এবং কাব্যটির শিল্প অবশ্যই প্রাচীন।"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ।

খণ্ডিত পদসহ ৪১৮টি পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ৪০৯টি ভণিতা মিলিয়াছে। কোন্ ভণিতা কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে নিম্নে দেওয়া হইল :

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—৭৫, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ—৫৭, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে—৫৯, বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—৪৯, বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস—২৯, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর—২৭, বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—২৪, বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ—১১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে—১০, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী—৭, গাইল চণ্ডীদাসে—৪, বড়ু চণ্ডীদাস গাএ—৩, বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ—৩, গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে—৩, বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস—২, বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—২, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলীচরণে—২, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আই—২, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস—২, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী—২, বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ দেবী বাসলীচরণে—২, গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে বন্দিআঁ বাসলীচরণে—২, বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে—২, বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—২, অনন্ত নাম বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল দেবী বাসলীগণে —১, মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ—১, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল দেবী বাসলীচরণে—১, গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীগণে—১,

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে—১, বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে—১, বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে—১, দেবী বাসলীচরণ কবী শিরে বন্দন গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—১, তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ—১, বড়ু চণ্ডীদাস গাএ বন্দিআঁ বাসলীচরণে—১, বাসলী শিরে ধরি গাইল চণ্ডীদাসে—১, বড়ু চণ্ডীদাসে গো গাইল বাসলী বরে—১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে—১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস (কাঙ্খাগ্রিঁল) দেবী বাসলী বরে—১, বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—১, গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগণ—১, বাসলীবরে চণ্ডীদাস গাএ—১, বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল গাইল বড়ু চণ্ডীদাস—১, গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে—১, গাইল চণ্ডীদাস বাসলী আশি—১, গাইল চণ্ডীদাস দেবী বাসলীর বরে—১, বাসলীচরণ শিরে বন্দী রাধা ল বড়ু চণ্ডীদাস গাএ—১, গাইল বাসলী বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাসে—১, বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল বড়ু চণ্ডীদাস গাএ—১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীর বরে—১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস সুন বড়ায়ি ল বাসলীগণে—১, বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ল পাআঁ দেবী বাসলীর বরে—১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ ল দেবী বাসলীগণ—১, বন্দিআঁ দেবী বাসলী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী শিরে বন্দিআঁ—১, বাসলী বন্দিআঁ এ বড়ায়ি গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—১, বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস এ—১, গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগতী—১, বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ল—১, বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস—১।

বর্তমান সংকলন-গ্রন্থে নির্বাচিত প্রায় দুইশতটি পদ আছে। পুঁথিতে যে পাঠ আছে সেই পাঠই আমরা হুবহু গ্রহণ করিয়াছি। যেখানে পাঠ অশুদ্ধ বোধ হইয়াছে সেখানে প্রস্তাবিত শুদ্ধ পাঠ পাদটীকায় দিয়াছি। পুঁথিতে যেখানে ছাড় পড়িয়াছে আমরাও সেখানে ফাঁক রাখিয়াছি। তবে অনুমিত পাঠ পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে যে জিনিসটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে—তাহা হইল লিপিকরদের সতর্কতা। পুঁথির পৃষ্ঠায় বেশ কিছু কাটাকুটি ও অশুদ্ধি সংশোধন আছে—এগুলির অধিকাংশই লিপিকরদের স্বহস্তে করা। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিপিকর ব্যতীত অন্য কাহারো কাহারো হস্তাক্ষরের চিহ্নও দেখা যাইতেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপিকর মোট তিনজন। যে লিপিকরের হাতের লেখায় চারটি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে—সেখানে তেমন কোনো অশুদ্ধি বা তাহার সংশোধন নাই। কিন্তু অন্য দুই লিপিকরের লেখায় বেশ কিছু ভুল ভ্রান্তি আছে। ভুল কি রকম? অধিকাংশ ভুল ঘটিয়াছে দ্রুত লিখনের জন্য। অন্যমনস্কতাও কোনো কোনো ভুলের মূল কারণ। লিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক ভুল ধরা পড়িয়াছে লিপিকরের। লিপিকর তখন তা কাটিয়া পরে যাহা লিখিবার তাহা লিখিয়াছেন। কোথাও কোথাও পংক্তির মধ্যে অনাবশ্যক অক্ষর বা শব্দ বসিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই

হয়তো ধরা পড়ে নাই; কিন্তু পরে পড়িয়াছে এবং সংশোধিত হইয়াছে। ' এই শ্রেণীর সংশোধন লিপিকর ব্যতীত অন্য কোনো সংশোধকও করিয়া থাকিতে পারেন।

আর এক শ্রেণীর সংশোধনের নমুনা পাওয়া যায় পুঁথির মধ্যে। যেখানে বর্জনীয়কে বর্জন করিলেই চলে না, নূতন কিছু যোগ করিতে হয়; সেইখানেই তোলাপাঠের ব্যবহার হইয়াছে। তোলা পাঠ কি? আমরা যেমন লিখিতে লিখিতে ছাড় পড়িয়া গেলে অভিপ্রেত স্থানে একটা চিহ্ন বসাইয়া উপরে বা পাশে লেখ্য বস্তুটি লিখিয়া দিই, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকরেরাও প্রায় তদ্রূপই করিয়াছেন। পুঁথিতে দেখা যাইতেছে ছাড়ের নির্দেশ রূপে চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ওই চিহ্নের সোজাসুজি, হয় উপরের বা নীচের মার্জিনে (পাশের মার্জিনে নয়) লেখ্য শব্দ লিখিত হইয়াছে। ইহাকেই পুঁথির তোলাপাঠ বলা নয়। তোলাপাঠের শব্দটির পাশে একটি সংখ্যাবাচক অঙ্কও দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোন্ লাইনে ছাড় পড়িয়াছে ওই অঙ্ক তাহার নির্দেশক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে তোলাপাঠের সংখ্যা কম নয়। এই তোলাপাঠ লিপিকর বা সংশোধক যাহারই হউক পুঁথির প্রত্যেকটি পাতার লেখা যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়া শুদ্ধি অশুদ্ধি পরীক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

পুঁথির অন্তর্গত সংশোধনগুলির প্রকৃতি কি রকম তাহা দেখা যাইতে পারে।

তাম্বূলখণ্ডে 'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনী' পদটিতে রাগতালাদির নির্দেশ আছে এইরূপ—'দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥' ইহার পরেই চিহ্ন দিয়া তোলাপাঠে লেখা হইয়াছে 'অথবা কানড়া ॥ যতিঃ ॥' এখানে দেখা যাইতেছে কেবল পদের মধ্যস্থ পাঠের সংশোধন নয়, সুর-তাল সম্পর্কেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সতর্কতা ছিল লিপিকরগণের।

দানখণ্ডে 'কিসের দান কাহ্নাঞিঁ কিসের ঘাট' পদটির ষষ্ঠ চরণে প্রথম লেখা হইয়াছিল 'পাজী পুথী চিরিবোঁ বাম হাথ'। পরে 'পুথী' ও 'চিরিবো'র মধ্যে 'তোহ্মার' শব্দ তোলাপাঠে বসানো। এই শব্দের সংযোজনে ছন্দের উৎকর্ষ ঘটিয়াছে বলা চলে।

দানখণ্ডে 'নীল জলদ সম কুন্তলভারা' পদটির তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠ পুঁথিতে কিভাবে লেখা আছে বিবৃত করি :

শিশত [সিন্দুরা] শোভএ তোর কামসিন্দুর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূরা ॥

'শিশত'-এর পর সিন্দুরা লেখা ও কাটা।

বসন্তরঞ্জন আদর্শ পাঠ স্থির করিয়াছেন :

শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর ॥

আমাদের প্রস্তাবিত পাঠ :

শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুরা।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূরা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন- পুঁথির ৪৯।২ পৃষ্ঠা : তোলাপাঠের নিদর্শন

দিল বিরোধা॥ আহ্মে দুখমতী নারী আঠকপালী। আসিআঁ পড়িআঁ গেলোঁ কাহ্নের ধামালী॥ ১ ॥ হরি হরি কিসকে চলিলোঁ বড়ায়ি মথু
রা নগর। আহ্মা দুখমতী লআঁ ভৈল আথান্তর॥ ধ্রু॥ দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বরাহ বৎসর। কোণোহো দানীর পোএঁ না দিল
উত্তর॥ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ ভৈল আতি বড়[১] দুরুবার॥ যাণাইবোঁ কং স যেন করএ বিচার॥ ২ ॥ গোআলার ঝি আহ্মে আতিশ
য় বালী। মোর আশ ছাডুক নটক বনমালী॥ এক বেলি কাহ্ন মোর রাখুক সমান। দয়া করী কাহ্ন মোরে দেউ জী
উ দান ॥ ৩॥ কাম্পিতেঁ কান্দিআঁ বোলোঁ তোহ্মার চ রণে। একবার আহ্মা প্রতি দয়া ধর মনে॥ নিবারহ কা
হ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং। জগাদ চতুরঃ[২] কৃষ্ণঃ স
তৃষ্ণো রাধিকাদিমং॥ দেশাগরাগঃ॥ লগনী॥ ক্রীড়া॥ আতি রূপসী পদুমিনী জাতী দেখি থীর নহে মনে। তোর বিরহে চি

১ 'বড়' তোলাপাঠে। ২ 'চতুরঃ'র 'তু' তোলাপাঠে।

পুঁথির উপরের মার্জিনে লেখা 'বড় ৩'। ইহার অর্থ ৩য় ছত্রে 'বড়' শব্দ ছাড় পড়িয়াছে। সোজাসুজি নীচের দিকে তাকাইলে ৩য় ছত্রে একটি অর্ধচন্দ্র চিহ্ন দেখা যাইবে। এই সংকেতস্থলেই 'বড়' বসিবে। নীচের মার্জিনে লেখা 'তু ৬'। 'তু ৬' এর অর্থ ৬ষ্ঠ ছত্রে 'তু' ছাড় পড়িয়াছে। ৬ষ্ঠ ছত্রে অর্ধচন্দ্র সংকেত লক্ষনীয়। পৃষ্ঠার ২য় ছত্রের গোড়ার দিকে সাফ কলমে কাটা 'রহাটে।' লিপিকর প্রথমে 'মথুরার হাটে' লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, পরে শেষের তিনটি অক্ষর কাটিয়া 'নগর' বসাইয়াছেন।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (শ্রাবণ-আশ্বিন ও কার্তিক-পৌষ ১৩৭০) প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা' শীর্ষক প্রবন্ধে উপরের পাঠটিকেই আদর্শ পাঠ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা: "লিপিকর প্রথমে 'শিশত সিন্দুরা' লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে 'সিন্দুরা' কাটিয়া লিখেন 'শোভএ তোর কামসিন্দুর'। পরবর্তী পংক্তি পুঁথিতে এইরূপ আছে: 'প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূরা।' সম্পাদক মহাশয় [বসন্তরঞ্জন] ২য় স্তবকের ১ম পংক্তির শেষ পদ 'কামসিন্দুর' আছে দেখিয়া অন্ত্য মিলের খাতিরে 'সূরা' কাটিয়া 'সূর' করিয়া দিয়াছেন। আমাদের মনে হয় আদর্শ পুঁথিতে 'কামসিন্দুরা'ই ছিল। ২য় স্তবকের ১ম পংক্তির ১ম শব্দের পর যে 'সিন্দুরা' শব্দটি লেখক ভুল করিয়া বসাইয়াছিলেন তাহার আ-কার আসিল কোথা হইতে? ভুলেরও একটা কারণ অবশ্য থাকিবে। আমরা বলি পরে 'সিন্দুরা' দেখিয়াই লিপিকর পূর্বে 'সিন্দুরা' লিখিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার লিখিবার সময় আকারটা ছাড়িয়া গিয়াছেন।...অন্ত্য মিলের জন্য পরের পংক্তির শেষের শব্দ 'সূরা' ছিল। এই 'সূরা'কে কাটিয়া 'সূর' করার কোনো প্রয়োজন নাই। কবি অ-কারান্ত শব্দকে বহুবার আকারান্ত করিয়াছেন। 'সূরা'র আকার লেখক অন্যমনস্কতাবশতঃ লিখেন নাই, সচেতনভাবে লিখিয়াছেন। আলোচ্য পদে কতগুলি অন্ত্য শব্দে আকার যুক্ত হইয়াছে দেখুন। -'কুন্তলভারা', 'শ্রবণযুগলা', 'আনুপামা', 'কমলদলসমা', 'দশন উজলা', 'উতপলা', কোকযুগলা', 'কলেবরা', 'পর্বতকুহরা', 'উপামা'। সুতরাং ২য় স্তবকের ১ম ও ২য় চরণের পাঠ এইরূপ হওয়া উচিত অর্থাৎ এইরূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়:

শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুরা।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূরা।"

দানখণ্ডের 'আরে ভৈরবপতনে গাঅ গডাহলি গিআঁ' পদটির দ্বাদশ ছত্রে লিপিকর প্রথমে লিখিয়াছিলেন 'পাপের খণ্ডন বুধী আহ্মে জাণী'। অতঃপর 'আহ্মে'র পর তোলা পাঠে 'ভালে' বসানো হইয়াছে। ছন্দের পক্ষে ইহার প্রয়োজন ছিল বোঝা যায়।

ভারখণ্ডের 'মাঝ বৃন্দাবন গিআঁ কাহ্নাঞিঁ গোআল' পদটির দ্বিতীয় চরণে লিপিকর প্রথমে লেখেন 'চামড় গাছের কাটিলেক ডাল'। পয়ারের পক্ষে স্পষ্টতঃই দুই মাত্রা কম। 'গাছের' শব্দের পর তোলাপাঠে 'বাছি' বসাইয়া ক্ষতিপূরণ করা হইয়াছে। ওই পদের তৃতীয় চরণের শেষের শব্দ 'করী' ছাড় পড়িয়াছিল, তোলাপাঠে বসানো হইয়াছে।

ভারখণ্ডের 'মো যবেঁ জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পেলাইব ভার' পদের চতুর্থ চরণের পাঠ পুঁথিতে আছে। 'পাঞ্চ দুর্গতি কাহ্ন করিল আহ্মার'। লিপিকর পুঁথিতে প্রথমে 'পাঞ্চ সঙ্গতি' লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি কিংবা আর কেহ 'সঙ্গ' কাটিয়া তোলাপাঠে 'দুর্গ' বসাইয়া দেন। আমাদের মনে হয় 'পাঞ্চ সঙ্গতি'ই আদর্শ পাঠ ছিল। 'পাঞ্চ সঙ্গতি',

'পাঞ্চ আবথা' ইত্যাদি প্রচলিত ইডিয়ম, 'পাঞ্চ দুর্গতি' ইডিয়ম নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'পাঞ্চ দুর্গতি' কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। 'পাঞ্চ সঙ্গতি' বা 'পাঞ্চ আবথা'র প্রয়োগ অনেকবার আছে।

ভারখণ্ডের আর একটি পদের প্রথম দুটি চরণ উদ্ধৃত করি :

কি বহিব ভার তোর বোলে নাহি ভাষ।
লোকতে আহ্মার করাইলেঁ উপহাস॥

লিপিকর প্রথমে 'ভাষ' স্থলে 'লাজ' লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইডিয়মের দিক দিয়া 'ভাষ' অপেক্ষা 'লাজ' অবশ্যই ভাল। তাই লিপিকরের লেখনীতে 'লাজ' শব্দটাই আগে আসিয়া গিয়াছিল। তাহার পর 'লাজ' কাটিয়া 'ভাষ' লিপিবদ্ধ করেন। আদর্শ পুঁথিতে যে 'ভাষ'ই ছিল তাহা বুঝা যায়, কারণ এর পরের ছত্রের শেষে যে শব্দটি আছে তাহা 'উপহাস'।

ছত্রখণ্ডের 'লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল' পদের চতুর্থ চরণের শেষের শব্দটি পুঁথিতে ছিল 'সরোঅরময়ী'। পরে উহার 'অ' কাটিয়া তোলাপাঠে 'ব' বসানো হইয়াছে। এই পরিবর্তনটি লক্ষণীয়। আদর্শ পুঁথিতে সম্ভবত 'সরোঅর'ই ছিল। কবি নিশ্চয় 'সরোঅর' লিখিয়াছিলেন প্রচলিত উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া। এই গ্রন্থেই অন্যত্র 'সরোঅর' শব্দ এই বানানেই ব্যবহৃত হইয়াছে। দানখণ্ডে আছে 'হংস রএ সরোঅরে'। মনে হয় পাঠ-পরীক্ষক ভাবিয়া ছিলেন, 'সরোঅর'কে সংস্কৃত করিয়া 'সরোবর' করিলে কাব্যের মাহাত্ম্য বাড়িবে।

বৃন্দাবনখণ্ডের 'তোর রতি আশোআশেঁ গেলা আভিসারে' পদের এইটি প্রথম ছত্র। এই ছত্রটি পুঁথিতে প্রথমে লিখিত হইয়াছিল 'তোর রতি আশেঁ গেলা আভিসারে'। এই পাঠে অর্থের দোষ কিছু ছিল না, কিন্তু ছন্দে কিঞ্চিৎ খাটো ছিল। তোলাপাঠে 'আশেঁ'র পূর্বে 'আশো' বসাইয়া চৌদ্দ মাত্রা পূরণ করা হইয়াছে।

বস্ত্রহরণখণ্ডের 'কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী' পদের পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ ছত্র :

তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটেঁা।
তাক হাথে করী দুধ না আউটেঁা॥

লিপিকর প্রথমে 'ঘাটেঁা'র স্থলে 'আউটেঁা' লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু সে ভুলটা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে নাই, পরে ধরা পড়িয়াছে। তখন 'আউটেঁা' কাটিয়া নূতন করিয়া 'ঘাটেঁা' লিখিবার স্থান লাইনের মধ্যে নাই। কাজেই 'আউ' কাটিয়া তোলাপাঠে একটি 'ঘা' লিখিত হইয়াছে।

বাণখণ্ডে 'কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল' পদটির দ্বিতীয় চরণে প্রথমে লিখিত হইয়াছিল 'কংস মারিবারে আবতার কৈল'। মধ্যে তোলাপাঠে 'আহ্মে' বসাইয়া 'কংস মারিবারে আহ্মে আবতার কৈল' করা হইয়াছে। এই সংশোধন আদর্শ পুঁথি দেখিয়া হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 'আহ্মে' শব্দটি না থাকিলে বাক্যটি অর্থ ও ছন্দ উভয় দিক দিয়াই অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

রাধাবিরহ অংশের অন্তর্গত 'শত পল সোনা বড়ায়ি লঞাঁ সে মেল' পদের অষ্টাদশ চরণে ছিল 'বাছা রাখিবারেঁ জাএ সে গোকুলে'। তোলাপাঠে 'রাখিবারেঁ'র পর 'কাহ্ন' বসাইয়া করা হইয়াছে 'বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন জাএ সে গোকুলে'। সংশোধনের ফলে ছত্রটির উন্নতি ঘটিয়াছে বুঝা যায়।

এই পদের একবিংশ ছত্রে ছিল 'বৃন্দাবনে কাহ্নাঞি ভালমতে'। তোলাপাঠে 'কাহ্নাঞিঁ'র পর 'চাইহ' বসানো। এ সংশোধনটিরও আবশ্যকতা ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবম সংস্করণে বলা হইয়াছে, তোলাপাঠে 'চাহিহ'। ইহা ঠিক নহে। পুঁথির তোলাপাঠে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা 'চাইহ'।

পুঁথির অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু পাঠসংশোধনের কথা বিশ্লেষণ করা হইল। আমাদের সংকলনে সকল তোলাপাঠের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পাঠ সম্পর্কে সংশয় আছে, গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বসন্তরঞ্জন যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা সে পাঠ গ্রহণ করি নাই। কেন গ্রহণ করি নাই তাহাও নির্দেশ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠ-সংক্রান্ত ব্যাপক আলোচনা করিয়াছেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত কয়েকটি পাঠও যুক্তিযুক্ত। বসন্তরঞ্জনের জীবিতকালে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কয়েকটি পাঠবিচার' করিয়াছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। আমরা এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির অন্তর্গত কয়েকটি শব্দ বা চরণের যথার্থ পাঠ কি হইবে তাহা আলোচনা করি।

জন্মখণ্ডের অন্তর্গত 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ' পদের দ্বাদশ চরণের পাঠটি লক্ষণীয়। এই চরণের যথার্থ পাঠটি কি সে-বিষয়ে মতভেদ আছে। বসন্তরঞ্জন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণে 'করঙ্গরুবিন্দ মাল নির্মিত কমলে'—এই পাঠ দেন। 'করঙ্গরুবিন্দ' ইহার অর্থ লিখিলেন—"করাঙ্গুলিবৃন্দ। বিদ্যাপতিতে পদাঙ্গুলি অর্থে 'পাঙ্গুর' শব্দের প্রয়োগ আছে।" আর 'মাল' শব্দের টীকায় লিখিলেন—"প্রাকৃত মালং। মালা।" অতঃপর বসন্তরঞ্জন দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) এই অংশ পরিবর্তন করিয়া পাঠ দিলেন 'করকুরুবিন্দমাল'। 'কুরুবিন্দ'-এর অর্থ লিখিলেন "পদ্মরাগ-সদৃশ মণিভেদ।" ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পাঠবিচার' প্রবন্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বসন্তরঞ্জনের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠে অর্থের অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া আপত্তি জানাইলেন ও দ্বিতীয় সংস্করণের 'করকুরুবিন্দ' অপেক্ষা প্রথম সংস্করণের 'করঙ্গরুবিন্দ' পাঠ শুদ্ধতর বলিয়া মন্তব্য করিলেন। অতঃপর বসন্তরঞ্জন শহীদুল্লাহর যুক্তি গ্রহণ করিয়া তৃতীয় ও পরবর্তী সংস্করণে প্রথম সংস্করণের 'করঙ্গরুবিন্দ-মাল' পাঠই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আমাদের মনে হয় পুঁথির যথার্থ পাঠ—'করকুরুবিন্দ মণি'। দ্বিতীয় সংস্করণে বসন্তরঞ্জনও 'করকুরুবিন্দ' গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি যে-শব্দটিকে 'মাল' বলিতেছেন আসলে পুঁথিতে সেটি 'মণি'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে ণ ন ল দেখিতে অনেকটা একই রকম। তদ্রূপ া-কার ও ি-কার উভয়ের মধ্যে

পার্থক্য সামান্য। তবে সামান্য হইলেও প্রভেদ আছে। আমরা মনে করি যথার্থ পাঠ 'মাল' নয় 'মণি'। এ-বিষয়ে তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ যুক্তিসঙ্গত। (—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, লিপি-কলা এবং পাঠ-বিভ্রাট)। সুতরাং সমগ্র চরণটির পাঠ দাঁড়াইল 'করকুরুবিন্দ মণি নির্ম্মিত কমলে।'।

দানখণ্ডের 'আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো' পদটির তৃতীয় চরণের পাঠ মূল পুঁথিতে আছে, 'কানড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন'। বসন্তরঞ্জন আদর্শ পাঠ স্থির করিয়াছেন, 'শ্রীফল যোড় বড়ায়ি মোর দুই তন'। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পাঠবিচার' প্রবন্ধে জানাইয়াছেন, "দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রথম পক্তির 'কানড়ী খোঁপা' লিপিকর প্রমাদে পুনর্লিখিত হইয়াছে। বোধহয় 'শ্রীফল সম' এইরূপ পাঁচ অক্ষরযুক্ত কোন পাঠ ছিল।" বসন্তরঞ্জনের প্রস্তাবিত 'শ্রীফল যোড়' পাঠ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সমর্থন করেন নাই। তিনি লিখিতেছেন, "পয়োধরের উপমা হিসাবে শ্রীফলের উপরেই কবির পক্ষপাত বেশী। বসন্তবাবু সেটা লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ 'শ্রীফল' বসাইয়াছেন। ভালই হইয়াছে, তাহাতে আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু 'যোড' বসাইলেন কেন, 'যোড'-এর স্থানে আর কিছু বসাইলেন না কেন? কবির অভিপ্রায় কি ছিল তাহা যখন জানা নাই এবং অনুমান দিয়াই যখন অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে হইবে তখন কবির প্রযুক্ত শব্দাবলীর উপর নির্ভর করাই সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত। কৃষ্ণকীর্তন পুঁথির মধ্যে 'শ্রীফল' এবং 'যোড়' এই দুই শব্দের পাশাপাশি অবস্থান আর নজরে পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ যে শব্দ বসাইতে হইবে তাহার মাত্রাসংখ্যা হওয়া উচিত ছয়। 'শ্রীফল যোড়' পাঁচ মাত্রা, জোর করিয়া ছয় মাত্রা করিতে হইবে। অথচ কবির নিজের ব্যবহৃত ছয় মাত্রার শব্দ অনেক আছে। 'শ্রীফল' শব্দটি রাখিয়াও ছয় মাত্রা পাওয়া যায়। যেমন 'শ্রীফল সদৃশ' 'শ্রীফল যুগল' 'পাকিল শ্রীফল'। ইহাদের মধ্য হইতেই একটিকে লই না কেন? 'শ্রীফল যোড় বড়ায়ি মোর দুই তন' ইহার জায়গায় যদি করি 'শ্রীফল যুগল বড়ায়ি মোর দুই তন' তাহা হইলে ছন্দ নির্দোষ হয় এবং আমরা কবির অধিকতর নিকটবর্তী হইতে পারি।"

যদিও রাধা এই দানখণ্ডেই নিজের স্তনকে 'শ্রীফলসদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী' বলিয়াছে, তথাপি আমরা পুঁথির 'কানড়ি খোঁপা' পাঠের স্থলে 'শ্রীফল সম' 'শ্রীফল যোড়' বা 'শ্রীফল সদৃশ' 'শ্রীফল যুগল' 'পাকিল শ্রীফল' ইত্যাদি কোনো পাঠ গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি না। পুঁথিতে 'কাড়ড়ি', তাহার পর তোলাপাঠে 'ন' বসাইয়া 'কানড়ি' করা। বসন্তরঞ্জন তাঁহার প্রথম সংস্করণে 'কানড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন' এই পাঠই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারাপদ মুখোপাধ্যায় বসন্তরঞ্জনের এই পাঠের সমর্থক। এই পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ দাঁড়ায়—কানড়ি খোঁপা ও আমার স্তনদ্বয় দেখিয়া কৃষ্ণ লুব্ধ হইয়াছে। পদের প্রথম দুই চরণে রাধা বড়াইকে বলিতেছে—হে বড়াই, তুমি যাও নাপিতকে ডাকিয়া আন। আমি আমার এই কানড়ি খোঁপা মুণ্ডিত করিব। এই দুই চরণ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে—কেন? কানড়ি খোঁপা কি দোষ

করিল? ইহারই উত্তর আছে পদের তৃতীয়-চতুর্থ চরণে। আমরা পুঁথির পাঠটিকেই আদর্শ পাঠ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি।

দানখণ্ডের 'নাহিঁ পুরে কাহ্নাঞিঁর প্রথম যৌবন' পদটির সপ্তম চরণের পাঠ পুঁথিতে ছিল, 'তাহার হোতিত নহে আহ্মার মরণ'। বসন্তরঞ্জনের মতে আদর্শ পাঠ 'তাহার হাথত নহে আহ্মার মরণ'। আমাদের প্রস্তাবিত আদর্শ পাঠ 'তাহার হাথত হএ আহ্মার মরণ।' ইহাতে পদটির প্রসঙ্গ অনুযায়ী অর্থ অধিকতর পরিষ্কার হয়।

বসন্তরঞ্জনের সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪২) 'রাধাবিরহে'র অন্তর্গত 'হাথে চান্দ মানী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী' পদের ১১-১২ চরণটি নিম্নরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল :

দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর ডাল যেন তখনে পালাইল॥

এই পাঠটির প্রসঙ্গে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (৪৮ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা) তিনি লেখেন, "লিপিতে জল ও ডাল একরূপ। সুতরাং লিপিকরের ভ্রম সম্ভব। প্রকৃত পাঠ 'জল'। লিপিকর মূলের 'যেহ্ন' স্থানে 'যেন' আধুনিক পাঠ দিয়াছেন। যেন কুহকীর ডাল তখনই পলাইল—এইরূপ উপমা কষ্টসাধ্য। টীকায় ঝালিআ অর্থে কুহকী লেখা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। এখানে ঝালিআ শব্দের দুইটী অর্থ সঙ্গত—(১) ঝারি=গাছে জল দিবার সচ্ছিদ্র পাত্র (চলন্তিকা)। (২) ঝালি=জল সেচনকালে জল জমিবার গর্ত (নূতন বাঙ্গালা অভিধান, আশুতোষ দেব)।" বসন্তরঞ্জন তাঁহার গ্রন্থের ৩য় সংস্করণে (১৩৪৯) 'ডাল' তুলিয়া 'জল' বসান এবং পাদটীকায় লেখেন 'পুথিতে ডাল'। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তাঁহার প্রবন্ধে 'ঝালিআর ডাল যেন তখনে পালাইল'—এই পাঠই আদর্শ পাঠ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তিনি এই চরণটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, "ঐন্দ্রজালিকের তৈয়ারি গাছের ডাল যেমন মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হয় শ্রীকৃষ্ণ তেমনি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন।" আমরাও পুঁথির পাঠটিকেই আদর্শ পাঠ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকের পাঠগুলিও বিশেষ লক্ষণীয়। বিষয়টি আমরা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়েই আলোচনা করিয়াছি। অদ্যাবধি এই সংস্কৃত শ্লোকগুলির মূল পাঠের প্রতি কেহ আকৃষ্ট হন নাই। সকলেই বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত পাঠকেই পুঁথির পাঠ হিসাবে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমরা পুঁথি মিলাইয়া দেখিয়াছি সংস্কৃত শ্লোকগুলির বসন্তরঞ্জন প্রদত্ত পাঠ ও পুঁথির পাঠ সম্পূর্ণ এক নয়, বহু স্থলেই আবিষ্কর্তা-সম্পাদক কর্তৃক মূল পাঠের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পুঁথি আবিষ্কার ও প্রকাশের পর এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সবকটি সংস্কৃত শ্লোকের মূল পাঠ সংকলিত হইল।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

সংকেত

অ--অশুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ বলিয়া অনুমিত

প্র—প্রস্তাবিত পাঠ

বড়ু চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

[অথ জন্মখণ্ডঃ]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠা[1]

রস শঙ্ক ॥ ৬ ॥

সভাপতি আর সব সভাসদ জন।
আলপমতীএঁ তোহ্মাতে শরণ ॥ ৭ ॥

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৮ ॥

সভাপতি এবং সভাসদগণ, আমি অল্পমতি তোমাদের শরণ লইলাম ॥ ৭ ॥ · বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৮ ॥

পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান্।
ততঃ সরভসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ॥

কবির উক্তি পৃথিবী গুরুভারজনিত দুঃখের কথা দেবতাগণকে বলিলেন। তখন দেবগণ সত্বর হইয়া কংসের বিনাশে মনোযোগী হইলেন ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১ ॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সম্ভেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥

---

১ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩।১, পুঁথির প্রথম দুইটি পাতা পাওয়া যায় নাই।

ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে নানা রূপেঁ কইলেঁ আস্থরের খএ।
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥
হেন শুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥
এহি দুই কেশ হৈবে বস্থলের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাস্থরের বিনাশে।
হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥
সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

কবির উক্তি: সকল দেবতা মিলিয়া স্বর্গে সভা করিলেন। কংসের জন্য সৃষ্টি বিনষ্ট হইতেছে ॥ ১ ॥ কি উপায়ে উহার মৃত্যু হয়। সকলেই ইহা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বলিলেন ॥ ২ ॥ ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া সাগরে গেলেন। জলমধ্যে অবস্থিত হরিকে তাঁহারা এইরূপ স্তব করিয়া তুষ্ট করিলেন ॥ ৩ ॥ তুমি নানাভাবে অস্থর বিনাশ করিলে, তোমার লীলায় কংসের বধ হইতে পারে ॥ ৪ ॥ এই কথা শুনিয়া নারায়ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া একটি শ্বেত এবং একটি কৃষ্ণ কেশ তাঁহাদের হাতে দিলেন ॥ ৫ ॥ বলিলেন, বস্থদেবের গৃহে দৈবকীর উদরে এই দুইটির একটি হলী বলরাম রূপে আর একটি কৃষ্ণ বনমালীরূপে আবির্ভূত হইবেন ॥ ৬ ॥ ইহারই হাতে কংসাস্থরের বিনাশ হইবে।—এই বর পাইয়া দেবগণ আপন স্থানে ফিরিয়া গেলেন ॥ ৭ ॥ এবং উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৮ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আয়িলা দেবের স্থমতি শুণী।
কংসের আগক নারদ মুনী ॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী ॥ ধ্রু ॥
খণে খণে হাসে বিণি কারণে।
খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে ॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥ ২ ॥

লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে ॥
উঠিআঁ সব বোলে আনচান।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৩ ॥
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ ॥
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি : দেবতাগণের মন্ত্রণার কথা শুনিয়া নারদমুনি কংসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাথার চুল এবং দাড়ির চুল পাকা, বামনের মত খর্বদেহ আর বেশ মর্কটের মত ॥ ১ ॥ নারদ মুখ বিকৃত করিয়া উন্মত্তবৎ ভেকের গতিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ধ্রু ॥ নারদ ক্ষণে ক্ষণে বিনা কারণে হাসেন, কখনও খোঁড়া সাজেন, কখনও কানা হন, এইভাবে তিনি নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকেন। তাহা দেখিয়া সকল লোক রঙ্গবোধ করিল ॥ ২ ॥ তিনি কখনও লাফ দিয়া আকাশ ধরিতে যান কখনও বা মাটিতে চিত হইয়া শুইয়া পড়েন, আবার উঠিয়া আবোলতাবোল বকিতে থাকেন, বিনা কারণে ঘন ঘন মাথা নাড়েন ॥ ৩ ॥ ঘন ঘন জিভ বাহির করিয়া বোকা ছাগলের মত শব্দ করিতে থাকেন। ইহা দেখিয়া কংসের হাসি পাইল। বাসলী বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কোণ সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহিঁ জাণ এবেঁ তোঁ আপণার নাশ ॥
যে হৈবক দৈবকীর গর্ব্ভ অষ্টম।
অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম ॥ ১ ॥
কহিলোঁ মোঁ ই সকল তোহ্মার ঠাএ।
এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপাএ ॥ ধ্রু ॥
হেন সব শুণী কংস হৈল সচকীত।
সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তির[১] হীত ॥
এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ব্ভ হএ।
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥ ২ ॥
আসিআঁ নারদ তবেঁ সত্বরে আপণে।
সকল কহিল তত্ত্ব বসুদেব থানে ॥

১ অ। প্র : চিন্তিল।

এবেঁ দৈবকীঞঁ যত গর্ব্ভ ধরিব।
পাপ দুঠ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব ॥ ৩ ॥
আষ্টম গর্ব্ভ হৈব দেব নারায়ণে।
সেই উপদেশ দিব তোক্ষাকে তখণে ॥
সেই উপদেশেঁ হয়িব সকল রক্ষণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

নারদের উক্তি হে কংস, কি সুখে তোমার মুখে এত হাসির উদয় হইল। তোমার বিনাশ আসন্ন তাহা তুমি জান না। দৈবকীর অষ্টম গর্ভে যাহার জন্ম হইবে, মহাবল সেই বীর তোমার কালস্বরূপ ॥ ১ ॥ আমি তোমার নিকটে সব কথা বলিলাম, এখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া নিজের জীবনরক্ষার উপায় স্থির কর ॥ ধ্রু ॥ কবির উক্তি: এইসব কথা শুনিয়া কংস সচকিত হইলেন এবং সকল পাত্রমিত্র লইয়া আপন কল্যাণ চিন্তা করিলেন। এখন হইতে দৈবকীর যখনই যত সন্তান হইবে সবই বিনষ্ট করিবার জন্য তিনি লোক নিযুক্ত করিলেন ॥ ২ ॥ নারদ তখনই সেখান হইতে বসুদেবের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সকল সংবাদ দিলেন। বলিলেন এখন হইতে দৈবকীর উদরে যে সন্তান জন্মিবে দুষ্ট কংস তাহাদের হত্যা করিবে ॥ ৩ ॥ ভগবান নারায়ণ অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই সময় তোমাকে প্রয়োজনমত উপদেশ দিব। সেই উপদেশে সকল দিক রক্ষা হইবে। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কহুগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

নারদের মুখে শুণী কংস মাহাবীর।
একেঁ একেঁ মাইল ছয় গর্ব্ভ দৈবকীর ॥ ১ ॥
সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে।
দুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে ॥ ২ ॥
পূর্ব্বে ছয় গর্ব্ভ তার মায়িল কংশাসুরে।
তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে ॥ ৩ ॥
দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।
সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল ॥ ৪ ॥
মাএর গর্ব্ভপাত ছল করিআঁ।
আপণে রহিলা রোহিণীগর্ব্ভ গিআঁ ॥ ৫ ॥
যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।
সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥ ৬ ॥
তাহাক আষ্টম গর্ব্ভ জাণী দৈবকীর।
আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ॥ ৭ ॥

স্বপুরুষ গর্ভ্ত ধরল আত্মরূপ।
দিনে দিনে বাড়ি গেল দৈবকীর রূপ ॥ ৮ ॥
ক্রমে দৈবকীর গর্ব্ভ হৈল দশ মাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

কবির উক্তি : মহাবীর কংস নারদের মুখে (নারায়ণের জন্মপ্রসঙ্গ) শুনিয়া একে একে দৈবকীর ছয় গর্ভ বিনাশ করিলেন ॥ ১ ॥ সেই অবসরে দেবগণ সকলে মিলিয়া দৈবকীর উদরে কেশদুইটি সংবিষ্ট করিলেন ॥ ২ ॥ পূর্বে কংসাসুর তাঁহার ছয় গর্ভ বিনষ্ট করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া দৈবকী কম্পিত হইলেন ॥ ৩ ॥ যে শ্বেতকেশটি দৈবকীর উদরে প্রবেশ করিল তাহাই মহা পরাক্রমশালী বলভদ্রের রূপ গ্রহণ করিল ॥ ৪ ॥ ইনি জননীর গর্ভপাতের ছল করিয়া রোহিণীর গর্ভে গিয়া আশ্রয় লইলেন ॥ ৫ ॥ যে কৃষ্ণকেশ দৈবকীর উদরে রহিল তাহাই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ লইল ॥ ৬ ॥ ইহাই দৈবকীর অষ্টম গর্ভ জানিয়া মহাবীর কংস প্রহরার জন্য লোক নিযুক্ত করলেন ॥ ৭ ॥ মহাপুরুষ উদরে আবির্ভূত হওয়ায় দৈবকীর রূপ দিনে দিনে বর্ধিত হইল ॥ ৮ ॥ এই ভাবে গর্ভকাল দশমাস পূর্ণ হইল। বাসলীকে বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৯ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে।
নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে ॥
হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী।
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী ॥ ১ ॥
রোহিণী আষ্টমী তিথি ল।
জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ বসুল জাণিল।
নিন্দে আকুল গোকুলের লোক ভৈল ॥
যশোদার কণ্যা সেই খনে উপজিল।
নিন্দভোলেঁ যশোদাএঁ তাক না জাণিল ॥ ২ ॥
বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে।
কংশের পহরী না জাণিল নিন্দভোলে ॥
কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল।
পার হআঁ বসুল নান্দের ঘর গেল ॥ ৩ ॥
যশোদার কোলে দিআঁ শিশু বনমালী।
বসুল আণিল ঘরে যশোদার বালী ॥
তার রাএ কংসের পহুরী চিআইল।
দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল ॥ ৪ ॥

কংশে কণ্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ।
কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ॥
নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে।
শুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে॥ ৫॥
প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল।
তনপান ছলে কাহ্ন তাক সংহরিল॥
তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল।
একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল॥ ৬॥
কেশি আদি[১] আসুর পাঠাইল আনন্তরে।
তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে॥
হেনমর্তে গোকুলে বাঢ়িলা দামোদর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৭॥

কবির উক্তি: ঘনবর্ষণমুখর অন্ধকাব রাত্রি। বিজয় নামক শুভমুহূর্তে শঙ্খ-চক্রগদাপদ্ম ধারণ করিয়া জগতের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন॥ ১॥ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইল॥ ধ্রু॥ দেবানুগ্রহে বসুদেব তাহা জানিতে পারিলেন। গোকুলের অধিবাসীগণ নিদ্রায় অভিভূত হইল। সেই সময় যশোদার একটি কন্যা জন্মিল, নিদ্রাবেশে যশোদা তাহা জানিতে পারিলেন না॥ ২॥ বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে লইয়া চলিলেন, নিদ্রাভিভূত প্রহরী তাহা জানিতে পারিল না। কৃষ্ণকে দেখিয়া যমুনা পথ ছাড়িয়া দিল, বসুদেব পার হইয়া নন্দগৃহে পৌছিলেন॥ ৩॥ যশোদার কোলে শিশু কৃষ্ণকে রাখিয়া বসুদেব যশোদার কন্যাকে গৃহে আনিলেন। তাহার ক্রন্দনে কংসের প্রহরীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে কংসের নিকট গিয়া দৈবকীর প্রসবসংবাদ জানাইল॥ ৪॥ কংস সেই কন্যাকে পাথরে আছড়াইয়া হত্যা করিলেন। তখন সেই কন্যা অন্তরীক্ষ হইতে বলিল, তোমাকে যে বধ করিবে সেই বালক নন্দগৃহে বাড়িতেছে। ইহা শুনিয়া কংস তাহাকে হত্যা করিবার উদ্‌যোগ করিলেন॥ ৫॥ প্রথমে কংস পূতনাকে এই কর্মে নিযুক্ত করিলেন কিন্তু কৃষ্ণ স্তনপানের ছল করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন। অনন্তর কংস যমলার্জুনকে প্রেরণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এক আঘাতেই তাহাদের বধ করিলেন॥ ৬॥ কংস তাহার পর কেশী আদি অসুরকে পাঠাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া তাহাদের সবাইকে বিনষ্ট করিলেন। এইভাবে দামোদর ধীরে ধীরে গোকুলে বাড়িতে লাগিলেন। বাসলী বরপ্রাপ্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৭॥

কোড়ারাগঃ॥ একতালী॥

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ॥

---

১ 'আদি' তোলাপাঠে। বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো সংস্করণে এই তোলাপাঠের উল্লেখ নাই।

চন্দনতিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে ॥ ১ ॥
সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী ॥
আবতার করি করে ধরণীত কেলী ॥ ধ্রু ॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল ॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কন্নযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল[১] ॥ ২ ॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
করকুরুবিন্দ মণি নির্ম্মিত কমলে[২] ॥
মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল ॥ ৩ ॥
মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
সজল জলদরুচি জিণি দেহকান্তী ॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

কবির উক্তি: কৃষ্ণের কুঞ্চিত ঘন কোমল ও সুদীর্ঘ কেশরাশি। তাহাতে মনোহর ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে। চন্দন তিলকে কপাল শোভিত। তাঁহার ললাটের দুইপার্শ্ব লঘু এবং মধ্যস্থল উন্নত ও প্রশস্ত ॥ ১ ॥ দেবগণের অনুরোধে হরি বনমালী ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন ॥ ধ্রু ॥ তাঁহার নাসিকা এবং লোচনদ্বয় সুন্দর সুগঠিত। ভ্রূযুগল ধনুকের ন্যায় বঙ্কিম। ওষ্ঠাধর যুগ্ম প্রবালসদৃশ, কর্ণযুগ বরুণের জালের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ২ ॥ আজানুলম্বিত করযুগল করিকরসদৃশ। করকমল কুরুবিন্দ মণি নির্মিত। বক্ষস্থল মরকত মণিফলকসদৃশ; কটিদেশ সূক্ষ্ম, জঙ্ঘাদ্বয় রামরম্ভার ন্যায় ॥ ৩ ॥ মাণিক্যখচিত চন্দ্রের ন্যায় নখপংক্তি। কংসবধের উদ্দেশ্যে বত্রিশ রাজলক্ষণসমন্বিত মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৪ ॥ রত্নালঙ্কারে তাঁহার

১ পুঁথিতে এই পাঠ আছে। বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সকল সংস্করণেই এই পাঠ। কেবল সর্বশেষ (নবম) সংস্করণে ভুল পাঠ মুদ্রিত—'কন্নযুগ শোভে বরুণের জাল।'

২ বসন্তরঞ্জন এই চরণের পাঠ ধরিয়াছেন 'করঅর্কবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে'। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দেহ সুশোভিত। তাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র, তাঁহার হাতে বাঁশি। কৃষ্ণ প্রতিদিন বৃন্দাবনে গিয়া গোরক্ষা করেন। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৫ ॥

ধান্নুষীরাগঃ[১] ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥
তেকারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥ ধ্রু ॥
তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহনী ॥
শিরীষকুসুমকোঅলী।
অদভুত কনকপুতলী ॥ ২ ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তনু লীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥
দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুলিল আইহনে ॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি: দেবগণ লক্ষ্মীকে বলিলেন, হে রাধা, তুমি শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও, সকল সংসার স্থির হউক ॥ ১ ॥ সেই কারণে তিনি পৃথিবীতে সাগরের ঘরে পদ্মার উদরে জন্ম লইলেন ॥ ধ্রু ॥ ত্রিভুবনজনমনোহরা, মদনানন্দদায়িনী, শিরীষকুসুমকোমলা, কনকপুত্তলীসদৃশ অপূর্ব সুন্দরী রাধা জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ২ ॥ দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় তাঁহার তনুলাবণ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে ষোলকলা পূর্ণ হইল। কৃষ্ণের মনোভিলাষ জানিয়া দেবগণ তাঁহাকে নপুংসক আইহনের পত্নী করিলেন ॥ ৩ ॥ রাধার রূপ-যৌবন দেখিয়া আইহন মাকে বলিলেন বড়াইকে ইহার কাছে রাখ। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

গুঞ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
ঝাঁট গিআঁ পদুমার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥

১ পুঁথিতে 'ধান্নুষীরাগঃ'। সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবম সংস্করণে 'ধনুষীরাগঃ' মুদ্রিত।

চাহি নৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি ॥ ১ ॥
নিয়োজিলী নানা পরকারে। আল ॥
হাট বাটে রাধা রাখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ॥
শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে ॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুঈ আখি ॥ ২ ॥
মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী ॥ ৩ ॥
কাঠী সম বাহুযুগলে।
নীভিমূলে দুঈ কুচ লুলে ॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি: আইহনের মা মনে মনে চিন্তা করিয়া শীঘ্রই পদ্মার নিকট হইতে বৃদ্ধাকে চাহিয়া আনিল। এই বৃদ্ধা পদ্মার পিসী, রাধার বড়াই ॥ ১ ॥ রাধাকে হাটে বাটে, নানাভাবে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইল ॥ ধ্রু ॥ তাহার চুল শ্বেত চামরের মত সাদা, দুইপাশে কপাল বসিয়া গিয়াছে। ভ্রূযুগল দেখিতে যেন দুইটি চুনের রেখা। আর চোখ দুইটি গর্তে ঢুকিয়া গিয়াছে ॥ ২ ॥ নাকের মাঝখানটা বসা, গাল তোবড়ানো, গালের হাড় দুইটা উঁচু, দাঁতগুলা বীভৎস, ঠোঁট দুইটা উটের ঠোঁট অপেক্ষাও খারাপ, আর কথাবার্তা কাপট্যপূর্ণ ॥ ৩ ॥ তাহার দুই বাহু কাঠির মত সরু, স্তনদ্বয় নাভিদেশ পর্যন্ত লম্বিত, পায়ে বল নাই তাই আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

অভিমন্যুজনন্যাহং নিযুক্তা তব রক্ষণে।
রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ ॥ ১ ॥
ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিতা।
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে ॥ ২ ॥

বড়াইর উক্তি: হে রাধা, অভিমন্যুর জননী তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে। অতএব হৃষ্টমনে আমার সহিত মথুরায় চল ॥ ২ ॥

রাধার উক্তি: হে বৃদ্ধা, তুমি মধুর ব্যবহারে সুনিপুণ। তুমি যে আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছ তাহা আমার সৌভাগ্য। অতএব চল মথুরায় যাই ॥ ২ ॥

অথ তাম্বূলখণ্ডঃ

গুজ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ।
নেত বাস ওহাড়ন দিআঁ ॥ ল রাধা ॥
সব সখিজন মেলি রঙ্গে।
একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥
নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
বনপথে মথুরা নগরী ॥ ল রাধা ॥ ধ্রু ॥
এক দিনে মনের উল্লাসে।
সখি সমে রস পরিহাসে ॥
আগু গেলি সত্বর গমনে।
বড়ায়িক না করী যতনে ॥ ২ ॥
বকুলতলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী ॥
বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে ॥ ৩ ॥
রাধিকা গুণিআঁ মনে মনে।
বড়াইর বিলম্ব কারণে ॥
বন মাঝেঁ পাইল তরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি: রাধা দধিদুধে পসার সাজাইয়া তাহাতে নেতবস্ত্রের আবরণ দিয়া সকল সখীকে সঙ্গে লইয়া বড়াইয়ের সহিত হৃষ্টমনে গমন করেন ॥ ১ ॥ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাধা বনপথ দিয়া প্রতিদিন মথুরায় যান ॥ ধ্রু ॥ সখীদের সহিত মনের আনন্দে রঙ্গপরিহাস করিতে করিতে একদিন রাধিকা বড়াইকে ছাড়াইয়া দ্রুতপদে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন ॥ ২ ॥ বড়াই ইতিমধ্যে অন্যপথে চলিয়া গেল। গোপকন্যা রাধা বকুলতলায় পৌঁছিয়া পথে বড়াইকে না দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন ॥ ৩ ॥ বড়াইয়ের কেন এত বিলম্ব হইতেছে রাধিকা আপন মনে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বনের মধ্যে ভয় পাইলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে।
ভালমনে পথক না দেখে নয়নে ॥

নাতিনীব মোহে বডাযি মনে বিমরিষে।
কমণ উপায় করোঁ জাওঁ কোণ দিশে ॥ ১ ॥
পথ হাবাইল বডায়ি মাঝ বৃন্দাবনে।
দৈবে সে জাণএ যাব যেহেন ঘটনে ॥ ধ্রু ॥
মনেত গুণেত বডাযি আধিক তরাসে।
কথাঁ গিআঁ পাওঁ মোএঁ রাধার উদ্দেশে ॥
একসবী হৈলোঁ মোএঁ হেন ঘোব বনে।
রাধিকা এডিআ আজি জীবো কেনমনে ॥ ২ ॥
কথো দূর পথ গিআঁ দেখিল বডায়ি।
বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই ॥
তাক দেখি বডায়িব মনেত হরিষে।
এহা বাথোআল পুছো বাধার উদ্দেশে ॥ ৩ ॥
হেন মনে গুণী বডাযি গেলান্তি তথাঞিঁ।
দেখিল লগুড কবে নাতিআ কাহ্নাঞিঁ ॥
হরিষে মেলিলী বডাযি তাহার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি রাধিকাকে হারাইযা বডাই স্থানে স্থানে ঘুবিতে লাগিল। বুড়ি ভাল কবিয়া পথ দেখিতে পায না। নাতনীব জন্য দুঃখিত মনে, কি উপায় করি কোন্ দিকে যাই, এই চিন্তা কবিতে লাগিল ॥ ১ ॥ মাঝবৃন্দাবনে বডাই পথ হারাইয়া বসিল। কাহাব অদৃষ্টে কি আছে তাহা বিধাতাই জানেন ॥ ধ্রু ॥ বড ভয পাইয়া বডাই মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কোথায গেলে রাধার উদ্দেশ পাইব ? গহনবনে বাধার সঙ্গ হারাইলাম বাধাকে ছাডিয়া আজ কি করিযা প্রাণ ধরি ॥ ২ ॥ খানিকটা পথ অতিক্রম করিয়া বডাই দেখিতে পাইল বৃন্দাবনেব মধ্যে বহুসংখ্যক গাই চবিতেছে। তাহা দেখিয়া বডাই খুশী হইযা ভাবিল, এই রাখালকে রাধার উদ্দেশ জিজ্ঞাসা কবি ॥ ৩ ॥ মনে মনে এই কথা চিন্তা করিযা বডাই সেখানে গেল এবং পাচনি হাতে নাতি কানাইকে দেখিতে পাইয়া হৃষ্টমনে তাহাব নিকটে উপস্থিত হইল। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

পাহাডীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥ একতালী ॥

আচম্বিত বুঢী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।
বিনয করিআঁ পুছন্তি দেববাজে ॥ ১ ॥
কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে ॥ ২ ॥
গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢী গোআলিনী।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী ॥ ৩ ॥

পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুত্রা কাহ্ণাঁ দেহ তুহ্মি ॥ ৪ ॥
সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী।
কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ববাণী ॥ ৫ ॥
কি নাম তাহার কেহ্নে তার রূপ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ ॥ ৬ ॥
দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ৭ ॥
নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী।
কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী ॥ ৮ ॥
সরূপ কহিবোঁ তবেঁ মথুরার পথ।
যে কাজ বোলোঁ তোহ্মাক তাত কর সত ॥ ৯ ॥
বোলা এক বোলোঁ তোকে যবেঁ ধর মনে।
তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা দরশনে ॥ ১০ ॥
তোঁ মোর নাতি যেহ্ন তুঅজ পরাণ।
তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন ॥ ১১ ॥
সত্যেঁ সত্যেঁ করিবোঁ মো তোহ্মার বচন।
যবেঁ আন করোঁ তাক বধওঁ বাহ্মণ ॥ ১২ ॥
উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে।
তবেঁ ভালমতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে ॥ ১৩ ॥
কাহ্নের বচনে বড়ায়ি পাইল হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

কবির উক্তি : বৃন্দাবনের মধ্যে অকস্মাৎ বুড়িকে দেখিয়া দেবরাজ কৃষ্ণ সবিনয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : কোথা হইতে তুমি এখানে আসিলে এবং কি কারণেই বা আসিলে? বৃন্দাবনের মধ্যে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছই বা কেন ॥ ২ ॥ বড়াইর উক্তি : আমি বুড়ি গোয়ালিনী গোষ্ঠ হইতে আসিতেছি। আমার সুন্দরী নাতিনী আমাকে ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে ॥ ৩ ॥ পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে আমি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। তুমি বাবা আমাকে মথুরার পথটি বলিয়া দাও ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : নাতিনীকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াও কেন? কোথায় তাহাকে হারাইলে ঠিক করিয়া বল ॥ ৫ ॥ তাহার কি নাম কেমন রূপ সব ভাল করিয়া বল ॥ ৬ ॥ বড়াইর উক্তি : ত্রৈলোক্যসুন্দরী নাতিনীকে লইয়া দধিবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মথুরা অভিমুখে যাইতে যাইতে বৃন্দাবনের পথেই তাহাকে হারাইয়াছি ॥ ৭ ॥ আমার নাতিনীর নাম চন্দ্রাবলী। হে বনমালী আমার নাতিনী কোমলাঙ্গী তন্বী বালিকা ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : মথুরার পথ কোন্ দিকে তাহা তোমাকে বলিয়া দিব। কিন্তু সত্য করিয়া বল

আমি যাহা বলিব তাহা তুমি নিশ্চয় করিবে ॥ ৯ ॥ আমি একটি কথা বলিব তাহাতে যদি সম্মত হও তাহা হইলে নিশ্চয় রাধার সহিত তোমার দেখা করাইয়া দিব ॥ ১০ ॥ বড়াইর উক্তি : তুমি আমার নাতি দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। তোমার বাক্য অন্যথা করিব না ॥ ১১ ॥ সত্য করিয়া বলিতেছি তোমার বাক্য আমি পালন করিব। যদি না করি আমার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : রাধার সংবাদ যদি বলিতে হয় তাহা হইলে ভাল করিয়া তাহার রূপের বর্ণনা কর ॥ ১৩ ॥ কবির উক্তি : কৃষ্ণবচনে বড়াই হৃষ্ট হইল। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুর ॥
কনককমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে ॥ ১ ॥
মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।
পদুমিনী আহ্মার নাতিনী রাধানামা ॥ ধ্রু ॥
ললিত আলকপাতিকাঁতি দেখি লাজে।
তমালকলিকাকুল গহে বনমাঝে ॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল ॥ ২ ॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে ॥
কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।
অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে ॥ ৩ ॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি : তাহার কেশপাশে সুরঙ্গসিন্দুর দীপ্তি পাইতেছে, সজল কৃষ্ণ মেঘের মধ্য দিয়া যেন নবসূর্য উদয় হইল। কনককমলের মত তাহার অম্লান আননের দ্যুতি, তাহা দেখিয়া চন্দ্র দুই লক্ষ যোজন দূরে প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥ আমার নাতিনী অনুপম রূপবতী, দেখিলে মুনির মনও মোহপ্রাপ্ত হয়। পদ্মিনী সেই সুন্দরীর নাম রাধা ॥ ধ্রু ॥ তাহার অলকাবলীর ললিতকান্তি দেখিয়া তমালকলিকাসমূহ অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছে। তাহার কজ্জলশোভিত অলসলোচন দেখিয়া নীলোৎপল জলে প্রবেশ করিয়া তপস্যামগ্ন হইয়াছে ॥ ২ ॥ সুন্দরীর কণ্ঠদেশ দেখিয়া শঙ্খের লজ্জা হইল, সে ত্বরাসহকারে সমুদ্রের

জলে গিয়া প্রবেশ করিল ॥ ৩ ॥ তাহার মনোহর পযোধরযুগল দেখিয়া পক্ক দাড়িম্ব অভিমানে বিদীর্ণ হইল ॥ ৪ ॥ তাহার কটিদেশ ক্ষীণ, বিপুলনিতম্ব গুরুভার, তাহার গতি মত্ত রাজহংস অপেক্ষাও সুন্দর, সুন্দরীর নবযৌবন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥
অথবা কানড়া ॥ যতিঃ ॥[১]

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥
দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ায়ি ল ॥ ১ ॥
পরাণ অধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে ॥ ধ্রু ॥
কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধু পীএ ॥
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।
তেকারণে থীর নহে মনে ॥ ২ ॥
আতিশয় বাঢে মোর মদনবিকার।
তাত কর মোর উপকার ॥
এ থানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার ভাগে।
মোর কাজ তোহ্মাতে লাগে ॥ ৩ ॥
একবার মোর তোহ্মে কর উপকার।
আহ্মে দেব সংসারের সার ॥
রাধিকা মানাআঁ বড়ায়ি পুর মোর আশ।
বাসলী[২] বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : হে বড়াই, তোমার মুখে রাধিকার রূপের বিবরণ শুনিয়া আমি আর প্রাণ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। মদনের দারুন পুষ্পশরের আঘাতে আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি ॥ ১ ॥ হে বড়াই, তুমি আমার প্রাণের অধিক প্রিয়, তোমাকে সকাতরে অনুরোধ করি, রাধাকে সম্মত করিয়া আমার কাছে আনিয়া দাও ॥ ধ্রু ॥ বসন্তকাল, বৃক্ষলতা কুসুমিত হইয়াছে, তাহাতে মধুকর বসিয়া মধু পান করিতেছে। পিকগণ পঞ্চম স্বরে গান ধরিয়াছে। তাই আমার মন ধৈর্য মানিতেছে না ॥ ২ ॥ হে বড়াই, আমি

১ 'অথবা কানড়া ॥ যতিঃ ॥' তোলাপাঠে। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২ ছাড়। প্র: শিরে।

মদনজ্বালায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। আমার সৌভাগ্য বশতই তুমি আসিয়াছ, দয়া করিয়া আমার এই কাজটি কর ॥ ৩ ॥ হে বড়াই, আমি ত্রিলোকের অধিপতি। তুমি রাধিকাকে বলিয়া-কহিয়া আমার আশা পূর্ণ কর। বড়াই একবার তুমি আমার এই উপকার কর। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতি।
চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণশকতি ॥
তোহ্মার আন্তরে তাক করিবোঁ শকতী।
আয়র মানায়িবোঁ করী আশেষ যুগতী ॥ ১ ॥
বোলহ সুন্দর কাহ্নু রাধার উদ্দেশে।
তথাঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে ॥ ধ্রু ॥
এ সব কাজের আহ্মে জাণিএ প্রবন্ধ।
এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ ॥
পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে।
এ কাজ সাধিব আহ্মে করিআঁ যতনে ॥ ২ ॥
আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি।
সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ॥
আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।
তাক লআঁ জাই আহ্মে রাধিকার থানে ॥ ৩ ॥
বিলম্ব না কর বোল রাধার উদ্দেশে।
আর কিছু দেহ কাহ্নাই উত্তম সন্দেশে ॥
ঝাঁট করী জাই আহ্মে রাধার উদ্দেশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি : আমি তোমার বড়াই, তুমি আমার নাতি। সুতরাং যথাসাধ্য তোমার মঙ্গলের কথা অবশ্যই চিন্তা করিব। তোমার জন্য নিশ্চয় তাহার মন পাইতে চেষ্টা করিব, নানাবিধ যুক্তি দিয়া তাহাকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিব ॥ ১ ॥ এখন, হে কৃষ্ণ, রাধার উদ্দেশ বলিয়া দাও। সেখানে গিয়া আনন্দিত মনে তোমার কার্য সাধন করিব ॥ ধ্রু ॥ এসব কাজের কলাকৌশল আমার জানা আছে। তোমার জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি। তোমাদের দুইজনের মধ্যে প্রেমবন্ধন হইবেই। আমি চেষ্টা করিয়া এ কার্য নিশ্চয় সাধন করিব ॥ ২ ॥ যাহা অজোড় আমি তাহাকেও জুড়িতে পারি। রাধিকা আর এমন কি? সে কি সীতার মত সতী? আমার হাতে কিছু ফুল-পান দাও তাহা লইয়া আমি রাধার কাছে যাই ॥ ৩ ॥ এখন আর দেরি না করিয়া রাধার উদ্দেশ

বলিয়া দাও আর আমার হাতে কিছু সন্দেশও দাও। আমি সত্বর যাইয়া রাঁধার সন্ধান করি। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী প্রকীর্ণক ॥

কথা থানি থানি কহিল বড়ায়ি বসিআঁ রাধার পাশে।
কর্পূর তাম্বুল দিআঁ রাধাক বিমুখ বদনে হাসে ॥ ল বড়ায়ি ॥ ১ ॥
কহির কপুর তাম্বুল বড়ায়ি কহির নেত পাটোল।
নেআলী মাহ্লী আওর নানা ফুল কে দিআঁ পাঠাইলে মোর ॥
ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥
আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।
বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ ॥ ল রাধা ॥ ৩ ॥
এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা হাণএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ ॥ ৪ ॥
উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল হেন কাম না করিএ।
নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন তোর দরশনে জীএ ॥ ৫ ॥
ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা ॥ ৬ ॥
যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥ ৭ ॥
ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতী[১] ॥ ৮ ॥
নাগর শেখর নান্দের সুন্দর উপেখিল মতিমোখে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

কবির উক্তি : বড়াই রাধার পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে অনেক কথা বলিল। তাহার পর তাহার হাতে কর্পূর তাম্বুল দিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি : এ কর্পূর কোথায় ছিল, এ পান কোথায় ছিল, এই নেতবস্ত্রই বা আসিল কোথা হইতে? নবমল্লিকা মালতী প্রভৃতি ফুলই বা আমার কাছে কে পাঠাইয়াছে ॥ ২ ॥ বড়াইর উক্তি : তবে তোমাকে বলি শোনো। কৃষ্ণ বিরহজ্বালায় বড়ই কাতর। বিকলহৃদয় সেই কৃষ্ণই তোমার কাছে এইসব পাঠাইয়াছে ॥ ৩ ॥ কবির উক্তি : এ কথা শুনিয়া রাধিকা নিজের শরীরে আঘাত হানিতে লাগিল এবং ফুল, পান, কর্পূরে পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দিল ॥ ৪ ॥ বড়াই তখন উঠিয়া রাধাকে বলিল : এমন কাজ করিতে নাই। ত্রিভুবনবন্দিত নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে দেখিলে প্রাণে বাঁচিবে ॥ ৫ ॥ রাধার উক্তি : ঘরে আমার

১ অ। প্র : হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী।

সর্বাঙ্গসুন্দর সুলক্ষণযুক্ত স্বামী আছেন। নন্দের ঘরের গোপালক রাখালের সঙ্গে কি আমার কখনো প্রেম হইতে পারে ॥ ৬ ॥ বড়াইর উক্তি : যে দেবতাকে স্মরণ করিলে পাপ নাশ হয়, যাঁহাকে দেখিলে মুক্তি হয়, তাঁহার সহিত যে প্রেম করে বিষ্ণুলোকে তাহার স্থান হয় ॥ ৭ ॥ রাধার উক্তি পরপুরুষের সহিত প্রেম করিয়া যাহার বিষ্ণুলোক লাভ হয় সে নারীর জীবনে ধিক্। এমন রমণীর স্বামীর জলে ডুবিয়া মরুক ॥ ৮ ॥ কবির উক্তি নাগরচূড়ামণি নন্দনন্দনকে রাধা বুদ্ধিভ্রংশ হেতু উপেক্ষা করিল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৯ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এত কালে বুঢ়ী । তোর কেহ্নে হেন মন ।
ভাল বুলিবে তোর স্তা কোন জন ॥
আদি অন্ত এগো বোল না বোলসি ভাল ।
মারিবোঁ পরাণে লোক জানানা গোআল ॥ ১ ॥
দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহিঁ লাজ ।
তেকারণে মোক বোলসি হেন কাজ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর ।
সামী দুরুবার মোর নহোঁ সতন্তর ॥
মো যবে জাণোঁ তোর হেন দুষ্ট মতী ।
তবেঁ কেহ্নে আসিবোঁ মোঁ তোহ্মার সংহতী ॥ ২ ॥
তোঁ মোর বড়াযি মোঁ তোর নাতিনী ।
এবেসি তোহ্মার মুখে শুণী হেন বাণী ॥
আর যবেঁ বোল মোরে হেন পরিহাস ।
আবসি করিবোঁ তবেঁ তোহ্মার বিনাশ ॥ ৩ ॥
এহা গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা ।
আপণাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা ॥
এহা বুলী বড়াযিক চড়ে মাইল রোষে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই এই বয়সে এ তোমার কি রকম মতিগতি? এসব কথা শুনিয়া তোমাকে কে ভাল বলিবে? আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত একটি কথাও তো তুমি ভাল বলিতেছ না। গোপালক আইহনকে জানাইয়া তোমাকে প্রাণে মারিব ॥ ১ ॥ বড়াই তোমার স্বভাব অতি মন্দ, তোমার একটুও লজ্জা নাই, তাই আমাকে এমন কাজ করিতে বলিতেছ ॥ ধ্রু ॥ বার বার এমন কথা আমাকে বলিও না। আমার স্বামী দুর্বার এবং আমি স্বাধীন নহি। তোমার যে এমন দুষ্ট অভিপ্রায় তাহা আগে জানিলে

তোমার সঙ্গে আমি আসিব কেন ॥ ২ ॥ তুমি আমার দিদিমা, আমি তোমার নাতনি। তাই তোমার মুখে এমন কথা শুনিলাম। কিন্তু আর যদি এই রকম পরিহাসবাক্য বল তাহা হইলে অবশ্যই তোমার বিনাশ সাধন করিব ॥ ৩ ॥ এই পানসুপারি তুমি নিজেই খাও। ভাল চাও তো কৃষ্ণের কাছে একলাই ফিরিয়া যাও ॥ কবির উক্তি: এই বলিয়া রাধা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বড়াইকে এক চড় মারিল। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের ঘরে গিআঁ সাঁঝ সমএ।
বড়ায়ি বুইল হেন আইহনের মাএ ॥
চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হুএ।
এবেঁ মথুরার হাট জাইতেঁ জুআএ ॥ ১ ॥
বোল রাধিকারেঁ সহি বড়ই যতনে।
যেহ্ন জাএ রাধা কালি বডই বিহাণে ॥ ধ্রু ॥
আপণে ভাবিআঁ দেখ থীর করী মণে।
বিণী বিকীএঁ হএ গোআলের ধনে ॥
আহোনিশি আহ্মে সহি তোর ভাল চাহী।
তেঁসি সংহতী করি নিতেঁ চাহোঁ রাহী ॥ ২ ॥
আহ্মে আপুণী জাইব সংহতি তাহারে।
কেহো তবেঁ কিছ বোল বুলিতেঁ না পারে ॥
গোআলের বহু ঝি লইআঁ জাইব আহ্মে।
তার মাঝেঁ রাধাহো পাঠাআঁ দেহ তোহ্মে ॥ ৩ ॥
হেনমতেঁ আইহন মাএর আনুমতী।
বড়ায়ি লইআঁ দিল রাধিকার প্রতী ॥
তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি: সন্ধ্যাকালে আইহনের গৃহে গিয়া বড়াই আইহনের মাকে এই কথা বলিল। বড়াইর উক্তি: অনেকদিন যাবৎ দধিদুধ ঘরে নষ্ট হইতেছে। এখন মথুরার হাটে যাওয়া উচিত ॥ ১ ॥ সখী রাধিকাকে ভাল করিয়া বল যেন কাল খুব সকালে উঠিয়া যায় ॥ ধ্রু ॥ তুমি মনস্থির করিয়া নিজেই ভাবিয়া দেখ না, বেচাকেনা না হইলে কি গোয়ালার ধন বাড়ে? আমি দিবারাত্র তোমার মঙ্গল কামনা করি তাই রাধাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চাই ॥ ২ ॥ আমি নিজেই তাহার সঙ্গে যাইব, তাহা হইলে কেহ কোনো কথা বলিতে পারিবে না। গোয়ালার বউ-ঝিদের লইয়া আমি যাইব। রাধাকেও তুমি তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিও ॥ ৩ ॥ কবির উক্তি: এইভাবে বড়াই

রাধিকাকে আইহনের মায়ের অনুমতি আনিয়া দিল। তখন রাধা হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজিআঁ পসার।
নেত বসন দিআঁ উপরে তাহার ॥
আনুমতী লআঁ রাধা সাম্ভড়ীর থানে।
লাস বেশ করে রাধা বড়ই বিহানে ॥ ১ ॥
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
সব সখিজন লআঁ আতি বড় রঙ্গে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।
আনত কপাল তার আধ শশি জিনী ॥
কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ॥ ২ ॥
তিলফুল জিনী নাসা কম্বু সম গলে।
কনকযুথিকামালা বাহু যুগলে ॥
কমলকলিকা সম তার পয়োভারে।
ডমরু সদৃশ মধ্য নাভি গম্ভীরে ॥ ৩ ॥
গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে।
চরণযুগল থলকমল আকারে ॥
করিরাজ জিণী রাধা করিল গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি: রাধা ঘৃত দধি দুধ এবং ঘোল দিয়া পসরা সাজাইয়া তাহার উপর নেতবস্ত্রের আবরণ দিলেন। অতি প্রত্যুষে শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া মনোহর বেশ পরিধান করিলেন ॥ ১ ॥ বড়াই ও সখীদের সহিত আনন্দিত মনে মথুরায় চলিলেন ॥ ধ্রু ॥ রাধার মুখখানি শতদলের মত সুন্দর, নয়ন দুইটি হরিণের মত চঞ্চল। আনতকপাল অর্ধচন্দ্রের শোভাকেও জয় করিয়াছে। মহুয়ার ফুলের সহিত তাহার গণ্ডদ্বয়ের তুলনা হয়, তাহার ওষ্ঠ ও অধর বন্ধুলী ফুলের ন্যায় রক্তিম ॥ ২ ॥ রাধার নাসিকা তিলফুল অপেক্ষাও সুন্দর, কণ্ঠদেশ শঙ্খের ন্যায় সুদর্শন, দুই বাহু যেন স্বর্ণযূথিকার দুইটি মালা, পয়োধরযুগল যেন দুইটি পদ্মকোরক। কটিদেশ ডমরুর মত, নাভিদেশ গভীর ॥ ৩ ॥ রাধিকার জঘন নিতম্ব গুরুভার, চরণতল স্থলপদ্মের মত, গজরাজনিন্দিত গতিতে সে মথুরার পথে চলিল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

অথ দানখণ্ডঃ

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সিশের সিন্দুর তোর লাসে।
মাথার কেশ সুবেশে ॥
আহ্মাকে না চিহ্নসি তোহ্মিঁ।
সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
দান আহ্মার পরমাণে। এ রাধা ল।
না কর মনে আন ভানে ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দুধ লঞাঁ তোএঁ যাসী।
ধাঞাঁ ধাঞাঁ মথুরা পালাসী ॥
আহ্মা ছাড়ী জাইবি কোণ পথে।
আজি পড়িলা মোর হাথে ॥ ২ ॥
মুঠি এক মাঝা বাএ হালে।
তা দেখি মুনিমন টলে ॥
ডাকর ডালিম দুই কুচে।
নান্দসুত কাহ্নাঞিঁকে রুচে ॥ ৩ ॥
সুঝি যাহা মোর সব দানে।
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥
রাধা মোর না কর নিরাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : তোমার সীমন্তে সিন্দুর শোভা পাইতেছে, মাথার কেশরাশি সুবিন্যস্ত। আমি কৃষ্ণ, সকল গোপীর মনোরঞ্জন করি। আমায় তুমি চেন না ॥ ১ ॥ রাধিকে, আমি দানী, দান আদায় করিয়া থাকি, আর কিছু ভাবিও না ॥ ধ্রু ॥ তুমি ঘৃত দধি দুধ লইয়া যাও, ছুটিয়া ছুটিয়া মথুরায় পলায়ন কর। আজ আমার হাতে পড়িয়াছ, আজ আমাকে এড়াইয়া কোন্ পথে যাও দেখিব ॥ ২ ॥ তোমার কটি এত ক্ষীণ যে হাতের মুঠিতে ধরা যায়, বাতাসে নুইয়া পড়ে। তাহা দেখিয়া মুনির মনও বিচলিত হয়। পরিণত দাড়িম্বের মত তোমার স্তনযুগল নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর ॥ ৩ ॥ আমার প্রাপ্য সব দান শোধ করিয়া যাও নহিলে আলিঙ্গন দাও। রাধা আমাকে নিরাশ করিও না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী।
রতি পতিআশে ভৈল পথে মহাদাণী ॥

ষোল শত গোপী জাএ আপণ ইছাএ।
দারুণ করম দোষে আহ্মাকে রহাএ ॥ ১ ॥
পরাণে[১] বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
তোর পরসাদেঁ ঘর জাওঁ একবার ॥ ধ্রু ॥
তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে।
কিসকে বাখানে কাহ্নু মোর দুঈ তনে ॥
চির কাল জীউ মোর সামী আইহন।
আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন ॥ ২ ॥
সব খন পরদারে উদ্গত মতী।
এতেকেঁ বুঝিল তার বড় কুল জাতী ॥
তা সমে নাহিঁক বড়ায়ি মোর কোণ বোল।
মিছা নঠ করে কাহ্নু মোর ঘৃত ঘোল ॥ ৩ ॥
খণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠেঁঠা দান।
মিছা কেহ্নে করে কাহ্নাঞিঁ মোর অপমান ॥
তার পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: বড়াই গো, নির্লজ্জ চক্রপাণির একটি কথাও ভাল নয়, রতি-প্রত্যাশায় পথে মহাদানী সাজিয়া বসিয়াছে। ষোলশত গোপিনী স্বাধীনভাবে যাওয়া-আসা করিতেছে। আমার কপাল মন্দ, তাই আমাকেই পথে আটকাইয়া রাখে ॥ ১ ॥ প্রাণের বড়াই, তুমি ইহার একটি প্রতিকার কর, তোমার দয়ায় একবার বাড়ি ফিরি ॥ ধ্রু ॥ আমার যৌবনে (তার গোত মুণ্ডিলেক?)। আমার স্তনযুগলের ব্যাখ্যান করে কেন? আমার স্বামী আইহন চিরজীবী থাকুন—যাঁহার বলবীর্য অতুলনীয়, যাঁহার বুদ্ধি অতিশয় প্রখর ॥ ২ ॥ কৃষ্ণ সর্বদাই পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত, তাহাতে বোঝা যায় তাহার জাতিকুল কত বড়। তাহার সহিত আমার কোনো সংস্পর্শ নাই, সে কেন অনর্থক আমার ঘৃত ঘোল নষ্ট করে ॥ ৩ ॥ মিছামিছি সে কেন আমায় অপমান করে। এই সব গণ্ডগোল, দানের নামে এই সব ধৃষ্টতা এবার বন্ধ হওয়া আবশ্যক। আমার যৌবন তাহার উপভোগের যোগ্য নহে। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে।
তেকারণে আইলোঁ মোএঁ যমুনার তীরে ॥

১ অ। প্র: পরাণ।

নিতি নিতি যাহা তোহ্মে মথুরা নগরে।
সব সুবিধান দান দেহ ত আহ্মারে ॥ ১ ॥
দিবেহেঁ দধির দাণ সুনহ গোআলীনী।
কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদাণী ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
দেহ দধি ঘৃত দান যত হএ লেখে।
পসারের দান দিআঁ যাহা একে একে ॥
অভরস না কর সত্য আহ্মে বুইল।
তোহ্মার কারণে আহ্মে মাহাদাণ লইল ॥ ২ ॥
আহ্মার বচন তোহ্মে শুন শশিমুখী।
নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী ॥
এহা জাণী মোকে দেহ আলিঙ্গন দানে।
আপণ গৌরব রাধা রাখহ আপণে ॥ ৩ ॥
লেখা করে কাহ্নাঞিঁ আপণে খড়ী পাড়ী।
বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী ॥
হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : রাজার কাছে পথের শুল্ক এবং হাটের শুল্ক আদায় করিবার ভার লইয়াছি, সেইজন্য যমুনাকূলে আসিলাম। তুমি প্রতিদিন মথুরা নগরে যাও, বিধিমত সকল দান এবার আমাকে দাও দেখি ॥ ১ ॥ হে গোপিনী, কি কি দান দিতে হইবে শোনো। দধি ঘৃত প্রভৃতি পসরার সব জিনিসের দাম হিসাবমত এক এক করিয়া দাও। অবিশ্বাস করিও না, সত্যই বলিতেছি আমি তোমার জন্যই মহাদান গ্রহণ করিয়াছি ॥ ২ ॥ শশিমুখী রাধিকা, আমার কথা শোনো। প্রেমের জন্য লোকে অনেক ত্যাগ করে—এই কথা মনে রাখিয়া আমাকে আলিঙ্গন দাও। নিজের মান নিজেই রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণ নিজেই খড়ি পাতিয়া হিসাব করিয়া বলিলেন, রাধা, তোমার নয় লক্ষ কড়ি বাকি পড়িয়াছে। না হয় নিজেই হিসাব করিয়া দেখ। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান।
শুণ তোহ্মে আল রাধা পাঁজী পরমান ॥ ১ ॥
নিতি দধি বিকে জাওঁ মথুরার হাটে।
মিছাই কাহ্নাঞিঁ তোঁ আগোলসি বাটে ॥ ২ ॥
আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট।
আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট ॥ ৩ ॥

বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার সভাএ।
কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ ॥ ৪ ॥
বারহ বরিষের দাণ স্থনহ মুগধী।
মোহোর করমেঁ তোহ্মা আণি দিল বিধী ॥ ৫ ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোর রাখোআল মতী।
পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিমাখিতী ॥ ৬ ॥
রাখোআল হঞাঁ তোর কংসের গোসাঞিঁ।
ত্রিভুবনে আহ্মা সম আর বীর নাহিঁ ॥ ৭ ॥
কাহাক দেখাহ তোহ্মে এত বীরপণে।
টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে ॥ ৮ ॥
তোর কংসে মোর কিছু করিতেঁ না পারে।
তোহ্মারি সে রূপেঁ মোরে মারিবারে পারে ॥ ৯ ॥
না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ হেন পাপবাণী ॥
তোহ্মে ভালে জাণো আহ্মে আইহনের রাণী ॥ ১০ ॥
বারহ বরিষেকের দিআঁ যাহা দানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : হে রাধা, বার বৎসরের মহাদান তোমার কাছে বাকি পড়িয়াছে, এই পঞ্জিকা তাহার প্রমাণ ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি : হে কানাই, আমি প্রতিদিন মথুরার হাটে দধি বিক্রয় করিতে যাই। আজ মিছামিছি তুমি আমার পথরোধ করিতেছ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : রাধা তুমি পরমরূপবতী। তোমার পরিধানে পট্টবস্ত্র। তোমার ললাটে অলকাতিলকা শোভা পাইতেছে ॥ ৩ ॥ রাধার উক্তি : আমি উচ্চবংশের বধূ, আমার স্বভাবও মহৎ কুলের অনুরূপ। আমি কাহারও কাঁচা (জমির) আলে পা দিই না ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : অল্পবুদ্ধি রাধা তোমাকে বলি শোনো। বার বৎসরের কর তোমার কাছে পাই। আজ আমার ভাগ্য ভাল, বিধাতা তোমাকে আনিয়া দিয়াছেন ॥ ৫ ॥ রাধার উক্তি : কৃষ্ণ, তোমার বৃত্তি রাখালী, তোমার চরিত্রও রাখালের মত। প্রান্তরে একলা অসহায় পাইয়া আমাকে অপমান করিতেছ ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : রাখাল হইয়াও আমি তোমাদের কংসেরও প্রভু। ত্রিভুবনে আমার সমান বীর আর একজনও নাই ॥ ৭ ॥ রাধার উক্তি : এত বীরপনা কাহাকে দেখাইতেছ ? কংস খড়্গের এক আঘাতে তোমার প্রাণ লইবেন ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : তোমার কংস আমার কিছুই করিতে পারে না। আমাকে যে মারিতে পারে সে কেবল তোমার রূপ ॥ ৯ ॥ রাধার উক্তি : ছি ছি কৃষ্ণ এমন পাপকথা বলিও না। আমি যে আইহনের পত্নী ইহা তুমি ভাল করিয়াই জান ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : তবে বার বৎসরের বাকি দান শোধ করিয়া যাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১১ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে ।
সকল বএসে মোর এগার বরিষে ।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥
এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ ।
লোক স্থণিলে তোকে হৈব উপহাস ॥ ১ ॥
পন্থ ছাড়ি দেহ কাহ্নাঞি বিরোধ না কর ।
তোর পুণ্যে জাওঁ বিকে মথুরা নগর ॥ ধ্রু ॥
নাগরশেখর তোহ্মে নামে বনমালী ।
তোর যোগ নহোঁ মোএঁ আতিশয় বালী ॥
আধিক পীডএ যবে ভুখিল ভষলে ।
তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমলমুকুলে ॥ ২ ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী ।
মোর রুপ যৌবনে তোহ্মাতে কী ॥
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে ।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥ ৩ ॥
রতিকথা সখিমুখে না শুণীলোঁ কানে ।
বারেক রাখহ কাহ্নাঞি আহ্মার সমানে ॥
চরণে ধরোঁ তোর দেব নারায়ণ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : হায়, আমার বয়স মোটে এগার বৎসর, বার বৎসরের দান কেমন করিয়া চাহিতেছ ? তোমার কাজের রীতি কি প্রকার তাহা ইহাতেই বুঝা গেল। লোকে একথা শুনিলে তোমাকে উপহাস করিবে ॥ ১ ॥ হে কৃষ্ণ, বিরোধ না করিয়া আমার পথ ছাড়িয়া দাও, দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে মথুরা নগরে যাই ॥ ধ্রু ॥ তুমি বনমালী নাগরচূড়ামণি, আমি নিতান্তই বালিকা, তোমার যোগ্য নহি। ক্ষুধার্ত ভ্রমর অতিশয় পীড়ন করিলেও কমলকলি হইতে মধু পায় না ॥ ২ ॥ আমি সম্ভ্রান্তলোকের বধূ, সম্ভ্রান্ত-লোকের কন্যা, আমার রূপযৌবনে লোভ করিয়া তোমার কি লাভ ? গাছের উপরে পাকা বেল দেখিয়া কাকের লোভ হয় কিন্তু সে বেল সে খাইতে পারে না ॥ ৩ ॥ আমি সখীমুখেও রতিকথা শুনি নাই। হে কৃষ্ণ তুমি আমার মান রাখ, হে নারায়ণ আমি তোমার পায়ে ধরিয়া মিনতি করি। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর ।
প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥ ১ ॥

যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে ॥ ২ ॥
তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরুপেঁসি জাণ।
তোহ্মে মোর সব তীথ তোহ্মে পুণ্যস্থান ॥ ৩ ॥
এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ ॥ ৪ ॥
হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী ॥ ৫ ॥
এ বোল বুলিতেঁ তোর মণে বড় সুখ।
পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥ ৬ ॥
ভাল বোল বুলিলি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী।
আহ্মার মণের কথা কহিলেঁ আপুণী ॥ ৭ ॥
বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল ॥ ৮ ॥
জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : তোর রূপ দেখিয়া আমার চিত্ত অস্থির হইয়াছে। আমার বুক ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া যাইতে চাহিতেছে ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি : প্রাণ যাহার ফাটিয়া বাহির হয়, বুক যে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, সে গলায় পাথর বাঁধিয়া জলে ডুবিয়া মরুক ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : রাধা সত্য জানিও, তুমিই আমার গঙ্গা, তুমিই আমার বারাণসী। হে রাধা, আমার সকল তীর্থ আমার সকল পুণ্যস্থান তোমারই মধ্যে অবস্থিত ॥ ৩ ॥ রাধার উক্তি : ছি ছি একথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় না। হে দেবরাজ, আমি যে তোমার মাতুলানী ইহা ভুলিও না ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : আমি দেবরাজ আর তুমি আমার রাণী। কেন মামী ভাগিনার মিথ্যা সম্বন্ধ পাতাইতেছ ॥ ৫ ॥ রাধার উক্তি : কোন্ সাহসে এমন কথা বলিতেছ। যে চোর সে কি বুক ফুলাইয়া পরের ঘরে প্রবেশ করে ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : চন্দ্রাবলী তুমি ভাল কথা বলিয়াছ। আমার মনের কথাটি তুমি নিজেই বলিয়া ফেলিয়াছ ॥ ৭ ॥ রাধার উক্তি : মদনজ্বালায় তুমি ছট্‌ফট্ করিতেছ। জরুয়ারোগী যেমন অম্বল দেখিলে লালায়িত হয় তোমার অবস্থা তেমনই হইয়াছে ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : গোয়ালিনী, তুমি যাইবার আশা ছাড়। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৯ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে।
চাণ্ডাল কাহ্নাঞিঁ এবেঁ বল করে ॥

দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ।
সোদর ভাগিনা হআঁ হেন তোর কাজ ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ লাজ নাহিঁ তোরে।
লাজ না বাসাস তোএঁ গোকুল কাহ্ন।
সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান ॥ ধ্রু ॥
জীবার উপায় নাহিঁ বোল মাহাদানী।
বাছিআঁ পাইলি সোদর মাউলানী ॥
পোএর মুখে পরবত টলে।
গুরু সাপে[১] বেঢ়িলের আলপ কালে ॥ ২ ॥
বারেঁ বারেঁ কাহ্ন মো দধি বিকে জাওঁ।
সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাওঁ ॥
কিসের কারণে তোঁ এবেঁ করসি বল।
বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর ॥ ৩ ॥
পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।
দেখ যত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার ॥
যত কিছু বোলোঁ মোএঁ সব পরমাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : নন্দগৃহে একই স্থানে বড় হইলাম। আজ দুষ্ট কানাই আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেছে। চোখে চোখে পড়িলে বাঘেরও লজ্জা হয়। আর নিজের ভাগিনা হইয়া তোমার এমন কাজ ॥ ১ ॥ হে কৃষ্ণ, তুমি নিতান্তই নির্লজ্জ। গোকুলে থাকিয়াও তোমার একটু লজ্জা নাই। তুমি নিজের মামীর কাছে দান সাধিতে চাও ॥ ধ্রু ॥ নিজেকে মহাদানী বলিয়া জাহির করিতেছ। তোমার কাছে বাঁচিবার উপায় নাই। শুল্ক আদায় করিবার জন্য বাছিয়া বাছিয়া নিজের মামীকেই ধরিয়াছ। শিশুর ফুৎকারে পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে। অল্পদিনের মধ্যেই তুমি গুরুপাপে মগ্ন হইবে ॥ ২ ॥ আমি তো নিত্যই দধি বিক্রয় করিতে যাই, একদিনও তোমার নিয়মসম্মত দানঘাট ভঙ্গ করি নাই। এখন কি কারণে তুমি বল প্রকাশ করিতেছ। তোমার মা-বাবাকে বিস্তর গালি দিব ॥ ৩ ॥ পুরাণ-বেদ-আগম বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে পরদারগমনে কত পাপ হয়। আমি যাহা বলিতেছি সবই সত্য। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বাপ বসুল মোর নন্দোঘরে জাণী।
কমণ কারণে রাধা ঘোসসি মাউলানী

১ অ। প্র: পাপে।

মাঅ দৈবকী মোর মামা কংসাস্থর।
তোহ্মার সম্বন্ধ কথা আনেক দূর ॥ ১ ॥
নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী ॥ ধ্রু ॥
মাউলানী মাউলানী বোলসি তুণ্ডে।
মোর মাহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে ॥
হেন যবেঁ রাধা বোলসি আর বার।
ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নাঞিঁ গোআল ॥ ২ ॥
কিকে তোঁ নাগরি রাধা উপেঁখসি স্থখ।
মুখ তুলী চাহা মোর পালাউক দুখ ॥
উন্নত পয়োধরেঁ ধরি মোরে চাপ।
পালাউ আহ্মার বিরহসন্তাপ ॥ ৩ ॥
কে তোকে জানাইলে মাউলানী সম্বন্ধ।
দুঈ আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ ॥
শালী সম্বন্ধে সম্বোধ নারায়ণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : নন্দগোকুলের বস্থদেব আমার পিতা ইহা সকলেই জানে। তবু তুমি নিজেকে মামী বলিয়া ঘোষণা করিতেছ কেন? দৈবকী আমার মা, কংসাস্থর আমার মামা। তোমার সহিত আমার যে সম্পর্ক সে অনেক দূরের ॥ ১ ॥ রাধা, তুমি মামী নও, তুমি সম্বন্ধে আমার শালী—এইভাবে কৃষ্ণ রঙ্গভরে পরিহাস করিলেন ॥ ধ্রু ॥ তুমি বার-বার মামী মামী বলিতেছ কেন? আমার মহাপাতক তোমার মাথায় পড়িবে। এমন কথা যদি আর বল তাহা হইলে তোমার মাথায় ভাঁড় ভাঙ্গিব ॥ ২ ॥ নাগরী রাধিকা, কেন বৃথা স্থখ উপেক্ষা করিতেছ? তুমি একবার মুখ তুলিয়া চাও, আমার সকল দুঃখ দূর হউক। তোমার উন্নত পয়োধরে আমাকে পীড়ন কর, আমার বিরহসন্তাপ চলিয়া যাক ॥ ৩ ॥ তোমাকে মামী-সম্পর্কের কথা কে বলিয়াছে? যে বলিয়াছে সে চোখ খাউক, তাহার দেহ অবশ হউক। শালী-সম্বন্ধে আমাকে সম্বোধন কর। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্ন।
আইস ল রাধা লেখা করি দান ॥ ১ ।
আহুঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোটি দান তাহাত মোর ॥ ২ ॥

মাথাত কুসুমমাল রচনে।
এহাত আহ্মার লক্ষক দানে॥ ৩ ॥
চামর জিণিআঁ চিকুর তোরে।
এহার দান দুঈ লাখ মোরে॥ ৪ ॥
সিসের সিন্দূর ভুবন মোহে।
এহার দান তিন লক্ষ হএ॥ ৫ ॥
নির্ম্মল শশি তোর মুখ দেখোঁ।
এহার দান চারি লাখ লেখোঁ॥ ৬ ॥
নীল উতপল তোর নয়নে।
এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে॥ ৭ ॥
গরুড় সমান তোহোর নাশা।
এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা॥ ৮ ॥
শ্রবণ[১] কুণ্ডল শোভএ তোরে।
এহার দান সাত লক্ষ মোরে॥ ৯ ॥
মাণিক জিণিআঁ দশন শোহে।
এহার দান আঠ লাখ নহে॥ ১০ ॥
বিম্বফলতুল তোর আধরে।
নব লক্ষ দান তাত আহ্মারে॥ ১১ ॥
কণ্ঠদেশ তোর কম্বু সমানে।
দশ লক্ষ হএ এহাত দাণে॥ ১২ ॥
বাহু মৃণাল কমল করে।
এগার লক্ষ দান তাহারে॥ ১৩ ॥
নখপাতি তোর চন্দ্রিকা জিণে
বার লক্ষ হএ এহার দানে॥ ১৪ ॥
শ্রীফলযুগল তোহোর তনে।
এহার দান তের লক্ষ ধনে॥ ১৫ ॥
ত্রিবলি মাঝা বাএ হালে তোরে।
চৌদ লক্ষ দান এহাত মোরে॥ ১৬ ॥
উরু তোর রামকদলী সমানে।
পঞ্চদশ লক্ষ এহার দানে॥ ১৭ ॥
পদযুগ থলকমল আকারে।
ষোল লক্ষ দান তাহাত আহ্মারে॥ ১৮

---

১ অ। প্র: শ্রবণে।

হেম পাট জিণি তোহোর জঘনে
চৌষাঠি লাখ তাত মোর দানে ॥ ১৯ ॥
বিণি দান দিআঁ নাহিঁ গমনে ।
বোলে দামোদর সত্য বচনে ॥ ২০ ॥
মাথাএ বন্দিআঁ বাসলীপাএ ।
আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : আমি হাতে খড়ি লইয়া বলিতেছি—হে রাধিকা, এস তোমার দানের হিসাব করি ॥ ১ ॥ তোমার দেহের মাপ সাড়ে তিন হাত। তাহার জন্য আমার প্রাপ্য দান দুই কোটি মুদ্রা ॥ ২ ॥ তোমার মাথায় যে ফুলের মালা, তাহার দান লক্ষ মুদ্রা ॥ ৩ ॥ চামরের অপেক্ষাও সুন্দর যে তোমার কেশরাশি তাহার দান দুই লক্ষ মুদ্রা ॥ ৪ ॥ তোমার সীমন্তের সিন্দূর যাহা দেখিয়া ভুবন মুগ্ধ হয় তাহার দান তিন লক্ষ ॥ ৫ ॥ তোমার মুখখানি যেন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র। তাহার জন্য চারিলাখ লিখিলাম ॥ ৬ ॥ তোমার চোখ দুইটি যেন নীলপদ্ম। তাহার দান ধরিলাম পঞ্চ লক্ষ ॥ ৭ ॥ তোমার নাক গরুড়ের সমান, তাহার জন্য ছয় লক্ষ আশা করিতেছি ॥ ৮ ॥ তোমার কর্ণে কুণ্ডল শোভা পাইতেছে, ইহার দান সাত লক্ষ ॥ ৯ ॥ মাণিক্যনিন্দিত তোমার দন্তরাজি, ইহার দান আট লক্ষ না হইয়া পারে না ॥ ১০ ॥ বিম্বফলের মত তোমার অধর, তাহার দান নয় লক্ষ ॥ ১১ ॥ তোমার কণ্ঠদেশ শঙ্খের মত সুন্দর, তাহার দান দশ লক্ষ হইবে ॥ ১২ ॥ তোমার বাহু দুইটি যেন মৃণাল, হাত দুইটি যেন পদ্ম। ইহার দান এগার লক্ষ ॥ ১৩ ॥ তোমার নখপংক্তির আভা চন্দ্রকিরণের অপেক্ষাও উজ্জ্বল, তাহার দান হইবে বার লক্ষ ॥ ১৪ ॥ তোমার স্তনদ্বয় যেন যুগ্ম শ্রীফল। তাহার দান ধরিয়াছি তের লক্ষ ॥ ১৫ ॥ ত্রিবলী-চিহ্নিত কটিদেশ এত ক্ষীণ যে বাতাসে আন্দোলিত হয়। তাহার জন্য চৌদ্দ লক্ষ দান দিবে ॥ ১৬ ॥ রামকদলীর সমান তোমার উরু, তাহার দান পনের লক্ষ ॥ ১৭ ॥ স্থলপদ্মের ন্যায় চরণযুগল, তাহার দান ষোল লক্ষ ॥ ১৮ ॥ হেমপাটনিন্দিত তোমার জঘন, তাহার দান চৌষট্টি লক্ষ ॥ ১৯ ॥ আমি দামোদর সত্য কথা বলিতেছি, দান-শোধ না করিয়া যাইতে পারিবে না ॥ ২০ ॥ আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ২১ ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কিসের দান কাহ্নাঞি কিসের ঘাট ।
কিসের আন্তরে কাহ্নাঞি আগোলসি বাট ॥
মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞি কপট নাটে ।
কংশে শুনিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে ॥ ১ ॥
কি মোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে ।
পাঁজী পুথী তোহ্মার[১] চিরিবোঁ বাম হাথে ॥ ধ্রু ॥

[১] 'তোহ্মার' তোলাপাঠে ।

রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোতে হেন বোল সাজে।
বড়ার বহুআরী আহ্মে পাইএ বড় লাজে ॥
এ সব চরিতেঁ তো নাসিলি তুই লোকে।
কমণ মুগধেঁ বাটে দানী কৈলে তোকে ॥ ২ ॥
মিছে বেঢ়ে চক্র কাহ্নাঞিঁ করহ বাখান।
কথাঁহো নাহিঁ শুণী দেহত বসে দান ॥
ঘৃত ঘোল দধি দুধ পসারত জাএ।
এহাতে সি দান লইতেঁ তোহ্মার জুআএ ॥ ৩ ॥
অইহন[১] বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী।
তোহ্মে কি না চিহ্ন আহ্মে তাহার রাণী ॥
কি না লাভ লোভেঁ কাহ্নাঞিঁ না চিহ্ন এখন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : দানই বা কিসের ? ঘাটই বা কিসের ? হে কৃষ্ণ, আমার পথই বা আটকাইতেছ কি কারণে ? কপট কৌশল করিয়া মিথ্যাই খড়ি পাতিতেছ। কংস এ কথা শুনিলে, তুমি বিপদে পড়িয়া যাইবে ॥ ১ ॥ মথুরার পথে আসিয়া কি জ্বালাতনেই পড়িলাম। তোমার ওই পাঁজি-পুঁথি বাম হাত দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব ॥ ধ্রু ॥ রাখাল কৃষ্ণ, এমন কথা তোমার মুখে সাজে না ! আমি সম্ভ্রান্তজনের স্ত্রী, তোমার কথা ,শুনিয়া লজ্জা পাই। স্বভাবদোষে তুমি ইহলোক পরলোক দুই নষ্ট করিলে। কোন্ সে নির্বোধ যে তোমাকে দানী নিযুক্ত করিয়াছে ॥ ২ ॥ অনর্থক অযৌক্তিক কথা বলিতেছ কেন ? দেহে দান ধরা হয় এমন কথা তো কখনো শুনি নাই। ঘৃত দধি দুধ ঘোল—এসব পসরায় করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদের উপর দান দাবি করিতে পার ॥ ৩ ॥ আইহন বীর, ত্রিলোকবিখ্যাত। তুমি কি জান না আমি তাহার পত্নী ? কি লাভের আশায় এখন সে কথা ভুলিলে ? বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা ॥ ১ ॥
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুর[২]।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুরা ॥ ২ ॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবনযুগলা ॥ ৩ ॥

১ অ। প্র: আইহন।
২ অ। প্র: কামসিন্দূরা। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপামা।
গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা ॥ ৪ ॥
নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে ॥ ৫ ॥
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা ॥ ৬।
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা ॥ ৭ ॥
কনকচম্পক সম শোভে কলেবরা।
মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্ব্বতকুহরা ॥ ৮
নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।
উরুযুগ রামকদলীতরুসমা ॥ ৯ ॥
মন্থর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে।
তা দেখিআঁ বনবাস কৈল করীবরে ॥ ১০
অমরপুরত নাহিঁ হএ হেন রামা।
বিধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা ॥ ১১ ॥
দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণের উক্তি: নীলজলদের ন্যায় তোমার কেশপাশ, তাহাতে বিদ্যুৎরেখার মত শোভা পাইতেছে চাঁপার মালা ॥ ১ ॥ সীমন্তে তোমার কামসিন্দুর নবোদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ॥ ২ ॥ নবশশিকলার মত তোমার ললাটের তিলক, তোমার সুন্দর শ্রবণযুগল কুণ্ডলমণ্ডিত ॥ ৩ ॥ তিলফুলের মত সুন্দর তোমার নাসিকা, কমলদলের মত মনোহর তোমার গণ্ডস্থল ॥ ৪ ॥ তোমার নয়নদ্বয় যেন যুগল খঞ্জন। তাহার ঈষৎ কটাক্ষে মুনির মনও মোহিত হয় ॥ ৫ ॥ তোমার অধরের রক্তিমা বিম্বফলের মত, তোমার দশনরাজি মাণিক্যের অপেক্ষাও অধিক দ্যুতিসম্পন্ন ॥ ৬ ॥ তোমার কণ্ঠ শঙ্খসদৃশ, স্তনদ্বয় যেন চক্রবাক্‌যুগল, মৃণালের মত বাহু এবং রক্তপদ্মের মত দুইটি কর ॥ ৭ ॥ তোমার দেহের রং কনকচাঁপার মত। তোমার ক্ষীণ কটি দেখিয়া সিংহ লজ্জায় পর্বতগহ্বরে প্রবেশ করিল ॥ ৮ ॥ তোমার নাভিস্থল গভীর, প্রয়াগের সহিত তাহার উপমা হয়। রামকদলী বৃক্ষের মত তোমার উরুদ্বয় ॥ ৯ ॥ তোমার চলন দেখিয়া মনে হয় পাছে ভাঙ্গিয়া পড় তাই মন্থর পদে চলিয়াছ, সেই গমনভঙ্গী দেখিয়া করিবর বনবাসে গমন করিল ॥ ১০ ॥ অমরপুরীতেও এমন রূপসী রমণী নাই। বিধাতা যেন একটি সচল কনক প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ দেবতা এবং অসুরগণ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া তোমাকে পাইয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১২ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী

আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ।
গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ ॥
হেন যদি কর কাহ্নাঞি আহ্মার বচনে।
তবেঁ তোর হএ পাপ সাগরে মোচনে ॥ ১ ॥
বিচারিআঁ চাহ কাহ্নাঞি আগম পুরাণে।
কত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার মনে ॥ ধ্রু ॥
তোর দুই উরু রাধা ভৈরবপতনে।
নিকটে থাকিতেঁ দূর জাইবোঁ কি কারণে ॥
তোর দুই কুচকুম্ভ বান্ধি নিজ গলে।
বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্যগঙ্গাজলে ॥ ২ ॥
সুন সুবদনী রাধা আইহনের রাণী।
পাপের খণ্ডনবুধী আহ্মে ভালে[১] জাণী ॥ ধ্রু ॥
কিছু না বুঝসি কাহ্নাঞি ধরম বেবথা।
আন বুলিতেঁ আন পাতসি কথা ॥
বুঝিল কাহ্নাঞি বুঝিল তোহ্মার মন।
তোহ্মা হেন পৃথিবীত নাহিঁক টেটন ॥ ৩ ॥
বিরোধ না কর কাহ্নাঞি জাইতেঁ দেহ ঘর।
বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন রাধা সুন পরমান।
বিণি রতি পাইলেঁ তোক না এড়িবে কাহ্ন ॥
এআ জানী বৈশ রাধা আহ্মার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
আহ্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে।
নহে ত বান্ধিআঁ থুইবোঁ দানের আন্তরে ॥ ধ্রু ॥

রাধার উক্তি: ভৈরবপত্তনে গিয়া দেহ বিসর্জন কর। নহিলে গলায় কলসী বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ কর। কেবল সাগরের জলেই তোমার পাপমোচন হইতে পারে ॥ ১ ॥ আগম-পুরাণ সব খুঁজিয়া দেখ তো পরদার গ্রহণ করিলে কত পাপ হয় ॥ ধ্রু ॥ কৃষ্ণের উক্তি: হে রাধা, তোমার উরু দুইটিই তো ভৈরবপত্তন। তাহা যখন নিকটেই আছে তখন আর দূরে যাই কেন? আর বলো তো তোমার দুইটি কুচকুম্ভ গলায় বাঁধিয়া ওই লাবণ্যগঙ্গাজলে ডুব দিই ॥ ২ ॥ সুন্দরী শোনো। পাপ কেমন করিয়া খণ্ডন করিতে হয় সে কৌশল আমার ভালই জানা আছে ॥ ধ্রু ॥ রাধার উক্তি: হে কৃষ্ণ, তুমি

১ 'ভালে' তোলাপাঠে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুঁথির ৩৯।১ পৃষ্ঠা

ধর্মব্যবস্থার কিছুই জান না। এক কথা বলিতে আর এক কথা পাড়িতেছ। তোমার অভিসন্ধি আমি বুঝিয়াছি। তোমার মত ধৃষ্ট আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৩ ॥ বিরোধ করিও না, আমাকে গৃহে ফিরিতে দাও। সেই সকালে আসিয়াছি, এখন বেলা তিনপ্রহর হইল ॥ ধ্রু ॥ কৃষ্ণের উক্তি : রাধা, আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য। রতিদান না করিলে আমি তোমাকে ছাড়িব না। ইহা বুঝিয়া আমার পাশে উপবেশন কর। বাসলীকে শিরে বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ হে রাধা, শীঘ্র আমার পাশে আইস, নহিলে দানের জন্য বাঁধিয়া রাখিব ॥ ধ্রু ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥ লগনী ॥

এত বড রাজা ভৈল ধনের কাতর।
পথে মাহাদাণী থুইল হেন আছিদর ॥ ১ ॥
কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী।
আপনে স্তুণ ল বোল[১] রাধা ল[২] গোআলী ॥ ২ ॥
মোর দধি ঘৃতে কেহ্নে তোহ্মে মাহাদাণী।
তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞি আহ্মে ত মাউলানী ॥ ৩ ॥
বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞিঁর দান বটে।
ভাণ্ড মাথে ষোল পন কাহাহো নাহিঁ টুটে ॥ ৪ ॥
সবে ষোল পোণ দেহ[৩] দধির পসারে।
মিছাই ঝগড় কর কাহ্নাঞিঁ গোআরে ॥ ৫ ॥
পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে।
তোহ্মে লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মে হরি কাহ্নে ॥ ৬ ॥
সকল পুরবকথা মিছা কহ তোহ্মে।
কথাঁ কাহ্ন হরি তোহ্মে কথাঁ লক্ষ্মী আহ্মে ॥ ৭ ॥
তোহ্মে ত না জাণ রাধা আহ্মার মায়া।
স্বগর্গ মর্ত্য পাতালে আহ্মার এক কায়া ॥ ৮ ॥
রাখোআল হঞাঁ বোল জগতনিবাস।
স্তুণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস ॥ ৯ ॥
বিণি দান পাইলেঁ আজি না এড়িবোঁ তোরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১০ ॥

রাধার উক্তি : রাজা অর্থের জন্য এতই কাতর হইল যে এমন একজন দুষ্টাশয়কে

১ 'বোল' তোলাপাঠে।
২ 'ল' তোলাপাঠে।
৩ অ। প্র : দেহ।

মহাদানী নিযুক্ত করিল ॥ ১ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: গোপবালিকা রাধা আমার কথা শোনো। মনে রাখিও বনমালী কাহারও অধীন নহে ॥ ২ ॥ রাধার উক্তি: তবে আমার দধি-ঘৃতে তুমি মহাদান চাহিতেছ কেন? আমি তো মামী আর তুমি তো ভাগিনা ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: পথে ঘাটে বাজারে সর্বত্রই আমার দানে অধিকার। ঘটপিছু ষোল পণ, তাহার এক কড়াও কম নহে ॥ ৪ ॥ রাধার উক্তি: পসারের জন্য সর্বসুদ্ধ ষোল পণ লও। কৃষ্ণ তুমি অবিবেচক। মিথ্যা ঝগড়া করিতেছ ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: পূর্বজন্মে আমি সমুদ্র মন্থন করিয়াছি। তুমি লক্ষ্মী, এ জন্মে রাধা হইয়াছ। আমি হরি, এ জন্মে কৃষ্ণ হইয়াছি ॥ ৬ ॥ রাধার উক্তি: তুমি যে সকল পূর্বকথা বলিতেছ সবই মিথ্যা। হে কৃষ্ণ, তুমিই বা কোথাকার হরি আর আমিই বা কোথাকার লক্ষ্মী ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: রাধা তুমি আমার মায়া জান না। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, সর্বত্র আমার এক কায়া ॥ ৮ ॥ রাধার উক্তি: সামান্য রাখাল হইয়া নিজেকে জগন্নিবাস বলিতেছ। এ কথা শুনিলে লোকে তোমাকে উপহাস করিবে ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: দান না পাইলে তোমাকে ছাড়িব না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১০ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।
যথাঁ সে কাহ্নাঞিঁর মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ ॥
হেন মনে করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ১ ॥
সরূপে মরিবোঁ তবেঁ শুণহ বড়ায়ি।
পন্থে বল করে যবেঁ আবাল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
দধি খাএ ভাণ্ড ভাঁগে দুধে দেয়ি পাণী।
সমুন্ধ না মানে সে ভাগিনা মাউলানী ॥
তিন লোক খাআঁ বোলে আহ্মার গোআলী।
জগজনে বোলে সে ভাগিনা বনমালী ॥ ২ ॥
শিশু হেন দেখি কাহ্ন বড় কাজ করে।
এড় এড় বুলিতেঁ আধিকেঁ করে ধরে ॥
তার বোল বুলিতেঁ সব গাঅ বিষ জলে।
নান্দো যশোদার পোঅ পন্থে বল করে ॥ ৩ ॥
আতিবড় দুরুজন বাটত কাহ্ন।
বার বরিষের মোকেঁ মাঁগে মাহাদান ॥
দাণ ঘাটের কাহ্ন এড়ু পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই, পাখী হইয়া জন্মি নাই। নহিলে এমন জায়গায় উড়িয়া যাইতাম যেখানে গেলে কৃষ্ণের মুখ দেখিতে হইত না। এমন মনে হয় যে, বিষ খাইয়া মরি অথবা মেদিনী বিদীর্ণ হউক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুকাই ॥ ১ ॥ বড়াই, কৃষ্ণ যদি পুনরায় পথে বলপ্রয়োগ করে তাহা হইলে সত্যই প্রাণত্যাগ করিব ॥ ধ্রু ॥ সে দধি খায়, ভাঁড় ভাঙ্গে, দুধে জল ঢালিয়া দেয়। মামী-ভাগিনা সম্বন্ধ পর্যন্ত মানে না। তিন লোক খাইয়া বলে—আমার গোয়ালিনী। অথচ জগতের লোক জানে বনমালী আমার ভাগিনা ॥ ২ ॥ তাহাকে দেখিতে ছোট বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু আচরণ বড়র মত। যত বলি ছাড় ছাড়, তত আরও জোর করিয়া হাত ধরে। নন্দযশোদার পুত্র পথে বাহির হইলেই বল প্রয়োগ করে। তাহার কথা আর কত বলিব ? বলিতে গা বিষের মত জ্বালা করে ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণ অতিশয় দুর্জন। পথরোধ করিয়া আমার কাছে বার বছরের দান চায়। তাহাকে বলিয়া দিও ঘাটের দান যেন আমার কাছে প্রত্যাশা না করে। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো ॥
কানড়ি খোঁপা[১] বড়ায়ি মোর দুঈ তন।
যা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ করন্তি যতন ॥ ১ ॥
কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী ॥ ধ্রু ॥
আলকে তিলক বড়াযি কাজল নয়নে।
এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে ॥
আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল।
এহা দেখি মাঁগে কাহ্নাঞিঁ বিরহের কোল ॥ ২ ॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিশের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর ॥
যা দেখিআঁ মাঙ্গে কাহ্নাঞিঁ নিবিড় শৃঙ্গার ॥ ৩ ॥
হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী।
পরার পুরুষ সমেঁ ধামালী না করী ॥
ধামালী বুলিতেঁ কাহ্নে না দিহলি আস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : হে বড়াই, তুমি যাও নাপিতকে ডাকিয়া আন। আমি আমার

[১] ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এই কানাড়ি খোঁপা মুণ্ডিত করিয়া ফেলিব। কানাড়ি খোঁপা ও আমার স্তনদ্বয় দেখিয়া কৃষ্ণ লুব্ধ হইয়াছে ॥ ১ ॥ হায় বিধাতা, নারীর জন্ম দিয়া কি দুঃখই না সৃষ্টি করিলে? আপনার মাংসের জন্যই হরিণী জগতের বৈরী ॥ ধ্রু ॥ আমার বদনের অলকা-তিলকা, আমার নয়নের কাজল, এইসব দেখিয়া নন্দনন্দন ব্যাকুল। দেখ বড়াই, আর আমি সুরঙ্গ পট্টবস্ত্র পরিধান করিব না। ইহা দেখিয়াই কৃষ্ণ আলিঙ্গন প্রার্থনা করে ॥ ২ ॥ আমার সীমন্তের সিঁদুর মুছিয়া ফেলিব, আমার বাহুর বলয় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিব। আমার সাতনরী হার ছিঁড়িয়া ফেলিব।[১]—এইসব দেখিয়াই কৃষ্ণ আলিঙ্গন চায় ॥ ৩ ॥ বড়াই, আমার মনে হয় জলে ডুবিয়া মরিব, তবু পরপুরুষের সহিত মন্দ আচরণ করিব না। বড়াই, কৃষ্ণকে তুমি উপদেশ দিও সে যেন আমার সহিত রঙ্গ না করে। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার।
কাল মেঘের জলে জীএ সংসার ॥
কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে।
কাল রতনে হার শোভে দেবরাজে ॥ ১ ॥
আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর নান্দো যশোদার বালা ॥ ধ্রু ॥
কাল চিকুর শোভে মাথার উপরে।
কাল ভুরুহী শোভে বদনকমলে ॥
কাল ভ্রমরে কমলবন শোহে।
কাল কাজনে[২] নারী জগজন মোহে ॥ ২ ॥
কাল নাঞ্ছন[৩] কোলে ধরে শশধরে।
কাল আলকপাঁতী শোভএ কপোলে ॥
কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী।
কাল সুন্দর দেহেঁ শোভে বনমালী ॥ ৩ ॥
কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ।
এহা বুঝী না কর রাধা তোঁ মন মন্দ ॥
কাল কাহ্নের এবেঁ ধরহ বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : কালো অক্ষর দিয়াই ত্রিভুবনের বিচার হয়। কালো মেঘের জলে সংসার জীবিত থাকে। কালো গোরুর দুধ অনেক কাজে লাগে। দেবরাজ ইন্দ্র

১ পৃষ্ঠা ২০৮ ছত্র ২৫ এর পর 'ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সাতেসরী হার' বসিবে।

২ অ। প্র: কাজলে। ৩ অ। প্র: লাঞ্ছন।

কালো রত্নের হারেই শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ হে রাধা, কালো কৃষ্ণকে অকারণে নিন্দা করিতেছ। যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর ॥ ধ্রু ॥ কালো চুল হয় মাথার শোভা, কালো ভ্রূ-দুইটি আছে বলিয়াই বদনকমলের শোভা, আর কালো ভ্রমরের জন্য পদ্মবন শোভা পায়, আর কালো কাজল দিয়াই নারীরা জগজনকে মুগ্ধ করে ॥ ২ ॥ চাঁদের কোলে কালো কলঙ্ক সাজে, রমণীর গণ্ডদেশে কালো কেশের গুচ্ছ শোভা পায়। গোয়ালিনী রাধা, কালো উৎপলের মত নয়ন-যুগলে তুমি শোভা পাইতেছ। আমি বনমালী, কালো দেহ লইয়াই সুন্দর ॥ ৩ ॥ কালো মেঘের পাশে পূর্ণিমার চন্দ্র শোভা পায়, ইহা বুঝিয়া মনকে বিমুখ করিও না। এখন কালো কৃষ্ণের কথা শোনো। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দহে পৈসু বড়ায়ি তিরীর জীবন।
বৈরি হঞাঁ লাগিল এ রূপ যৌবন ॥
এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতেঁ না পারী।
আপণ গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী ॥ ১ ॥
হরি হরি সুন বড়ায়ি মথুরা গমন নাহিঁ।
বৈরি হঞাঁ লাগিল এ কাল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
কমণ আসুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা ॥
সোদর ভাগিনা বড়ায়ি মাঙ্গএ সুরতী।
দিবওঁ পরাণ মোঁ করিবোঁ আত্মঘাতী ॥ ২ ॥
সোনার চুপড়ী বড়ায়ি রুপার ঘড়ী।
নেত আঞ্চল সে দিঞাঁ ত ওহাড়ী ॥
নঠ হৈল ঘোল দুধ আর নঠ ঘী।
এড়ি জাএ মোক সব গোআলার ঝী ॥ ৩ ॥
কান্দিঞাঁ জাণায়িবোঁ কাঁশে।
পাছে কাহ্নাঞিঁ মোকে না দিহে দোষে ॥
বোলহ কাহ্নাঞিঁ এভোঁ তেজু মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: বড়াই, স্ত্রীলোকের জীবন বড় দুঃখের। এ রূপ-যৌবন আমার শত্রু হইল। হায় বড়াই, হরিণী নিজের গায়ের মাংসের জন্যই বিকল হয়। আমারও সেই অবস্থা। এ দুঃখ যে আর সহিতে পারি না ॥ ১ ॥ হায় হায়, বড়াই কি আর বলিব? মথুরায় যাওয়া হইল না। কালো কানাই বৈরী হইয়া লাগিয়াছে ॥ ধ্রু ॥ কোন্ অশুভক্ষণে পা বাড়াইলাম। না হাঁচি, না টিকটিকি, কিছুই তো বাধা দিল না।

(তবু এমন বিপদ কেন?) আপন ভাগিনা সে কি না সুরত প্রার্থনা করে। আমি এ প্রাণ আর রাখিব না, আত্মঘাতী হইব ॥ ২ ॥ বড়াই গো, সোনার চুপড়িতে রূপার ঘট সাজাইয়া তাহাতে নেতবস্ত্রের আবরণ দিয়াছি। (কিন্তু কিছু কাজে লাগিল না।) ঘোল নষ্ট হইল, দুধ নষ্ট হইল, ঘি নষ্ট হইল। আর সকল গোয়ালিনী আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল ॥ ৩ ॥ আমি কৃষ্ণের কথা কাঁদিতে কাঁদিতে কংসকে জানাইব, পরে যেন কৃষ্ণ সেজন্য আমাকে দোষ না দেয়। কৃষ্ণকে বলিও যেন এখনও সে আমার আশা ত্যাগ করে। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥ ১ ॥
আঁচলে না ধর কাহ্নাঞি...[১]।
এড় কাহ্নাঞিঁ যাইবোঁ মথুরার হাটে ॥ ধ্রু ॥
হের মথুরাব হাটে লক্ষ জন রহে বাটে
সন্ধাক এড়িআঁ আহ্মার লহ পরাণে।
বিহা না কর আপণে কিসকে রাখহ ধনে
আপনে না ভুঁজ পরাক না কর দানে ॥ ২ ॥
ভাগিনা তোহ্মাক জাণী আহ্মে তোর মাউলানী
বল করিতেঁ মেদিনী উলটি জাএ।
তোহ্মে ত গোআল জাতী ছাড়হ হেন বিমতী
ঘর গিআঁ সম্বন্ধ পুছ মাএ ॥ ৩ ॥
আহ্মে আতিশয় বালী নবনীদল[২] কোঁয়লী
এহা বুঝি তেজ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পাশে।
মল্লিকাকলিকা পাশে ভ্রমর না পাএ রসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: ঘরের বাহির হইতে দেখিলাম তেলিনী তেল বেচিতে চলিয়াছে, শুষ্ক ডালে বসিয়া কালো কাক ডাকিতেছে, শূন্য কলস লইয়া নারীরা যাইতেছে। এ সব উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিলাম, হাঁচি টিকটিকিও মানিলাম না। তাহার উচিত ফল পাইলাম ॥ ১ ॥ হে কৃষ্ণ, পথিমধ্যে অঞ্চল ধরিও না। ছাড়িয়া দাও আমি মথুরার হাটে যাইব ॥ ধ্রু ॥ মথুরার হাটের পথে লক্ষ লক্ষ লোক চলিয়াছে, তুমি সবাইকে

১ কয়েকটি অক্ষর ছাড় পড়িয়াছে।
২ অ। প্র: নবনীদল।

ছাড়িয়া আমারই প্রাণ লইতেছ। বিবাহ কর নাই, ধন জমাইয়া কি করিবে? নিজেও ভোগ কর না, অন্যকেও দান কর না॥ ২॥ তোমাকে ভাগিনা বলিয়া জানি, আমি তোমার মামী। আমার প্রতি যদি বল প্রয়োগ কর তো পৃথিবী উলটিয়া যাইবে। তুমি জাতিতে গোয়ালা, এই মন্দবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, ঘরে গিয়া মায়ের কাছে সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা কর॥ ৩॥ আমি নিতান্তই বালিকা, নবনীদলের মত কোমলা, ইহা বুঝিয়া আমাকে পরিত্যাগ কর। মল্লিকাকুঁড়ির কাছে ভ্রমর রস পায় না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪॥

রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

নাহিঁ পুরে কাহ্নাঞিঁর প্রথম যৌবন।
তবেঁ কেহ্নে রতি প্রতি এত বড় মন॥
এড়ায়িবারে কৈল বড়ায়ি এত পরকার।
এথোই না ধরে কাহ্নাঞিঁ উমত আকার॥ ১॥
আহ্মা সমে সুরতি কাহ্নের না জুআএ।
মাণিকে হিরাক বিন্ধে কে বা পাতিআএ॥ ধ্রু॥
তাহার হোতিত নহে[1] আহ্মার মরণ।
হেন কাজ করিতেঁ তাহার কেহ্নে মন॥
এথো না বুঝিএ বড়ায়ি কাহ্নের চারীত।
যত কথা কহে কাহ্নাঞিঁ সব বিপরীত॥ ২॥
পরাক না পুছে কাহ্নাঞিঁ না বুঝে আপণে।
তাহাক উপায় নাহিঁ এ তীন ভুবনে॥
সব লোক বোলে তারে কাহ্ন শিশুমতী।
এথো জন নাহিঁ জাণে তার কাজগতী॥ ৩॥
হেন পড়িহাসে কাহ্নাঞিঁ[2] তোহ্মার কি মনে।
মোর প্রতি যোগ হএ নান্দের নন্দনে॥
মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমূতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৪॥

রাধার উক্তি: কৃষ্ণের প্রথম যৌবন এখনও পূর্ণ হয় নাই, তবু তাহার রতিরঙ্গে এত অনুরাগ কেন? আমি তাহাকে এড়াইবার জন্য অনেক রকম উপায় অবলম্বন করিলাম। কিন্তু কৃষ্ণ উন্মত্তপ্রায়, কোনো কথায় কান দিল না॥ ১॥ আমার সহিত কৃষ্ণের মিলন সংগত হয় না। মাণিকের দ্বারা হীরা বিদ্ধ হয়—এ কথা কে বিশ্বাস করিবে॥ ধ্রু॥ তাহার হাতে আমার মরণ ঘটিতে পারে, এমন কাজ করিতে সে উৎসুক কেন? দেখ বড়াই,

---

১ অ। প্র: হাথত হএ। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২ অ। প্র: বড়ায়ি।

কৃষ্ণের কোন আচরণেরই অর্থ বুঝি না। সে যত কথা বলে সবই অন্যায়, অসংগত ॥ ২ ॥ সে নিজেও বুঝে না, অন্যকেও জিজ্ঞাসা করে না। ত্রিভুবনে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। সকল লোকে তাহাকে শিশুমতি বলিয়া জানে, তাহার কাজের ধারা যে কিরূপ তাহা কেহই জানে না ॥ ৩ ॥ বড়াই, তোমার কি মনে হয় যে নন্দনন্দন আমার (মত বালিকার) যোগ্য ? গজমুক্তা মর্কটের কণ্ঠে মানায় না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি পুছিল রাধারে।
এত খন কথাঁ ছিলা এড়িআঁ আহ্মারে ॥
সকল শরীর তোর দেখি বিপরীত।
ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত ॥ ১ ॥
মিছা না বুলিহ মোরে পরাণনাতিনী।
আহ্মার থানত কহ সরূপ কাহিনী ॥ ধ্রু ॥
কে না কাঢ়ি নিলেঁ তোর সব আভরণ।
আসুখিনী[১] হেন দেখি কমন কারণ ॥
আধর ছাড়িল তোর তাম্বুলের রাগ।
হেন বুঝোঁ বনে তোর কাহ্নু পাইল লাগ ॥ ২ ॥
আয়াসিনী[২] ভৈলা আজি তোহ্মে কি কারণে।
বুঝিতেঁ নারেঁ৷ রাধা মোএঁ তোর মনে ॥
তোহ্মার বিলম্ব দেখি পাইলোঁ বড় ডর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

বড়াই ঈষৎ হাস্য করিয়া রাধাকে জিজ্ঞাসা করিল: রাধা, এতক্ষণ তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় ছিলে? তোমার সর্বাঙ্গ বিপরীত দেখিতেছি, ইহা তো আমার ভাল বোধ হইতেছে না ॥ ১ ॥ আমার প্রাণের নাতিনী, আমার কাছে মিছা না বলিয়া সকল কথা খুলিয়া বল ॥ ধ্রু ॥ সব আভরণ কে লইল, কি জন্য তোমাকে এমন অসুখী দেখাইতেছে? অধরে সেই তাম্বুলের রাগ নাই, মনে হয় বনে তোমাকে কৃষ্ণ ধরিয়াছিল ॥ ২ ॥ কি কারণে তুমি এত শ্রান্ত? রাধা তোমার মনের কথা কিছুই বুঝিতে পারি না। তোমার বিলম্ব দেখিয়া আমি বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৩ ॥

---

১ অ। প্র: আসুখিনী।
২ অ। প্র: আয়াসিনী।

অথ নৌকাখণ্ডঃ

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী চিত্রকং ॥

রাধাক না পাআঁ মোর বেআকুল মনে।
রাতি দিন নিন্দ না আইসে তাহার কারণে ॥ ১ ॥
উনমত ভৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিরহে।
তার দরশন বিনি প্রাণ না রহে ॥ ২ ॥
আইহনের রাণী রাধা বড় আছিদরী।
বোলেঁ চালেঁ তোর থান আণিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
আপণেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার।
সেহিমতেঁ করিবোঁ তোহ্মার উপকার ॥ ৪ ॥
আহ্মা হেতু রাধিকারে বুলিহ কপটে।
দধি দুধ বিচি নিআঁ মথুরার হাটে ॥ ৫ ॥
এবার তোহ্মাক লআঁ যাইব আন পথে।
তবেঁ না পড়িব রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে ॥ ৬ ॥
তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।
উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ ॥ ৭ ॥
আহ্মে রাধা লআঁ যাইব মথুরার হাটে।
নাঅ লআঁ থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে ॥ ৮ ॥
তোহ্মার বচনে আহ্মে হরষিত মনে।
নাঅ বহ্নিতেঁ গিআঁ করিউ যতনে ॥ ৯ ॥
গাছ চাহিতেঁ আহ্মে জাইএ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণের উক্তি: রাধাকে না পাইয়া আমার মন ব্যাকুল। তাহার জন্য রাত্রিদিন আমার নিদ্রা আসে না ॥ ১ ॥ বড়াই, তাহার বিরহে আমি পাগল হইয়াছি, তাহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ স্থির হইতেছে না ॥ ২ ॥ বড়াইর উক্তি: আইহনের পত্নী রাধা বড়ই ধূর্ত। বলিয়া-কহিয়া তাহাকে তোমার কাছে আনা যাইবে না ॥ ৩ ॥ তুমি নিজেই কিছু বুদ্ধি বলিয়া দাও যাহা অনুসরণ করিয়া তোমার উপকার করিতে পারি ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: আমার জন্য রাধাকে মিথ্যা করিয়া বল যে, চল দধিদুধ বিক্রয় করিতে মথুরার হাটে যাই ॥ ৫ ॥ এবার তোমাকে লইয়া অন্যপথে যাইব, তাহা হইলে আর তুমি কৃষ্ণের হাতে পড়িবে না ॥ ৬ ॥ বড়াইর উক্তি: তোমার কথা আমার মনে লাগিয়াছে। এই দেখ বর্ষাকাল আগতপ্রায় ॥ ৭ ॥ আমি রাধিকাকে লইয়া মথুরার হাটে যাইব, তুমি যমুনার ঘাটে নৌকা লইয়া অপেক্ষা করিও ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: তোমার কথায় আমি হৃষ্টমনে

যাইয়া নৌকা বাঁধিবার আয়োজন করি ॥ ৯ ॥ আমি বৃন্দাবনে গাছ খুঁজিতে যাইতেছি। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১০ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকং ॥

কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।
শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে ॥ ১ ॥
চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোখ মাপে।
তাত গুড়া যোড়ী দিল তৌলঝাঁপে ॥ ২ ॥
ঘলা পাড়ী সুরগুঠি দিল সব নাএ।
তবেঁ নাম্বায়িল লআঁ মাঝযমুনাএ ॥ ৩ ॥
নাঅ গঢ়ায়িল কাহ্নাঞিঁ গুণিআঁ হৃদয়ে।
দুঈ ছাড়ী তীন জন জাত নাহিঁ জাএ ॥ ৪ ॥
হৃদয়ে ভাবিআঁ কাহ্নাঞিঁ যুগতি বিশেষে।
আর এক বড় নাঅ গঢ়িল হরিষে ॥ ৫ ॥
জলের ভিতরে তাক থুয়িল ডুবায়িআঁ।
পাছে ঘাটের নিকট গেলা নাঅ লআঁ ॥ ৬ ॥
রাধার পন্থ নেহালিআঁ রহিলা কাহ্নাঞিঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীআই ॥ ৭ ॥

কবির উক্তি : শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ বিধানে কাঠ কাটিয়া শুভক্ষণে দণ্ড পত্তন করিলেন ॥ ১ ॥ নৌকার মাপজোখ অনুসারে চারি পাট তক্তা চিরিলেন এবং তুলাদণ্ডের পরিমাণে গুড়া যোগ করিলেন ॥ ২ ॥ ছিদ্রমুখ বন্ধ করিবার জন্য নৌকার ফাঁকে ফাঁকে পাটের পলিতা গুঁজিয়া দিলেন। তাহার পর নৌকা লইয়া গিয়া মাঝযমুনায় নামাইলেন ॥ ৩ ॥ মনে মনে ভাবিয়া কৃষ্ণ এমন ভাবে নৌকা গড়িলেন যেন তাহাতে দুইজনের বেশী তিনজন না যাইতে পারে ॥ ৪ ॥ পরে বিশেষভাবে যুক্তি আঁটিয়া হৃষ্টচিত্তে আর একটি বড় নৌকাও নির্মাণ করিলেন ॥ ৫ ॥ সেই নৌকাটি জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া ছোট নৌকাটি লইয়া ঘাটের নিকট গেলেন ॥ ৬ ॥ সেইখানে কৃষ্ণ রাধার পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৭ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥[১]

দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআঁ।
ডাক পাড়ে গোআলিনী চারি পাস চাহিআঁ ॥
বিহাণ আইলাহোঁ এথাঁ বেলা আপার।
কত খনে যাইব আহ্মে মথুরার পার ॥ ১ ॥

১ 'পাহাড়ীআরাগঃ। ক্রীড়া।' তোলাপাঠে।

ঘাটের ঘাটিআল কহি গেল সে।
দধির চুপড়ী মোর পার করি দে ॥ ধ্রু ॥
নাএর অন্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী।
তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী ॥
কথো দূর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ ॥ ২ ॥
তার থান গিআঁ বোলে রাধা গোআলিনী।
কেহ্নমনে পার হয়িব ছোট নাঅখানী ॥
একেঁ একেঁ পার হআঁ যাইব মথুরা।
সব্ধাই চড়িলেঁ নাঅ না সহিব ভরা ॥ ৩ ॥
শুন ঘাটিআল নাঅ চাপা য়আঁ ঘাটে।
সব্ধা পার কর যাইউ মথুরার হাটে ॥
রাধার বচন শুণী ঘাটিআল হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দধির চুপড়ি যমুনার তীরে রাখিয়া গোয়ালিনী রাধা চারিদিকে চাহিয়া ডাক পাড়িয়া বলিতে লাগিল : আমরা সকালে এখানে আসিয়াছি, এখন অনেক বেলা হইয়া গেল। নদী পার হইয়া মথুরায় যাইব কখন ॥ ১ ॥ ঘাটের যে ঘাটোয়াল সে কোথায় গেল? আসিয়া আমার দধির চুপড়ি পার করিয়া দাও ॥ ধ্রু ॥ কবির উক্তি : রাধা নৌকার সন্ধানে গেল। তাহার পিছনে পিছনে যত সখী ছিল তাহারাও গেল। কিছু দূর গেলে একখানি নৌকা দেখিতে পাইয়া রাধা সত্বর তাহার নিকট গেল ॥ ২ ॥ তাহার নিকট গিয়া গোয়ালিনী রাধা বলিল : নৌকাটি যে ছোট, ইহাতে কেমন করিয়া পার হইব? সকলে চড়িলে এ নৌকায় ভার সহিবে না। আমরা এক একজন করিয়া পার হইয়া মথুরায় যাইব ॥ ৩ ॥ ঘাটিয়াল আমার কথা শোনো, নৌকা ঘাটে আনিয়া আমাদের সবাইকে পার করিয়া দাও, আমরা মথুরায় যাইব। রাধার কথা শুনিয়া ঘাটোয়াল হাস্য করিল। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একাতালী[১] ॥

প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী।
মুদিত ভাণ্ডারে কাহ্নাঞিঁ না সাম্বাএ চুরী ॥
ধরম দেখিআঁ কর যমুনাত পার।
তোহ্মা প্রতি যোগ নহে যৌবন আহ্মার ॥ ১ ॥
পথে বল না কর নিলজ বনমালী।
মো কিছু না জাণো শিশু আবালী গোআলী ॥ ধ্রু ॥

১ ঐ। প্র : একত্তালী।

ঘৃত দধি দুধ মোর ঘোলের পসার।
সব নঠ হএ কাহ্নাঞি ঝাঁট কর পার ॥
নাহিঁ চিহ্ন আহ্মা তোহ্মে আইহনের রাণী।
কালি ছিলা রাখোআল আজি মাহাদাণী ॥ ২ ॥
ও কুলে মথুরা মাঝে যমুনার নদী।
ও আরিতেঁ পার হআঁ বিকণিবোঁ দধী ॥
ঘাটের ঘাটিয়াল মোরে ঝাঁট কর পার।
তোর মায় যশোদার ননন্দ আহ্মার ॥ ৩ ॥
তোহ্মে ত ভাগিনা আহ্মে তোহ্মার মাউলানী।
পাপ বচন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥
এড়িআঁ বিবুধি তোহ্মে থীর কর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : স্বামী আমার নব-যৌবন পরিমাণ করিয়া গিয়াছেন। রুদ্ধ ভাণ্ডারে চোর প্রবেশ করিতে পারে না। ধর্ম বিচার করিয়া যমুনা পার করিয়া দাও। আমার যৌবন তোমার উপভোগের যোগ্য নহে ॥ ১ ॥ লজ্জাহীন বনমালী, পথে বল প্রয়োগ করিও না। আমি বালিকা, গোপকুমারী, আমি কিছুই জানি না ॥ ধ্রু ॥ আমার ঘৃত দধি দুধের পসার সব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। হে কৃষ্ণ, শীঘ্র পার করিয়া দাও। আমি আইহনের পত্নী, আমাকে তুমি চেন না। কাল ছিলে রাখাল আজ হইয়াছ মহাদানী ॥ ২ ॥ মধ্যে যমুনা, ওপারে মথুরা। ওপারে গিয়া দধি বিক্রয় করিব। ওহে ঘাটের ঘাটোয়াল, শীঘ্র আমাকে পার করিয়া দাও। তোমার মা যশোদা সম্পর্কে আমার ননদ ॥ ৩ ॥ তুমি আমার ভাগিনা, আমি তোমার মামী। হে চক্রপাণি, তবু এমন পাপকথা বল কেন? মন্দবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া মন স্থির কর। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

অথ ভারখণ্ডঃ

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

মাঝ বৃন্দাবন গিআঁ কাহ্নাঞি গোআল।
চামড় গাছের বাছি[১] কাটিলেক ডাল ॥
দুঈ পাশেঁ ছুচ করী মাঝেঁ পুষ্ট করী।[২]
বাঁহুক সজাএ ভাল দেব মুরারী ॥ ১ ॥
রাধার কারণে কাহ্নাঞিঁ আল বেধিল মদন।
ভার সজ করিবারে করিলান্ত মন ॥ ধ্রু ॥
সুচাঁছে চাঁছিল ভার দুঈ মুঠী।
দুঈ পাশে নিরমিল শুশোভন গুঠী ॥
ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ।
বাঁহুক সংপুন্ন হয়িল আতী শুশোভন ॥ ২ ॥
নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞি মাঝজলে থুইল।
বার পহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল ॥
সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসর।
চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর ॥ ৩ ॥
সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ।
তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণ্ডুআ ॥
বাঁহুক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি : বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে গিয়া গোপালক কৃষ্ণ চামর গাছের ডাল বাছিয়া বাছিয়া কাটিলেন। উহার দুইপাশ সরু করিয়া কাটিয়া মধ্যাংশ পুষ্ট রাখা হইল। এইভাবে বাঁক নির্মাণ করা হইল ॥ ১ ॥ রাধার জন্য কামনার্ত কৃষ্ণ ভার তৈয়ার করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ধ্রু ॥ ভারের দুই দিক সুন্দরভাবে চাঁছিয়া পরিষ্কার করা হইল এবং দুইপাশে দুইটি গুটি নির্মাণ করা হইল। তাহার পর ঝামা দিয়া ঘষিয়া তাহাকে চিক্কণ করিয়া তুলিলেন। এইভাবে বাঁকটি অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত হইল ॥ ২ ॥ কৃষ্ণ নালিচা (পাট) কাটিয়া জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলেন। বার প্রহর পরে তাহা তুলিয়া শুকাইয়া পাট বাছিয়া লওয়া হইল। দামোদর সেই পাট চারিগুণ করিয়া পাকাইয়া দড়ি তৈয়ার করিলেন ॥ ৩ ॥ তাহার পর শক্ত করিয়া দুইটি শিকা বাঁধা হইল। ওই শিকার নিম্নে গাঁথা হৈল দুই বিঁড়া। এইভাবে বাঁক নির্মাণ করিয়া কৃষ্ণ যমুনার পারে গেলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

১ 'বাছি' তোলাপাঠে। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২ 'করী' তোলাপাঠে। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞি মরণ ইছসি।
সাপের মুখেতে[১] কেহ্নে আঙ্গুল দেসী ॥
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা ॥ ১ ॥
লাজ নাহিঁ কাহ্নাঞি বদনে তোহোর।
পাছে আসিতেঁ কেহ্নে চাহসি মোর ॥ ধ্রু ॥
মজুরিআ হআঁ কেহ্নে এত বড় রঙ্গ।
অলপ হআঁ[২] চাহ বড়ার সঙ্গ ॥
হাথেঁ হাথেঁ চাহা কাহ্নাঞি আকাশের চান্দ।
…সেরেঁ[৩] করসি তোএঁ ছান্দ ॥ ২ ॥
উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা।
পুরুষ হআঁ তোহ্মে[৪]…॥
কল[৫] লোকের মাঝে না বাসসি লাজ।
ন বহসি ভার বোলসি আন কাজ ॥ ৩ ॥
মাকড়ের…[৬] ঝুনা নারিকল।
আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল ॥
সঙ্গে আসিবে যবেঁ[৭] লঅ দধিভারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বা…[৮] ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: কৃষ্ণ, তুমি আয়ু থাকিতে মরণ ইচ্ছা করিতেছ কেন? কেন সাপের মুখে ইচ্ছা করিয়া আঙ্গুল দিতেছ? বিনা চুনে যেমন তাম্বুল তিক্ত লাগে, অল্প বয়সে বিরহের চিন্তাও তেমনই ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ, তোমার কিছুমাত্র লজ্জা নাই। আমার পিছনে পিছনে কেন আসিতে চাও। সামান্য মজুর হইয়া এত রঙ্গ করিবার স্পর্ধা করিতেছ কেন? ক্ষুদ্র হইয়া বৃহতের সঙ্গ চাহিতেছ। আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইতে চাও। তোমার কাজ দেখিয়া লোকে উপহাস করিবে ॥ ২ ॥ তুমি নন্দের পুত্র, উত্তম জাতিতে তোমার জন্ম। পুরুষ হইয়া তুমি এত ছলনা শিখিয়াছ। জনসমাজের মধ্যে

১ 'মুখেতে'র 'তে' তোলাপাঠে।
২ অ। প্র: হইআঁ।
৩ কয়েকটি অক্ষর ছাড় পড়িয়াছে। 'লোক উপহাসেরেঁ' হওয়া সম্ভব বলিয়া বসন্তরঞ্জন মনে করেন।
৪ ছাড়। 'জাণ এতেক কলা' হওয়া সম্ভব।
৫ অ। প্র: সকল।
৬ ছাড়। প্র: হাথে যেহ্ন।
৭ 'যবেঁ' তোলাপাঠে।
৮ প্র: বাসলীর বরে।

তোমার লজ্জা নাই। ভার বহিলে না, অথচ অন্য কাজে তোমার বড়ই আগ্রহ ॥ ৩ ॥ দেখো, মাকড়ের হাতে ঝুনা নারিকেল দিলে সে খাইতে পারে না। আমাকে দেখিয়াও তুমি বিকল হইও না। সঙ্গে যদি আসিতে চাও তাহা হইলে দধি-ভার তুলিয়া লও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ কানড়ারাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

ব্রহ্মা বেদ হরিবেক[২] ইন্দ্রে হরিব পাণী।
সজনসমাজেঁ হরিব সত্য বাণী ॥
কপিলা হরিব ক্ষীর সস্য বসুমতী।
ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী[৩] ॥ ১ ॥
না বোল না বোল রাধা হেনস বচন।
কৃষ্ণেঁ ভার বহিলেঁ মজিব ত্রিভুবন ॥ ধ্রু ॥
কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হুআঁ দুঠমনে।
প্রবল হৈআঁ সুদ্রেঁ লংঘিব ব্রাহ্মণে ॥
পুত্রেঁ বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে।
পুণ্য লংঘিব জনে হুআঁ পাপমনে ॥ ২ ॥
সেবকেঁ লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতী।
আপণা মজায়িব ব্রত লংঘিআঁ সতী ॥
শরণ জনের লোকেঁ লংঘিব পরাণ।
দাতাএঁ লংঘিব আপণেয়ি দিআঁ দান ॥ ৩ ॥
সব বিপরীত হৈব রাধা তোহ্মার কাজে।
আর রুঠ হয়িব তোরে ত্রিদশসমাজে ॥
না বহাঅ ভার রাধা পুব মোর আশ।
বাসলী শি'ব বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : ব্রহ্মা বেদ হরণ করিবেন, ইন্দ্র জল হরণ করিবেন, সজ্জনসমাজ সত্যবাণী হরণ করিবে, কপিলাগাভী দুগ্ধ, বসুমতী শস্য, ঋষিগণ তপস্যা এবং পণ্ডিতগণ সুমতি হরণ করিবে ॥ ১ ॥ রাধা এমন কথা তুমি বলিও না। কৃষ্ণ ভারবহন করিলে ত্রিভুবণ মজিবে ॥ ধ্রু ॥ তাহা হইলে কনিষ্ঠ দুষ্টমনা হইয়া জ্যেষ্ঠকে লঙ্ঘন করিবে, শূদ্র প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করিবে, পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে লঙ্ঘন করিবে, পাপে নিমগ্ন হইয়া মানুষ পুণ্যকে লঙ্ঘন করিবে ॥ ২ ॥ সেবক প্রভুকে, নারী পতিকে লঙ্ঘন করিবে, সতী পাতিব্রত্য লঙ্ঘন করিয়া আপনার সর্বনাশ করিবে, যে শরণাগত লোকে

১ 'কানড়ারাগঃ' তোলাপাঠে।
২ 'হরিবেক' তোলাপাঠে।
৩ 'সুমতী'র 'সু' তোলাপাঠে।

তাহার প্রাণ হরণ করিবে, যে দাতা সে দত্তাপহরণ করিবে ॥ ৩ ॥ রাধা, তোমার কাজে সব বিপরীত হইবে এবং দেবসমাজ কষ্ট হইবেন। আমাকে দিয়া ভার বহাইও না। রাধা, আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তীন ভুবনে রাধা আহ্মে আধিকারী।
বাছিআঁ সে পালি রাধা আহ্মাক ভারী ॥
ভার গরুঅ নহে গরুঅ বড[1] লাজ।
কেমনে জায়িব রাধা সজনসমাজ ॥ ১ ॥
না বোল না বোল রাধা হেনস উত্তর।
কোণ লাজে ভাব বহিবে গদাধর ॥ ধ্রু ॥
সকট ভাঁগিল আহ্মে শুণিআছ তোহ্মে।
জমল আর্জ্জুন ৩রু উপাড়িল আহ্মে ॥
কংস বধিবাবেঁ মোএঁ কৈলোঁ আবতার।
এবেঁ কি বহিব আহ্মে তোব দধিভার ॥ ২ ॥
দধি দুধ বিচি তোব বিপরীত মতী।
তেঁসি না চিহ্নসি আহ্মা দেব আধিপতী ॥
গোআলার ঝি তোহ্মে বড আছিদবী।
তেকাবণে ভাব বহাযিতেঁ চাহা হরী ॥ ৩ ॥
যৌবনগবর্বেঁ বোল এ সব উত্তর।
তাহাক শুণিতেঁ কোপ উপজে অন্তর ॥
এভোঁহো অযোগ্য বোল রাধা পরিহর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : রাধা, আমি ত্রিভুবন অধিকারী। বাছিয়া বাছিয়া আমাকেই তুমি ভারী নির্বাচন করিলে। ভারবহন গুরুতর নয়, কিন্তু ভারবহনের লজ্জাটাই আমার কাছে গুরুতর। হে রাধা, সজ্জনসমাজে আমি কেমন করিয়া যাই ॥ ১ ॥ রাধা, এমন কথা তুমি বলিও না। ভারবহন করা কৃষ্ণের পক্ষে লজ্জার কারণ হইবে ॥ ধ্রু ॥ আমি শকটাসুরকে বধ করিয়াছি, সে কথা তুমি শুনিয়াছ। জমল এবং অর্জুন এই দুই অসুর আমার হাতে নিহত হইয়াছে। কংসকে বধ করিবার জন্য আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। সেই আমি তোমার দধিভার- কেমন করিয়া বহন করিব ॥ ২ ॥ রাধা, দধি-দুধ বিক্রয় করিয়া তোমার মতিভ্রংশ হইয়াছে। তাই দেবতাগণের অধিপতি আমাকে তুমি চিনিতে পারিলে না। হে গোপকন্যা, তুমি বুদ্ধিহীনা, তাই কৃষ্ণকে দিয়া ভার বহাইতে চাও ॥ ৩ ॥ রাধা, তুমি যৌবনের অহঙ্কারে এই সব কথা বলিতেছ। শুনিয়া আমার অন্তরে ক্রোধের

১ 'বড়' তোলাপাঠে।

উদয় হইতেছে। এখনও বলি, তুমি এইরূপ অনুচিত বাক্য পরিহার কর। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

শৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে।
কত খনে জায়িব আহ্মে মথুরার হাটে ॥
ঘৃত দুধ নঠ হএ আম্বল দহী।
সংহতী এড়িআঁ জাএ গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥
লইবেঁ না লইবেঁ ভার সুন্দর মুরারী।
না বহিভেঁ ভার যবেঁ ধরোঁ আন ভারী ॥ ধ্রু ॥
ষোল শত সখিজন সহ্মে গেলা আগ।
তোর বোলেঁ তা সমার না লইলোঁ লাগ ॥
বোলহ উপায় কাহ্নাঞিঁ কি বুধি করিবোঁ।
জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ ॥ ২ ॥
সব সখি গেলেঁ কাহ্নাঞিঁ হৈবোঁ একসরী।
লোক দেখিলেঁ তবেঁ আহ্মেঁ লাজেঁ মরী ॥
তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ কিছু নাহিঁ লাজ।
ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তেঁসি একো[১] কাজ ॥ ৩ ॥
হার বিচিব আহ্মে ধরিব আন ভারী।
বসিআঁ থাক তোহ্মে সুন্দর মুরারী ॥
বাহুড়িআঁ চল কাহ্নাঞিঁ নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : যমুনার ঘাটেই এক প্রহর বেলা হইয়া গেল, মথুরার হাটে আর কখন যাইব ? ঘৃত-দুধ নষ্ট হইল, দধি টক হইয়া গেল, গোয়ালিনী সখীরাও সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া গেল ॥ ১ ॥ মুরারি, তোমাকে বলি শোনো। ভার লইবে কি না বলিয়া দাও। ভার যদি না বহিতে চাও তাহা হইলে আমি অন্য ভারী ধরিয়া আনি ॥ ধ্রু ॥ আমার ষোলশত সখী সকলেই আগাইয়া গেল। তোমারই কথায় তাহাদের সঙ্গে গেলাম না। এখন বল তো আমি কি বুদ্ধি করি ? যাহাকে দুধ জোগাই তাহাকে কি বলি ॥ ২ ॥ হে কৃষ্ণ, সব সখী চলিয়া গেলে আমি একলা পড়িয়া যাইব। লোকে আমাকে দেখিলে আমি লজ্জায় মরিব। তোমার মুখে তো লজ্জা বলিয়া কিছু নাই। তুমি যে কাজ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হও তাহার কোনটাই কর না ॥ ৩ ॥ আমি হার বিক্রয় করিয়া অন্য ভারী ধরিয়া আনিব। হে মুরারি, তুমি বসিয়া থাক নহিলে ঘরে চলিয়া যাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

১ 'একো' শব্দটি প্রথমে 'এখো' লিখিত হইয়াছিল। পরে 'খো' কাটিয়া 'কো' বসানো।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুঁথির ২২২ পৃষ্ঠা

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

মো যবেঁ জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পেলাইব ভার ।
তবেঁ কেহ্নে দিবোঁ তারে গরুঅ পসার ॥
বহুমূল পসার করিআঁ ছারখার ।
পাঞ্চ দুর্গতি[১] কাহ্নু করিল আহ্মার ॥ ১ ॥
এহে কি লআঁ জাইবোঁ হাট আগ হে বড়ায়ি ।
অখণ্ড পসার নঠ করিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
বিথর করী সাজাইলোঁ ঘৃত ঘোল দহী ।
বাধা নাহিঁ দিল কেহো গোয়ালিনী সহী ॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি কোণ পরকার ।
কেহ্নমতেঁ সজ হউ দধির পসার ॥ ২ ॥
আপণে যাচিআঁ কাহ্নাঞিঁ লৈল দধিভার ।
তাহাত লাগিআঁ ভারী না ধরিলোঁ আর ॥
এবেঁ সজ করু কাহ্নু আপণে পসার ॥
আপণা চিহ্নিআঁ ভার লউ আর বার ॥ ৩ ॥
যেই দধি দুধ ঘৃত ভাণ্ডত আছএ ।
পসার সাজিতেঁ তেঁএ কাহ্নুক জুআএ ॥
আপণে বুঝাহ বড়ায়ি নান্দের নন্দনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : কানাই সব ফেলিয়া দিবে, একথা আগে জানিলে তাহাকে কি আর এই গুরুভার বহিতে দিতাম ? বহু মূল্যের পসার ছাবখার করিয়া কৃষ্ণ আমার বড়ই দুর্গতি করিল ॥ ১ ॥ আমার সজ্জিত পসার নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখন কি লইয়া, বড়াই, হাটে গিয়া বেচিব ॥ ধ্রু ॥ বহু যত্ন করিয়া দধি-দুধের পসরা সাজাইয়াছিলাম । পথেও কেহ আসিয়া বাধা দেয় নাই । এখন কি উপায়ে এই ভাঙা পসরা সাজাই ? বড়াই, তুমি তাহার পথ বলিয়া দাও ॥ ২ ॥ কৃষ্ণ নিজে আসিয়াই তো এই দধিভার গ্রহণ করিল । আর সেই কারণেই আমি আর অন্য কোনো ভারী সংগ্রহ করিলাম না । এবার কৃষ্ণ স্বহস্তে আমার ভার সাজাইয়া দিক । নিজেই চাহিয়া আবার ভারগ্রহণ করুক ॥ ৩ ॥ যতটুকু দধি-দুধ ভাণ্ডের মধ্যে আছে তাহা দিয়াই তাহার এই পসরা সজ্জিত করিয়া দেওয়া উচিত । বড়াই, তুমি নিজে একথা কৃষ্ণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল । বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

---

১ প্রথমে 'সঙ্গতি' লেখা । পরে 'সঙ্গ' কাটা ও তোলাপাঠে 'দুর্গ' শব্দ বসানো । ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ লগনী ॥

কি বহিব ভার তোর বোলে নাহিঁ ভাষ[১] ।
লোকতে আহ্মার করাইলেঁ উপহাস ॥ ১ ॥
লোক কেহ্নে উপহাস করিব তোহ্মারে ।
কোণ গোআল সে নাহি বহে ভারে ॥ ২ ॥
ভার বহায়িলেঁ রাধা নানা পরবন্ধে ।
বড় দুখ পাইলোঁ ঘাঅ ভৈল মোর কান্ধে ॥ ৩ ॥
বিণি দুখেঁ সুখ নাহিঁ কথাঁহো কাহ্নাঞিঁ ।
হএ নহে পুছ তোহ্মে আপণ বড়ায়ি ॥ ৪ ॥
কি পুছিব বডায়ি রাধা আহ্মে সব জাণী ।
না দেখিল তোহ্মা হেন কথাহোঁ চউহালিণী ॥ ৫ ॥
না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ হেন রুখ বাণী ।
আসিতেঁ পুরিবোঁ আশ তোর চক্রপাণী ॥ ৬ ॥
আমৃতের ধারেঁ তোঁ সিঞ্চিলি মোর মন ।
সরূপেঁ কি হৈব রাধা তোর এ বচন ॥ ৭ ॥
সরূপ কহিলোঁ কাহ্ন লঅ দধিভারে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : তোমার কথায় কোনো শৃঙ্খলা নাই, ত্রিলোকের সর্বত্র আমাকে লইয়া উপহাস চলিতেছে। আমি তোমার ভার আর কেমন করিয়া বহন করি ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি : লোকে কেন তোমাকে উপহাস করিতে যাইবে? গোয়ালা হইয়া কে না ভারবহন করে ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : তুমি নানা প্রকারে আমাকে দিয়া ভারবহন করাইলে। আমি বড়ই দুঃখ পাইয়াছি। ভারবহনের ফলে আমার স্কন্ধে ঘা হইয়া গিয়াছে ॥ ৩ ॥ রাধার উক্তি : দুঃখ বিনা কোনোখানেই সুখ নাই—এ কথা বিশ্বাস না হয় তুমি বড়াইকে জিজ্ঞাসা কর ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : বড়াইকে এ কথা আর কিই বা জিজ্ঞাসা করিব? সবই আমার জানা আছে। তোমার ন্যায় চতুরালী আমি আর কোথাও দেখি নাই ॥ ৫ ॥ রাধার উক্তি : কৃষ্ণ, তুমি মুখ ফুটিয়া এমন কঠিন কথা বলিও না। দেখিও ফিরিবার পথে তোমার আশা নিশ্চয় পূর্ণ করিব ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : তোমার অমৃতবচনে মন তো ভিজিয়া গেল। কিন্তু এ কথা কি কখনো স্বরূপে পরিণত হইবে ॥ ৭ ॥ রাধার উক্তি : কানাই, তুমি দধিভার লও, আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিতেছি। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৮ ॥

---

১ ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অথ ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ডঃ

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

হাটের বাটের দাণ চাহে ভীনে ভীনে ।
মিছা পাঞ্জী মেলি বোলে লিখন প্রমাণে ॥
ভাণ্ড মাথেঁ চাহে মোরে ষোল পণ দাণ ।
মিছাই ঝগড় পাতে আছিদর কাহ্ন ॥ ১ ॥
আতি আদভুত বড়ায়ি কাহ্নের কাহিণী ।
খনে মজুরিআ হএ খনে মাহাদাণী ॥
যে কিছু মাণিলোঁ মোএঁ কাহ্নাঞিঁর থানে ।
ভার বহিলে মোর তাহার কারণে ॥
দধিভার না বহিল কাহ্ন ভালমণে ।
এবেঁ তার বোল আহ্মে পালিব কেমনে ॥ ২ ॥
নিষধিতেঁ কাহ্নে করী লৈল দধিভার ।
পসার টালিআঁ দধি ছাড়ায়িল আহ্মার ॥
সব ঠায়ি আপচয় কৈল মোর হরী ।
দাণ চাহিতেঁ লাজ না বাসে মুরারী ॥ ৩ ॥
দধি দুধ ছাড়ায়িলেঁ তার কড়ী দেউ ।
যে হএ মজুরি তার তাহাকেহো নেউ ॥
বোলহ কাহ্নেরে তেজু পাপবচন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : কৃষ্ণ হাট ও বাটের দান পৃথক পৃথক করিয়া চাহিতেছে। মিথ্যা পঞ্জিকা বাহির করিয়া বলিতেছে এই তাহার লিখন-প্রমাণ। আমার মস্তকস্থিত ভাণ্ডের জন্য ষোল পণ দান দাবি করিয়া কৃষ্ণ আমার সহিত মিছামিছি ঝগড়া বাধাইতেছে ॥ ১ ॥ বড়াই, কৃষ্ণের আচরণ সত্যই বড় অদ্ভুত। সে কখনো মজুর সাজিয়া বসে আবার কখনো মহাদানী হইয়া উঠে। কৃষ্ণ আমার ভার বহন করিবে এই শর্তেই তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। কৃষ্ণ আমার দধিভার ভালভাবে বহনই করিল না। এখন আমি কিরূপে তাহার কথা মানি ॥ ২ ॥ নিষেধ সত্ত্বেও আমার দধিভার তুলিয়া লইল, আর পসরা হইতে দধি-দুধ টলিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকল দিক দিয়াই সে আমার ক্ষতি করিল, তবুও দান চাহিতে তাহার লজ্জা করে না ॥ ৩ ॥ যে দধি-দুধ ছড়াইয়া কৃষ্ণ নষ্ট করিয়াছে তাহার দাম সে দিক, মজুরি হিসাবে তাহার যাহা প্রাপ্য হয় তাহা সে লউক। কৃষ্ণকে বল, সে যেন আর পাপজনক কথা না বলে। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে আলক ভষল ॥
নেত্র উতপল তোর নাসা নাল দণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড ॥ ১ ॥
সুন্দরি রাধা ল সরোবরময়ী[১]।
দুসহ বিরহজরে জরিলা কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার ॥
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল।
অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল ॥ ২ ॥
ঈষত ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে।
কনকরচিত তোর ত্রিবলী সোপানে ॥
গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে।
আরপিল হেম পাট শোভের জঘনে ॥ ৩ ॥
গরুঅ উরু নাল পদ হেম কমল।
তাত সুললিত রএ নূপুর ভষল ॥
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জবহরণ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : তোমার লাবণ্য জলের ন্যায়, কুন্তল শৈবালসদৃশ। মুখকমলে অলক-ভ্রমর শোভা পাইতেছে। উৎপলের ন্যায় তোমার চোখ আর নাসিকা হইল নলাকার দণ্ড। তোমার কপোলদ্বয় যেন অখণ্ড মহুয়ার ফুল ॥ ১ ॥ ওগো সুন্দরী রাধা, তুমি সরোবরসদৃশা। কৃষ্ণ দুঃসহ বিরহজ্বরে জীর্ণ। ॥ ধ্রু ॥ কুমুদসম তোমার হাসি আর দাঁতগুলি কেশরসদৃশ। তোমার উন্মুক্ত অধর প্রস্ফুটিত বন্ধুক পুষ্পের ন্যায়। বাহু তোমার মৃণাল, আর করদ্বয় যেন রক্তপদ্ম। তোমার অপরূপ পয়োধর যেন যুগল চক্রবাক ॥ ২ ॥ তোমার নাভিদেশে যেন ঈষৎ প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। তোমার ত্রিবলী যেন স্বর্ণনির্মিত সোপান। গুরুভার নিতম্ব যেন প্রশস্ত শিলাফলক। জঘনস্থলে স্বর্ণফলক শোভা পাইতেছে ॥ ৩ ॥ সুপুষ্ট উরু দুইটি কদলীকাণ্ডসদৃশ, পদদ্বয় স্বর্ণকমলসম। সেখানে ভ্রমর সুললিত গান করিয়া নূপুরের কাজ করিতেছে। তোমাকে ছাড়া বিরহজ্বালা হইতে আমার মুক্তি নাই। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

---

১ পুঁথিতে প্রথমে ছিল 'সরোঅরময়ী'। তাহার পর 'অ' কাটিয়া তোলাপাঠে 'ব' করা। ভূমিকায় পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তোর সুণিআঁ কাকুতী।
সদয়হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী ॥
তোর ভাগেঁ দিল রাধা রতি আনুমতী।
হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী ॥ ১ ॥
আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ।
এহাত না করিহ কাহ্ন মণে কিছু লাজ ॥ ধ্রু ॥
এবার সরূপ করি মোরে বুইল রাধা।
এহাত আঅর মণে না চিন্তিহ বাধা ॥
ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে।
কথো দূর গেলেঁ রতী পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ২ ॥
রৌদেঁ বিকলী রাধা চলিতেঁ না পারে।
এখনে করিতেঁ যোগ্য তার উপকারে ॥
ছাতী ধরিআঁ তার তোষিআঁ মনে।
আপণার সুখেঁ তাক নেহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচন তোহ্মে না করিহ আন।
আপণে সকল বুঝ নাগর কাহ্ন ॥
ঝাঁট করী রাধার মাথাত ধর ছাতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি: সুন্দর কৃষ্ণ, তোমার কাকুতিমিনতিতে যুবতী রাধিকার মন গলিয়াছে। তোমাকে সে রতিদানে সম্মত হইয়াছে, এখন হৃষ্টমনে তুমি তাহার মাথায় ছত্র ধারণ কর ॥ ১ ॥ অল্প কর্মেই তুমি অধিক ফলের সুযোগ পাইতেছ। ইহাতে মনে লজ্জা করিও না ॥ ধ্রু ॥ এবার রাধা সত্য করিয়া আমাকে বলিয়াছে। আর কোনো বিঘ্নের আশঙ্কা করিও না। যাও, গিয়া রাধিকার মাথায় ছত্র ধারণ কর। কিছু দূর গেলেই রাধার সহিত মিলন হইবে ॥ ২ ॥ রৌদ্রে সে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এখন তুমি তাহার যোগ্য উপকার কর। ছত্রধারণে রাধাকে তুষ্ট করিয়া মনের খুশীতে তাহাকে কুঞ্জবনে লইয়া যাও ॥ ৩ ॥ আমার কথার তুমি আর অন্যথা করিও না। বুদ্ধিমান কানাই তুমি তো নিজেই সব বুঝিতে পার। দ্রুত গিয়া রাধার মস্তকে ছত্র ধারণ কর। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী দণ্ডকঃ ॥

আহ্মা ছাতী ধরাইআঁ কি সাধিবেঁ মান।
সহিতেঁ না পারিবোঁ এত বড় আপমান ॥ ১ ॥

যদি সুরতীকে তোর আছে পতিআশ।
ছাতী কেহ্নে না ধর আসী মোর পাশ ॥ ২ ॥
বিমতী তেজহ রাধা দেহ শৃঙ্গারে।
আহ্মা ভাণ্ডিবারে কেহ্নে[১] পাত পরকারে[২] ॥ ৩ ॥
তোহ্মে কি না জাণ তীন ভুবন বিচার।
কোণ বেদ পুরাণে আছএ পরদার ॥ ৪ ॥
কিবা বেদ শাস্ত্র আহ্মা কিবা পুণ্য পাপ।
সহিতেঁ না পারী আহ্মে বিরহের তাপ ॥ ৫ ॥
এতেক আরতী আছে পরে কেহ্নে মাঙ্গী।
বিহা করিতেঁ না জুআএ হঅ তোহ্মে যোগী ॥ ৬ ॥
আহ্মে হরী আহ্মে হর আহ্মে মহাযোগী।
কর যোড় করি রতি ভিক্ষ্যা তোক মাঁগী ॥ ৭ ॥
দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পুড়ী মরে।[৩]

কৃষ্ণের উক্তি : রাধার মন পাইবার জন্য আমাকে তাহার মাথায় ছাতা ধরিয়া সাধিতে হইবে এত বড় অপমান আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয় ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি : যদি সুরতিতে তোমার এত আকাঙ্ক্ষা তবে কেন আমার পার্শ্বে আসিয়া ছত্র ধারণ করিবে না ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : দুর্মতি ত্যাগ কর। আমাকে প্রতারিত করিবার জন্য কৌশল করিতেছ কেন ॥ ৩ ॥ রাধার উক্তি : ত্রিভুবনে এমন কথা কি কোথাও শুনিয়াছ ? বল তো কোন্ বেদ-পুরাণে এই পরদারের কথা বলা হইয়াছে ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : কোথায় বেদ কোথায় শাস্ত্র পাপপুণ্যই বা কি ? বিরহের জ্বালা আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না ॥ ৫ ॥ রাধার উক্তি : এতই যদি লালসা তবে পরের কাছে ভিক্ষা করিতেছ কেন ? যোগী সাজিয়া আছ, বিবাহ করিতে পার না ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : আমি হরি, আমি হর, আমি মহাযোগী, তোমার কাছে করজোড়ে রতিভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৭ ॥ রাধার উক্তি : সাধুর ধনসম্পত্তি দেখিয়া চোর পুড়িয়া মরে।

---

১ 'কেহ্নে'র ে-কার তোলাপাঠে।

২ 'পরকারে'র র-কার তোলাপাঠে।

৩ ইহার পর ১০৪-১১১ সংখ্যক পাতা পুঁথিতে নাই।

অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

তোর রতি আশোআশেঁ[১] গেলা আভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার শঙ্কেতবেণু বাজাএ যতনে ॥ ১ ॥
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে ॥ ধ্রু ॥
তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে।
তাহাকো করএ কাহ্নু আতি বহুমানে ॥
পাখি বসিতেঁ তরুপাতচলনে।
তোহ্মার গতি শঙ্কিআঁ রচয়ে শয়নে ॥ ২ ॥
চাহে দশ দিশ কাহ্নু চকিত নয়নে।
কত খনে আইসে রাধা এহি করী মণে ॥
তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে।
শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে ॥
গলিত বসন হীন রসন জঘনে।
আপণে আরোপ গিআঁ পল্লবশয়নে ॥ ৪ ॥
মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞিঁ শেষ রজনী।
তার পুর মনোরথ মোর বোল সুণী ॥
এবেঁ আয়ুগত রাধা বিলম্ব গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

বড়াইর উক্তি : সর্বাঙ্গে মনোহর বেশ ধারণপূর্বক কৃষ্ণ অভিসারে গিয়াছে। রাধা, তুমি আর বিলম্ব করিও না। ওই দেখ, সে অতি যত্নসহকারে তোমার উদ্দেশ্যে সংকেতবেণু বাজাইতেছে ॥ ১ ॥ কালিন্দীর তীরে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে। তোমার কথাই কৃষ্ণ চিন্তা করিতেছে ॥ ধ্রু ॥ তোমার দেহস্পর্শ বহন করিয়া যে বাতাস প্রবাহিত হইতেছে কৃষ্ণ তাহাকে পরম সমাদর করিতেছে। পাখীর পায়ের আঘাতে বৃক্ষপত্র কম্পিত হইলে তুমি আসিতেছ মনে করিয়া কৃষ্ণ তোমার জন্য শয্যা রচনা করিতেছে ॥ ২ কতক্ষণে রাধিকা আসিবে এই ভাবিয়া কৃষ্ণ দশদিকে চঞ্চল নয়নে চাহিতেছে। রাধা,

[১] 'আশো' তোলাপাঠে। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তুমি তোমার ওই মুখর নূপুর দুইটি ছাড়িয়া এই ঘন অন্ধকারে দ্রুত কুঞ্জে যাও ॥ ৩ ॥ কবির উক্তি : কৃষ্ণের হৃদয়াসীনা রাধিকা মেঘমালায় বিদ্যুৎশিখার ন্যায় শোভমানা। স্খলিতবসন, জঘনদেশ কাঞ্চীমুক্ত। নিজে গিয়া পল্লব-শয্যায় শয়ন কর ॥ ৪ ॥ রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। কৃষ্ণ বড় অভিমান করিয়াছে। আমার কথা শুনিয়া তাহার মনোরথ পূর্ণ কর। এখন গমনে বিলম্ব করা অনুচিত। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৫ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বৃন্দবনকথা শুণী বড়ায়ির মুখে।
গোআল যুবতী সব পাইল বড় সুখে ॥
সন্ধাক লয়িআঁ রাধা করিআঁ যুগতী।
বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলা একমতী ॥ ১ ॥
রাধা সব সখি সমে করিল গমনে।
তখণ সন্ধার মণে বেধিল মদনে ॥ ধ্রু ॥
আতি বড় পাইল রাধা মনত হরিষে।
বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি বৃন্দাবন দিশে ॥
আগু করী বড়ায়িক চন্দ্রাবলী জাএ।
চিত্তের হরিষে সব গোপী গীত গাএ ॥ ২ ॥
বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে।
আড় নয়নে দেখে কাহ্নাঞিঁক পাশে ॥
খসাআঁ বন্ধিল পুণী কুন্তলভার।
সঘন ছাড়িল রাধা হাম্বী আপার ॥ ৩ ॥
চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে।
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে ॥
হেনমতেঁ গেলী রাধা মাঝবৃন্দবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি : বড়াইর মুখে বৃন্দাবনের কথা শুনিয়া যুবতী গোপ-বালিকারা বড় খুশী হইল। রাধা সকল সখীকে লইয়া পরামর্শের পর বৃন্দাবন দেখিতে সম্মত হইল ॥ ১ ॥ রাধা সকল সখীর সঙ্গে যাত্রা করিল। তখন সকলের মনেই কামনার ভাব সঞ্চারিত হইল ॥ ধ্রু ॥ রাধারও মনে আর আনন্দ ধরে না। সে বৃন্দাবনের অভিমুখে অগ্রসর হইল। বড়াইকে সম্মুখে রাখিয়া চন্দ্রাবলী চলিতে লাগিল আর মনের হরষে গোপিনীরা কণ্ঠে সুর তুলিল ॥ ২ ॥ বৃন্দাবনে পৌছিয়া রাধা রঙ্গের সহিত আড়-নয়নে একবার কৃষ্ণের দিকে তাকাইল। কুন্তলভার একবার খসাইয়া আবার বিন্যস্ত করিল এবং আবেশবশে ঘন ঘন হাই তুলিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ রাধা সখীর বদনে চুম্বন করিল। মদনাবেশে মধুর

সুরে গান গাহিল। এইরূপে চলিতে চলিতে রাধা মাঝবৃন্দাবনে প্রবেশ করিল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ।

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে।
কুসুমসমূহে শোভে সব তরুগণে ॥
তাত সুললিত[১] ভ্রমরের রোল।
আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল ॥ ১ ॥
রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে।
আজি সে সফল হ…ন[২] যৌবনে ॥ ধ্রু ॥
শপথ করিআঁ রাধা বোলো এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥
একা[৩] ঠায়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পত্র ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার ॥ ২ ॥
এহা বন[৪] আদভুত আছে থানে থানে।
আহ্মা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জাণে ॥
তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আনুমতী।
তথাঁক না লইহ লোক কেহো[৫] সংহতী[৬] ॥ ৩ ॥
সকল শরীর মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার।
তেহ্ন সব বন মাঝেঁ এ বন আহ্মার ॥
এহাত উচিত হএ তোহ্মার বিলাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি: চন্দ্রাবলী রাধিকা, মাঝবৃন্দাবনে গিয়া দেখ কুসুমসমূহে তরুরাজি কিরূপ শোভা পাইতেছে? সেখান হইতে সুললিত ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যাইতেছে। মানুষের তো কথাই নাই, দেবতারাও ইহা শুনিয়া মোহিত হইয়া পড়েন ॥ ১ ॥ রাধা, তুমি ও আমি এই বৃন্দাবনের মধ্যে মিলিত হইয়াছি, আজ তোমার জীবন-যৌবন সার্থক হোক্ ॥ ধ্রু ॥ রাধা, শপথ করিয়া বলিতেছি তোমারই জন্য এই বৃন্দাবন নির্মাণ করিয়াছি। তুমি তোমার পসার একস্থানে রাখিয়া ফুল দিয়া অঙ্গশোভা কর এবং ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ এই

---

১ ছাড়। প্র: শুণী।
২ কয়েকটি অক্ষর অস্পষ্ট। প্র: হ [উ জীব] ন।
৩ অ। প্র: এহা। বসন্তরঞ্জন 'একা' স্থলে 'এক' হইবে অনুমান করেন।
৪ অ। প্র: বনে।
৫ 'লোক কেহো' তোলাপাঠে।
৬ প্রথমে 'সংকতী' লেখা, পরে 'ক' কাটিয়া তোলাপাঠে 'হ' করা।

বৃন্দাবনের ফল খাও ॥ ২ ॥ এই বনের স্থানে স্থানে এক একটি অদ্ভুত জায়গা রহিয়াছে—আমি ছাড়া যাহার খবর আর কেহই জানে না। যদি অনুমতি কর তোমাকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া দেখাই। অপর কোনো লোক কিন্তু সঙ্গে লইও না ॥ ৩ ॥ সকল মানুষের মধ্যে যেমন তুমি শ্রেষ্ঠ সকল বনের মধ্যে তেমনি আমার এই বনটি। এই বন তোমার বিলাসের যোগ্য। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

লাজ ভয় তেজিআঁ সকল গোপীগণে।
মিলিআঁ বুইল গিআঁ গেবিন্দচরণে ॥
আহ্মা না হেলিহ গোসাঞিঁ আনের বচনে।
আজি হৈতেঁ আহ্মে সহ্মে তোহ্মার শরণে ॥ ১ ॥
তোহ্মে দেব বনমালী নান্দের নন্দন।
আজি হৈতেঁ গোপীর হৃদয়চন্দন ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার ধরহ আর এক বচন।
কতো খন দেখি গোসাঞিঁ তোর বৃন্দাবন ॥
এড়িতেঁ না ফুরে মন এখো খনে।
কমন আন্তরে তোহ্মে হরিলেহেঁ মনে ॥ ২ ॥
বুঝিবারে নারিল তোহ্মারে জগন্নাথ।
পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহিঁ দেহ ভাত ॥
আসত নিফল দুখ সহন না জাএ।
ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহ্মাএ ॥ ৩ ॥
এ বচন শুণী উল্লসিত ভৈল কাহ্ন।
আমৃতেঁ সিঞ্চিল আপণার দুঈ কান ॥
গোপীগণমন তোষিবারে কৈল মন।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি : গোপবালিকারা সকলে মিলিয়া সমস্ত লজ্জা-সংকোচ বিসর্জন দিয়া গোবিন্দ-চরণে নিবেদন করিল—অন্যের কথায় তুমি আমাদের ত্যাগ করিও না। আজ হইতে আমরা সকলে তোমারই আশ্রিত হইলাম ॥ ১ ॥ দেববনমালী ওগো নন্দের নন্দন, আজ হইতে তুমি সকল গোপীর হৃদয়ের চন্দনরূপে বিরাজ করিবে ॥ ধ্রু ॥ আমাদের আর একটা কথা শোনো। কিছুক্ষণ ঘুরিয়া তোমার বৃন্দাবনটা দেখিয়া লই। কেমন করিয়া তুমি আমাদের মন হরণ করিলে। মুহূর্তের জন্যও এই স্থান ছাড়িতে মন উঠিতেছে না ॥ ২ ॥ জগন্নাথ, সত্যই তোমাকে বোঝা দায়। আশা দিয়া কেন আমাদের নিরাশ করিলে। এ আশাভঙ্গের দুঃখ সহ্য করা যায় না। ত্রিভুবনের সকলের মনই তো তোমার জ্ঞাত ॥ ৩ ॥ গোপীদের এই বচন কৃষ্ণের কানে যেন অমৃত সঞ্চার করিল। কৃষ্ণ তাই

উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং গোপাঙ্গনাদের মনস্তুষ্টিবিধানের জন্য ইচ্ছা করিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ আধর আমিআঁ[১] লোভে।
পরতেখ তোর[২] নয়নচকোর যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১ ॥
মদনবাণে দগধ ভৈলোঁ তোর আকারণ মাণে।
বদনকমল-মধুপান দিআঁ রাখহ মোর পরাণে ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ সত্যেঁ কোপ কয়িলেঁ তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ অধর দংশ দশনে ॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষন তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।
এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর বুলি তেঁ আতি যতনে ॥ ২ ॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন আধরে[৩] কোকনদ রূপে।
মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ হএ তোর আনুরূপে ॥
এ তোর কুচ শোভে মণি[৪] জঘনে নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর থলকমল চরণে ॥ ৩ ॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণপল্লব আরোপ রাধা মোর মাথার উপরে ॥
পালাউ আহ্মার মদনবিকার সত্বরেঁ করহ আদেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি: তুমি যখনই কোনো কথা বল তখনই হে রাধা, তোমার দন্তরুচি আমার ভয়ান্ধকার দূর করিয়া দেয়। তোমার বদন পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ, তাহারই অধরামৃতের আশায় আমার দুইটি নয়নচকোর নিশ্চলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে ॥ ১ ॥ তোমার অকারণ অভিমানে আমি মদনবাণে দগ্ধ হইলাম। তোমার বদনকমলের মধু পান করিতে দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। তোমার ভুজযুগল দিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া অধরে দর্শনাঘাত কর। তুমিই আমার রতন ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, ইহা মনে রাখিয়া আমার প্রতি দয়া কর ॥ ২ ॥ তোমার ম্লান নয়ন দুইটি নীলোৎপলসদৃশ। সেই নয়নবাণের আঘাতে কৃষ্ণকে দণ্ডিত কর। তোমার বক্ষে মণিমালা শোভা পাইতেছে, তোমার কটিদেশে রসনা

---

১ 'আমিআঁ' তোলাপাঠে।

২ অ। প্র: মোর।

৩ অ। প্র: ধরে।

৪ অ। প্র: মণিমাল।

মুখর হউক। রাধা, তুমি যদি অনুমতি কর স্থলকমলসদৃশ তোমার চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করি ॥ ৩ ॥ আমার শিরোমণ্ডনস্বরূপ স্মরগরলখণ্ডন তোমার ওই চরণপল্লব আমার মাথায় রাখ। তুমি সত্বর আদেশ কর আমার মদনবিকার দূরীভূত হউক। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥

তমাল কুসুম চিকুরগণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে ॥ ১ ॥
সুপুট নাসা তিলফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে ॥ ২ ॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কর্ণযুগ তোর এ বগহুলে ॥ ৩ ॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।
খস্তরী কুসুম তোর বসনে ॥ ৪ ॥
ভুজযুগ হেমযূথিকামালে।
অশোকতবক করযুগলে ॥ ৫ ॥
মুকুলিত থলকমল তনে।
রোমরাজী তাত আতয়ীগণে ॥ ৬ ॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনক কেতকী জংঘযুগলে ॥ ৭ ॥
চরণকমল থলকমলে।
আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে ॥ ৮ ॥
নখরনিকর দেখি গুলালে।
শিরীষ কুসুম তনু সকলে ॥ ৯ ॥
কনক চম্পক কুসুমপান্তী।
তোহ্মার সকল শরীরকান্তী ॥ ১০ ॥
নেআলী সেআলী মাহলী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে ॥ ১১ ॥
দেখোঁ মো তোর ফুলশরীরে ॥
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : তোমার কেশকলাপে তমালকুসুম, নয়নে নীলকুরুবক ॥ ১ ॥ সুগঠিত নাসিকায় তিলফুল ও গণ্ডযুগলে মহুয়ার ফুল দেখিতেছি ॥ ২ ॥ রক্তিম অধরে বান্ধুলী এবং কর্ণযুগলে বকফুলের শোভা ॥ ৩ ॥ দশনরাজিতে অর্ধপ্রস্ফুটিত কুন্দফুল, বসনে কস্তুরীকুসুমের আভাস ॥ ৪ ॥ স্বর্ণযূথিকার মালার মত বাহুদ্বয়, করযুগলে অশোকস্তবকের রক্তিমা ॥ ৫ ॥

পয়োধরে মুকুলিত স্থলপদ্ম ॥ ৬ ॥ গভীর নাভিদেশ নাগকেশরের সঙ্গে তুলনীয়। জংঘাযুগল স্বর্ণকেতকীসদৃশ ॥ ৭ ॥ তোমার চরণযুগলে স্থলপদ্ম এবং অঙ্গুলীতে চাঁপার কলির শোভা ॥ ৮ ॥ তোমার নখরপংক্তিতে রক্তিমা এবং তোমার সর্বাঙ্গে শিরীষকুসুমের কোমলতা ॥ ৯ ॥ স্বর্ণচাঁপার রাশি দিয়া তোমার দেহকান্তি রচিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ তোমার স্মিত হাস্যে নেয়ালী, শেফালী এবং মল্লিকা ফুলের প্রফুল্লতা ॥ ১১ ॥ তোমার সকল অঙ্গে দেখি নানা পুষ্পের সমারোহ। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১২ ॥

৩ অ।

৪ অ।

অথ যমুনান্তর্গত কালীয়দমনখণ্ডঃ[1]

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

গোপীগণমন তোষিল দেব চক্রপাণী।
মথুরা নগর যাইতেঁ দিলান্ত মেলানী ॥ ১ ॥
তখন গুণিল কিছু মণে দামোদর।
বিলাস করিলোঁ মোঞঁ বনের ভিতর ॥ ২ ॥
জলকেলি করিবারেঁ কাহ্নু কৈল মন।
খণিএক[2] গুণিল হৃদয়ে জনার্দ্দন ॥ ৩ ॥
বৃন্দাবন মাঝেঁ যমুনা নদী বহে।
তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহে ॥ ৪ ॥
কালীয় নাম নাগ তাহাত বসে।
জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে ॥ ৫ ॥
কোহ্নো জন্তু তাত না করএ জল পান।
তাহাত আধিক নাহিঁ বিজন থান ॥ ৬ ॥
কালী দলিআঁ জল করিআঁ নির্ম্মল।
তাহাত করিবোঁ জলকেলি সকল ॥ ৭ ॥
হেন মনে চিন্তি গেলা দেব দামোদর।
কালীয়দহের কূল কদমের তল ॥ ৮ ॥
কদম্বতরুত চড়ী দহে দিল ঝাঁপ।
দেখি রাখোআল ডরেঁ উঠি গেল কাঁপ ॥ ৯ ॥
কোপিল কালীয় লাগ[3] লআঁ পরিবারে।
দশনে দংশিল সব কাহ্নের শরীরে ॥ ১০ ॥
তিলেঁ তিলেঁ নাগকুলেঁ দংশিল কাহ্নাঞিঁ।
হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঁ ॥ ১১ ॥
তখণ বিষের জালে দগধ পরাণ।
আচেতন হয়িআঁ রহিলা দেব কাহ্ন ॥ ১২ ॥
হেনই সম্ভেদে সব গোপযুবতী।
বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী ॥ ১৩ ॥

---

১ পুঁথিতে 'কলীয়দমনখণ্ডঃ' আছে। বসন্তরঞ্জন বানান পরিবর্তন করিয়া 'কালিয়দমনখণ্ডঃ' পাঠ বসাইয়াছেন।

২ অ। প্র: খানিএক।

৩ অ। প্র: নাগ।

বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখোআলগণে।
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে ॥ ১৪ ॥
সব গোপ রাখোআল গোপীগণ থানে।
বুইল কালীদহে ঝাঁপ দিল দেব কাহ্নে ॥ ১৫ ॥
এহা সুণী সব গোপী পাইল তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৬ ॥

কবির উক্তি. গোপীগণের মন তুষ্ট করিয়া মথুরা নগরে যাইবার পথে কৃষ্ণ তাহাদের বিদায় দিলেন ॥ ১ ॥ তাহার পর দামোদর মনে মনে ভাবিলেন, তিনি কেবল বনপ্রদেশেই বিলাস করিলেন ॥ ২ ॥ তিনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন। এবার তাঁহার জলক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইল ॥ ৩ ॥ বৃন্দাবনের মধ্যে যমুনা নদী বহিতেছে। তাহাতে কালীদহ নামে এক গভীর হ্রদ আছে ॥ ৪ ॥ তাহাতে কালীয নামে একটি সর্প বাস করে যাহার বিষে জলের মাছ ডাঙার গাছ সকলই বিনষ্ট হইল ॥ ৫ ॥ কোনো জন্তু আসিয়া সেখানে জল পান করে না। তাহা অপেক্ষা অধিকতর নির্জন স্থান আর কোথাও নাই ॥ ৬ ॥ কালীদহের জল নির্মল করিয়া তাহাতে সকলে মিলিয়া জলকেলী করিব ॥ ৭ ॥ এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ কালীদহের কূলে কদম্বতলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥ কদম্ববৃক্ষ হইতে ওই জলে কৃষ্ণকে ঝাঁপ দিতে দেখিয়া রাখাল বালকেরা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল ॥ ৯ ॥ কালীয়নাগ সপরিবারে কৃষ্ণের শরীরের সর্বত্র দংশন করিল ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণকে এইরূপ তিলে তিলে দংশন করিয়া সর্পকুল কৃষ্ণের হাতে পায়ে গলায় জড়াইয়া সেইখানেই রাখিয়া দিল ॥ ১১ ॥ বিষের জ্বালায় কাতর কৃষ্ণ চৈতন্য হারাইলেন ॥ ১২ ॥ এমন সময়, গোপযুবতীরা সকলে মিলিয়া বৃন্দাবনের পথ দিয়া মথুরায় যাইতেছিল ॥ ১৩ ॥ রাখালবালকদের বিহ্বল অবস্থা দেখিতে পাইয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের এমন সন্ত্রস্ত দেখিতেছি কেন ॥ ১৪ ॥ গোপবালকেরা তখন গোপিনীসকলকে কৃষ্ণের কালীদহে ঝাঁপ দিবার কথা বলিল ॥ ১৫ ॥ এ কথা শুনিয়া তাহারাও ভয় পাইল। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১৬ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সকল গোআলকুল লআঁ ততিখনে।
নন্দ যশোদা ধাযিআঁ আইল সেই থানে ॥
দেখিল কালীদহে পসিলা নারাযণ[১]।
নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন ॥ ১ ॥
কেহ্নে হেন কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ মোর আদিবসে।
তোহ্মে লাগি ভৈল আজি শুন দশ দিশে ॥ ধ্রু ॥
লোটাআঁ লোটাআঁ দুঈহো কান্দে একবারে।
কেহ্নে শুন কৈলেঁ মোর সকল সংসারে ॥

১ অ। প্র নারায়ণ।

থাণিএক উঠ দেখোঁ পুতা তোর মুখ।
আহ্মা দুখ দিআঁ পুতা কত পাইবেঁ সুখ ॥ ২ ॥
সকল গোআল কান্দে মাথে দিআঁ হাথে।
কেহ্নে আহ্মা মারি যাহা দেব জগন্নাথে ॥
উঠিআঁ বোলহ কে বা কৈল কোণ দোষে।
দহত পসিলা কাহ্নাঞিঁ কাহার রোষে ॥ ৩ ॥
বলভদ্র থাণিএক গুনিলান্ত মণে।
মোহো পায়িল কাহ্নাঞিঁ বিসরি আপণে ॥
পুৰ্ব্বব জাণায়িআঁ আহ্মে করায়িউ চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি : সমগ্র গোপকুলকে সঙ্গে লইয়া নন্দ ও যশোদা সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কালীদহে নারায়ণ প্রবেশ করিয়াছেন। তখন উভয়েই ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ, তুমি আমাকে অভাগিনী করিয়া এমন কাজ কেন করিলে? আজ তোমার জন্য আমাদের দশ দিক শূন্য হইয়া গেল ॥ ধ্রু ॥ তাঁহারা দুইজনই লুটাইয়া লুটাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, তুমি আমাদের সকল সংসার শূন্য করিয়া কেন চলিয়া গেলে? বাছা একবার উঠ, তোমার মুখটুকু শুধু দেখি। আমাদের দুঃখ দিয়া তুমি কি সুখ পাইবে ॥ ২ ॥ মাথায় হাত দিয়া গোপ গোপী সকলেই কাঁদিতে লাগিল। আমাদের দুঃখ দিয়া হে জগন্নাথ, তুমি কোথায় চলিয়া গেলে? উঠিয়া বল কাহার দোষের জন্য রাগ করিয়া তুমি কালীদহে প্রবেশ করিলে ॥ ২ ॥ বলভদ্র কিছুক্ষণ মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন। তিনি বুঝিলেন কৃষ্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছেন। বলিলেন, পূর্ব কথা জানাইয়া আমি কৃষ্ণের চৈতন্য সম্পাদন করিব। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

পড়াড়ীআরাগঃ[১] ॥ ক্রীড়া ॥

আহা
তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী।
স্বগ্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী ॥
তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল ॥ ১ ॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালী।
জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী ॥ ধ্রু ॥
মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ।
কমঠশরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ ॥

১ অ। প্র : পাহাড়ীআরাগঃ।

মাহাকোল রূপেঁ দন্তে মেদনী বিদারিলেঁ[১] ।
নরহরি রূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারিলেঁ ॥ ২ ॥
বামন রূপেঁ তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ ।
পরশুরাম রূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ ॥
শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ ।
বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্টজন ।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥
হেন স্থনিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাইল চেতন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বলভদ্রের উক্তি : আহা ! তুমিই জল, তুমিই স্থল, তুমিই বন, তুমিই পর্বত। স্বর্গ মর্ত্য পাতালে তুমিই ভগবান হরি। তুমিই সূর্য, তুমিই চন্দ্র, সর্বদিকের তুমিই একমাত্র অধীশ্বর। লীলাদেহ ধারণ করিয়া তুমি গোপরূপে আসিয়াছ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ, তুমি নিজেকে কেন চিনিতে পার না ? যে জগৎ সংহার করে তাহার কাছে কালীয়নাগ তো কোন্ ছার ॥ ধ্রু ॥ মীনরূপ ধরিয়া তুমি জল হইতে বেদ উদ্ধার করিলে। কচ্ছপের রূপ ধারণ করিয়া তুমি ধরণী ধারণ করিলে। বরাহরূপে মেদিনী বিদীর্ণ করিলে। নরহরিরূপে তুমি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলে ॥ ২ ॥ বামনরূপ ধরিয়া তুমি বলিকে ছলনা করিলে। পরশুরামরূপে ক্ষত্রিয় নাশ করিলে। শ্রীরামচন্দ্ররূপে তুমি রাবণ সংহার করিলে। বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া তুমি নিরঞ্জনের চিন্তা করিলে ॥ ৩ ॥ কল্কীরূপে তুমি দুষ্ট জনকে দলন করিয়াছ। এবার কংসবধের জন্যে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কবির উক্তি : এই সকল কথা শুনিয়া কৃষ্ণের চেতনা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

১ অ। প্র : তুলিলেঁ।

অথ যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ডঃ[১]

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যাই যমুনার পাণিকে আইস সখি মোর সঙ্গে ।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ আসিব এ বড় রঙ্গে ॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ জাএ গজগড়ি[২] ছান্দে ।
আলকেঁ শোভে বদন তাহার যেহেন কলঙ্ক চান্দে ॥ ১ ॥
আল ।
পাইল রাধা কালীদহ কূল লইআঁ সখি সমাজে ।
ঘাটত ভেটিল নান্দের পো কাহ্ন না বুঝিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপ নারীগণ লাগিলা যমুনাতীরে ।
কাহ্নাঞিঁর মুখ কমল দেখিআঁ কেহো না ভরিল নীরে ॥
কেহো না পারিল করেঁ ধরিতেঁ খসিল দেহ বসনে ।
ওহার এহার মুখ চাহে সব কাহ্নো থির নহে মনে ॥ ২ ॥
তখন নয়ন নিমেষ না কৈল দেখি প্রিয় বনমালী ।
সকল গোআল যুবতী রহিলা যেহ্ন কনক পুতলী ॥
এখো পাঅ কেহো চলিতেঁ নারে বুলিতেঁ নারেঁ বচনে ।
কাহ্নাঞিঁ নাম পৃথিবীর চান্দ তাহাত লাগিল মনে ॥ ৩ ॥
আনেক যতন করিআঁ রাধা গেলি কাহ্নের সংমুখে ।
বুইল কাহ্নাঞিঁরে থাণিএক ঘুচ সখি পাণি নেউ সুখে ॥

১ পুঁথিতে বর্তমান খণ্ডের আদিতে 'অথ অমুক খণ্ডঃ' কিংবা অন্তে 'ইতি অমুক খণ্ডঃ সমাপ্তঃ'—এইরূপ কোনো নির্দেশ নাই। তাই এই খণ্ডের প্রকৃত নাম কি ছিল তাহা জানা যাইতেছে না। বসন্তরঞ্জন রায় এই খণ্ডের নাম দিয়াছেন 'যমুনাখণ্ডঃ'। বর্তমান খণ্ড এবং ইহার পূর্ববর্তী 'যমুনান্তর্গত কালীয়দমনখণ্ডঃ' ও পরবর্তী 'যমুনান্তর্গত হারখণ্ডঃ'—এই তিনটি খণ্ড একটি বৃহত্তর খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। সেই বৃহত্তর খণ্ডটিকেই কেবল 'যমুনাখণ্ড' নামে অভিহিত করা যায়। বর্তমান খণ্ডটি কালীয়দমন বা হারখণ্ডের ন্যায়ই বৃহত্তর 'যমুনাখণ্ডে'র অন্তর্গত একটি অংশ এবং বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইহার নাম হওয়া উচিত 'যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ডঃ'। বস্ত্রহরণ রাধাকৃষ্ণলীলাবিলাসের একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ। তিন খণ্ডাংশ সমন্বিত সমগ্র খণ্ডটিকে যে বড়ু চণ্ডীদাস 'যমুনাখণ্ডঃ' বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন তাহার প্রমাণ, বর্তমান খণ্ডের পূর্ববর্তী কালীয়দমনখণ্ডের শেষে যেমন 'ইতি যমুনান্তর্গত কালীয়দমনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ' লিখিত আছে, বর্তমান খণ্ডের পরবর্তী হারখণ্ডের শেষে সেইরূপ 'ইতি যমুনান্তর্গত হারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ' লেখা নাই। পুঁথিতে হারখণ্ডের শেষে লিখিত আছে 'ইতি যমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ'। অর্থাৎ কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ ও হার—এই তিন খণ্ডাংশ মিলিয়া যে যমুনাখণ্ড, তাহাই সমাপ্ত হইল।

২ 'গজগড়ি'র 'গজ' তোলাপাঠে।

পরিহাস রসেঁ দেব দামোদর যেহ্ন নাহিঁ পরিচএ।
তেহ্নমতেঁ বুঝিল রাধাক উত্তর বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: চল সখী চল, যমুনায় জল আনিতে যাই। যমুনার জলে কলস ভরিয়া আনিব—এ বড় রঙ্গ হইবে। কবির উক্তি: এইরূপ বলিয়া রাধা কলস হস্তে লইয়া গজগতি-ছন্দে যাত্রা করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলের উপর কেশপাশ চন্দ্রের উপর কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১ ॥ রাধা সখীদের সঙ্গে লইয়া যাইতে যাইতে কালীদহের কূলে উপনীত হইলেন। ঘাটেই স্বয়ং কৃষ্ণের সহিত দেখা হইল। লজ্জায় আর কাজের কথা বলা হইল না ॥ ধ্রু ॥ কৃষ্ণের মুখকমল দেখিয়া গোপবালিকারা যমুনার তীরে হাসিতে খেলিতে শুরু করিয়া দিল। জল ভরা তাহাদের হইল না। তাহাদের গাত্র হইতে বসনাঞ্চল খসিয়া পড়িতেছে। হাত দিয়া সম্বরণ করা যাইতেছে না। কাহারো মন এ অবস্থায় স্থির নাই, গোপীরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ॥ ২ ॥ কৃষ্ণকে দেখিয়া তাহাদের চোখে আর পলক পড়িতেছে না। কনক-পুত্তলীর মত তাহারা নিশ্চল হইয়া রহিল। তাহারা এক পাও চলিতে পারে না, মুখ দিয়াও বাক্যস্ফূর্তি হয় না। কৃষ্ণ নামে ভূতলে যে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে সেই চন্দ্রেই তাহাদের মন নিবিষ্ট হইয়া রহিল ॥ ৩ ॥ অতঃপর অনেক কষ্টে রাধিকা কৃষ্ণের সম্মুখে গিয়া বলিল, সখীরা খুশীমনে জল ভরিয়া লউক, তুমি কিছুক্ষণ একটু সরিয়া দাঁড়াও। রাধার সহিত যেন পরিচয় নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া কৃষ্ণ তাহার সহিত পরিহাসবাক্য বলিতে লাগিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী।
কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী ॥ ১ ॥
বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।
আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত কী ॥ ২ ॥
কাখের কলস নাম্বাঅ তোহ্মে।
কথা চারি পাঁচ কহিব আহ্মে ॥ ৩ ॥
যার কান্ধ বসে দোষর মাথা।
সেসি আহ্মা সমে কহিবে কথা ॥ ৪ ॥
তাম্বুল[১] নেহ আইহনের রাণী।
তোর বচনে জীএ চক্রপাণী ॥ ৫ ॥
তাম্বুল দিআঁ মোরে…[২] বোলসী।
খুদ বড়সিএঁ রুহী বাজুসী ॥ ৬ ॥

১ অ। প্র: তাম্বুল।
২ ছাড়। প্র: কি।

এহা যমুনাত মো আধিকারী।
আহ্মার বচন স্থণ স্থন্দরী ॥ ৭ ॥
তোর মোর আর বচন নাহীঁ।
বুঝিল তোহ্মার মতী কাহ্নাঞিঁ ॥ ৮ ॥
স্থদ্ধ স্থবন্নের মোহোর কিঙ্কিনী।
এহা নেহ মোর ধরহ বাণী ॥ ৯ ॥
গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী।
মোর কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিনী ॥ ১০ ॥
হের ষোল হাথ মোর পাটোল।
এহা নেহ মোর ধরহ বোল ॥ ১১ ॥
স্থদ্ধ স্থবন্নের মোহোর বাঁশী।
এহা নেহ রাধা পাসত বসী ॥ ১২ ॥
তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটেঁ।।[১]
তাক হাথে করী দুধ না আউটেঁ। ॥ ১৩ ॥
তোর পাটোলের স্থণ কথা।
সে মোহোর ঘৃত ভাণ্ডের নাথা ॥ ১৪ ॥
মাথার মুকুট জলে রতনে।
এহা নেহ রাধা রাখহ সমানে ॥ ১৫ ॥
বাহিরেঁ ভিতরেঁ তোঁ কাহ্নু কাল।
মুকুট ধুয়িআঁ আহুকিতেঁ ভাল ॥ ১৬ ॥
ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে।
তাহাত মজিল মন আহ্মারে ॥ ১৭ ॥
মাহাকাল ফল আহ্মার তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে ॥ ১৮ ॥
রাধার নিঠুর স্থণিআঁ বাণী।
মনত ভয় পাইল চক্রপাণী ॥ ১৯ ॥
রস রাখে রাধা না দিল আশে।
বাসলী বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণের উক্তি: তুমি কাহার বধূ, কাহার তুমি রাণী? কেন যমুনা হইতে তুমি জল সংগ্রহ করিতেছ ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি: আমি বড় বাড়ির বধূ, বড় বাড়ির কন্যা। আমি জল তুলিতেছি তোমার তাহাতে কি ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: কাঁখের কলস একবার নামাও, আমি তোমার সহিত গুটিকয়েক কথা বলিতে চাই ॥ ৩ ॥ রাধার উক্তি:

১ প্রথমে 'আউটেঁ।' লেখা, পরে 'আউ' কাটা এবং তৎস্থলে তোলাপাঠে 'ঘা' করা। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যাহার কাঁধের উপর দুইটি মাথা রহিয়াছে সেই কেবল আমার সঙ্গে কথা বলিতে পারে ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : ওগো আইহন-পত্নী, এই তাম্বূলাদি গ্রহণ কর। তোমার বচন-সুধায় চক্রপাণি প্রাণ পায় ॥ ৫ ॥ রাধার উক্তি : তাম্বূল দিয়া আমাকে কি বলিতে চাও? ক্ষুদ্র বঁড়শি দিয়া কি কখনো রুই মাছ ধরা যায় ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : সুন্দরী, আমার কথা শোনো। এই সমস্ত যমুনার আমিই হইলাম অধিকারী ॥ ৭ ॥ রাধার উক্তি : কৃষ্ণ, আমি তোমার সকল মতলবই বুঝিতেছি। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো কথা নাই ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্মিত এই কিঙ্কিণী গ্রহণ করিয়া আমার কথা শোনো ॥ ৯ ॥ রাধার উক্তি : তোমার কিঙ্কিণীতে আমার কোনো কাজ নাই। আমি গোয়ালিনী, আমি তো আর নর্তকী নই ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : ষোল হাত দীর্ঘ এই পট্টবস্ত্রটি লইয়া একবার আমার কথা শোনো ॥১১॥ স্বর্ণনির্মিত এই বাঁশিটি লইয়া একবার আমার পাশে বসো ॥ ১২ ॥ রাধার উক্তি : তোমার বাঁশি দিয়া আমি ভাতে কাঠি দিই না, দুধও আওটাই না ॥ ১৩ ॥ আর তোমার পট্টবস্ত্রের কথা, তাহা আমি ঘৃতভাণ্ড পরিষ্কার করিবার নাতা বলিয়া গণ্য করি ॥ ১৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : রত্নখচিত এই মাথার মুকুটটি লইয়া আমাব মান রাখো ॥ ১৫ ॥ রাধার উক্তি : কানাই তোমার বর্ণ কাল, অন্তরও সেইরূপ মলিন। উজ্জ্বল মুকুট-ধোয়া জল তোমার সর্বাঙ্গে সেচন করিলে মালিন্য দূর হইবে ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : ডালিমের ন্যায় তোমার পয়োধর দুইটিই আমার মনকে মাতাইয়াছে ॥ ১৭ ॥ রাধার উক্তি : আমার পয়োধর মাকাল ফলসদৃশ। বাহির হইতে দেখিতেই সুন্দর কিন্তু খাইলে মৃত্যু অবধারিত ॥ ১৮ ॥ কবির উক্তি : রাধার নিষ্ঠুর বচন শুনিয়া চক্রপাণি ভীত হইলেন ॥ ১৯ ॥ রাধা রঙ্গরস অব্যাহত রাখিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণকে আশা দিলেন না। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ২০ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কভোঁ না কইল কাহ্নাঞিঁ তোর কিছু দোষে।
আকারণে কেহ্নে রাধা কৈলেঁ তারে রোষে ॥
তোত লাগি কোণ কাম না করিল কাহ্নে।
এবেঁ রাধা কেহ্নে কর তার আপমাণে ॥ ১ ॥
আহ্মার বচন শুন রাধা চন্দ্রাবলী।
সরস বচন দিআঁ তোষ বনমালী ॥ ধ্রু ॥
কোহ্নো গোপী না বুইল তারে খর বাণী।
তোহ্মে কেহ্নে তাহাত হয়িলা আগুআনী।
তেকারণে আসুখিল হৈল চক্রপাণী।
আনেক বুইল মোরে আভিমানবাণী ॥ ২ ॥
জাণিলোঁ রাধা তোত কিছু নাহিঁ বুধী।
হেনই মিলন হাথে কনক নিধী ॥

যে বচন বোলে কাহ্নু তাত পাত কান।
এতেকেই মণে পরিতোষ পাএ কাহ্নু ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচনে রাধা করিহ হেলা।
যৌবনসাগরে তোর কাহ্নাঞিঁ ভেলা ॥
না পরিহর রাধা কাহ্নের বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি: রাধা তুমি অকারণে কেন কৃষ্ণের প্রতি রুষ্ট হইলে, সে তো কোনোদিন তোমার কোনো ক্ষতি করে নাই। তোমার জন্য সে কোন্ কাজটা করে নাই? তবে কেন তুমি তাহাকে অপমান করিতেছ ॥ ১ ॥ রাধা চন্দ্রাবলী, আমার কথা শোনো। তুমি সরসবচনে বনমালীর তুষ্টি বিধান কর ॥ ধ্রু ॥ আর কোনো গোপী তো তাহাকে কোনো রূঢ় কথা বলিল না, তুমি কেন আগে গিয়া বলিলে। সেইজন্যই তো কৃষ্ণ অসুখী হইয়াছে। আমার নিকট সে তাহার অনেক অভিমানের কথা বলিল ॥ ২ ॥ বুঝিতেছি, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই নাই। এ মিলন বহু সৌভাগ্যের ফল। কৃষ্ণ যাহা বলে তাহা শুনিলেই তো সে পরিতুষ্ট হয় ॥ ৩ ॥ আমার কথার আর অবহেলা করিও না। তোমার যৌবন-সাগরে কৃষ্ণ-ভেলা ভাসাইয়া দাও। রাধা, কৃষ্ণের কথা দূরে ঠেলিও না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাছের কলসিএঁ রাধা তুলিলেঁ পাণী।
মধু রসময় তোর বোল থাণী থাণী ॥
হৃদয়ে কাঞ্চুলী শোভে কানড়ে[১] কুণ্ডলে।
আদিত্য জিণিআঁ উয়িল কিরণ মণ্ডলে ॥ ১ ॥
ধীরেঁ ধীরে যাহা[২] গোআলিনী স্থন মোর বোল।
রহিআঁ রহিআঁ দেহ বিরহের কোল ॥ ধ্রু ॥ :
আহ্মা লয়িআঁ[৩] রাধা পানি লয়িআঁ যাসি।
রোষে মন দিআঁ কেহ্নে মোরে না তরাসী ॥
কমণ কারণে রাধা না কাঢ়সি রাএ।
বিরহ আনলে মোর বিদগধ গাএ ॥ ২ ॥
রোষ পরিহর রাধা মোর বোল স্থন।
রোষে বিনাসে দেহে এ সকল গুন ॥

১ অ। প্র: কানতে।
২ 'হা' তোলাপাঠে।
৩ অ। প্র: লজ্জিআঁ।

আধিকার কৈল[১] আহ্মে যমুনার ঘাটে।
কলসি ভাঁগিবোঁ বোল না ধরিলেঁ বাটে ॥ ৩ ॥
পুরুব আপর কথা রাধা মণে গুন।
এভোঁহো সুন্দরি রাধা মোর বোল সুন ॥
এ বোলেঁ উলটি রাধা চাহিল নয়নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : কাঁখের কলসীতে রাধা জল ভরিলে, এখন কিছু মধুর বাক্য বলিয়া যাও শুনি। তোমার হৃদয়ে কাঞ্চুলী, কর্ণে কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। তাহা সূর্যের কিরণমণ্ডল অপেক্ষাও উজ্জ্বল ॥ ১ ॥ ওগো গোয়ালিনী, একটু ধীরে যাও; আমার কথাটা একবার শোনো। আমাকে ধীরে ধীরে প্রেমালিঙ্গন দাও ॥ ধ্রু ॥ আমাকে উপেক্ষা করিয়া রাধা জল লইতেছ। আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছ বলিয়া আমাকে ভয় পাইতেছ না। রাধা ; তুমি কেন আমার সহিত কথা কহিতেছ না ? বিরহ জ্বালায় আমি দগ্ধ হইতেছি ॥ ২ ॥ রাধা, আমি বলিতেছি, ক্রোধ পরিত্যাগ করো ; ক্রোধ হইতে দেহের সকল গুণ বিনষ্ট হয়। যমুনা-ঘাটের সকল অধিকার আমি গ্রহণ করিয়াছি। কথা না শুনিলে পথিমধ্যে তোমার কলসী ভাঙ্গিব ॥ ৩ ॥ পূর্বের সকল কথা স্মরণ করিয়া দেখ। এখনও আমার কথা শোনো। কবির উক্তি : এই কথায় রাধা কৃষ্ণের প্রতি ফিরিয়া চাইল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝ যাএ।
তাহাক বারিআঁ বোল বুলিতেঁ জুআএ ॥
যেহ্ন তোহ্মে গোপ কথা করহ বিকাশ।
বুঝিল তোহ্মার কাজে নাহিঁ কিছু ভাষ ॥ ১ ॥
পথত বারহ মন নান্দের নন্দন।
কি কারণে ঝগড় করহ[২] সব খন ॥ ধ্রু ॥
দুর্জ্জন সাসুড়ী মোর ঘরতে আছএ।
অবোল বুলিতেঁ তাক নাহিঁ কিছু ভএ ॥
পুরুবেঁ যে কৈল তত জাণিআঁ আপুণী।
ঘাটে বাটে হেন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥ ২ ॥
এখনে তেজহ কাহ্নাঞিঁ আরতী বচন।
তোহ্মে কি না জানহ মন্দ[৩] ভাল সখিগণ ॥

১ অ। প্র : লৈল।
২ 'হ' তোলাপাঠে।
৩ 'মন্দ' তোলাপাঠে।

কেহো যবেঁ বেকত করিহেঁ এহা কাজ।
আহ্মার থাঁথার তবেঁ তোহ্মে পাইবেঁ লাজ ॥ ৩ ॥
বোলাবুলি রাধিকা পাইল নিজ ঘর।
ভয় মানী কাহ্নাঞিঁ তেজিল সে উত্তর ॥
আপণ আপণ ঘর গেলা সখিগণ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : পথে ভাল মন্দ কত লোক যাইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া কথা বলিতে হয়। তুমি গোপন কথা সব প্রকাশ করিয়া দাও। তোমার কাজের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা নাই ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ, তুমি পথের মাঝে মনটাকে একটু সংযত রাখো। সর্বদা কলহ কর কেন ॥ ধ্রু ॥ ঘরে আমার দুর্জন শাশুড়ী রহিয়াছেন। দুর্বাক্য বলিতে তাঁহার মুখে বাধে না। পূর্বের সকল ঘটনার কথা তুমি তো নিজেই জান। তবে কেন পথেঘাটে এসকল কথা তুল ॥ ২ ॥ চারিদিকে ভাল মন্দ নানা প্রকৃতির সখীরা আছে। ওগো কৃষ্ণ, এখন প্রেমের কথা ত্যাগ কর। এইসব কথা যদি কেহ প্রকাশ করিয়া দেয় তবে আমার তো বিপদ হইবেই, তোমাকেও বিষম লজ্জায় পড়িতে হইবে ॥ ৩ ॥ কবির উক্তি : কথা বলিতে বলিতে রাধা নিজের ঘরে আসিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণও ভয় পাইয়া আর কথা বাড়াইলেন না। সখীরাও যে যার ঘরে ফিরিয়া গেল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥
একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

হরিষেঁ আইলা রাধা তোহ্মে এহা তীরে।
আজি সফল হৈব যমুনার নীরে ॥ ১ ॥
উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ।
শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখাএ ॥ ২ ॥
পুরুবেঁ আছিল এহো দহে নাগগণে
এহাত নাহিতেঁ ভয় লাগে তেকারণে ॥ ৩ ॥
নাহিবারেঁ সখিগণ চাহে এহা জলে।
তবেঁ নাহিঁ নাহে ডরে[১] পাণী লআঁ চলে ॥ ৪ ॥
কালীনাগ পাঠায়িল সাগরের পার।
এবেঁ মিছা ডর কর জলে[২] যমুনার ॥ ৫ ॥
আহ্মার বচন সুন্দরী রাধা ধর।
আহ্মে আগেঁ লাম্বী[৩] তবেঁ জলের ভিতর ॥ ৬ ॥

১ 'ডরে' তোলাপাঠে।
২ 'জলে' তোলাপাঠে।
৩ অ। প্র : নাম্বি।

কুবুধি তেজিআঁ যবেঁ নাম্ব এহা জলে।
তবেঁ আহ্মে নাম্বি লআঁ এ সখি সকলে ॥ ৭ ॥
জলত নাম্বিল কাহ্নাঞি দেখে সখিগণে।
উনমত নহিহ মোর বিরহ বচনে ॥ ৮ ॥
আনুমতি দিআঁ কাহ্নাঞি নাম্বায়িল জলে।
পাছত করিআঁ রাধা আর গোপীকুলে ॥ ৯ ॥
জলকেরি[1] করে কাহ্নাঞি আপণার সুখে।
মনমথ ভাবেঁ দেখে সব গোপী মুখে ॥ ১০ ॥
কাহ্নাঞিক দেখি রাধা উল্লসিত মনে।
আর তাক দেখি থীর নহে গোপীগণে ॥ ১১ ॥
সভ্মার জলকেলিত লাগিল মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : রাধা, হৃষ্টমনে আজ তুমি এই যমুনাতীরে আসিয়াছ, আজ যমুনার জল সফল হইবে ॥ ১ ॥ এখন গ্রীষ্মের সময়, গভীর শীতল জলে থাকিতে বড়ই সুখ ॥ ২ ॥ পূর্বে এই দহে সর্পকুলের বাস ছিল, সেই কারণে তাহাতে স্নান করিতে ভয় হইত ॥ ৩ ॥ সখীরা এই জলে স্নান করিতে চাহিত। কিন্তু সর্পভয়ে তাহারা স্নান না করিয়া কেবল জল লইয়া ফিরিয়া যাইত ॥ ৪ ॥ কালীনাগকে সাগরের পারে পাঠাইয়া দিয়াছি। এখন যমুনার জলে নামিতে মিথ্যা ভয় কিসের ॥ ৫ ॥ সুন্দরী রাধা, আমার কথা শোনো ॥ দেখ আমি জলে আগে নামিয়া যাইতেছি ॥ ৬ ॥ কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া তুমি এই জলে নামিলে আমিও সকল সখীকে সঙ্গে করিয়া নামিব ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণ জলের মধ্যে নামিল, সখীরা দেখিতে লাগিল। আমার প্রেমবচনে তোমরা উন্মত্ত হইও না ॥ ৮ ॥ কবির উক্তি : কৃষ্ণ আশ্বাস দিয়া রাধা ও গোপীগণকে জলে নামাইলেন ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণ সকাম-দৃষ্টিতে গোপীদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনের সুখে জলকেলি করিলেন ॥ ১০ ॥ কানাইকে দেখিয়া রাধা উল্লসিত হইলেন। গোপীদের চিত্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল ॥ ১১ ॥ সকলেই জলক্রীড়ায় মন দিল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১২ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।
গোপীর বসন হার লয়িআঁ দামোদর।
উঠিলা গিআঁ কদম্ব তরুর উপর ॥
তথাঁ থাকী ডাক দিআঁ বুইল বনমালী।
কি চাহি বিকল হঅ সকল গোআলী ॥ ১ ॥
নিকট আইস মোর সব গোপীগণে।
আজি কথা সুণ মোর মরণ জীবনে ॥ ধ্রু ॥

---

১ অ। প্র : জলকেলি।

দেখি[১] হরষে তা সব গোপ যুবতী।
গাছের উপরে কাহ্নাঞিঁ উল্লসিত মতী॥
হরিআঁ গোপীর হার আম্বর বসনে।
হাসো হাসে খলিখলি[২] কাহ্নাঞিঁ গরুঅ মনে॥ ২॥
কুলে পরিধান নাহিঁ দেখি গোপনারী।
হৃদএঁ জাণিল তবেঁ নিলেক মুরারী॥
তবেঁ বড় গল করী বুইল জগন্নাথে।
তোহ্মার বসন হের আহ্মার হাথে॥ ৩॥
যাবত না উঠিবেঁহে জলের ভিতর।
তাবত বসন নাহিঁ দিব দামোদর॥
এহা জাণী তডাত উঠিআঁ নেহ বাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

কবির উক্তি : হায় হায়, গোপিনীদের কণ্ঠের হার এবং বসন লইয়া দামোদর কদম্ব-তরুর উপরে উঠিয়া বসিযাছেন। সেখান হইতে ডাক দিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন : তোমরা কিসের জন্য বিকল হইতেছ॥ ১॥ তোমরা আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও আমি তোমাদের কাছে আমার মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কাহিনী বলিতেছি॥ ধ্রু॥ কবির উক্তি : তখন সহাস্যে গোপযুবতীরা দেখিল গাছের উপরে কৃষ্ণ উল্লসিত চিত্তে বসিয়া আছেন। গোপীদের বস্ত্র ও হার হরণ করিয়া কৃষ্ণ হৃষ্টমনে খলখল করিয়া হাসিতেছেন॥ ২॥ ঘাটে বস্ত্রাদি না পাইয়া তাহারাও বুঝিল, ইহা মুরারির কাজ। তখন কৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন : আমার হাতে তোমাদের পরিচ্ছদ॥ ৩॥ জল হইতে যতক্ষণ না উঠিবে ততক্ষণ বসন দিব না। সুতরাং তীরে উঠিয়া তোমাদের বস্ত্র লইয়া যাও। চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪॥

রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

জলেঁ চাহিবারেঁ তবেঁ নান্দের নন্দনে।
ঘাটত থুইল সঙ্গে হার বসনে॥
সখিসব মেলিআঁ গাহ্মিলাস্ত জলে।
হার বসন কাহ্নাঞিঁ লআঁ গেল বলে॥ ১॥
আয়ি মোর লাজ নিলজ বনমালী।
জলে বিবসিনী ডাক পাডেরে গোআলী॥ ল॥ ধ্রু॥
জলতে উঠিলী রাহী আধ করি তলে।
দক্ষিণ করেঁ ঢাকিআঁ কুচযুগলে॥

১ অ। প্র : দেখিল।
২ অ। প্র : হাসে হাসি খলখলি।

কাহ্নক বুইল তোর মুখেঁ নাহিঁ লাজ।
বড়ার বহুক করসি হেন কাজ ॥ ২ ॥
দুরত থাকিআঁ বুইল জগন্নাথ।
তড়াত উঠিআঁ রাধা কর যোড়হাথ ॥
তড়ে হাথ যোড় করী বুয়িল চন্দ্রাবলী।
হার বসন দেহ দেব বনমালী ॥ ৩ ॥
রাধার চরিত্র দেখি দেব দামোদর।
নেত বসন দিল রাধার উপর ॥
হার লুকায়িআঁ রাধাক দিল বাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি : কৃষ্ণকে জলের মধ্যে খোঁজ করিবার জন্য সখীরা সকলে তাহাদের বসন ও হার ঘাটে খুলিয়া রাখিল। তাহারা জলে নামিলে কৃষ্ণ সেই ঘাট হইতে হার ও বস্ত্র লইয়া গেলেন ॥ ১ ॥ ওমা কি লজ্জা, বনমালী বড়ই নির্লজ্জ—জলের মধ্যে বিবসনা গোপিনীরা ইহা বলিতে লাগিল ॥ ধ্রু ॥ অর্ধ জলমগ্ন অবস্থায় দক্ষিণ বাহুদ্বারা বক্ষদেশ আবৃত করিয়া রাধা কৃষ্ণকে বলিলেন : তোমার কোনো লজ্জা নাই। বড় ঘরের বধূর সহিত তুমি এইরূপ করিতেছ ॥ ২ ॥ দূর হইতে জগন্নাথ বলিলেন : ডাঙ্গায় উঠিয়া তুমি জোড়হাত কর। তখন ডাঙ্গায় উঠিয়া চন্দ্রাবলী করজোড়ে বনমালীর নিকট অপহৃত বস্ত্র ও হার প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩ ॥ রাধার আচরণ দেখিয়া কৃষ্ণ হারটি লুকাইয়া নেত বস্ত্রখানি ফিরাইয়া দিলেন। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

অথ যমুনান্তর্গত হারখণ্ডঃ

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে।
তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে ॥ ল ॥
আনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে।
হরিলেক হার মোর বালগোপালে ॥ ল ॥ ১ ॥
বোল গিঁআ আল বড়ায়ি মোর[১]

রাধার উক্তি : গদাধর যখন আমার পট্টবস্ত্র লয় তখন সাতলহরী হারটিও তাহার সহিত অপহরণ করে। অনেক সাধ্যসাধনার পর সে বস্ত্র ফিরাইয়া দিল বটে কিন্তু হারটি আর ফিরাইয়া দিল না।

তেকারণে আয়িলোঁ তোহ্মার থানে ॥ ৭ ॥[২]
বারেঁ বারেঁ কাহ্নু সে কাম করে।
যে কামে হএ কুলের খাঁখারে ॥ ৮ ॥
আহ্মা বিগুতিল যেহেন কাহ্নে।
তেহ্নু বিগুতিল এ সখিগণে ॥ ৯ ॥
আপণ[৩] এহা দেখ বিগুমানে।
কাজ বুঝী এভোঁ বারহ কাহ্নে ॥ ১০ ॥
আহ্মারা মরিব শুণিলেঁ কাঁশে।
তোহ্মার হয়িবে সকল নাশে ॥ ১১ ॥
সব কথা বুয়িলোঁ তোহ্মার পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১২ ॥

রাধার উক্তি : সেই কারণেই তোমার কাছে আসিয়াছি ॥ ৭ ॥ যাহাতে কুলের কলঙ্ক হয়, কৃষ্ণ বারবার সেইরূপ কাজই করিয়া বসে ॥ ৮ ॥ যেমন আমার উপর, সেইরূপ সখীদিগের উপরেও কৃষ্ণ উৎপীড়ন করিল ॥ ৯ ॥ তুমি নিজেই দেখ। এখন অবস্থা বুঝিয়া কৃষ্ণকে নিষেধ কর ॥ ১০ ॥ কংস যদি শুনিতে পায় তাহা হইলে আমরাও মরিব এবং তোমারও সর্বনাশ হইবে ॥ ১১ ॥ তোমার পদতলে সকল কথা নিবেদন করিলাম। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১২ ॥

১ ইহার পর পুঁথির ১৪৫-১৫১ পাতা নাই।
২ পূর্বের পৃষ্ঠা পাওয়া না যাওয়ায় পদটি খণ্ডিত।
৩ দ্র। প্র : আপণে।

মল্লাররাগঃ ॥ যতিঃ ॥

গোকুল নগরমাঝেঁ বসোঁ চিরকাল।
আহ্মা ভাল করী জাণে সকল গোআল ॥
ভাল পুত্র হৈলা তোহ্মে কুলের নন্দন।
তোহ্মাত লাগিআঁ হয়িব আহ্মার মরণ ॥ ১ ॥
কুমতী তেজহ কাহ্নাঞিঁ বুয়িলোঁ তোহ্মারে।
তোহ্মাতে[১] লাগিআঁ কত সহিবোঁ সহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
বারেঁ বারেঁ যে কাম নিষধিএ আহ্মে।
নিষেধ না শুণী সেসি করহ তোহ্মে।
বাছা সব বুলে কাহ্নাঞিঁ নানা থানে থানে।
তোহ্মে ত বুলহ পুতা রাধার কারণে ॥ ২ ॥
সব গোপী লআঁ রাধা রাজাক গোচরী।
সহ্মে যবেঁ আসি মোক লই যাব ধরী ॥
তথাঁ কোণ বোলেঁ আহ্মে পায়িব নিস্তারে।
এ যুগতী পুতা বোলহ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহীঁ।
একই আথরে মো বুয়িলোঁ তোর ঠাই ॥
আহ্মার বচনে পুতা নেবারত মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

যশোদার উক্তি : গোকুলনগরের মধ্যে চিরকাল বাস করিয়া আসিতেছি। আমাকে ভাল করিয়া সবাই জানে। পুত্র, তুমি বংশের সুসন্তান হইয়াছ। তোমার জন্যই আমাকে মরিতে হইবে ॥ ১ ॥ কানাই, তোমায় বলিতেছি কুবুদ্ধি মন হইতে পরিত্যাগ কর। তোমার জন্য সকলের গঞ্জনা কত সহ্য করিব ॥ ধ্রু ॥ যে কাজ করিতে তোমায় বারবার নিষেধ করিয়াছি, নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তুমি তাহাই করিতেছ। বাছুরগুলি ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়ায়, আর তুমি রাধার জন্য ঘুরিতে থাক ॥ ২ ॥ সব গোপীকে লইয়া রাধা রাজার কাছে অভিযোগ করিয়াছে। সবাই আসিয়া যখন আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে তখন আমি কি বলিয়া নিস্তার পাইব, সেই যুক্তি আমাকে বলিয়া দাও ॥ ৩ ॥ এক কথায় এই বলিয়া দিলাম মা বাবার অপেক্ষা গুরুজন আর নাই। আমার কথা শুনিয়া চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত কর। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

১ অ। প্র : তোহ্মাত।

অথ বাণখণ্ডঃ

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আহ্মার বচন শুণ কাহ্নাঞিঁ গোআল।
গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল ॥
হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া ॥ ১ ॥
শুণহ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মার বচনে।
রাধাক হাণ ফুলের পাঁচ বাণে ॥ ধ্রু ॥
পুরুবেঁ রাধাক দিলোঁ মো তোহ্মার তাম্বুলে।
কোণো পরকারেঁ না শুণিল মোর বোলে ॥
কোন কাম না কৈলে[১] তোহ্মাত লাগিআঁ।
আপণা বোলায়িল সতী আহ্মাক মারিআঁ ॥ ২ ॥
বিলম্ব না কর কাহ্ন মোর বোল শুন।
ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুন ॥
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥ ৩ ॥
ত্রিজগতনাথ তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী ॥
উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি : কানাই, আমার কথা শোনো। গোয়ালিনী রাধা ভারি গণ্ডগোল বাধাইতেছে। দয়ামায়া না করিয়া তাহাকে পঞ্চবাণে আঘাত কর। তাহার সকল ছলনা দূর হউক ॥ ১ ॥ কানাই, তুমি আমার কথা শোনো। রাধাকে পুষ্পনির্মিত পঞ্চবাণদ্বারা আঘাত কর ॥ ধ্রু ॥ তোমার তাম্বুলপাত্র তাহাকে দিয়াছিলাম, সে কিছুতেই আমার কথা শুনিল না। তোমার জন্য সে কোনো কিছুই করিল না, তাহার উপর আমাকে প্রহার করিয়া নিজেকে সতী বলিয়া ঘোষণা করিল ॥ ২ ॥ কানাই, আমার কথা শোনো। বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র পুষ্পধনুতে গুণ লাগাও। স্তম্ভন, মোহন, দহন, শোষণ, উচ্চাটন—এই পাঁচ বাণে রাধার পরাণ লও ॥ ৩ ॥ দেববনমালী, তুমি ত্রিজগতের অধিকর্তা, রাধাচন্দ্রাবলী তোমাকে এতটুকুও ভয় করে না। এখন উল্টে সে তোমাকে প্রার্থনা করুক। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

---

১ অ। প্র: কৈলো।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়ায়ির বচন শুণী রাধা চন্দ্রাবলী।
দধির পসরা লআঁ মথুরা চলিলী ॥ ১ ॥
ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা।
হরশিরে শোভে যেহ্ন কনকমেখলা ॥ ২ ॥
শিশত সিন্দুর শোভে উয়ে যেন সুর।
নয়ন দেখিআঁ খঞ্জন জাএ দূর ॥ ৩ ॥
নানা আভরণ রাধা পহ্নী সাবধানে।
পসার ঢাকিআঁ লৈল নেতের বসনে ॥ ৪ ॥
আগু বড়ায়ি জাএ পাছে জাএ রাধা।
মথুরাক জাইতেঁ কেহো না কৈল বিরোধা ॥ ৫ ॥
কথো দূর গিআঁ যমুনাত পার হআঁ।
বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ ॥ ৬ ॥
দেখিল কদমতলে বসে কাহ্নাঞিঁ।
ধীরেঁ বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাই ॥ ৭ ॥
তখন রহিল রাধা বৃন্দাবন পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

কবির উক্তি : বড়াইর কথা শুনিয়া রাধাচন্দ্রাবলী দধি-দুধের পসরা লইয়া মথুরায় চলিলেন ॥ ১ ॥ ললিত খোঁপায় চম্পকমাল্য, শিরোদেশে স্বর্ণমেখলা ॥ ২ ॥ সীমন্তের সিন্দুরে নবীন রবির আলো শোভা পাইতেছে। নয়ন দেখিয়া খঞ্জন দূরে পলায়ন করে ॥ ৩ ॥ বহু যত্ন করিয়া রাধা নানা আভরণ পরিধান করিয়া নেত বস্ত্র দিয়া পসার ঢাকিয়া লইলেন ॥ ৪ ॥ আগে আগে বড়াই চলিল, পিছনে চলিলেন রাধা। মথুরার পথে যাইতে কেহই তাঁহাকে কোনো বাধা দিল না ॥ ৫ ॥ কিছুদূর গিয়া যমুনা পার হইলে বৃন্দাবন মিলিল ॥ ৬ ॥ কদম্বতলায় কৃষ্ণ বসিয়া আছেন, বড়াই কৃষ্ণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥ তখন রাধিকা বৃন্দাবনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৮ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর
কেশপাশে নীল বিগুমানে। এআ।
সিসের সিন্দুর সুর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসএ মদনে ॥ এআ ॥ ১ ॥
সুণ বড়ায়ি ল
বোল গিআঁ গোবিন্দক বাতে। এআ।

তীন ভুবন বীর　　　　রাখএ যৌবন ধন
কি করিতেঁ পারে জগন্নাথে ॥ ধ্রু ॥
নাসা বিনতানন্দন　　　　পাণ্ডু গণ্ডু[১] পাশে কন্ন
বিম্ব ওষ্ঠ পুষ্প দন্ত সঙ্গে ।
কুচযুগ যুধিষ্ঠির　　　　বাহু দণ্ড মনোহর
সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে ॥ ২ ॥
বলি বসে নাভীতলে　　　　পৃথু নিতম্ব যুগলে
মাঝ দেশে সিংহ বিদ্যমানে ।
জঘনে বসে নুপুরু[২]　　　　আতিশয় রুচি গুরু
পদনখ নক্ষত্রগণে ॥ ৩ ॥
হাথে ধবী ধনু বাণে　　　　কাহ্নু আসু বিদ্যমানে
তভোঁ তাক নাহিঁ মোব ডরে ।
বোল দূতা কাহ্নু পাশে　　　　গাইল বডু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : আমার খোঁপা প্রত্যক্ষ দেবের দেব মহাদেব, অলকাগুচ্ছ নীলগঙ্গা, সিঁথার সিন্দূর সূর্য এবং ললাটের তিলক হইল চন্দ্র। আমার নয়নে মদনদেবের অবস্থান ॥ ১ ॥ শোনো বড়াই, কৃষ্ণকে গিয়া বলো যে আমার যৌবনধন ত্রিভুবনের বীব সকল রক্ষা করিতেছেন, জগন্নাথ সেখানে কি করিতে পারে ॥ ধ্রু ॥ বিনতানন্দন গরুড় নাসিকার, রাজা পাণ্ডু গণ্ডদেশের, বরুণ-পাশ কর্ণদ্বয়ের এবং গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্তবিম্বৌষ্ঠের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। কুচযুগে যুধিষ্ঠির, বাহুতে মনোহর দণ্ড এবং দেহে সুগ্রীব আনন্দে বাস করে ॥ ২ ॥ নাভিদেশে দৈত্যপতি বলি, নিতম্বযুগলে বেণ-পুত্র পৃথু এবং কটিদেশে সিংহের অবস্থান। গুরু জঘনদেশে নৃপ পুরু এবং পদনখে নক্ষত্ররাজির বসবাস ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণ তীরধনুক লইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেও আমি তাহাকে ভয় পাই না। দূতী, কানাইকে তুমি একথা জানাইয়া দিও। বডু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

গুআ পান দিআঁ দূতী পাঠায়িলোঁ তোরে ।
বিণি অপরাধেঁ তো মারিলি তাহারে ॥
কোণ কাম না কয়িলোঁ তোহ্মার আন্তরে ।
সংসার ভরায়িলি তোঁ আহ্মার খাঁথারে ॥ ১ ॥
মারিবোঁ জুড়িআঁ মদণ পাঁচ বাণে ॥
কংস নরপতি তোর রাখউ পরাণে ॥ ধ্রু ॥

১ অ। প্র : গণ্ড।
২ অ। প্র : নৃপুরু।

দেব আসুর যার না সহে টান[১]।
হেন বাণে রাধা তোর লইবোঁ পরাণে ॥
যদি বা আছএ তোর পরাণের ভএ।
শরণ সাম্বাহ তবেঁ বড়ায়ির পাএ ॥ ২ ॥
আনেক কাকুতী করিলোঁ তোহারে।
তভোঁ মোর আশমান কৈলেঁ বারে বারে ॥
এতেকেঁ জাণিলোঁ তোর থীর নহে মণে।
এবেঁ মোর হাথে তোর আবসি মরনে ॥ ৩ ॥
তোহ্মাক মারিবোঁ আর আইহন বীর।
আর কংস মারিতেঁ মন কৈলোঁ থীর ॥
তোহ্মার জীবার আর নাহিঁক উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : পানসুপারি দিয়া আমি দূতীকে পাঠাইলাম। তুমি বিনা অপরাধে তাহাকে প্রহার করিলে। আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করিলাম না তথাপি তুমি আমার নিন্দায় সংসার ভরাইয়া দিলে ॥ ১ ॥ আমি তোমাকে এই পঞ্চবাণের দ্বারা আঘাত করিব। দেখি কংস-নরপতি কি ভাবে তোমাকে প্রাণে বাঁচান ॥ ধ্রু ॥ দেবাসুরের পক্ষে যে বাণের বেগ সহ্য করা কঠিন, সেইরূপ বাণদ্বারা তোমার প্রাণ লইব। যদি প্রাণের জন্য ভয় থাকে তবে বড়ায়ির পদতলে গিয়া শরণ লও ॥ ২ ॥ অনেক কাকুতিমিনতি সত্ত্বেও তুমি আমাকে বারবার অপমান করিলে। ইহাতে বুঝিতেছি তুমি এখনও মনস্থির করিতে পারিতেছ না। সুতরাং আমার হাতে তোমার নিশ্চিত মরণ ॥ ৩ ॥ তোমার সঙ্গে আইহন ও কংসকেও মারিব স্থির করিয়াছি। তোমার বাঁচিবার আর কোনো উপায় নাই। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

সুণ হে বড়ায়ি বোলোঁ তোহ্মার চরণে।
নিষধ কাহ্নাঞিঁকে মোক না জুড়িহে বাণে ॥
সব ঠাই তোহ্মে মোর নিস্তার কারণে।
এবেঁ তোত লাগি হএ আহ্মার মরণে ॥ ১ ॥
সুণ হে বড়াই মোরে দয়া ধর মণে।
বারেক কাহ্নাঞিঁক বুলী রাখহ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে যে বড়ায়ি হঅ কাহ্নাঞিঁর দূতী।
বারেক কাহ্নের মোর করাহ পিরিতী ॥

১ অ। প্র: টানে।

এবার রাখহ বড়ায়ি আহ্মার পরাণ।
লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাথ দাণ ॥ ২ ॥
একে মোরে রুঠ কাহ্ন তাহে রোষ তোর।
এতেকেঁ জাণিলেঁ৷ নিস্তার নাহিঁ মোর ॥
কোপ ছাড়ী বোল কাহ্নে মোহোর আন্তরে।
যেহ্ন রক্ষা করে মোরে দেব দামোদরে ॥ ৩ ॥
আর কভোঁ না লঙ্ঘিবোঁ তোহ্মার বচনে।
সে করিহ তবেঁ যেবা থাকে তোর মণে ॥
আহ্মা মাইলেঁ বড়ায়ি কি পুরিবেঁ কাহ্নের আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই, তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার প্রতি কৃষ্ণকে বাণ নিক্ষেপ করিতে নিষেধ কর। সকল বিপদ হইতে তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, এখন তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ হইলে ॥ ১ ॥ ওগো বড়াই, আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া একবার কৃষ্ণকে বল। আমাকে প্রাণে বাঁচাও ॥ ধ্রু ॥ তুমি তো কৃষ্ণের দূতী, আমার সঙ্গে তাহার একবার সদ্ভাব জন্মাইয়া দাও। আমার জীবন এইবারের মত রক্ষা কর। হাতে পরিবার জন্য লক্ষ মুদ্রার আংটি উপহার দিব ॥ ২ ॥ একে কৃষ্ণ রুষ্ট, তাহার উপর তুমিও রাগ করিয়াছ। এবার কোনো জন্য কৃষ্ণকে বল ॥ ৩ ॥ উপায়েই আমার নিস্তার নাই। অকারণে না রাগ করিয়া আমাকে প্রাণে বাঁচাইবার আর কোনোদিন তোমার কথা লঙ্ঘন করিব না। করিলে তোমার খুশীমত আমাকে শাস্তি দিও। আমাকে মারিলে কি কৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে? চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

কালী দলিল আহ্মে শলিল শোষিল[১]।
কংস মারিবারে আহ্মে[২] আবতার কৈল
মামা বধ করিবোঁ মো লিখিত করম।
তেকারণে গোপকুলে লভিল জরম ॥ ১ ॥
পসরিলহে মদন পাঁচ বাণে।
কে তোর রাখিবে রাখউ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
হের ফুলের ধনু ফুলের পাঁচ বাণ।
এহি ফুলেঁ আজি তোর লইবোঁ পরাণ ॥
আহ্মার থাঁথার কৈলেঁ সব জন থানে।
তেকারণে রাধা তোক যোড়োঁ৷ পাঁচ বাণে ॥ ২ ॥

১ অ। প্র : শোধিল।
২ 'আহ্মে' তোলাপাঠে। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হেন পাঁচ বাণে কাহ্ন মারে পরতিরী ।
আহ্মা না চিহ্নসি রাধা বড় আছিদরী ॥
পুরুবে দূতী মারিলি কমণ কারণে ।
এবেঁ তোর ফল হের দেওঁ এহি বাণে ॥ ৩ ॥
বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান ॥
পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : কালীনাগকে আমি দলিত করিলাম, কালীদহের জল শোধন করিলাম। কংসকে বধ করিবার জন্য আমি অবতাররূপে জন্মিয়াছি। কর্মফলে লিখিতই আছে আমি মাতুলকে বধ করিব। সেইজন্যই গোপকুলে জন্ম লইয়াছি ॥ ১ ॥ মদন আমাকে পঞ্চশরে দগ্ধ করিতেছে। দেখি কে তোমার প্রাণ রাখিতে পারে ॥ ধ্রু ॥ দেখ, ফুলের এই ধনুক ও বাণ। ইহার দ্বারাই তোমার প্রাণ লইব। চারিদিকে আমার কুখ্যাতি রটাইয়াছ, সেইজন্যই তোমার উদ্দেশ্যে আজ আমার বাণ নিক্ষেপণ ॥ ২ ॥ চতুরা রাধিকা, তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই। এই পঞ্চবাণের আঘাতেই আমি পরস্ত্রীকে হত্যা করিব। কেন তুমি পূর্বে আমার দূতীকে মারিয়া তাড়াইয়াছ ? এখন তাহার ফল গ্রহণ কর ॥ ৩ ॥ কবির উক্তি : বাম হাতে ধনুক লইয়া কৃষ্ণ তীক্ষ্ণ লক্ষ্যের সহিত রাধার হৃদয়ে দক্ষিণ হস্তে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পুষ্প-শরাঘাতে রাধা হেলিয়া পড়িলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এথাঞি রহিআঁ বড়ায়ি সজাইবোঁ ঘর ।
এথাঞি আণায়িবোঁ বড়ায়ি নান্দের সুন্দর ॥
এথাঞি তা লয়িঁ মোঁ করিবোঁ শৃঙ্গার ।
সফল করিবোঁ নব যৌবন ভার ॥ ১ ॥
কত সহিবোঁ এ বড়ায়ি ল ।
কুসুমশর বাণ কত সহিব ॥ ধ্রু ॥
এথাঞি যমুনা বড়ায়ি এথাঞি বৃন্দাবন ।
এথাঞি আণাঅ মোর নান্দের নন্দন ॥
এথাঞি কাহ্নাঞিঁর মোঁ ধরিবোঁ নিচোলে ।
এথাঞি কাহ্নাঞিঁকে দিবোঁ কুচ ভেড়ি কোলে ॥ ২
এ নব যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী ।
লাজ আঙ্কুশেঁ তাক নিবারিতেঁ নারী ॥

দুর্ব্বার মদনশর সহিতেঁ না পারী।
বাহিরে না মারে ভিতরে পুড়ী মরী ॥ ৩ ॥
আদেখ বাণের ঘাঅ সহিতেঁ না পারী।
হেন পাঁচ বাণে কাহ্নাঞি মারে পরতিরী ॥
এহা বুলী মুরুছা গেলী মনমথবাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই, এখানে থাকিয়া ঘর সাজাইব, এখানে নন্দের পুত্রকে লইয়া আসিব, এখানে তাহার সহিত আমি ক্রীড়া করিয়া নিজের যৌবনভার সফল করিব ॥ ১ ॥ বড়াই, কুসুমশরের বাণ আর কত সহ্য করিব ॥ ধ্রু ॥ এই তো যমুনা, এইখানেই তো বৃন্দাবন। নন্দের নন্দনকে এইখানে আমার কাছে আনিয়া দাও। এখানে কানাইয়ের আমি উত্তরীয় ধরিব। এখানে তাহাকে আমি বক্ষদ্বারা আলিঙ্গন করিব ॥ ২ ॥ আমার এই নবযৌবন যেন মদমত্ত হস্তী; লজ্জার অঙ্কুশে তাহাকে নিবারণ করা যায় না। দুর্বার মদনশর সহ্য করা কঠিন। বাহিরে আহত না হইলেও ভিতরে পুড়িয়া মরিতেছি ॥ ৩ ॥ পরের স্ত্রীর প্রতি কৃষ্ণ পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিল। অদৃশ্য এই বাণের আঘাত আমি সহিতে পারিতেছি না। কবির উক্তি : এই কথা বলিয়া রাধা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে।
হাথ ভরিলোঁ কিবা পুরিল কলসে ॥
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে।
মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি মোর লাভে বন্ধন সার।
আছুক লাভ মোর মূলত আন্ধার ॥ ধ্রু ॥
না পাইল চুম কোল না পাইল শৃঙ্গার।
রাধার কারণে ভৈল্প এতেক খাঁখার ॥
সুণিআঁ বা কি বুলিব মোরে সব জনে।
আজি আহ্মে গোকুলক জাইব কেনমনে ॥ ২ ॥
তোঞঁ বুয়িলী বড়ায়ি[১] রাধা মোরে দিল গালী।
তেকারণে পরাণে মাইলোঁ চন্দ্রাবলী ॥
ত্রিদশের আধিপতী নামে শ্রীকাহ্ন।
তোহ্মাত লাগিআঁ সহে এত আপমান ॥ ৩ ॥
যে বচন বোলোঁ মোঞঁ তাত নাহিঁ বাধা।
জিআইআঁ দিবোঁ মো চন্দ্রাবলী রাধা ॥

১ 'বড়ায়ি' তোলাপাঠে।

বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : আমি কি ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্থীর চাঁদ দেখিলাম, পূর্ণ কলসে কি হাত ডুবাইলাম, নাকি মাটির উপর জলের দাগ কাটিলাম—যেজন্য আমি মিছামিছি দোষের ভাগী হইতেছি ॥ ১ ॥ বড়াই বন্ধনই আমার সার হইল। লাভ তো দূরের কথা কেবল ক্ষতিই হইল ॥ ধ্রু ॥ চুম্বন পাইলাম না, শৃঙ্গারের সুযোগ মিলল না, রাধার জন্য কেবল অপমান ও লাঞ্ছনাই সহিতে হইল। লোকে এখন এ সকল কথা শুনিয়া কি বলিবে বল তো? এখন কিরূপে গোকুলের পথে যাই ॥ ২ ॥ তোমাকে অপমান করিয়াছে বলিয়াই তো আমি তাহার উদ্দেশ্যে বাণনিক্ষেপ করিলাম। ত্রিজগতের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ আজ তোমারই জন্য এত অপমান সহ্য করিতেছে ॥ ৩ ॥ আমি যে কথা বলিব তাহার অন্যথা হইবে না। আমি রাধার পুনরায় জ্ঞান ফিরাইয়া দিতেছি। আমার বন্ধন ঘুচাইয়া দাও দেবতারা যাহাতে দেখিতে না পায়। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

অথ বংশীখণ্ডঃ

(৭)

অনঙ্গসঙ্গরে রাধা ভঙ্গং প্রাপ্য কুরঙ্গদৃক্।
আলসকুলতারঙ্গাৎ জরতীসহিতা যযৌ ॥

কুরঙ্গনয়না রাধা অনঙ্গসংগ্রাম অবসানে অবসন্ন হইয়া রঙ্গভরে বৃদ্ধার সহিত গমন করিলেন।

পাহাড়ীআঁরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়ায়ি লইআঁ রাহী গেলী সেই থানে।
সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে ॥ ১ ॥
ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে।
তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে ॥ ২ ॥
খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।
তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ ॥ ৩ ॥
আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞিঁ।
পতিদিনে নানা ছান্দে বাএ সেহি ঠাই ॥ ৪ ॥
তা দেখিআঁ না তুলিলী[১] আইহনের রাণী[২]।
সৃজি[৩] কাহ্নাঞিঁ তবেঁ মোহন বাঁশী ॥ ৫ ॥
সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম।
সুবর্ণের সাম্বী হিরার বান্ধিল কাম ॥ ৬ ॥
হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞিঁ তাহাত ওঁকার।
বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার ॥ ৭ ॥
যমুনার ঘাটে রাধা [৪] বাঁশীনাদ সুণী।
জল লআঁ ঘর আয়িলী আইনের[৫] রাণী ॥ ৮ ॥
বৃন্দাবনে বাঁশী বাএ নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

বড়াইয়ের সহিত রাধা সেইস্থানে গমন করিলে সখীগণ বলিল: চল রাধা স্নান করিতে যাই ॥ ১ ॥ কবির উক্তি: ষোলশত গোপী যমুনার ঘাটে গেল, তাহা দেখিয়া

১ অ। প্র: ভুলিলী।
২ অ। প্র: দাসী।
৩ অ। প্র: সৃজিল।
৪ 'রাধা' তোলাপাঠে।
৫ অ। প্র: আইহনের।

কৃষ্ণ রঙ্গ পাতিলেন ॥ ২ ॥ তিনি কখনো করতালি বাজাইলেন, কখনো মৃদঙ্গ বাজাইলেন। তাহা দেখিয়া রাধা এবং সখীগণ আমোদিত হইলেন ॥ ৩ ॥ ইহা ছাড়াও আরো যত রকমের বাদ্য আছে কৃষ্ণ নানা ছন্দে সেইসব বাদ্য সেই স্থানে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥ তাহা দেখিয়াও আইহনপত্নী ভুলিলেন না। তখন কৃষ্ণ মোহন বংশী নির্মাণ করিলেন ॥ ৫ ॥ তাহাতে সাতটি সুন্দর ছিদ্র রচনা করিলেন, সোনার সামি লাগাইলেন এবং বাঁশিতে হীরার কারুকার্য করিলেন ॥ ৬ ॥ সেই বাঁশি কৃষ্ণ ওঁকার ধ্বনিতে পূর্ণ করিলেন। সে বাঁশির ধ্বনিতে জগৎ মুগ্ধ হয় ॥ ৭ ॥ আইহনরমণী রাধা যমুনার ঘাটে বাঁশির ধ্বনি শুনিয়া জল লইয়া গৃহে ফিরিলেন ॥ ৮ ॥ বৃন্দাবনে নন্দনন্দন বংশীধ্বনি করিতেছেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৯ ॥

নিপীয় বংশনিনদং রাধা কংসভয়াতুরা।
বেদিতুম্বাদকন্তস্যাজ্জগাদ[১] জরতীমিদং ॥

কংসের ভয়ে কাতর রাধিকা বংশীধ্বনি শুনিয়া কে তাহা বাজাইতেছেন তাহা জানিবার জন্য বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

১ অ। প্র : 'বেদিতুম্বাদকত্তস্ত জগাদ'।

রাধার উক্তি : হে বড়াই, কালিন্দী নদীর তীরে কে ওই বাঁশি বাজান? এই গোষ্ঠগোকুলেও তাঁহার বাঁশি বাজে, কে তিনি? দেহ আমার আকুল, মন আমার ব্যাকুল। বাঁশির শব্দে আমার রন্ধন বিপর্যস্ত হইল ॥ ১ ॥ বড়াই গো, কে সেই বংশীর বাদক আমাকে বলিয়া দাও। আমি দাসী হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করিব ॥ ধ্রু ॥ হে বড়াই, প্রসন্ন চিত্তে কে ওই বাঁশি বাজাইতেছেন? তাঁহার চরণে আমি কি দোষ করিয়াছি? অজস্র ধারায় আমার নয়নজল ঝরিতেছে। হে বড়াই, বাঁশির সুরে আমি প্রাণ হারাইলাম ॥ ২ ॥ আমার মন আকুল করিবার জন্যই কি নন্দের নন্দন এই বাঁশি বাজাইতেছেন? হায়, আমি তো পাখী নই, নইলে তাঁহার কাছে উড়িয়া চলিয়া যাইতাম। বসুন্ধরা তুমি দ্বিধা হও, তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করি ॥ ৩ ॥ বড়াই গো, বনে যখন আগুন লাগে তখন জগতের লোক তাহা দেখে কিন্তু আমার মনের দাহ কুমারের পোয়ানের মত বাহির হইতে দেখা যায় না। কৃষ্ণকামনায় আমার অন্তর শুষ্ক হইতেছে। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং স্মরজ্বরতুরাতুরা[১]।
যমুনাতীরমাগত্য রাধাহ জরতীমিদম্ ॥

কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া মদনজ্বরকাতরা রাধা যমুনাতীরে আসিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন।

শ্রীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

সুসর বাঁশীর নাদ সুণী আইলোঁ মো যমুনাতীরে।
শোভন কলসী করে ধরিআঁ পরিলোঁ[২] যমুনানীরে ॥
বড়ায়ি ল।
বাঁশীর নাদ না শুণী এবেঁ কাহ্ন গেলা কিবা দূরে।
প্রাণ বেআকুল ভৈল এবেঁ কিমনে জায়িবোঁ ঘরে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি ল।
তোহ্মে কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে।
কাল কাহ্নাঞিঁ চাঁচর কেশে কুসুম শোভিত মাথে ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি মো আন না জাণো এত দুখ কহিবোঁ কাএ।
কাহ্নের ভাবেঁ চিত্ত বেআকুল লাজে মোঁ না কান্দো রাএ ॥
যমুনাতীরে কদমের তলে কাহ্ন মোরে দিলে কোলে।
তাহা সুঁঅরিআঁ বিকলী ভৈলোঁ কাহ্ন বিরসিল[৩] ভোলে ॥ ২ ॥
চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল বহে বসন্তের বাএ।
আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে লাগে বিষবাণঘাএ ॥

---

১ অ। প্র: স্মরজ্বরভরাতুরা।
২ অ। প্র: পুরিলোঁ।
৩ অ। প্র: বিসরিল।

চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্নু বিণি মোর এবেঁ এক খন এক কুল যুগ ভাএ ॥ ৩ ॥
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ কাহ্নু গেলা কোণ দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে যেন বেআপিল বীষে ॥
এবেঁ আণিআঁ দেহ নান্দের নন্দন পুর ত আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : মধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া আমি যমুনাতীরে আসিলাম এবং শোভন কলসী হাতে ধরিয়া যমুনার জলে পূর্ণ করিলাম। ওগো বড়াই, বাঁশির শব্দ আর শুনিতে পাই না কেন, কৃষ্ণ কি দূরে চলিয়া গেলেন? আমার যে প্রাণ বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এখন আমি কি করিয়া গৃহে ফিরি ॥ ১ ॥ ওগো বড়াই, তুমি কি সেই কৃষ্ণকে পথে যাইতে দেখিয়াছ—বর্ণ যাঁহার কালো, কেশ যাঁহার কুঞ্চিত আর সেই কুঞ্চিত কেশে যাঁহার পুষ্পদাম শোভা পাইতেছে ॥ ধ্রু ॥ আমার যে দুঃখ, সে দুঃখের কথা কাহাকে বলি। দিবারাত্রি আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও জানি না। তাঁহার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল। কেবল লজ্জারি ভয়ে আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিতেছি না। সেই যে যমুনার তীরে কদম্বতলায় কৃষ্ণের আশ্লেষ লাভ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করিয়া বিকল হইয়াছি। হায় সেই কৃষ্ণ আজ আমাকে বিস্মৃত হইলেন ॥ ২ ॥ চারিদিকে বৃক্ষশাখায় পুষ্পের মঞ্জরী দেখা দিয়াছে। বসন্তের মৃদু বাতাস বহিতেছে। সহকার শাখায় বসিয়া কোকিলী কুহুরব করিতেছে। সেই রব আমার পক্ষে বিষবাণের আঘাতের মত মর্মঘাতী। হায় বড়াই, আমার কাছে চন্দ্র ও সূর্যের কোনো ভেদ নাই। চন্দনে আমার দেহের উত্তাপ বাড়ে। কৃষ্ণ বিহনে একটি মুহূর্তও আমার পক্ষে সম্পূর্ণ এক যুগের মত সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হয় ॥ ৩ ॥ বাঁশির শব্দে প্রাণ হরণ করিয়া কৃষ্ণ কোন্ দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে না পাইয়া হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, মনে হইতেছে যেন সর্বাঙ্গে বিষ ছাইয়া গিয়াছে। এবার সেই নন্দনন্দনকে আনিয়া দিয়া আমার আশা পূর্ণ কর। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

(৬) শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এবেঁ বড় নয়নে মো না দেখোঁ সুন্দরী।
কথাঁ গেলেঁ পায়িব আহ্মে শ্রীকৃষ্ণ হরী ॥
হেনক উপায় মোক বোল চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মো তোহ্মাক আণি দিবোঁ বনমালী ॥ ১ ॥
যত কিছু বুয়িলেঁ মোর পরাণনাতিনী ॥
বড় দুখ উপজিল মণে তাক সুণী ॥ ধ্রু ॥
যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার।
ঘড়িআল কুম্ভীর তাহাত আপার ॥

শকতিএঁ পার হয়িলা চন্দ্রাবলী রাণী।
তথাঁ বা কেমনে পায়িব দেব[১] চক্রপাণী॥ ২ ॥
সেহি বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর।
বাঘ ভালুক তাত্রি বসে বিথর ॥
তাহাত আগত রাধা এড়ায়ি কেমনে।
হেনক উপায় তোহ্মে কহ মোর থানে॥ ৩ ॥
ভরিল যমুনাত তোহ্মা কৈল পার।
তোহ্মা হেতু কান্ধে বহিল দধিভার ॥
তভোঁ তোর ভালমর্তে না পুরিল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি: এখন চোখে ভাল দেখিতে পাই না। কোথায় গেলে শ্রীকৃষ্ণকে পাইব। হে চন্দ্রাবলী, তুমি আমাকে পথ বলিয়া দাও তাহা হইলে আমি বনমালীকে তোমার কাছে আনিয়া দিব ॥ ১ ॥ প্রাণের নাতিনী আমাকে যত কথা বলিলে সব শুনিয়া মনে বড় দুঃখ পাইয়াছি ॥ ধ্রু ॥ যমুনায় অসংখ্য ঘড়িয়াল কুমীর আছে, বল তো কেমন করিয়া সে নদী পার হইব? আর কষ্ট করিয়া যদি বা কোনোক্রমে পার হইয়াও যাই তাহা হইলেই বা সেখানে চক্রপাণি কৃষ্ণকে পাইব কিরূপে ॥ ২ ॥ সেই বৃন্দাবন ভয়ঙ্কর স্থান, সেখানে বহু ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস। হে রাধা, তাহাদের অতিক্রম করিয়া কি ভাবে যাইব আমাকে তাহার উপায় বলিয়া দাও ॥ ৩ ॥ ভরা যমুনায় তিনি তোমাকে পার করিয়াছেন, তোমার জন্য কাঁধে দধির ভার বহন করিয়াছেন। তবু তোমার আশা ভাল করিয়া পূরণ হইল না? চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

আইস ল বড়ায়ি মোর[২] রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ না পারোঁ মদন পাঁচ বাণ ॥
সরস বসন্ত ঋতু কোকিল রাএ।
আধিক বিরহশিখি হৃদএ জলএ ॥ ১ ॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি বোলহ এখন।
যে বুধি করিলেঁ রহে আহ্মার জীবন ॥ ধ্রু ॥
কে বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশীতল।
আহ্মার মনত ভাএ যেহেন গরল ॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।
ঘাঅত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান ॥ ২ ॥

১ 'দেব' ভোলাপাঠে।
২ 'মোর' ভোলাপাঠে।

নানা তরু লতা বন ঘোর আন্ধকার।
বৃন্দাবন চল বড়ায়ি ত্রিভুবনে সার ॥
ধবণ না জাএ বড়ায়ি আহ্মার যৌবন।
প্রাণ রাখ আণি দেহ নান্দের নন্দন ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচন শুণ তোহ্মে বড়ি মা।
না জাণ[১] কেমণ করে আহ্মার গা ॥
বিণি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই গো, আমার প্রাণ বাঁচাও, আমি মদনের পঞ্চবাণ আর সহিতে পারি না। সরস বসন্ত ঋতু, কোকিল কুহুধ্বনি করিতেছে, আমার হৃদয়ে বিরহজ্বালা বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১ ॥ হে বড়াই, যে বুদ্ধি করিলে আমার প্রাণ বাঁচে সেই বুদ্ধি বল ॥ ধ্রু ॥ চন্দ্র ও চন্দনকে শীতল বলে কে? আমার তো গরল সমান বলিয়া মনে হয়। নবকিশলয় আমার পক্ষে অগ্নিস্বরূপ। তাহার উপর বাঁশীর ধ্বনি, আঘাতের উপর আঘাত ॥ ২ ॥ নানা তরুলতায় ঘেরা বৃন্দাবন গহন অন্ধকার, ত্রিভুবনে তেমন সুন্দর স্থান আর নাই। তুমি সেখানে যাও। আমার যৌবন আর ধরিয়া রাখা যায় না। তুমি নন্দনন্দনকে আনিয়া দাও, আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ ওগো বড় মা, তুমি আমার কথা শোনো। কৃষ্ণ বিহনে আমার দেহ বিবশ, আমার মন ব্যাকুল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী।
আল বড়ায়ি।
সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ সব সখিজনে
কেহো নান্দে কাহ্নাঞিঁকে আণী ॥ ১ ॥
আল বড়ায়ি চাহা চাহা।
কোণ দিগেঁ মোহারী বাজে ॥ ধ্রু ॥
রূপস দেখিএ যথাঁ নানা ফুল ফল গড়া
সেই সে কাহ্নাঞিঁর দেশ।
নান্দের নন্দন কাহ্ন … … …
সোঁঅরিতেঁ পাঞ্জর শেষ ॥ ২ ॥
কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন।

১ অ। প্র : জাণো।
২ ছাড়।

আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লঞা গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ ॥ ৩ ॥
তোহ্মাত আগত সত্যেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি
তোর বোল না করিবোঁ আনে।
আনিআঁ কাহ্নাঞিঁ দেহ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ
বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : আষাঢ় শ্রাবণে যেমন মেঘের ধারা ঝরে তেমনি আমার নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে। ওগো বড়াই, করজোড়ে সব সখীকে প্রণাম করিয়া বলিলাম। তবু কেহ কৃষ্ণকে আনিয়া দিল না ॥ ১ ॥ ওগো বড়াই, খুঁজিয়া দেখ কোন্ দিকে মোহারী বাঁশি বাজে ॥ ধ্রু ॥ ফুল ফল দিয়া মনোরম সজ্জায় সজ্জিত যে দেশ দেখিবে সেখানেই শ্রীকৃষ্ণের বাস। নন্দনন্দন সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করিতে বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে ॥ ২ ॥ সারা সংসারে আমার কেহ নাই, কৃষ্ণ বিহনে দশদিক্ আমার শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হায়, আমার আঁচলের সোনা কে চুরি করিয়া লইল, আমি কাহার কি ক্ষতি করিয়াছি ॥ ৩ ॥ ওগো বড়াই, তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমার কথার কখনো অন্যথা করিব না। তুমি কৃষ্ণকে একবার আনিয়া দাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

উত্তম গোআলকুলে আহ্মার[১] জরম।
তোহ্মাকে জুগত নহে এ সব করম ॥
দুচারিণী যার মা তার হেন গতী।
সেসি পর পুরুষের বাঞ্ছএ সুরতী ॥ ১ ॥
সুণহ নাতিনী তোক কিছু নাহিঁ বুধী।
কথাঁ গিআঁ পাইব আহ্মে কাহ্নাঞিঁর সুধী ॥ ধ্রু ॥
এ সব কামত যে বা উপসন্ন হএ।
পাপ বেআপিত সে ধরম করে খএ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ থাক আইহনের[২] রাণী।
লোকেঁ জনি সুণে তোর এ সব কাহিণী ॥ ২ ॥
শিশু হয়িতেঁ জাণো তোর মাএর চরীত।
তার ঝিউ হআঁ তোর কেহ্নে হেন চীত ॥
পুরুবে যে কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে।
এবেঁ তোর মন তাক বেকত করিতেঁ ॥ ৩ ॥

১ অ। প্র: তোহ্মার।
২ 'র' ভোলাপাঠে।

সুণহ সুন্দরি তোহ্মে আইহনের দাসী।
এ সব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী॥
হেন কাম করিলেँ নাসিবোঁ তোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

বড়াইর উক্তি : উচ্চ গোপকুলে তোমার জন্ম। এসব কাজ তোমার সাজে না। যাহার মা দ্বিচারিণী তাহারই এমন অবস্থা হয়, সে-ই পরপুরুষেব সঙ্গ কামনা করে॥ ১॥ নাতিনী, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নাই। কৃষ্ণের সন্ধান কোথায় গেলে পাইব॥ ধ্রু॥ যে এসব কাজ করে সে পাপে মগ্ন হয়, তাহার ধর্ম নষ্ট হয়। হে আইহনগৃহিণী, নিজের ভাল চাও তো সাবধান হও। লোকে যেন এসব কথা না শোনে॥ ২॥ শিশুকাল হইতে তোমার মার স্বভাব জানি। তাহার মেয়ে হইয়া তোমার এমন মনোভাব কেন? পূর্বে যেসব কাজ হইয়াছে সব গোপনে হইয়াছে। এখন দেখিতেছি সে-সব কথা তুমি প্রকাশ করিতে চাও॥ ৩॥ সুন্দরী রাধিকা, এ সব কাজে তুমি ভয় পাও না? তোমাকে বলি শোনো, এমন কাজ করিলে আমি আর কখনো তোমার কাছে আসিব না। চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪॥

রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ॥
খাট পালঙ্কি গঢ়ায়িবোঁ।
আল। সুবর্ন্নে মঢ়ায়িবোঁ।
কাহ্নাঞি লইআঁ রতিঞঁ[1] পোহাইবোঁ॥
এবেঁ শুণিআঁ[2] বাঁশীর ধ্বনী।
আল। মরিবোঁ জালী আগুণী।
কাহ্নের সকল দোষ খণ্ডিবোঁ আপুণী॥ ১॥
তোরে মো না এড়িবোঁ দূতী ল।
বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউ সমতী ল॥ ধ্রু॥
মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ।
মো জে কস্তুরী কপুর খাইবোঁ।

১ অ। প্র: রাতিঞঁ।
২ অ। প্র: এবেঁ না শুণিআঁ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুঁথির ১৭২।২ ও ১৭৩।১ পৃষ্ঠা

কিশলয় শয়ন বিছাইবোঁ।
কাহ্ন আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ ॥ ২ ॥
তার বাঁশীর শবদ শুণী।
পরাণ জাএ মোর গুণী।
সুণ তোঁ দূতা আণি দেহ চক্রপাণী ॥
দেবের বর যদি পাওঁ।
এখনে তবেঁ পাখি হওঁ।
আপণে উড়িআঁ কাহ্নের ঠায়ি জাওঁ ॥ ৩ ॥
সে গোবিন্দ গোপনন্দনে।
মোর কুচযুগের চন্দনে।
সব সখি লআঁ তার করিবোঁ বন্দনে ॥
আন বড়ায়ি কাহ্ন মোর থানে।
সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : মল্লিকা মালতীর মালা গাঁথিয়া সকল সখীকে সঙ্গে লইয়া তোমার সহিত কৃষ্ণসন্দর্শনে যাইব। খাট পালঙ্ক গড়াইয়া সোনা দিয়া মণ্ডিত করিব। শ্রীকৃষ্ণসহ রজনী যাপন করিব। এখন বংশীরব শুনিয়া চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। নিজে আগুন জ্বালিয়া সেই আগুনে পুড়িয়া মরিব। কৃষ্ণের যত দোষ আমি নিজেই খণ্ডন করিব ॥ ১ ॥ দূতী, তোমাকে আমি ছাড়িব না। কৃষ্ণকে বলো তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ধ্রু ॥ মল্লী ও মালতী ফুলের মালা গাঁথিয়া সখীদের সঙ্গে লইয়া তোমার সহিত কৃষ্ণমুখ দেখিব। কর্পূর কস্তুরী খাইয়া কিশলয়ে শয্যা রচনা করিব। 'এবং কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া দেহ সর্বদাই শীতল করিব ॥ ২ ॥ তাঁহার বাঁশির শব্দ শুনিয়া আমার প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতেছে। হে দূতী, দয়া কর, চক্রপাণিকে আনিয়া দাও। দেবতার বর পাইলে এখনই পাখী হইতাম আর পাখী হইয়া উড়িয়া গিয়া কৃষ্ণের নিকটে চলিয়া যাইতাম ॥ ৩ ॥ সব সখীকে সঙ্গে লইয়া সেই গোপনন্দন গোবিন্দকে আমার কুচযুগের চন্দন দিয়া বন্দনা করিব। বড়াই গো, শ্রীকৃষ্ণকে আমার কাছে আনিয়া দাও, আমি তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে যাই। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী[১] ॥

আল রাধা ॥
কিসক মরিতেঁ চাহ তোহ্মে।
চাহিআঁ কাহ্নাঞিঁ আণি দিব আহ্মে ॥ ল ॥

---

১ 'একতালী' তোলাপাঠে। মুদ্রিত পুঁথি চিত্র দ্রষ্টব্য।

বুঝাইআঁ বুলিবোঁ তারে বাণী ।
যেহ্ন সে আইসে চক্রপাণী ॥ ল ॥ ১ ॥
আল রাধা বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ বোঁ[১] ।
তোর সঙ্গে সুরতী করায়িবোঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
যত দুখ দেখিলোঁ তোহ্মারে ।
একেঁ একেঁ কহিবোঁ কাহ্নেরে ॥
আবসি সোঁঅরি তোর নেহে ।
কাহ্নাঞিঁ আসিব কুঞ্জগেহে ॥ ২ ॥
যত কিছু বসে তোর মণে ।
নিবেদিহ কাহ্নের থানে ॥
তবেঁ তোক না ছাড়িব কাহ্নে ।
সরূপেঁ বুইলোঁ তোর থানে ॥ ৩ ॥
হেন বেলে মাঝ বৃন্দাবনে ।
কাহ্নাঞিঁ বাঁশীত দিল সানে ॥
সুণী রাধা পাইল হরিষে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি : ওগো রাধিকা, কেন তুমি মরিতে চাও ? আমি কৃষ্ণের সন্ধান করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিব। আমি এমন ভাবে বুঝাইয়া বলিব যেন তিনি তোমার কাছে আসেন ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে আনাইয়া তোমার সহিত মিলন করাইব ॥ ধ্রু ॥ তোমার যত দুঃখ দেখিলাম এক এক করিয়া সব কথা শ্রীকৃষ্ণকে বলিব। তোমার প্রেম স্মরণ করিয়া তিনি তোমার কুঞ্জগৃহে অবশ্যই আসিবেন ॥ ২ ॥ তোমার মনে যাহা আছে সব কথা তুমি কৃষ্ণের নিকটে নিবেদন করিও, তাহা হইলে আর তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এই তোমাকে প্রকৃত কথা বলিলাম ॥ ৩ ॥ এমনি সময়ে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশি বাজিল, তাহা শুনিয়া রাধা আনন্দিত হইলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বংশীনিনাদতরলা তরলাঞ্চললোচনা ।
জগাদ রুচিরং রাধা ভারতীং জরতীং প্রতি ॥

বাঁশির শব্দ শুনিয়া চঞ্চললোচনা রাধিকার হৃদয় ব্যাকুল হইল তিনি বৃদ্ধাকে এই মধুর বচন বলিলেন।

১ অ। প্র: আণিবোঁ।

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়ায়ি।

হাথে ভাণ্ড মাথে করী চান্দ
চন্দন চর্চ্চিত গা এ।
যমুনার তীরে কদমের তলে
কে না বাঁশী বোলাএ ॥ ১ ॥

রাধা।

পাএ মগর খাডু হাথে বলয়া
মাথে ঘোড়াচুলা।
ধুলাএ ধুসর নীল কলেবর
সেই সে নান্দের বালা ॥ ২ ॥
তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ
তোর সঙ্গে নিতি আসী।
গোকুলত থাকে বাছাক রাখে
কথাঁ পাইলে হেন বাঁশী ॥ ৩ ॥
রাধা তোঞঁ মুগধী ...গোআলী
না জাণ কাহ্নের শুধী।
তোহোর আন্তরে চতুর কাহ্নাঞিঁ
পাতএ আশেষ বুধী ॥ ৪ ॥
আতি মনোহর বাজাএ সুসর
সুণিআঁ পরাণ জাএ।
কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি
কেমণে তাক বাজাএ ॥ ৫ ॥
বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ
সপত সর বাজাএ।
নাগর শেখর নান্দের সুন্দর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৬ ॥

রাধার উক্তি: ওগো বড়াই, যমুনার তীরে কদম্বের তলায় ওই যে বাঁশি বাজায়, ও কে? যাহার হাতে বাঁশি, যাহার মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ওই বংশীবাদককে তুমি কি চেন ॥ ১ ॥ বড়াইর উক্তি: রাধা তুমি যাঁহার কথা বলিতেছ, যাঁহার পায়ে মকর খাড়ু, হাতে বলয়, মাথায় ঘোড়াচুলা, যাঁহার নীল কলেবর ধুলায় ধুসর হইয়া উঠিয়াছে—তিনি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ॥ ২ ॥ রাধার উক্তি: সে তো প্রত্যহ তোমার সঙ্গে মথুরায় যায়, তোমার সঙ্গে ফিরিয়া আসে। গোকুলে তাহার বাস, গরুবাছুর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া

---

১ ছাড়। প্র: আবালী।

দিন কাটায়, সে এমন বাঁশি কোথা হইতে পাইল ॥ ৩ ॥ বড়াইর উক্তি: রাধা, তুমি নিতান্তই বুদ্ধিহীনা, তাই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব কিছুই জান না। চতুর চক্রপাণি তোমারই জন্য নানা ছলনা বিস্তার করেন ॥ ৪ ॥ রাধার উক্তি: মনোহর বাঁশির মধুর শব্দ শুনিয়া প্রাণধারণ করিতে পারিতেছি না। বড়াই গো, ও কি রকম বাঁশি এবং কি ভাবেই বা তিনি ওই বাঁশি বাজান তাহা আমাকে বলিয়া দাও ॥ ৫ ॥ বড়াইর উক্তি: নাগর চূড়ামণি সেই নন্দনন্দন বাঁশির ছিদ্রে মুখ লাগাইয়া সপ্তস্বর ধ্বনিত করেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৬ ॥

এতাং শ্রুত্বা রূপসরোহংসী[১] বংশীকথামথ।
জগাদ রাধা মধুরা[২] ভারতীং জরতীং প্রতি ॥

রূপসরোবরের হংসীস্বরূপা রাধা এই বংশীবৃত্তান্ত শুনিয়া বৃদ্ধাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন।

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

ঘরেত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞিঁ
কোণ দিগেঁ সাব নীসারে।
বাঁশীর শবদেঁ চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি
জাইবোঁ তার আনুসারে ॥ ১ ॥
তুখ বাঁশীর শবদেঁ গো বড়ায়ি।
ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবন পসিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
বাঁশী বাএ সুললিত ছান্দে।
হার কঙ্কন বড়ায়ি সব তেআগিবোঁ
সুণী তাক বুক কে বা বান্ধে ॥ ২ ॥
চলি জাইতেঁ চাহোঁ বড়ায়ি পাঅ নাহিঁ চলে
হারায়িলোঁ সখিজন সঙ্গে।
এবে বাঁশীনাদ সুণী দেহ কাহ্নু আণী
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৩ ॥

রাধার উক্তি: নাগরশেখর শ্রীকৃষ্ণ গৃহের বাহির হইয়া কোন্‌দিকে বাঁশি বাজাইতেছেন? বড়াই গো, বাঁশির শব্দে চিত্ত আমার ব্যাকুল। আমি সেই বাঁশির ধ্বনি অনুসরণ করিয়া তাঁহার কাছে যাইব ॥ ১ ॥ বড়াই গো, বাঁশির শব্দে বড় জ্বালা। আমার ঘোলের পাত্রে আমার হাতের মন্থনদণ্ড ঘোরে না, অচল হইয়া থাকে ॥ ধ্রু ॥ মনোহর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া সুললিত ছন্দে বাঁশি বাজাইতেছেন। তাঁহার

১ অ। প্র: রূপসরোহংসী।
২ অ। প্র: মধুরাং।

জন্য আমি গলার হার কঙ্কণ সব পরিত্যাগ করিব। এ বাঁশি শুনিয়া বুক বাঁধিতে পারে এমন শক্তি কাহার আছে ॥ ২ ॥ বড়াই গো, চলিয়া যাইব বলিয়া মনে করি, কিন্তু চলিতে গিয়া পা চলে না। সখীরা আগাইয়া গেল, আমি তাহাদের সঙ্গ হারাইলাম। এখন বংশিধ্বনি শুনিতেছি, ওগো দূতী, শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দাও। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৩ ॥

রাধায়া প্রেরিত[১] বৃদ্ধা হরেরন্বেষণং প্রতি।
ইদং জগাদ বচনং রাধিকামাধিকাতরাং ॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে যাইবার জন্য রাধা বড়াইকে বলিলে বড়াই ব্যাকুলহৃদয়া রাধাকে এই কথা বলিল।

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

খনে বসী থাকে কাহ্নাঞি যমুনীর[২] তীরে।
গেণ্ডুয়া খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে ॥ ১ ॥
কথাঁ গিআঁ চন্দ্রাবলী চাহিব কাহ্নাঞি।
সরূপ করিআঁ বোল আহ্মার ঠাই ॥ ধ্রু ॥
খণে বৃন্দাবনে খনে বাঁশী বোলায়িতেঁ।
নিশ্চল বোলহ লাগ পাইব কেনমতেঁ ॥ ২ ॥
হারা[৩] উদ্দেশে কত বেড়ায়িব আহ্মে।
বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোহ্মে ॥ ৩ ॥
কাকুতী করিআঁ বোলোঁ খেমা কর মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি : শ্রীকৃষ্ণ কখনো যমুনার তীরে বসিয়া থাকেন, কখনো বা গোকুলে বসিয়া গেণ্ডুয়া খেলেন ॥ ১ ॥ এখন চন্দ্রাবলী, তুমি আমাকে ভাল করিয়া বলিয়া দাও কোথায় গিয়া তাঁহার খোঁজ করিব ॥ ধ্রু ॥ তিনি কখনো বৃন্দাবনে অবস্থান করেন, কখনও বা বাঁশি বাজান। তাঁহার উদ্দেশ কেমন করিয়া পাইব নিশ্চয় করিয়া বলো ॥ ২ ॥ বুড়ামানুষের প্রতি তোমার একটুও দয়া নাই, বলো তো নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে আর কত ঘুরিয়া বেড়াই ॥ ৩ ॥ আমি তোমাকে কাকুতি করিয়া বলিতেছি আমাকে ক্ষমা কর। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

১ অ। প্র : রাধয়া প্রেরিতা।

২ অ। প্র : যমুনার।

৩ বসন্তরঞ্জন পুঁথির পাঠ অশুদ্ধ মনে করিয়া 'হারা' স্থলে 'তাহার' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পুঁথির পাঠ কোনো দিক হইতেই অশুদ্ধ বলিয়া মনে করি না। অর্থেও কোনো অসঙ্গতি ঘটে না।

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে ।
এবেঁ কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে ॥
প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে ।
এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞিঁ দরশন নাঁদে ॥ ১ ॥
আহ্মা উপেখিআঁ গেলা নান্দের নন্দন ।
তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ ॥ ধ্রু ॥
আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ ।
কেলি কৈল যেই বৃন্দাবনত পসিআঁ ॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ সমে বিবিধ বিধানে ।
এবেঁ লআঁ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে ॥ ২ ॥
বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী ।
কাহ্ন বিণি মোর রূপ যৌবনে কী ॥
এ রূপ-যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
মন্দ পবন বহে কালিনী নইতীরে ।
কাহ্নাঞিঁ সোঁঅরী মোর চিত নহে থীরে ॥
এবেঁ আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দন[১] ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : কালো বৃন্দাবনে কালো কোকিল কুহুধ্বনি করিতেছে। এখন নন্দের নন্দন আমার পক্ষে কাল হইলেন। হায় বাঁশির শব্দে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইল, তবু তো কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া আমায় দেখা দিলেন না ॥ ১ ॥ আমাকে উপেক্ষা করিয়া নন্দনন্দন চলিয়া গেলেন কিন্তু আমার চিত্ত যে তাঁহাতেই নিমগ্ন হইয়া আছে। সে চঞ্চল চিত্ত কেমন করিয়া সংবরণ করি ॥ ধ্রু ॥ বড়াই গো, দেহে অগুরু চন্দন লেপন করিয়া যে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিধানে কেলি করিয়াছি সেই বৃন্দাবনে আমাকে লইয়া চলো ॥ ২ ॥ আমি মানীজনের স্ত্রী, মানীজনের কন্যা। কৃষ্ণবিহনে আমার রূপযৌবনের মূল্য কি? এ রূপযৌবন লইয়া আমি কোথায় যাইব? বরং হে বসুন্ধরা তুমি দ্বিধা হও, তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুকাই ॥ ৩ ॥ কালিন্দী নদীর তীরে ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে। এখন শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করিয়া চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না। হায়, নন্দনন্দন আমাকে আকুল করিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

১ অ। প্র: নন্দনে।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যবেঁ আহ্মা দিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাঠায়িলে তাম্বুল।
তখন কি বুঝিআঁ না কৈলে আণুকুল ॥ ১ ॥
পুনরপি কান্ধে বহিলেঁ দধিভার।
তবেঁ কেহ্নে না পালিলে বচন তাহার ॥ ২ ॥
যখন শরতরৌদে ধরিলেক ছাতী।
তখন বোলায়িলেঁ রাধা আপণাক সতী ॥ ৩ ॥
তোহ্মা সমে করিব যমুনাজলে কেলী।
হেন বুঝী কালীয় দলিল বনমালী ॥ ৪ ॥
নানা ফুল আরোপিল নির্ম্মিল বৃন্দাবন।
তোহ্মার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন ॥ ৫ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ এত কৈল দামোদরে।
তভোঁ তাক দোষ দেসি তোঞেঁ বারে বারে ॥ ৬ ।
এখন বোলহ রাধা আহ্মার মরন।
এবেঁ কথাঁ পাইব আহ্মে নান্দের নন্দন ॥ ৭ ॥
মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৮ ॥

বড়াইর উক্তি : আমার হাত দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন তাম্বূল পাঠাইলেন কি ভাবিয়া তখন তাঁহার প্রতি অনুকূল হইলে না ॥ ১ ॥ তাহার পরেও তিনি তোমার দধিভার বহন করিলেন, তবু কেন তাঁহার কথা শুনিলে না ॥ ২ ॥ যখন তিনি শরতের রোদে তোমার মাথায় ছাতা ধরিলেন তখন নিজেকে সতী বলিয়া খুব তো বড়াই করিলে ॥ ৩ ॥ তোমার সহিত জলকেলি করিবার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় কালীয়দমন করিলেন ॥ ৪ ॥ তোমারই বিলাসের উদ্দেশ্যে নন্দনন্দন নানা পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়া বৃন্দাবন নির্মাণ করিলেন ॥ ৫ ॥ হায়, দামোদর তোমারই জন্য কত করিলেন তবু তাঁহাকে বারবার দোষ দিতেছ ॥ ৬ ॥ এখন তোমার জন্য আমারই মরণ। বলো তো এখন সেই নন্দনন্দনকে কোথায় খুঁজিয়া পাইব ॥ ৭ ॥ রাধা, আমার কথা শোনো, শ্রীকৃষ্ণের আশা ছাড়িয়া দাও। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৮ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী ॥ ১ ॥

রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি
স্থণিআঁ বাঁশীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।
তা স্থণিআঁ ঘ্বতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ ॥ ২ ॥
সেই ত বাঁশীর নাদ স্থণিআঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ
বিণি জলেঁ চড়াইলোঁ চাউল ॥ ৩ ॥
যমুনার তীরে কদম তরুতলে
তহি বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে।
তাক আণিআঁ বড়ায়ি রাখহ পরাণ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই গো, সুমধুর বংশিধ্বনি শুনিয়া যে রাঁধন রাঁধিলাম সে কাহিনী বলি শোনো। অম্বল ব্যঞ্জনে দিলাম ঝাল মশলা আর শাকের হাঁড়িতে এমন জল ঢালিলাম যে কানা পর্যন্ত ভর্তি হইয়া গেল ॥ ১ ॥ বড়াই গো, বাঁশির শব্দ শুনিয়া রন্ধনের জুত হারাইয়া গেল ॥ ধ্রু ॥ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে আড়বাঁশি বাজান তাহার স্বর শুনিলে মনে হয় যেন পিঞ্জরের শুক পাখী গান গাহিতেছে। তাহা শুনিয়া পটোল বলিয়া, এই দেখ, কাঁচা সুপারি ঘিয়ে ভাজিয়া ফেলিয়াছি ॥ ২ ॥ সেই বাঁশির ধ্বনি শুনিয়া চিত্ত আমার নিরতিশয় ব্যাকুল। আমি নিমঝোলে লেবুর রস নিংড়াইয়া দিয়াছি, চাউল চড়াইয়াছি বিনা জলে ॥ ৩ ॥ যমুনার তীরে কদম্বের তলে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতেছেন। ওগো বড়াই, তাঁহাকে আনিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আজি ভাল না শুনো মো তোহ্মার বচন।
আপণার গুণ কহ আউলাআঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
আপণার স্থখে কাহ্নাঞিঁ ভ্রমে বৃন্দাবনে।
লাজ না বাস বুলিতেঁ হেন বচনে ॥ ধ্রু ॥
তাহাক আণিতেঁ তোহ্মে নাম্বায়িলেঁ আম্বলে।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ রস দিলেঁ নিমঝোলে ॥ ২ ॥
চল চাহা গিআঁ রাধা বৃন্দাবন পাশে।
তথাঁ কাহ্নাঞিঁ...[১] গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

---

১ ছাড়।

বড়াইর উক্তি : আজ তোমার এই সব কথা শুনিয়া ভাল লাগিতেছে না। রান্না এলোমেলো করিয়া নিজের বড় গুণ গাহিতেছ ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সুখে আপনি বৃন্দাবনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এ কথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় না ॥ ধ্রু ॥ তাঁহাকে আনিবার জন্য তুমি অম্বল নামাইলে, লেবু নিংড়াইয়া নিমঝোলে তাহার রস দিলে ॥ ২ ॥ রাধা, যাও বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহার খোঁজ কর, শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই আছেন। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৩ ॥

। নিধায় কলসং কুক্ষৌ বৃদ্ধয়া সহ রাধিকা।
জগাম যমুনাতীরং কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা ॥

রাধিকা কৃষ্ণের অন্বেষণ করিবার জন্য কক্ষে কলসী লইয়া বড়াইয়ের সহিত যমুনাতীরে গমন করিলেন।

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাখেত কলসী বড়ায়ি জাওঁ ধীরে ধীরে।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ বড়ায়ি যমুনার তীরে ॥
বাঁশীনাদ সুণী কাহ্ন দেখিতে না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিঞাঁ লুকাওঁ ॥ ল ॥ ১ ॥
চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক তীরে।
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ কেহ্ন জণি করে ল ॥ ধ্রু ॥
শীতল মনোহর বাশী[১] কে না বাএ।
ডালত বসিঞাঁ যেহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥
উল্লসিত হইলোঁ বড়ায়ি তার নাদ সুণী।
না পায়িঞাঁ কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি তেজিবোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
যমুনার তীরে বড়াই[২] কদমের তলে।
পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহি ত মঙ্গলে ॥
মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে।
তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে ॥ ৩ ॥
এবে মঙ্গল চাহীঞাঁ দেখিলোঁ বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী ॥
এথণ বড়ায়ি মোরে বোলহ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই, কক্ষে কলসী লইয়া ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে যমুনার তীরে

---

১ অ। প্র : বাশী।
২ 'বড়াই' তোলাপাঠে।

চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছি। বাঁশির স্বর শুনিতে পাইতেছি কিন্তু কই শ্রীকৃষ্ণকে তো দেখিতে পাইলাম না। হে বসুন্ধরা, তুমি বিদীর্ণ হইয়া তোমার কোলে আমাকে স্থান দাও ॥ ১ ॥ বড়াই গো, বাঁশির শব্দে প্রাণ আমার কেমন করিতেছে। তুমি যমুনার তীরে ভাল করিয়া তাঁহার খোঁজ কর ॥ ধ্রু ॥ বাঁশির শীতল মনোহর ধ্বনি শুনিয়া মনে হয় যেন ডালে বসিয়া কোকিল কূজন করিতেছে। বাঁশির ধ্বনি শুনিয়া চিত্ত উল্লসিত হইল। এখন বংশিবাদককে না পাইলে এ প্রাণ বিসর্জন করিব ॥ ২ ॥ যমুনার তীরে কদম্বতরুতলে পূর্ণ ঘট পাতিয়া মঙ্গল কামনা করি। মঙ্গল পাইলে চিত্ত সুস্থির হইবে এবং প্রিয়তম আসিয়া মিলিত হইবেন ॥ ৩ ॥ এখন মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া দেখিলাম শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার কোনো লক্ষণ নাই। এখন, ওগো বড়াই, আমি কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাই তাহার উপায় বলিয়া দাও। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাবন[১]।
কথাহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥
আজি সুন্দরী রাধা চলি জায়ি ঘর।
এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর ॥ ১ ॥
এখণ আর কিছ উপায় নাহী।
কালী পরভাতে আসি চাহিব কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
বিহাণ আইলাহোঁ হৈল সাঁঝ উপসন।
গোঠে হৈতেঁ ঘর আজি আসিআঁ আইহন ॥
তোহ্মাক না দেখিআঁ রোষিব আহ্মারে।
না জাণো আয়র কিবা করএ আহ্মারে ॥ ২ ॥
কোপছলে পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে।
এখন[২] পায়িবাক তাক না কর যতনে ॥
বিরহেঁ বিকল হআঁ তোহ্মার থানে।
আপণে মেলিব আসি নাগর কাহ্নে ॥ ৩ ॥
আহ্মাত আধিক তোর কে করিবে হিত।
সব খন তোর কাজে জাগে মোর চিত ॥
হেন বুলী বড়ায়ি লয়িআঁ গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি : নানাভাবে বৃন্দাবনে খোঁজ করিয়াছি তবু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাই নাই। সুন্দরী রাধা, আজ চল ঘরে ফিরি। চিত্ত সংবরণ করিয়া আমার কথা শোনো

১ অ। প্র: বৃন্দাবনে।
২ 'এ' তোলাপাঠে।

॥ ১ ॥ এখন তো আর কোনো উপায় দেখিতেছি না। কাল বরং সকালে আসিয়া কৃষ্ণের সন্ধান করিব ॥ ধ্রু ॥ সেই সকালে আসিয়াছি, আর এখন সন্ধ্যা হইতে চলিল। গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আইহন যখন তোমাকে গৃহে দেখিতে পাইবে না তখন আমার উপর ক্রোধ করিবে। জানি না আরো কি করিয়া বসে ॥ ২ ॥ রাগের ভাণ করিয়া কৃষ্ণ তোমার মন পরীক্ষা করিতেছেন। এখন তাঁহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিও না। নাগর শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া একদিন নিজেই তোমার কাছে আসিবেন ॥ ৩ ॥ আমার অপেক্ষা বেশী কে তোমার উপকার করিবে? আমার মনে তোমার কল্যাণচিন্তা সর্বদাই জাগ্রত আছে। এই কথা বলিয়া বড়াই রাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

প্রথম পহরে গোআল গেলা নিন্দ।
আচম্বিত বাঁশীধুনী করিল গোবিন্দ ॥
উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।
বিরহেঁ বিকলী হআঁ গোআলিনী কান্দে ॥ ১ ॥
শ্রীরঘুনন্দন[১] গোবিন্দ হে।
অনাথী নারীক সঙ্গে নে ॥ ধ্রু ॥
দুঅজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন।
নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন ॥
চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে।
কথাঁহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর রাতী কোকিল রএ।
বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ ॥
এভোঁ নাইল সে ত নান্দের পূত।
কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত ॥ ৩ ॥
চৌঠ পহরে গুণিআঁ পাচ সাতে।
বিরহেঁ মুরুছা গেলী রাধিকা প্রভাতে ॥
মুখ[২] জল দিআঁ বড়ায়ি করায়িল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি: প্রথম প্রহরে গোয়ালা (আইহন) নিদ্রিত হইল। অমনি গোবিন্দ বংশিধ্বনি করিলেন। বাঁশির শব্দ শুনিয়া গোপাঙ্গনা রাধিকা বিরহে ব্যাকুল

১ অ। প্র: শ্রীনন্দনন্দন।
২ অ। প্র: মুখে।

হইয়া রোদন করিলেন ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি : হে শ্রীনন্দনন্দন, হে গোবিন্দ, এই অনাথা রমণীকে সঙ্গে লও ॥ ধ্রু ॥ কবির উক্তি : দ্বিতীয় প্রহরে আইহনকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন দেখিয়া রাধিকা পথে বাহির হইয়া চমকিত মনে চারিদিকে চাহিলেন কিন্তু কোথাও কৃষ্ণের দর্শন পাইলেন না ॥ ২ ॥ রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইয়া গেল, কোকিল ডাকিতে লাগিল। ব্যাকুলা গোয়ালিনী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায়, নন্দনন্দন তো এখনো আসিলেন না। এই কোকিলের রব আমার পক্ষে যমদূতের সমান ॥ ৩ ॥ চতুর্থ প্রহর কাটিয়া গেল, প্রভাত হইয়া আসিল। নানাচিন্তা করিতে করিতে-বিরহকাতরা রাধা মূর্ছাগত হইলেন। বড়াই তাঁহার মুখে জল দিয়া চেতন করাইল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

অথ রাধা[1] পুরো বীক্ষ্য স্মরজ্বরভরাতুরাং।
চতুরা জরতী প্রাহ যমুনাগমনং প্রতি ॥

মদনকাতরা রাধাকে সম্মুখে দেখিয়া চতুরা বড়াই তাঁহাকে যমুনা অভিমুখে যাইবার কথা বলিল।

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥

সুণহ সুন্দরী রাধা বচন আহ্মার।
যমুনাক যাই ছলে পাণী আণিবার ॥ ১ ॥
তোহ্মার বচনে যমুনাক আহ্মে জাইব।
তথাঁ গেলেঁ কেমনে কাহ্নাঞিঁর লাগ পাইব ॥ ২ ॥
তথাঁ বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে।
যমুনার তীরে সব খন থাকে কাহ্নে ॥ ৩ ॥
তার বাঁশী নিলেঁ হিত কি হয়িব মোর।
সরূপ করিআঁ কহ পাএ ধোরোঁ তোর ॥ ৪ ॥
বাঁশীত লাগিআঁ তোকে নান্দের নন্দন।
আপুণী বুলিব আসী কাকুতীবচন ॥ ৫ ॥
কদমের তলে যবেঁ কাহ্ন থাকে বসী।
তবেঁ তার কেনমতেঁ চোরায়িব বাঁশী ॥ ৬ ॥
নিন্দাউলী মন্ত্রে থাক[2] নিন্দাইব আহ্মি।
তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুহ্মি ॥ ৭ ॥
কেহো যবেঁ বাঁশী হাথে দেখিব আহ্মারে।
তবেঁ তাক সম্বোধিব কমণ উত্তরে ॥ ৮ ॥

১ অ। প্র: রাধাং।
২ অ। প্র: তাক।

বাঁশীগুটি থুইহ তোহ্মে কলসি ভীতর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৯ ॥

বড়াইর উক্তি : সুন্দরী রাধিকা, আমার কথা শোনো। চল, জল আনিবার ছল করিয়া যমুনার দিকে যাই ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি : তোমার কথায় যমুনায় যাইতে পারি কিন্তু সেখানে গিয়া কৃষ্ণকে কেমন করিয়া পাইব ॥ ২ ॥ বড়াইর উক্তি : যমুনার তীরে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই অবস্থান করেন। সেখানে গিয়া তাঁহার বাঁশিটি চুরি করিবার চেষ্টা করিও ॥ ৩ ॥ রাধার উক্তি : বড়াই গো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় সত্য করিয়া বলো তাঁহার বাঁশি লইলে আমার কি লাভ হইবে ॥ ৪ ॥ বড়াইর উক্তি : বাঁশির জন্য নন্দনন্দন স্বয়ং আসিয়া তোমাকে মিনতি করিবেন ॥ ৫ ॥ রাধার উক্তি : কিন্তু কদম্বের তলায় শ্রীকৃষ্ণ যদি সর্বক্ষণ বসিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার বাঁশি কেমন করিয়া চুরি করিব ॥ ৬ ॥ বড়াইর উক্তি : আমি নিন্দাউলী মন্ত্র পড়িয়া তাঁহাকে নিদ্রাকুল করিব, তুমি সেই অবসরে তাঁহার বাঁশিটি লইয়া গৃহে যাইও ॥ ৭ ॥ রাধার উক্তি : সেই বাঁশি আমার হাতে দেখিয়া কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে আমি কি উত্তর দিব ॥ ৮ ॥ বড়াইর উক্তি : তুমি বাঁশিটি কলসীব মধ্যে রাখিয়া দিও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৯ ॥

গত্বা রাধাযুতা বৃদ্ধা মাধবং যামুনে তটে।
নিদ্রালু[১] বিদধে মন্ত্রৈর্বংশাপহরণাশয়া ॥

রাধিকার সহিত যমুনাতটে উপস্থিত হইয়া বড়াই বংশী অপহরণের উদ্দেশ্যে মন্ত্র-সাহায্যে মাধবকে নিদ্রাভিভূত করিল।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যমুনার তীরে কদম তরুতলে বাঅ বহে সুশীতলে।
তথাঁ বশিআঁ সে দেবরাজ পুরিল বাঁশীত শরে ॥
নিদ্রাহো আসিআঁ চাপিল কাহ্নে তেঁসি না গেলা ঘরে।
নব কিশলয় শয়নে সুতিল বাঁশীত দিআঁ সিঅরে ॥ ১ ॥
আল। কাহ্ন নিন্দ গেলা হেলে।
দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ বাঁশী হারাইল ভোলে ॥ ধ্রু ॥
সকল সখিগনে যমুনাক গেলা আণিবারেঁ পাণী।
কদম তলাত নিন্দ গেল কৃষ্ণ দেখিল আইহনরাণী ॥
ধীরে ধীরে তার নিকট গিআঁ বাঁশী চোরায়িআঁ সত্বরে।
কাথের কুম্ভত ভিথর[২] থুয়িআঁ রাধা লড়িলা ঘরে ॥ ২ ॥

১ অ। প্র : নিদ্রালুং।
২ অ। প্র :

ঘরত গিআঁ সে চন্দ্রাবলী ভূমিত থুয়িআঁ কলসী।
উল্লসিত মনে বাহির করিআঁ পুণি পুণি চাহে বাঁশী॥
পাছে লুকায়িল রাধিকা বাঁশী যথাঁ নাহিঁ জাএ আনে।
মনত গুণিআঁ সার কৈল আর নাহিঁ দিব কাহ্নে॥ ৩
নিদ্রা ভাঙ্গিআঁ সত্বর হয়িআঁ কাহ্নাঞিঁ তুলীল গাএ।
চারি পাশ চাহী বাঁশী না পায়িআঁ কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ॥
বেআকুল হয়ি বড়ায়ি দেখিআঁ বিলপিলা শ্রীনিবাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

কবির উক্তি : যমুনার তীরে কদম্বতরুতলে সুশীতল বাতাস বহিতেছে। দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বসিয়া বাঁশিতে সুর ধরিলেন। তখন তাঁহার নয়নে নিদ্রা নামিয়া আসিল। তিনি সেই কারণে গৃহে না ফিরিয়া বাঁশিতে মাথা রাখিয়া নব কিশলয়ের শয্যায় শয়ন করিলেন॥ ১॥ শ্রীকৃষ্ণ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সেই অবস্থায় তাঁহার বাঁশিটি চুরি গেল। দৈবের নির্বন্ধ তো খণ্ডন করা যায় না॥ ধ্রু॥ সখীরা সকলে মিলিয়া জল আনিবার জন্য যমুনায় গেলেন। আইহনগৃহিণীও তাঁহাদের সহিত গিয় দেখিলেন, কদমতলায় শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাগত। ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট হইতে বাঁশিটি চুরি করিলেন এবং কক্ষের কলসীর মধ্যে বাঁশিটি লুকাইয়া রাখিয়া দ্রুতগতি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন॥ ২॥ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রাধিকা কলসীটি ভূমিতে রাখিয়া বাঁশিটি বাহির করিলেন এবং উল্লসিত মনে সেটি বার বার করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর এমন স্থানে বাঁশিটি লুকাইলেন যেখানে আর কাহারো যাওয়া আসা নাই। রাধা মনে মনে চিন্তা করিয়া এই স্থির করিলেন, কৃষ্ণকে এ বাঁশি আর ফিরাইয়া দিবেন না॥ ৩॥ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে কৃষ্ণ জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন কিন্তু বাঁশিটি কোথাও পাইলেন না। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। বড়াইকে দেখিয়া শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪॥

কোড়ারাগঃ॥ যতিঃ॥

আনেক যতন করি আলোচিআঁ কাজে।
বাঁশী নির্মিল আহ্মে গোকুলসমাজে॥
শোভে রতনজড়িত বাঁশী আহ্মারে।
নাদে মোহো জাএ সকল সংসারে॥ ল॥ ১॥
বাঁশী হারায়িলোঁ বড়ায়ি ল
আল গোকুলে আসিআঁ।
হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ॥ ধ্রু॥

এবেঁ কে না নীল মোহন বাঁশে।
মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে॥
মাণিকে খঞ্চিল তথি সোনার পাতা।
সুরপতী জাণে মোর বাঁশীর বারতা॥ ২॥
বাঁশী হারায়িআঁ কাহ্নু মনে খেদ করে।
তাহাক চাহিআঁ কাহ্নু বুলে ঘরে ঘরে॥
মাথাত হাথ দিআঁ কান্দন্তি গদাধরে।
তাহাক শুণিআঁ রাধা পায়িল বড় ডরে॥ ৩॥
মণত গুণিআঁ পাছে দেব চক্রপাণী।
দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী॥
তবে সবে[১] কহিলান্ত বড়ায়ির থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

কৃষ্ণের উক্তি: কার্যের বিষয় আলোচনা করিয়া আমি অতিশয় যত্ন সহকারে গোকুল সমাজে এই বংশী নির্মাণ করিয়াছি। আমার এই বাঁশি নানা রত্নে খচিত। তাহার শোভা অপরূপ, তাহার ধ্বনিতে সকল সংসার মোহপ্রাপ্ত হয়॥ ১॥ হায় বড়াই, গোকুলে আসিয়া আমি সেই বাঁশি হারাইলাম। আমি ভূমিতে লুটাইয়া তাই ব্যাকুলভাবে বিলাপ করিতেছি॥ ধ্রু॥ সে বাঁশির দুই ধারে মুক্তার ঝালর আর পাটের গুচ্ছ শোভা পায়, তাহা মাণিকে খচিত সোনার পাত দিয়া মোড়া, স্বয়ং সুরপতি সে বাঁশির সংবাদ জানেন। হায়, আমার সেই মোহন বাঁশি কে লইল॥ ২॥ কবির উক্তি: শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি হারাইয়া বড়ই মনোবেদনা পাইলেন। বাঁশির খোঁজে তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়াইলেন। না পাইয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া রাধার বড় ভয় হইল॥ ৩॥ অনন্তর দেবচক্রপাণি আপন মনে চিন্তা করিয়া দুই হাতে চোখের জল মুছিলেন, তাহার পর বড়াইয়ের নিকট সব কথা খুলিয়া বলিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪॥

মল্লাররাগঃ॥ রূপকং॥

না কান্দ না কান্দ কাহ্নাঞিঁ সুণহ বচনে।
কাতর কিকে হয় কমললোচনে॥
আযাত্রাঞঁ গোকুল কইলেঁ গমনে।
শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে॥ ১॥
সুণহ সুণহ কাহ্নু না কর আতোষে।
আহ্মে সব কহিআঁ দিব বাঁশীর উদ্দেশে॥ ধ্রু॥
আহ্মার বচনে তোহ্মে কর অবধান।
গোপীকুলের তোহ্মে কৈলেঁ আপমান॥

১ অ। প্র: সব।

তেকারণে এবেঁ আহ্মে করি আনুমান।
তেঁ সম্বে চোরায়িল বাঁশী তোর কাহ্ন॥ ২ ॥
বাঁশীর উদ্দেশ তোক কহিল মুরারী।
গোপী মাঝেঁ বাঁশী তোর কেহো কৈল চুরী॥
ষোল শত যুবতীক কর যোড় হাথ।
তবেঁ বাঁশী পায়িবেঁ শুন জগন্নাথ॥ ৩ ॥
যোড়হাথে কাকুতী কৈল বনমালী।
তা দেখিআঁ ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী॥
বুঝিআঁ রাধাক বাঁশী মাঙ্গিল কাহ্নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি : হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ আমার কথা শোনো। এত কাতর হইও না। অযাত্রায় গোকুলের পথে যাত্রা করিয়াছিলে তাই শিয়রের বাঁশি হারাইয়াছ॥ ১ ॥ হে কৃষ্ণ, তুমি দুঃখ করিও না। আমি তোমার বাঁশির সন্ধান সব বলিয়া দিব॥ ধ্রু॥ আমার কথা মন দিয়া শোনো। তুমি গোপীদের অপমান করিয়াছ। আমার বিশ্বাস তাহারা সেই কারণে তোমার বাঁশি চুরি করিয়াছে॥ ২ ॥ আমি তোমাকে বাঁশির সংবাদ এই বলিয়া দিলাম। হে জগন্নাথ, গোপীদের মধ্যেই কেহ তোমার বাঁশি চুরি করিয়া থাকিবে। তুমি ষোলশত গোপযুবতীর নিকট করযোড়ে বাঁশিটি প্রার্থনা কর। তবেই বাঁশি পাইবে॥ ৩ ॥ কবির উক্তি : তখন বনমালী জোড়হাতে গোপাঙ্গনাদের নিকট নতি স্বীকার করিলেন। তাহা দেখিয়া চন্দ্রাবলী ঈষৎ হাস্য করিলেন। রাধাই বাঁশিটি লইয়াছেন ইহা বুঝিয়া কৃষ্ণ তাঁহার কাছে বাঁশিটি চাহিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ॥ রূপকং॥

আহ্মার বাঁশীর শবদেঁ ল।
আল হের রাধা
খণ্ডএ সকল আপদে।
আল রাধে জার ধুনী সরগদুআরে॥ ল॥ ১
মোরে বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দাণে।
আল হে রাধা
বারেক রাখহ সমানে ল॥ ধ্রু॥
বাঁশী পাইল হর গৌরী বরে।
দেখিতেঁ আতি মনোহরে।
যার নাদেঁ গোকুল রহে॥ ২ ॥

সুণ তোঁ আইহনের গোআলী।
আকুল না কর বনমালী ॥
বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে।
হের তোর ধরিলোঁ আঁচলে ॥ ৩ ॥
সুণী কি বুলিহে বাপ নান্দে।
বাঁশী হারায়িলোঁ মো নিন্দে ॥
বাঁশী দিআঁ পুর মোর আশ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি: আমার বাঁশির শব্দে, হে রাধিকা, সকল বিপত্তির খণ্ডন হয়। সে বাঁশির ধ্বনি স্বর্গদ্বার অবধি শ্রুত হয় ॥ ১ ॥ হে রাধা, বাঁশিটি দিয়া একবার আমার মান রাখ ॥ ধ্রু ॥ হরগৌরীর বরে বাঁশিটি পাইয়াছি। অতি মনোহর বংশিধ্বনিতেই গোকুলপুরী সুস্থির হইয়া আছে ॥ ২ ॥ আইহনঘরণী, তোমাকে বলি শোনো, আমাকে আকুল করিও না। গণ্ডগোল না করিয়া আমার বাঁশিটি দিয়া দাও, তোমার অঞ্চল ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি ॥ ৩ ॥ ঘুমের ঘোরে বাঁশি হারাইয়াছি এ কথা শুনিয়া পিতা নন্দই বা কি বলিবেন? রাধিকা, বাঁশিটি দিয়া আমার আশা পূর্ণ কর। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

কৃষ্ণের বচন শুনিয়া ব্যথিত হৃদয়া রাধা কাঁপিতে কাঁপিতে বড়াইকে এই কথা বলিলেন।

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো
 বিকে জাইতেঁ মথুরা নগরী।
আঞ্চলে ধরিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ রহাএ গো
 বোলে তোঞ্ঁ বাঁশী কৈলী চুরী ॥ ১ ॥
আল হের না জাণো বাঁশীর শুধী।
আল ল বড়ায়ি।
ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ বল করে ॥ ধ্রু ॥
তেজিলোঁ মো তার চীর নূপুর কঙ্কন বড়ায়ি
 তেজিলোঁ মো সব আভরণে।
বারে বারে কাহ্নাঞিঁ মোকে ধিকাধিক বোলে গো
 যত কিছু তোহ্মার কারণে ॥ ২ ॥

গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ
কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ।
তবে বা মোঞঁ কাহ্নের ঝগড় এড়াওঁ
কিবা মরোঁ খরল[১] খায়িআঁ ॥ ৩ ॥
আহ্মার আন্তরে বড়ায়ি বোলহ কাহ্নেরে গো
চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে।
না কর ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো
গাইল বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: হে বড়াই, ঘৃত দধি দুধে পসার সাজাইয়া বিক্রয়ের জন্য মথুরা নগরী অভিমুখে যাইতেছিলাম। কৃষ্ণ আমার অঞ্চল ধরিয়া পথরোধ করিয়া রহিলেন। বলিলেন, তুমিই বাঁশি চুরি করিয়াছ ॥ ১ ॥ বড়াই, আমি বাঁশির সংবাদ কিছু জানি না। বালক শ্রীকৃষ্ণ অকারণে আমার সহিত দুর্ব্যবহার করিতেছে ॥ ধ্রু ॥ আমি বসন কঙ্কণ নূপুর আদি সব আভরণ বিসর্জন করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ যে বারংবার আমার প্রতি কটুবাক্য উচ্চারণ করে—এ সবই তোমার জন্য ॥ ২ ॥ গলায় পাথর বাঁধিয়া আমি জলে ঝাঁপ দিব, না হয় তো আগুনে পুড়িয়া মরিব, নয়তো বিষ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব, তবে যদি শ্রীকৃষ্ণের অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই ॥ ৩ ॥ আমার হইয়া, হে বড়াই, তুমি কৃষ্ণকে এই কথা বলিও যে চন্দ্রাবলী তোমার কাছে হার মানিয়াছে, আর তুমি তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করিও না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

রাধিকাবাচমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং
উবাচ কাতরঃ কৃষ্ণঃ[২] বংশোৎপাদনহেতবে ॥

বড়াইয়ের মুখে রাধিকার কথা শুনিয়া কাতর কৃষ্ণ বংশী পাইবার আশায় এই কথা বলিলেন।

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

মাঞঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল।
না করিহ গোঠ সঘনে[৩]।
সেহো বোল না শুণিল কানে ল।
আল হের বড়ায়ি হে।
তেঁ মোর বাঁশী নিল আনে ॥ হে ॥ ১ ॥
হরি হরি।
কে না পরাণে দুখ দিল।

১ অ। প্র: গরল।
২ অ। প্র: কৃষ্ণো।
৩ অ। প্র: শয়নে।

আল হের।
বিরহবিনোদ বাঁশী নিল হে ॥ ধ্রু ॥
মোর বাঁশী ত্রিভুবনে জাণী।
খিঙ্কিল মাণিকে হিরা মণী ॥
বাঁশী নিআঁ রাধা নাহি মানে।
সে নিল জাণো আনুমানে ॥ ২ ॥
বাঁশী হারাইল বনমালী।
সুণী বাপ মাঞ দিব গালী ॥
তাক ধন দিব চক্রপাণী।
যে মোর বাঁশী দিব আনী ॥ ৩ ॥
নাহি করোঁ কিছু আপরাধা।
বাঁশী নিআঁ প্রাণে মারে রাধা ॥
বোল তারে দেউ মোর বাঁশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : মা নিষেধ করিয়া বলিলেন, বাছা, গোষ্ঠে শয়ন করিও না। সে নিষেধ অমান্য করিলাম। হে বড়াই, সেই কারণে কেহ আমার বাঁশি অপহরণ করিল। ॥ ১ ॥ হায় হায়, আমার বিরহবিনোদ বাঁশিটি চুরি করিয়া কে আমার প্রাণে এমন দুঃখ দিল ॥ ধ্রু ॥ আমার বাঁশি ত্রিভুবনে পরিজ্ঞাত, হীরা মণি মাণিক্যে তাহা খচিত। সে বাঁশি রাধা লইয়াছে অনুমানে বুঝিয়াছি। কিন্তু বাঁশি লইয়া সে স্বীকার করিতেছে না ॥ ২ ॥ আমি বাঁশি হারাইয়াছি শুনিলে পিতা মাতা তিরস্কার করিবেন। যে আমাকে বাঁশিটি আনিয়া দিবে তাহাকে পুরস্কার দিব ॥ ৩ ॥ বড়াই, আমি তো কোনো অপরাধ করি নাই। তবু বাঁশি লইয়া রাধা আমায় প্রাণে মারিতেছে। তুমি বলো সে আমার বাঁশিটি ফিরাইয়া দিক। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
অথ রাধা নিরাবাধা পুন[১] প্রাহ গদাধরং ॥

অনন্তর বড়াইর মুখে কৃষ্ণের বচন শুনিয়া রাধা কোনো দুঃখের ভাব না দেখাইয়া গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা জগতে বিদিত তোরে।
তার পুত্র হআঁ দেব দামোদর মিছা চুরী দোষ মোরে ॥ ১ ॥
এথাক্রিঁ শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ সুতিআঁ আছিলোঁ আহ্মি।
পাণী নিবারেঁ আসিআঁ সে বাঁশী নিলেহেঁ তুহ্মি ॥ ২ ॥

১ অ। প্র: পুনঃ।

বড়ার ঝিআরী বড়ার বৌহারী আহ্মে আইহনের রাণী।
আহ্মে বাঁশী। চোরায়িল কাহ্নাঞি মুখে আন হেন বাণী॥ ৩॥
আহ্মে সে তোহ্মার সকল বেভার রাধা জাণোঁ ভালমতেঁ।
তেঁসি পুছি আহ্মে তোহ্মার থানে বাঁশী নিলেঁ কোণ ভিতে॥ ৪॥
মিছা বোল তেজ সুন্দর কাহ্নাঞি সত্য কর পরমাণে।
আহ্মে যত বড় মন্দ লোক কাহ্ন তাক সখিজন জাণে॥ ৫॥
না বোল না বোল নাগরী রাধা মোরে হেন দুষ্ট বাণী।
এথাঞি আহ্মার তোহ্মে নিহ্মে বাঁশী সকল লোকে ভালেঁ জাণী॥ ৬॥
তেজিআঁ সংশয় কর পরতয় কাহ্নাঞি মোর বচনে।
কোন কাজেঁ তোর বাঁশী হরিআঁ আমান করিব আহ্মে॥ ৭॥
যত আলঙ্কার বহুমূল সার সব রাধা মোর নে।
সুবন্নে জড়িত হিরাঞঁ রচিত বাঁশীগুটি মোরে দে॥ ৮॥
নাহিঁ বোলোঁ তোরে কপট উত্তরে সত্য বুঝিলোঁ দামোদরে।
মোঞঁ নাহিঁ নেওঁ তোহ্মার বাঁশী ঝগড় না কর মোরে॥ ৯॥
নটকী গোআলী ছিনারী পামরী সত্যে ভাষ নাহিঁ তোরে।
তোঞঁ নিলী বাঁশী গাইল চণ্ডীদাস দেবী বাসলীর বরে॥ ১০॥

রাধার উক্তি: তোমার পিতা নন্দগোপ, তোমার মাতা যশোদা, জগতের লোক তাঁহাদের জানে। তাঁহাদের পুত্র হইয়া, হে দামোদর, আমাকে বৃথা চুরির অপবাদ দিতেছ কেন॥ ১॥ কৃষ্ণের উক্তি: এখানেই বাঁশিটি মাথায় দিয়া আমি শুইয়াছিলাম; আর তুমি জল ভরিতে আসিয়া বাঁশিটি লইয়া গেলে॥ ২॥ রাধার উক্তি: আমি বড় মানুষের কন্যা, বড় মানুষের স্ত্রী, স্বয়ং আইহনের পত্নী আমি। আমি তোমার বাঁশি চুরি করিয়াছি—এমন কথা তুমি মুখে আনিবার স্পর্ধা কর॥ ৩॥ কৃষ্ণের উক্তি: আমি তো তোমার সকল ব্যবহারই ভাল করিয়া জানি; তাই রাধা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বাঁশিটি কখন লইলে॥ ৪॥ রাধার উক্তি: হে কৃষ্ণ, মিথ্যা কথা না বলিয়া সত্যের উপর নির্ভর কর। আমি কত মন্দ লোক তাহা আমার সখীরা জানে॥ ৫॥ কৃষ্ণের উক্তি: নাগরী রাধা আমাকে এমন দুষ্ট বাক্য বলিও না। এখানেই তুমি আমার বাঁশি লইয়াছ সকলে তাহা জানে॥ ৬॥ রাধার উক্তি: হে কৃষ্ণ, তুমি নিঃসংশয় হইয়া আমার কথায় বিশ্বাস কর। তোমার বাঁশি চুরি করিয়া আমি কেন মিছামিছি অস্বীকার করিব॥ ৭॥ কৃষ্ণের উক্তি: আমার যত বহুমূল্য রত্ন-আভরণ, হে রাধা, তুমি সব লও, কেবল সোনার পাত জড়ানো হীরার কাজ করা আমার সেই বাঁশিটি ফেরত দাও॥ ৮॥ রাধার উক্তি: হে দামোদর, তোমাকে ছলনা করি নাই, সত্য সত্যই বলিতেছি, তোমার বাঁশি আমি লই নাই। আর বৃথা আমাকে জ্বালাতন করিও না॥ ৯॥ কৃষ্ণের উক্তি: প্রগল্‌ভা পাপীয়সী তুমি, নটিনীর মত ছলনায় পটু, সত্য কথা তোমার মুখ দিয়া বাহির হয় না। বাঁশি তুমিই লইয়াছ। চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ১০॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কোণ আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ॥ ১॥
বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি।
আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী॥
কান্ধে কুরুআ লঅঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ॥ ২॥
ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি দহতে পেলায়িবোঁ।
যোগিনীরূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ॥
আনলকুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ।
কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাইআঁ মরিবোঁ॥ ৩॥
বোলওঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ করিআঁ করুণে।
লোটাআঁ ভূমিত ধরী তোহ্মার চরণে॥
কিসক কাহ্নাঞিঁ মোক দেহ হেন দোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধার উক্তি: কোন্ অশুভক্ষণে যাত্রা করিলাম কে জানে? হাঁচি টিকটিকির বাধা মানি নাই, হোঁচট খাইয়াও অগ্রাহ্য করিয়াছি। শূন্য কলসী লইয়া সখীরা সম্মুখে যাইতেছিল। বামের শিয়াল ডাহিনে যাইতেও দেখিয়াছিলাম॥ ১॥ হায় হায় বড়াই, বাঁশির জন্য এ আমার কি হইল? শ্রীকৃষ্ণ যে ধৌত ক্ষতে বিষের জ্বালা জ্বালিলেন॥ ধ্রু॥ পথে কিছুদূর গিয়া এক ব্যাধকে দেখিয়াছিলাম। হাতে খর্পর লইয়া এক যোগিনী ভিক্ষা করিতেছিল, কাঁধে তৈলপাত্র লইয়া এক তৈলিক আগে আগে যাইতেছিল, শুকনা ডালে বসিয়া কাক ডাকিতেছিল—এই সব অশুভ চিহ্ন চোখে পড়িয়াছিল॥ ২॥ বড়াই, ঘৃত দধি দুধ সব জলে ফেলিয়া দিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইব বা অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জন দিব। নহিলে শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিষ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব॥ ৩॥ হে কৃষ্ণ, তোমার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমাকে বৃথা অপবাদ দিও না। চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কিসক নাগরী রাধা যোড়সি কান্দনে।
তিরীকলা পাতি ভাণ্ডিবারেঁ চাহ কাহ্নে॥

সপ্ত লাখের মোর চুরী করি বাঁশী।
না জাণো বাঁশীর সুধী আপণে বোলসী ॥ ১ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ বাঁশী দেহ মোরে আণী।
যবেঁ তোর পরাণ না লৈব চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
সব আভরণ তোর কাঢ়িআঁ লইবোঁ।
বাঁশীত লাগিআঁ তোক বান্ধিআঁ রাখিবোঁ ॥
জীবার আশ যবেঁ আছএ তোহ্মার।
ঝাঁট করী বাঁশীগুটী দিআর আহ্মার ॥ ২ ॥
বাঁশী পায়িলেঁ কিছু না বুলিব গদাধর।
আপণার সুখে রাধা জাইহ তোহ্মে ঘর ॥
যবেঁ বা না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আহ্মারে।
এখনী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে ॥ ৩ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ...[১] বাংশী[২] দেহ মোরে।
নহে পাঁচ আবথা করিব আহ্মে তোহ্মারে ॥
এহা সুণী বড়ায়িতে উপজিল হাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : নাগরী রাধা, ক্রন্দন জুড়িয়া দিলে কেন ? তুমি নারী-সুলভ ছলনা দ্বারা আমাকে প্রবঞ্চনা করিতে চাও। আমার সপ্তলক্ষ মূল্যের বাঁশি চুরি করিয়া এখন বলিতেছ বাঁশির খবর কিছুই জান না ॥ ১ ॥ যদি নিজের মঙ্গল চাও তো বাঁশিটি আনিয়া দাও। নহিলে তোমার প্রাণ লইব ॥ ধ্রু ॥ যদি বাঁচিবার আশা থাকে তো অবিলম্বে আমার বাঁশিটি দিয়া দাও নহিলে তোমার সব অলঙ্কার কাড়িয়া লইব, বাঁশির জন্য তোমাকে বাঁধিয়া রাখিব ॥ ২ ॥ বাঁশি পাইলে আর তোমাকে কিছু বলিব না, তুমি নিজের খুশিমত গৃহে চলিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু বাঁশি না দিয়া যদি আমাকে ঠকাইতে চাও তাহা হইলে এখনই তোমার প্রাণ লইব ॥ ৩ ॥ ভাল চাও তো আমার বাঁশিটি দাও নহিলে তোমার পাঁচ অবস্থা করিয়া ছাড়িব। কবির উক্তি : একথা শুনিয়া বড়াইয়ের হাসি পাইল। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

হারায়িল তোহ্মার বাঁশী তেঁসি বড়ায়িতে হাসী
মোর বোল সুণ চক্রপাণী।
বুলী চোর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সত্বর করে
হেন ছুঠ বড়ায়ির বাণী ॥ ১ ॥

১ ছাড়। প্র : রাধা।
২ অ। প্র : বাঁশী।

কিকে কাকুতী করসি চল কাহ্নাঞি
বড়ায়ি নিলে বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
বুঢ়ী বড় আছিদরী ভাণ্ডে তোহ্মা মায়া করী
তার মন বুঝিতেঁ না পারী ।
দুঠ মন মিঠ[১] দেখে আত্ম সম পর দেখে[২]
চাহা বাঁশী তাহাক মুরারী ॥ ২ ॥
দেখি তোহ্মা আসুখ মোর মণে বড় দুখ
মো কেহ্নে হরিবোঁ তোর বাঁশী ।
তোহ্মেঞিঁ বড় সিআন আপণে গুণিআঁ যান
বড়ায়ি পরক বিনাসী ॥ ৩ ॥
আহ্মার বোল পরমান তাক না করিহ আন
চল তোহ্মে বড়ায়ির পাশে ।
বাঁশীর তত্ব কহিল আহ্মে দোষ এড়ায়িল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : তোমার বাঁশি হারাইয়াছে বলিয়া বড়াই হাসিতেছে। হে চক্রপাণি, আমার কথা শোনো। বড়াইয়ের কথাবার্তা ভাল নয়, বড়াই একদিকে চোরকে ডাকিয়া ঘরে ঢোকায় আর অন্যদিকে গৃহীকে সজাগ করিয়া দেয় ॥ ১ ॥ কেন এত মিনতি করিতেছ, যাও বড়াইকে ধর, বড়াই-ই বাঁশি লইয়াছে ॥ ধ্রু ॥ বুড়ী বড় চতুরা, ছলনার দ্বারা তোমাকে প্রবঞ্চিত করিতেছে, উহার মন বোঝা যায় না। বুড়ী সকলকে নিজের মত খারাপ ভাবে। হে মুরারি, তুমি উহারই কাছে বাঁশি চাও ॥২॥ আহা, তোমাকে অসুখী দেখিয়া আমারও মনে সুখ নাই, আমি কেন তোমার বাঁশি লইতে যাইব ? তুমি তো জ্ঞানবান্, তুমি নিজেই গণনা করিয়া দেখ না, বুঝিতে পারিবে বড়াই লোকের সর্বনাশ করিয়া বেড়ায় ॥ ৩ ॥ আমার কথা বিশ্বাস কর, যাহা বলি অন্যথা করিও না, বুড়ীর কাছে গিয়া বাঁশিটি চাও। বাঁশির সন্ধান তোমাকে বলিয়া দিলাম, আমি দোষ হইতে মুক্ত হইলাম। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

তোঁ বড়ায়িক দেসি দোষে বড়ায়ি তোহ্মাক দোষে
সব মোর করমের ফল ।
দুইঁার কপট হাসী চোরাআঁ আহ্মার বাঁশী
রাধা মোক না কর বিকল ॥ ১ ॥

১ অ। প্র: মিছ।
২ অ। প্র: লেখে।

কেহ্নে আমান করসী।
আহ্মে জাণী তোহ্মে নিলেঁ বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
তোরে বোলোঁ চন্দ্রাবলী আকুল মো বনমালী
তোহ্মে কৈল চুরী মোর বাঁশী।
কথাঁ নিআঁ বাঁশী এড়ি মিছাঞিঁ[১] দোষসি বুঢ়ী
হৃদয়ত ভয় না মানসী ॥ ২ ॥
কহ তোঁ আহ্মার থানে কিবা আছে তোর মনে
দুখ দেহ মোরে কি কারণে।
বাঁশী দেহ একবার মাণিবোঁ উপকার
এহাত না কর তোহ্মে আনে ॥ ৩ ॥
দৈবেঁ মোক নিন্দ পাইল তোহ্মে এথাঁ বাঁশী নিল
বাঁশী দেহ না কর নিরাশ।
দেবী বাসলীচরণ করী শিরে বন্দন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি: তুমি বড়াইয়ের দোষ দাও, বড়াই আবার তোমার দোষ দেয়, সবই দেখিতেছি আমার কর্মের ফল। দুইজনেই ছলনা করিয়া হাসিতেছ। রাধা, আমার বাঁশি চুরি করিয়া কেন আমাকে ব্যাকুল করিতেছ ॥ ১ ॥ কেন অস্বীকার করিতেছ। আমি জানি তুমিই আমার বাঁশি লইয়াছ ॥ ধ্রু ॥ হে চন্দ্রাবলী, তোমাকে বলি শোনো, তুমিই আমার বাঁশি লইয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ। বাঁশিটি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া এখন মিছামিছি বড়াইয়ের দোষ দিতেছ। হৃদয়ে তোমার একটুও ভয় নাই ॥ ২ ॥ আমাকে ঠিক করিয়া বলো তো তোমার অভিপ্রায় কি? কেন আমাকে দুঃখ দিতেছ? আমার কথা অমান্য করিও না, বাঁশিটি ফিরাইয়া দাও, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব ॥ ৩ ॥ দৈবক্রমে আমার ঘুম আসিল আর তুমি এই সুযোগে বাঁশিটি লইলে। আমি মিনতি করিয়া বলি বাঁশিটি ফিরাইয়া দাও, আমাকে নিরাশ করিও না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।
জল মাঝে দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী ॥
পূর্ণ কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ॥ ১ ॥
জাণি মেণ আল বড়ায়ি কাহ্নের কাঁহিণী।
কলঙ্ক থুয়িল মোর বাঁশীচুরণী ॥ ধ্রু ॥

১ অ। প্র: মিছাঞি।

গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ॥
খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ।
তেকারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ॥ ২॥
চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ ছুয়ি আখী॥
যবেঁ মো চুরী কৈলোঁ হআঁ নারী সতী।
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী॥ ৩॥
এখণে আছিল বাঁশী তোহ্মার এই ঠাএ।
আগু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাএ॥
আহ্মে বাঁশী নাহিঁ নীএ শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

রাধার উক্তি : ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথির রাত্রিকালে আমি কি জলের মধ্যে চন্দ্রের ছায়া দেখিলাম, না পূর্ণ কলসে হাত ভরিলাম যে তুমি, হে জগন্নাথ, আমাকে বাঁশি চুরির অপবাদ দিতেছ॥ ১॥ বড়াই, কৃষ্ণের কাহিনী আমার সব জানা আছে, আমার নামে কৃষ্ণ বাঁশি চুরির অপবাদ আরোপ করিলেন॥ ধ্রু॥ আমি কি গুরুর আসনে বসিয়া পড়িলাম, না ভূমিতলে জলের অক্ষর অঙ্কিত করিলাম অথবা ভাঙা পাখার বাতাস গায়ে লাগাইলাম? সেই কারণেই কি কৃষ্ণ বাঁশি চুরির অপবাদ দিতেছেন॥ ২॥ চন্দ্র সূর্য বায়ু বরুণ সব দেবতাকে সাক্ষী মানিয়া বলিতেছি, যে তোমার বাঁশি লইয়াছে সে দুই চোখ খাউক। আমি যদি সতী রমণী হইয়া চুরি করিয়া থাকি তাহা হইলে আজ রাত্রিকালেই কালসাপে খাইবে॥ ৩॥ বাঁশি তো এখনই তোমার কাছে ছিল, আগে যে গোপকন্যা গেল সেই হয়তো লইয়া গেল। হে মধুসূদন, তোমাকে জানাইয়া দিলাম আমি তোমার বাঁশি লই নাই। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪॥

রাধা[১] বৃদ্ধাং ভৃশং শুদ্ধাং বিমৃষ্য কৃতকৈতবাং।
বঞ্চনং কুরুষে জন্মে সর্ব্বং তদ্বিদিতং মম॥

রাধা, বিশুদ্ধস্বভাবা বড়াইকে তুমি যে মিথ্যা করিয়া ছলনাকারিণী বলিয়া আমাকে ঠকাইতেছ তাহা আমার বেশ জানা আছে।

রামগিরীরাগঃ॥ একতালী॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

গাই রাখিতেঁ নিন্দ গেলোঁ বাঁশী মাথে।
সে না বাঁশী আল রাধা নিলী কোণ ভিতে॥ ১॥
নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে॥ ২॥

---

১ অ। প্র: রাধে।

এথাঞি আছিল বাঁশী সন্ধ্যার বিদিতে।
সে না বাঁশী রাধা মোর নিলেঁ কোণ ভিতে ॥ ৩ ॥
বিচারিআঁ চাহ মোর দধির পসারে।
কথা বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে ॥ ৪ ॥
না বোল না বোল রাধা হেন দুঠবাণী।
তোহ্মে বাঁশী চোরায়িলেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী ॥ ৫ ॥
চান্দ সুরুজ মোর আছে তুয়ি সাখী।
আহ্মা মিছা দোষ কাহ্ন খাইবি দুঈ আখী ॥ ৬ ॥
সপ্ত লাখের মোর বাঁশী করী চুরী।
আত্রো গালী দেহ মোরে রাধিকা নাগরী ॥ ৭ ॥
ঘৃত দুধ নঠ মোর ঘোলের পসার।
গোহারী করিবোঁ রাজা কংসের দুআর ॥ ৮ ॥
তোর কংশাসুরক নাহিঁক মোর ডরে।
হের ধরিলোঁ বলে তোহোর আঞ্চলে ॥ ৯ ॥
মিছা চুরীদোষ দিআঁ জাইতেঁ দেহ বাধা।
আজী কৈলি আথান্তর করিবেক রাধা ॥ ১০ ॥
বিণি বাঁশী দিলেঁ তোর নাহিক গমনে।
এহা বুঝী কর মোরে বাঁশীগুটি দানে ॥ ১১ ॥
সত্যেঁ নাহিঁ নেওঁ বাঁশী তোর গদাধর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : আমি গোরু চরাইতে গিয়া বাঁশি মাথায় দিয়া যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম তখন তুমি কোন্ ফাঁকে আসিয়া সেই বাঁশিটি চুরি করিয়া লইলে ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি : হে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে বলি, বাঁশি আমি লই নাই। তুমি নিজেই কোথায় বাঁশি হারাইয়া আমাকে দোষ দিতেছ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : সকলে জানে বাঁশিটি এখানেই ছিল, সে বাঁশি তুমি কখন লইয়া গিয়াছ ॥ ৩ ॥ রাধার উক্তি : আমার দধির পসরা খোঁজ করিয়া দেখ না। নিজেই কোথায় বাঁশি হারাইয়াছ, এখন আমাকে দোষ দিতেছ ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : এমন মিথ্যা কথা বলিও না। তুমিই যে বাঁশি চুরি করিয়াছ তাহা আমি ভাল করিয়া জানি ॥ ৫ ॥ রাধার উক্তি : চন্দ্র সূর্য আমার সাক্ষী আছে। আমায় যদি মিথ্যা দোষ দাও তাহা হইলে দুই চোখ খাইবে ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : রাধা, একে তো সপ্তলক্ষের বাঁশিটি চুরি করিয়াছ। তাহার উপর আবার আমাকে গালি দিতেছ ॥ ৭ ॥ রাধার উক্তি : আমার ঘৃত দুগ্ধ ও ঘোলের পসার নষ্ট হইয়া গেল। আমি রাজা কংসের নিকটে গিয়া অভিযোগ করিব ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : তোমার কংসাসুরকে আমি ভয় করি না। এই দেখ আমি জোর করিয়া তোমার অঞ্চল ধরিলাম ॥ ৯ ॥ রাধার উক্তি : মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়া আমার

যাইতে বাধা দিতেছ। আজ বলিয়া দিলাম আমি কিন্তু বিপদ্ বাধাইব ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: বাঁশি না পাইলে পথ ছাড়িব না। ইহা বুঝিয়া বাঁশিটি দিয়া দাও ॥ ১১ ॥ রাধার উক্তি: গদাধর, সত্য বলিতেছি তোমার বাঁশি আমি লই নাই। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১২ ॥

নিপীয় রাধাবচনং নিষেধপরুষাক্ষরং।
বংশীমুদ্দিশ্য কংশারি[১]র্বিললাপ নিরন্তরং ॥

রাধার মুখ হইতে অস্বীকৃতিমূলক নিষ্ঠুর বচন শুনিয়া কংসারি শ্রীকৃষ্ণ বংশীর জন্য নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সুন্ধ সুবর্ণে শোভিত আহ্মার বাঁশী
নাল বিন্ধিল[২] তার বাহিরে।
অ প্রাণ।
সুণিআঁ কি বুলিহে বলভদ্র ভাই
বাঁশী হারায়িলোঁ মো শিঅরে ॥ ১ ॥
অ প্রাণ ধরণ না জাএ সুন্দরি রাধে।
কে না নিল মোহন বাঁশী ॥ ধ্রু ॥
ঋগ যজু সাম আথর্ব্ব
চারী বেদ গাওঁ মো বাঁশীর সরে।
সুণী সব দেবগণে কি বুলিহে আহ্মারে
কে না নীল বাঁশী সিঅরে ॥ ২ ॥
হার কেয়ূর রাধা সব মোর নে।
বাঁশীগুটি আণী মোক দে।
বনমালা আভরণ তাহা তোক দিবোঁ।
যে বোলসি তাহাক করিবোঁ ॥ ৩ ॥
তোহ্মে মোর বাঁশী নিলে সুন্দরি ধা[৩]
মোর মনে হেন পড়িহাহে[৪]।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ।
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ প্র: কংসারি।
২ অ। প্র: বান্ধিল।
৩ অ। প্র: রাধা।
৪ অ। প্র: পড়িহাসে।

কৃষ্ণের উক্তি : আমার বাঁশি শুদ্ধ সুবর্ণে শোভিত। আমি তাহার বাহিরে নাল লাগাইয়াছি। সেই বাঁশি আমার শিয়র হইতে হারাইয়া গেল। হায়, এ কথা শুনিয়া বলভদ্র ভাই কি বলিবে ॥ ১ ॥ হায় রাধা, আমার ওই মোহন বাঁশি কে লইল? আমি যে প্রাণ ধরিতে পারিতেছি না ॥ ধ্রু ॥ বাঁশির সুরে আমি ঋগ্ সাম যজু অথর্ব চারি বেদ গান করি। সেই বাঁশি শিয়র হইতে কে লইয়া গেল? এ কথা শুনিয়া দেবগণই বা কি বলিবে ॥ ২ ॥ রাধা, আমার হার লও, আমার কেয়ূর লও, আমার যাহা কিছু আছে সব লও। আমার বনমালা, আমার আভরণ সব তোমাকে দিব, তুমি যাহা বলিবে তোমার জন্য তাহাই করিব। শুধু আমার বাঁশিটি আমাকে আনিয়া দাও ॥ ৩ ॥ আমি মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছি, সুন্দরী, তুমিই আমার বাঁশি লইয়াছ। আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনাক আইলোঁ নীতেঁ পাণী। আল।
তোর বাঁশী সুধিহো না জাণী ॥ কাহ্নাঞিঁ হে ॥
হআঁ তোহ্মে দেব চক্রপাণী। আল।
কেহ্নে বোল হেন দুষ্টবাণী ॥ ল কাহ্নাঞিঁ হে ॥ ১ ॥
শিঅরে হারায়িআঁ তোহ্মে বাঁশী।
মিছা কেহ্নে আহ্মারে দোষসি ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
হয়িল মোর এতেক বএসে।
কেহো নাহিঁ দিল চুরীদোষে ॥
সব লোক মোরে ভালেঁ জাণে।
চুরিণী হয়িলাহোঁ তোর থানে ॥ ২ ॥
আতি রতিবেআকুল হআঁ।
কমণ তিরীক বাঁশী দিআঁ ॥
সাধিলেহেঁ আপণার কাজে।
আহ্মা কেহ্নে দোষ দেবরাজে ॥ ৩ ॥
সরূপেঁ বুয়িলোঁ মো কাহ্নাঞিঁ।
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ পাই ॥
যাক দিলেঁ চল তার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : হে কৃষ্ণ, আমি যমুনায় জল লইতে আসিয়াছি, তোমার বাঁশির কোনো সংবাদই জানি না। তুমি স্বয়ং চক্রপাণি হইয়া এমন নিষ্ঠুর কথা কেন বলিতেছ ॥ ১ ॥ শিয়রের বাঁশি হারাইয়া তুমি আমাকে মিথ্যা দোষ দিতেছ কেন ॥ ধ্রু ॥ আমার এত বয়স হইল কেহ কখনো চুরির অপবাদ দেয় নাই। সকল লোকই আমাকে ভাল করিয়া জানে,

কেবল তোমার কাছেই চোর হইলাম ॥ ২ ॥ অতিশয় মদনব্যাকুল হইয়া নিশ্চয় কোনো রমণীকে বাঁশিটি দিয়া কামনা চরিতার্থ করিয়াছ। এখন হে দেবরাজ, কেন বৃথা আমাকে দোষ দিতেছ ॥ ৩ ॥ তোমাকে প্রকৃত কথা বলিতেছি, তোমার বাঁশি আমি পাই নাই। বাঁশি যাহাকে দিয়াছ তাহার কাছে যাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কহুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণহ আইহনদাসী তোঁ মোর চোরায়িলি বাঁশী
তেঁসি তোর পাছে বেড়ায়িএ।
বাঁশীগুটি দেহ যবেঁ বড় পুন পাহ তবেঁ
বাঁশী পাইলেঁ সুখেঁ ঘর জাইএ ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥
সুণহ নটক কাহ্ন কেহ্নে কর আপমান
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ নীএ।
বাঁশী যবেঁ পাইএ তবেঁ ঘসি ঘাটিএ
চারি চীর করি বা পোড়াইএ ॥ ২ ॥
সগ্‌র্গ মর্ত্য পাতালে চিন্তিআঁ চাহিলোঁ মনে
তোঁ মোর নিআছিস বাঁশী।
উচিতেঁ গরুঅ মনে তোএঁ মুচুকে হাসী
তাক দেহ আইহনের দাসী ॥ ৩ ॥
পাণ্ডরে হারাআঁ বাঁশী মোর থানে খোজসি
এহা না সহে মোর পরাণে।
হেন যবেঁ বোলে আন কাটোঁ তার নাক কান
তোহ্মা তেজোঁ ভাগিনা কারণে ॥ ৪ ॥
বাপ বসুল মোর মাঅ দৈবকী ল
সব দেবেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে।
গোআলার ঝি তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী ল
ধিক বোল মোক কি কারণে ॥ ৫ ॥
আহ্মে ত আইহনদাসী আহ্মাতে চাহসি বাঁশী
সুণী তোক রোষিব কাঁশে।
তোহ্মে কাহ্ন বারেঁ বারেঁ ধিক বোল মোর থানে
ফল পাইবেঁ আপনার দোষে ॥ ৬ ॥
না বোল নিঠুর বাণী আহ্মে দেব চক্রপাণী
দেহ মোরে বাঁশীর আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : আইহনঘরণী রাধা, তোমাকে বলি শোনো। তুমিই আমার বাঁশি চুরি করিয়াছ তাই তোমার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বাঁশিটি আমায় ফিরাইয়া দাও, তোমার অনেক পুণ্য হইবে। বাঁশি পাইলে আমিও খুব সুখী হইয়া ঘরে চলিয়া যাই ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি : হে নটবর শ্রীকৃষ্ণ, কেন আমাকে অপমান করিতেছ? তোমার বাঁশি আমি লই নাই। তোমার বাঁশি পাইলেও তাহা দিয়া ঘসি ঘাঁটিতাম, নহিলে চারি ফালি করিয়া পুড়াইয়া দিতাম ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : স্বর্গ মর্ত্য পাতাল খোঁজ করিয়া এখন মনে মনে বুঝিয়াছি আমার বাঁশি তুমিই লইয়াছ। হে আইহনপ্রিয়া, প্রসন্ন মনে স্মিত মুখে সেই বাঁশি আমাকে ফিরাইয়া দেওয়াই তোমার কর্তব্য ॥ ৩ ॥ রাধার উক্তি : প্রান্তরে বাঁশি হারাইয়া আমার কাছে বাঁশির খোঁজ করিতেছ ইহা আমার প্রাণে সহ্য হয় না। এমন কথা যদি আর কেহ বলিত তবে তাহার নাক কান কাটিয়া দিতাম, তুমি নিতান্তই ভাগিনা বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : বসুদেব আমার বাবা, দৈবকী আমার মা। সব দেবতা আমাকে ভালভাবে জানে। গোপকন্যা চন্দ্রাবলী, তুমি আমাকে গালি দিতেছ কি কারণে ॥ ৫ ॥ রাধার উক্তি : আমি আইহনের দাসী, আমার কাছে যে বাঁশি চাহিতেছ তাহা শুনিলে কংস ক্রুদ্ধ হইবেন। হে কৃষ্ণ, তুমি যে বারংবার আমাকে দুর্বাক্য বলিতেছ নিশ্চয় সেই অপরাধের ফল পাইবে ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : আমি স্বয়ং দেবচক্রপাণি। হে রাধা, আমাকে এমন নিষ্ঠুর বাক্য বলিও না। বাঁশি ফিরিয়া পাইব, এই ভরসা আমাকে দাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৭ ॥

নিরাসসবনেনাহং রাধায়া[১] বিকলীকৃতঃ।
বংশলাভায় বৃদ্ধে ত্বমুপায়ং বদ সংপ্রতি ॥

বড়াই, রাধা নিরাশবচনে আমাকে বিফল করিয়াছে। এখন তুমি বলো কি উপায় করিলে বাঁশিটি ফিরিয়া পাই।

গুঞ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥

ষোল শত রাধার সঙ্গিণী। আল।
তার থান চলহ আপুণী ॥ ল কাহ্নাঞি।
একেঁ একেঁ কর যোড়হাথে। আল।
তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ১ ॥
কত কান্দ নেতে[২] মোছ লোহে। আল।
আন্তর পোড়এ মোর নেহে ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥

১ অ। প্র: রাধয়া।
২ 'নে' ভোলাপাঠে।

আহ্মে হরি ত্রিভুবনে জাণী। আল।
আহ্মা লঞাঁ পুরাণ বাখানী॥ ল বড়ায়ি॥
ত্রিদশগণের আহ্মে নাথ। আল।
কেমণে করিব যোড়হাত॥ ল বড়ায়ি॥ ২॥
এত বড় মোর আপমাণে। আল।
সুণি কি বুলিব দেবগণে॥ ধ্রু॥
সুণ তোহ্মে নান্দের কুমার।
নিজ কাজে বিকল সংসার॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥
যোড়হাথে বুলিহ বচনে।
সুখী হইব রাধার মণে॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ৩॥
কেহ্নে তোঞঁ কাজ না বুঝসি।
তণ্ডী কয়িলেঁ না পাইবেঁ বাঁশী॥ ধ্রু॥
যোড় হাথ করিলেঁ বড়ায়ি।
তবেঁ কি দিবেক বাঁশী রাহী॥
পাছে জনি লোক উপহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥
হের গিআঁ তোহ্মার বচনে।
হাথ যোড় করে দেব কাহ্নে॥ ধ্রু॥

বড়াইর উক্তি : হে কৃষ্ণ, রাধার যে ষোলশত সঙ্গিনী আছে তুমি তাহাদের নিকট গিয়া প্রত্যেকের কাছে জোড়হাত কর। তাহা হইলে হে জগন্নাথ, ওই বাঁশি তুমি ফিরিয়া পাইবে॥ ১॥ হে কৃষ্ণ, আর কত কাঁদিবে? নেত্রবস্ত্রে চোখের জল মুছিয়া ফেল। তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি বেদনাবোধ করিতেছি॥ ধ্রু॥ কৃষ্ণের উক্তি : বড়াই, ত্রিভুবনের অধিবাসী আমাকে জানে। আমাকে লইয়াই পুরাণের ব্যাখ্যান। আমিই দেবতাগণের অধীশ্বর। আমি কি করিয়া হাতজোড় করিব॥ ২॥ আমার এই অপমানের কথা শুনিয়া দেবতারাই বা কি বলিবেন॥ ধ্রু॥ বড়াইর উক্তি : হে নন্দনন্দন, তোমায় বলি শোনো। সকল সংসারই নিজের কাজ উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই বলি তুমি জোড়হাত করিয়া বাঁশির কথা বলো। রাধা মনে মনে খুশী হইবে॥ ৩॥ কার্যসিদ্ধির উপায় বুঝিতে পার না কেন? বেশী তম্বি করিলে বাঁশি পাইবে না॥ ধ্রু॥ কৃষ্ণের উক্তি : আচ্ছা বড়াই, আমি যদি জোড়হাত করি, তাহা হইলে রাধিকা নিশ্চয় বাঁশি দিবে তো? পাছে লোকে উপহাস করে এই ভয় হয়। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪॥ এই দেখ তোমার কথায় গিয়া আমি স্বয়ং দেব-শ্রীকৃষ্ণ হাতজোড় করিলাম॥ ধ্রু॥

প্রমুক্তকাকুবচনং কৃতসংঘতলং পুরঃ।
বিলোক্য মাধবং বৃদ্ধা রাধিকামিদমাদধে॥

মাধবকে করযোড়ে মিনতি করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা রাধিকাকে এই কথা বলিল।

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে।
ঝরে তার পাণী নয়নে গো ॥
কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে।
কত তার দেখিবোঁ দুখে গো ॥ ১ ॥
বাঁশীর শোকেঁ চক্রপাণী।
এবেঁ বাঁশী দেহ বাঁশী আনী[১] ॥ ধ্রু ॥
যোড়হাথ কৈল দেব কাহ্নে।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ দানে ॥
নাহিঁ পিন্ধে উত্তম বসনে।
শরীরে দুবল ভৈল কাহ্নে ॥ ২ ॥
মোর বোল সুণ আবগাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর রাহী ॥
দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে।
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে ॥ ৩ ॥
যে বা রাধা আছে তোর মণে।
কাহ্নাঞিঁকে বোল সে আপণে ॥
তাক করিব কাহ্নাঞিঁ হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি : আষাঢ় শ্রাবণের মেঘে যেমন বর্ষণ হয় শ্রীকৃষ্ণের নয়নে সেইরূপ অশ্রুধারা ঝরিতেছে। হায়, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মুখ মলিন হইল, তাঁহার আর কত দুঃখ দেখিব ॥ ১ ॥ বাঁশির শোকে চক্রপাণি কাতর। এবার তাঁহাকে বাঁশিটি আনিয়া দাও ॥ ধ্রু ॥ শ্রীকৃষ্ণ করযোড়ে বাঁশি চাহিয়াছেন, এবার তাঁহার বাঁশিটি দাও। তিনি উত্তম বসন পরিধান করিতেছেন না। তাঁহার শরীর দুর্বল হইয়া গিয়াছে ॥ ২ ॥ রাধা, আমার কথা মন দিয়া শোনো। শ্রীকৃষ্ণের সহিত এবার প্রীতি করো। তাঁহার হাতে বাঁশিটি ফিরাইয়া দাও, দেব জগন্নাথ সন্তুষ্ট হউন ॥ ৩ ॥ রাধা তোমার মনে যাহা কিছু আছে তুমি নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে খুলিয়া বলো। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় আনন্দিত মনে তোমার কথা শুনিবেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বৃদ্ধাবচনমাকর্ণ্য রাধা প্রাহ গদাধরং।
সাদরং সপ্রবন্ধঞ্চ পঞ্চবাণশরাতুরা ॥

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া মদনকাতরা রাধা সাদরে এবং চাতুরী সহকারে গদাধরকে এই কথা বলিলেন।

---

১ অ। প্র : এবেঁ তাক বাঁশী দেহ আনী।

শৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বুলিতেঁ নারিএ তোর চরিতে।
খনেকেঁ তোর হএ আন চিতে ॥
এবেঁ করিলেঁ তোহ্মে যোড় হাথ।
কাজ বুঝিআঁ দেব জগন্নাথ ॥ ১ ॥
সরূপেঁ বোলহ বড়ায়ির থানে।
মোর বোল না করিবেঁ কি আনে ॥ ধ্রু ॥
আহ্মাক এড়িআঁ গেলা বৃন্দাবনে।
বাঁশী বাজায়িলেঁ তোহ্মে থানে থানে ॥
তাক শুণী ভৈলোঁ বেআকুলী।
তোর বিরহে প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥
এভোঁ কাহ্নাঞিঁ থীর কর মন।
কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোর বচন ॥
তবেঁ মেলিবেক বাঁশী তোহ্মারে।
সরূপেঁ তোক বুইলোঁ দামোদরে ॥ ৩ ॥
কভোঁ কি না দিবে আহ্মাক দুখে।
এহা বোল আপণ মুখে ॥
তবেঁ কহিবোঁ মো বাঁশী উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে পারি না। ক্ষণে ক্ষণে তোমার মতি পরিবর্তিত হয়। এখন কাজ বুঝিয়া, হে জগন্নাথ, তুমি হাত জোড় করিলে ॥ ১ ॥ সত্য করিয়া বড়াইয়ের কাছে বলো তো দেখি যে আর কখনো আমার কথা অমান্য করিবে না ॥ ধ্রু ॥ তুমি আমাকে ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গেলে আর স্থানে স্থানে বাঁশি বাজাইয়া ফিরিলে। হে বনমালী, আমি তাহা শুনিয়া তোমার বিরহে ব্যাকুল হইলাম ॥ ২ ॥ হে কৃষ্ণ, এখনো মন স্থির করিয়া বলো কখনো আমার বাক্য লঙ্ঘন করিবে না। তবেই বাঁশি পাইবে। এই কথা সত্য করিয়া বলিলাম ॥ ৩ ॥ নিজের মুখে বলো আর কখনো আমাকে দুঃখ দিবে না, তবেই বাঁশির উদ্দেশ বলিব। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ।
বংশীলাভত্বরাবেশাজ্জগাদ জরতীমিদং ॥

রাধিকার বাক্য শুনিয়া প্রমোদিতমনা শ্রীকৃষ্ণ বংশীলাভের জন্যে ঔৎসুক্যবশতঃ বড়াইকে বলিলেন।

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

মন দিআঁ শুণ বড়ায়ি বচন আহ্মার
সরূপ কহিবোঁ তোর থানে। বড়ায়ি গো।
যে বচন বুইল রাধা তোহ্মার গোচরে
তাক মোএঁ না করিবোঁ আনে ॥ বড়ায়ি গো ॥ ১ ॥
পরাণ বড়ায়ি তোহ্মে বোলহ রাধারে।
বাঁশী দিআঁ জীআউক মোরে ॥ ধ্রু ॥
যত কিছু করিলোঁ মোএঁ রাধার আতোষে।
তার ফল পাইলোঁ নিজ দোষে ॥
মণে গুণিআঁ এবেঁ কৈলোঁ মোএঁ সার।
না লঙ্ঘিব বচন রাধার ॥ ২ ॥
তোহ্মে জাণহ বড়ায়ি মোহোর বেভার।
অবিচল বচন আহ্মার ॥
এহা সরূপ জাণী বুঝাহ রাধারে।
বাঁশীগুটি দেউক আহ্মারে ॥ ৩ ॥
আহ্মার চরিত্র বিদিত তোর থানে।
আর তাক কেহো নাহিঁ জাণে।
রাধার বচন আহ্মে পালিব আবসে।
বাসলী বন্দী[১] গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি: বড়াই, মন দিয়া আমার কথা শোনো। আমি তোমার কাছে প্রকৃত কথা বলিব। রাধা তোমার সম্মুখে যে কথা বলিল আমি তাহার অন্যথা করিব না ॥ ১ ॥ বড়াই, তুমি রাধাকে বলিয়া দাও বাঁশিটি দিয়া সে আমার প্রাণ রক্ষা করুক ॥ ধ্রু ॥ রাধার অসন্তোষজনক যাহা কিছু করিয়াছি তাহার ফল পাইয়াছি। ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির করিলাম, রাধার কথা আর কখনো লঙ্ঘন করিব না ॥ ২ ॥ বড়াই, তুমি তো আমার স্বভাব জান, আমার কথার কখনো অন্যথা হয় না। ইহা সত্য জানিয়া রাধাকে বুঝাইয়া বলো, সে আমার বাঁশিটি দিক ॥ ৩ ॥ আমার চরিত্র আর কেহ না জানিলেও তুমি জান। রাধার বাক্য অবশ্যই পালন করিব। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
মধুরং মাধবং প্রাহ রাধিকাধিমতী সতী ॥

বৃদ্ধার মুখে কৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধিকা দুঃখিত মনে মাধবকে মধুর বচনে বলিলেন।

১ অ। প্র: বাসলী শিরে বন্দী।

রামগিরীরাগঃ ॥ বিচিত্র ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কাহ্নাঞিঁ তোর কথা শুণী বড়ায়ির মুখে
কহিতেঁ না পারোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে ॥ ১ ॥
তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী।
তে কারণে তোর বাঁশী নিলো বনমালী ॥ ২ ॥
রাধা।
বিরহে আকুলী ভৈলা আপণার দোষে।
আহ্মার বাঁশী তোঁ চোরায়িলি রোষে ॥ ৩ ॥
আহ্মার খাঁখার যবেঁ না করহ তোহ্মে।
তবেঁ কি বিরহদুখ তোক দিএ আহ্মে ॥ ৪ ॥
কাহ্নাঞিঁ।
যে কারণে খাঁখার তোহ্মার মোএঁ কৈলোঁ।
তেকারণে বিরহ আনলে পুড়ি গৈলোঁ ॥ ৫ ॥
আর কভোঁ চঞ্চল না করিহ মনে।
মোক রোষ না করিহ কাহারো বচনে ॥ ৬ ॥
তোক প্রতি মোর মণে নাহিঁ কিছু রোষে।
এহা তত্ত্ব করী জাণী দেহ মোরে বাঁশে ॥ ৭ ॥
বাঁশী দিআঁ কর মোর মন সোআথ।
সহজেঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ ॥ ৮ ॥
বিরহেঁ আকুলী যবেঁ চাহোঁ মো তোহ্মারে।
তখন আসিহ তোহ্মে আতি আবিচারে ॥ ৯ ॥
হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞিঁ বাঁশী।
আজি হৈতে চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী ॥ ১০ ॥
সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী।
আর তোর অহিত না করে বনমালী ॥ ১১ ॥
হেনমতেঁ বাঁশী পাআঁ হরষিত মণে।
কালী নই তীরে হৈতেঁ ঘর গেলা কাহ্নে ॥ ১২ ॥
পাছে রাধিকা লআঁ বড়ায়ি গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১৩ ॥

রাধার উক্তি : হে কৃষ্ণ বড়াইয়ের মুখে তোমার কথা শুনিয়া যত দুঃখ পাইলাম তাহা বলিতে পারি না ॥ ১ ॥ তোমার বিরহে আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলাম, তাই হে বনমালী, তোমার বাঁশিটি লইয়াছিলাম ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : হে রাধা, তুমি যে বিরহে ব্যাকুল হইয়াছিলে সে তো তোমার নিজের দোষে। আমার বাঁশি তুমি রাগ করিয়া চুরি করিলে ॥ ৩ ॥ আমাকে তুমি যদি যন্ত্রণা না দাও তাহা হইলে কি আমি

তোমাকে বিরহ দুঃখ দিই ॥ ৪ ॥ রাধার উক্তি : হে কৃষ্ণ, আমি যে তোমাকে দুঃখ দিয়াছি তাহার শাস্তিস্বরূপ বিরহবেদনায় দগ্ধ হইয়াছি ॥ ৫ ॥ আর কখনো মন চঞ্চল করিও না। কাহারো কথায় আমার উপরে রুষ্ট হইও না ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : সত্য জানিও, তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র রাগ নাই ॥ ৭ ॥ এখন বাঁশিটি দিয়া আমার মনকে শান্ত করো। তাহা হইলেই সহজেই তোমার প্রতি আমার প্রীতি বৃদ্ধি পাইবে ॥ ৮ ॥ রাধার উক্তি : বিরহে কাতর হইয়া যখন তোমাকে চাহিব তখন তুমি অবিলম্বে চলিয়া আসিবে ॥ ৯ ॥ এই লও, তোমার বাঁশিটি ভাল করিয়া দেখিয়া লও। আজ হইতে চন্দ্রাবলী তোমার দাসী হইল ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : রাধা, তোমার সব দোষ ক্ষমা করিলাম। আর কখনো তোমার অহিত করিব না ॥ ১১ ॥ কবির উক্তি : এইভাবে বাঁশিটি পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টমনে কালিন্দী নদীর তীর হইতে গৃহে গেলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর বড়াই রাধিকাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১৩ ॥

অথ রাধাবিরহঃ

ইত্থং কৃষ্ণগতঃপ্রাণা[১] কথঞ্চিন্নিজসদ্মনি।
নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্ম্মণি ॥
হরিণীহারিনয়না চিরায বিবহে হরেঃ।
জগাদ জরতীমেবং বাধা পঞ্চশরাতুরা।

এইরূপে কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকা কোনো রকমে গৃহকর্ম করিয়া নিজের গৃহে কিছুকাল কাটাইলেন। হরির দীর্ঘ বিরহে পঞ্চশরাতুরা হরিণী অপেক্ষাও সুন্দর নয়নবিশিষ্ট রাধা বড়াইকে এইরূপ বলিলেন।

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

দূতা চিরকাল ভৈল তভোঁ বনমালী নাইল।
তাক মো পাযিবোঁ কত কালে বড়ায়ি গো ॥ ১ ॥
সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন চিত্তে না পড়এ আন।
তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে ॥ ২ ॥
আইল চৈত মাস কি মোর বসতী আশ।
নিফল যৌবনভাবে ॥ ৩ ॥
বিরহে আন্তর জলে সুতিলোঁ কদমতলে।
আধিক আন্তর মোর পোড়ে ॥ ৪ ॥
পরিধান নেত লাসী হাথত মোহন বাঁশী।
সে কাহ্নাঞিঁ গেলা আকাশে ॥ ৫ ॥
সুতিলোঁ সখির বোলে সজল নলিনীদলে।
তাত হৈতেঁ আনল শীতলে ॥ ৬ ॥
ডালী ভরী ফুল পানে মোরে পাঠায়িল কাহ্নে।
তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে ॥ ৭ ॥
তাম্বুল না লৈলোঁ করে তোক মাইলোঁ চড়ে।
তেঁসি কাহ্ন আসুখিল মোরে ॥ ৮ ॥
দূতী ধরোঁ তোর পাএ হের মোর প্রাণ জাএ।
কহ মোরে জীবন উপাএ ॥ ৯ ॥
বহে প্রভাত সমএ মলয় শিয়ল বাএ।
বৃন্দাবনে কুয়িলী কাড়ে রাএ ॥ ১০ ॥

---

১ অ। প্র: কৃষ্ণগতপ্রাণা।

সাগরসঙ্গম গিআঁ　　　　　গাএর মাঁস কাটিআঁ।
　আপণা মগর ভোজ দিআঁ ॥ ১১ ॥
এ জন্মে বা না কযিলোঁ ভাগ　হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ।
　আর তার না পাযিবোঁ লাগ ॥ ১২ ॥
কিবা পুরুব জরমে　　　　　খণ্ডব্রত কইল আহ্মে।
　তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারাযিলোঁ ॥ ১৩ ॥
আণি দেহ বনমালী　　　　　বন্দিআঁ দেবী বাসলী।
　গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

রাধার উক্তি : হে দূতী, অনেকদিন হইয়া গেল, তবু বনমালী আসিলেন না। তাঁহাকে কতকাল পরে আমি পাইব ॥ ১ ॥ স্বপ্নে আমি কৃষ্ণকে দেখিযাছি। এখন আর কিছু আমার মনে পড়ে না। তাঁহাকে কি প্রকাবে পাইব ॥ ২ ॥ চৈত্রমাস আসিয়া গেল, নিষ্ফল যৌবনভার লইযা আমাব জীবনেব কি আশা ॥ ৩ ॥ বিরহে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। কদমতলায শুইলাম, তাহাতে হৃদয়জ্বালা আরো বাড়িল ॥ ৪ ॥ তাঁহার পরিধানে নেতবস্ত্র, হাতে মোহন বাঁশি, সে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫ ॥ সখীর কথায় সজল পদ্মপত্রে শুইলাম। আগুনও তাহা অপেক্ষা শীতল ॥ ৬ ॥ ডালা ভরিযা কৃষ্ণ আমাকে ফুল পান পাঠাইলেন, তাহা আমি হাত দিয়াও ছুঁইলাম না ॥ ৭ ॥ হাতে পান লইলাম না, তোমাকে চড় মারিলাম, তাই কৃষ্ণ আমাকে অসুখী করিলেন ॥ ৮ ॥ দূতী তোমার পায়ে ধরি, দেখ আমার প্রাণ যায়, আমার জীবনরক্ষার উপায বলিয়া দাও ॥ ৯ ॥ প্রভাতকালে শীতল মলয বাতাস বহিতেছে, বৃন্দাবনে কোকিল কূজন কবিতেছে ॥ ১০ ॥ সাগরসঙ্গমে গিয়া নিজের গাযের মাংস কাটিয়া মকরকে খাওযাইব ॥ ১১ ॥ এ জন্মে বোধ হয় তেমন ভাগ্য করি নাই। কৃষ্ণের সান্নিধ্য হারাইলাম, আর তাঁহার নাগাল পাইব না ॥ ১২ ॥ পূর্বজন্মে হযতো আমি খণ্ডব্রত করিয়াছি, তাহার ফলেই কৃষ্ণকে হারাইলাম ॥ ১৩ ॥ বনমালীকে আনিয়া দাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

দেখিলোঁ প্রথম নিশী　　　　　সপন সুন তোঁ বসী
　　সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে　　　　　সে কৃষ্ণ করিল কোলে
　　চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥ ১ ॥
　　এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
　　সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে ॥ ধ্রু ॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে　　　　　বুলিআঁ তবেঁ বচনে
　　আড়বাঁশী বাএ মধুরেশ

চাহিল মোরে স্বুরতী না দিলোঁ মো৽আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর নিশী মোএঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহানিলোঁ[১] তাহার বদনে।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ ৩ ॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: রাত্রি প্রথম ভাগে যে স্বপ্ন দেখিলাম সেই স্বপ্ন বিষয়ক সব কথা তোমাকে বলিতেছি বসিয়া শোনো। সে কৃষ্ণ কদমতলায় বসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন ॥ ১ ॥ হে বড়াই, আমার জীবন নিষ্ফল, সেই কৃষ্ণকে আনিয়া দাও ॥ ধ্রু ॥ দেহে চন্দন লেপন করিয়া মিষ্টি কথা বলিয়া মধুর স্বরে আড়বাঁশি বাজাইলেন। অনন্তর তিনি রতি ভিক্ষা করিলেন কিন্তু আমি সম্মতি দিলাম না। দ্বিতীয় প্রহরে ইহাই দেখিলাম ॥ ২ ॥ রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আমি কৃষ্ণের কোলে বসিয়া তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিলাম। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া আমার মনোহরণ করিয়া লইলেন। আমি মদনপীড়িতা হইলাম ॥ ৩ ॥ চতুর্থ প্রহরে কৃষ্ণ অধর পান করিলেন। আমার রতিরসলালসা জাগ্রত হইল। এমন সময় দারুণ কোকিলনাদে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন। আগ বড়ায়ি।
চিত্তে মোর না পড়ে আন ॥ কি হরি হরি ॥
হাণিল মদন পাঁচ বাণে। আগ বড়ায়ি।
তেঁ মোর দগধ পরাণে ॥ কি হরি হরি ॥ ১ ॥
মুকুলিল কুষ্ণ নেআলী। আগ বড়ায়ি।
আণিআর বনমালী ॥ ধ্রু ॥
দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে।
না জাণো মো কেহ্ন করে গাএ ॥
কাঁট করী কাহ্নাঞিঁ আনাওঁ।
রতী স্বুখেঁ রজনী পোহাওঁ ॥ ২ ॥

১। প্র: নেহালিলোঁ।

এ মোর বাহুর বলএ।
সব খন খসিআঁ পড়এ ॥
অনমীষ নয়ন করিআঁ।
বিকলী মো তার বাট চাহিআঁ ॥ ৩ ॥
এবেঁ মোর সংপুন বএসে।
কিকে কাহ্ন করে আমরিষে ॥
ঝাঁট করী আন কাহ্ন পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : ওগো বড়াই, আমি স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখিলাম। তিনি ছাড়া আমার চিত্তে আর কিছু স্থান নাই। ওগো বড়াই, মদন পঞ্চবাণ হানিল তাই আমার হৃদয়জ্বালা ॥ ১ ॥ নবমল্লিকার কুঞ্জে মুকুল ধরিয়াছে। বনমালীকে আনিয়া দাও ॥ ধ্রু ॥ দক্ষিণ হইতে মলয় বাতাস বহিতেছে। আমার শরীর কেমন করিতেছে জানি না। শীঘ্র কৃষ্ণকে লইয়া আসি, মিলনসুখে রজনী যাপন করি ॥ ২ ॥ আমার এই বাহুর বলয় নিরন্তর খসিয়া পড়িতেছে। আমি ব্যাকুল হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার পথ চাহিয়া আছি ॥ ৩ ॥ এখন আমার সম্পূর্ণ বয়স। কৃষ্ণ এখন ক্রোধ করে কেন? অবিলম্বে কৃষ্ণকে আমার পার্শ্বে আনো। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকস্বা ॥

কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে।
সে তাম্বুল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে ॥
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ১ ॥
পাগলী রাধা গোআলিনী গো।
কথা পাব নান্দে[১] যশোদার পো ॥ ধ্রু ॥
গন্ধ চন্দন রাধা দিলোঁ তোর গাএ।
সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ।
এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর।
কাহ্ন দুর গেল বৃন্দাবনের পার ॥ ২ ॥
বিথর বুয়িলোঁ তোরে কাহ্নের আন্তরে।
তবেঁ বাম করে চড় মায়িলি মোহোরে ॥
এবেঁ কাহ্নের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ।
তাহাক করিব আহ্মে কমণ উপাএ ॥ ৩ ॥

১ অ। প্র: নান্দো।

আনেক কাকুতী করি তোক গোআলিনী।
আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী।
এবেঁ নিবারিআঁ থাক আপণার মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ।

বড়াইর উক্তি : কৃষ্ণের তাম্বূল তোমার হাতে দিলাম। আমার মাথায় সে তাম্বূল ভাঙ্গিলে। এখন তোমার মন ঘুসঘুস করিয়া পুড়িতেছে। তোমার নবযৌবন পুঁটুলি বাঁধিয়া রাখো ॥ ১ ॥ পাগলী গোয়ালিনী রাধা, নন্দযশোদার পুত্রকে কোথায় পাইব ॥ ধ্রু ॥ রাধা, তোমার গায়ে যে গন্ধ চন্দন দিলাম তাহা তুমি বাম পায়ে মুছিলে। এখন আর কি বলিতেছ? কৃষ্ণ এখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের জন্য তোমাকে বিস্তর বলিয়াছি। তখন তুমি আমাকে বাম হাতে চড় মারিলে। এখন কৃষ্ণের জন্য তোমার প্রাণ যায়। আমি তাহার কি উপায় করিব ॥ ৩ ॥ তোমাকে অনেক কাকুতি করিয়া দেব চক্রপাণি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছেন। এখন নিজের মন নিবারণ করিয়া থাকো। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ য়ে[১] সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥ ১ ॥
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান।
আপণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্নু ॥ ধ্রু ॥
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর ॥
যবেঁ কাহ্নু না মিলিহে করমের ফলে।
হাতে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥ ২ ॥
কাহ্নু সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী।
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥
এভোহোঁ বড়াই মোর কর প্রতিকার।
আনিআঁ দিআর মোকে কাহ্নু একবার ॥ ৩ ॥
মাথে শম্ভু সম খোঁপা শিসতে সিন্দুর।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্নু গেলান্ত বিদুর ॥
আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞি পালাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

১। প্র: মোয়ে।

রাধার উক্তি : বড়াই, এ ধন-যৌবন সবই অসার। গজমুক্তার হার ছিঁড়িয়া ফেলিব। মাথার সিন্দুর মুছিয়া ফেলিব। বাহুর বলয় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিব ॥ ১ ॥ নিষ্ঠুরা বড়াই গো, আমার প্রাণদান করো। নিজের ভাগ্যদোষে কৃষ্ণকে হারাইলাম ॥ ধ্রু ॥ মাথা মুড়াইয়া সাগরে যাইব। যোগিনী বেশ ধরিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইব। যদি কর্মফলে কৃষ্ণকে না পাই তাহা হইলে হাতে তুলিয়া বিষ খাইব ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হইল না। আমার অঞ্চলের ধন বিধাতা হরণ করিলেন। বড়াই গো, এখনো প্রতিকার করো, কৃষ্ণকে একবার আনিয়া দাও ॥ ৩ ॥ আমার মাথায় শম্ভুসদৃশ খোঁপা, আমার সীমন্তে সিন্দূর। তাহা দেখিয়াও কৃষ্ণ দূরে গেলেন কেন? আমাকে অনাথ করিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

কাল কাহ্নাঞিঁ কঠিন তার আন্তর ল
বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর থানে।
তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ
গেল বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
নিবারিআঁ থাক নিজ মনে।
আপণা রাখিআঁ কাহ্ন এবেঁ গেলা নিজ থান
তাক পাইব কেনমনে ॥ ধ্রু ॥
তোর চরিত্র ভাবিআঁ আন্তর দগধ হআঁ
ভাল মন্দ কিছু না মানিআঁ।
প্রতিজ্ঞা করিআঁ কাহ্নে গেল মাঝ বৃন্দাবনে
তোর নেহে তিনাঞ্জলী[১] দিআঁ ॥ ২ ॥
কমণ সুধিএঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাইবোঁ[২]
আপণেঞিঁ বোল সুবদনী।
আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুরারী
তবেঁ তাক আণো গোআলিনী ॥ ৩ ॥
নটক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে
কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি : কৃষ্ণের বর্ণ কালো, তাঁহার অন্তর কঠিন। অনুরোধ উপরোধে তোমার কাছে আসেন না। তোমার প্রেমলাভের আশায় অনেক সন্তাপ পাইয়া তিনি

১ অ। প্র: তিলাঞ্জলী।
২ অ। প্র: পাইবোঁ।

বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন ॥ ১ ॥ নিজের মনকে নিবারণ করিয়া থাকো। নিজের মান রাখিয়া কৃষ্ণ নিজের স্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আর কেমন করিয়া পাইবে ॥ ধ্রু ॥ তোমার চরিত্র দেখিয়া তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইয়াছে। তিনি ভালমন্দ কিছু না মানিয়া তোমার প্রেম বিসর্জন করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন ॥ ২ ॥ কোন্ পথে যাইব এবং কোথায় তাঁহার নাগাল পাইব, হে সুবদনী, তুমি নিজেই সে কথা বলো। অনেক কৌশল করিয়া মুরারিকে জানিতে হইবে। তবে তো তাঁহাকে লইয়া আসিব ॥ ৩ ॥ সেই নটরূপী গদাধর বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন। কোন্ চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ পাইব ? আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকং ॥

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ্ পরাণ।
সহিতেঁ নারোঁ মনমথবাণ ॥ ১ ॥
কথাঁ মনমথ কথাঁ সে বাণ।
কোমণ বাণে লএ পরাণ ॥ ২ ॥
বসন্ত কালে কোকিল রাএ।
মণে মনমথ সে বাণ তাএ ॥ ৩ ॥
আহ্মার বোল সাবধান হয়।
বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ ॥ ৪ ॥
কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে।
আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে ॥ ৫ ॥
মোর বোল তোঁ মণে পরিভায়।
সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ ॥ ৬ ॥
পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে।
আহ্মা নিআঁ যাহ সেই বৃন্দাবনে ॥ ৭ ॥
বাঘ ভালুকে আতি গহনে।
কেমনে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে ॥ ৮ ॥
বাঘ ভালুকে বা আহ্মাক খাউ।
কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ ॥ ৯ ॥
যমুনা বহে খরতর ধার।
কেমতেঁ তাহাত হইবেঁ পার ॥ ১০ ॥
যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনাতরঙ্গে।
তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে ॥ ১১ ॥
পরিহর রাধা কাহ্নের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

রাধার উক্তি : ওগো বড়াই, এসো আমার প্রাণ রক্ষা করো। মন্মথর বাণ আর আমি সহিতে পারি না ॥ ১ ॥ বড়াইর উক্তি : মন্মথ কোথায়? কোথায় তাঁহার বাণ? কোন্ বাণেই বা তিনি প্রাণ লন্ ॥ ২ ॥ রাধার উক্তি : বসন্তকালে কোকিল ডাকিতেছে। মনে মন্মথ আর ওই কোকিলের ডাক তাঁহার বাণ ॥ ৩ ॥ বড়াইর উক্তি : আমার কথায় মন দাও। বাহিরে চন্দ্র কিরণে শয়ন করো ॥ ৪ ॥ রাধার উক্তি : চন্দ্রকিরণে শুইব কি? তাহাতে মদনের দাহ আরো অধিক বাড়িয়া যায় ॥ ৫ ॥ বড়াইর উক্তি : আমার কথা যদি তোমার পছন্দ হয় তবে শীতল চন্দন অঙ্গে বুলাও ॥ ৬ ॥ রাধার উক্তি : সেই চন্দনে দেহ পুড়িয়া যায়। আমাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাও ॥ ৭ ॥ বড়াইর উক্তি : গহন অরণ্যে অনেক বাঘ ভালুক। সে বৃন্দাবনে কেমন করিয়া যাইবে ॥ ৮ ॥ রাধার উক্তি : বাঘ ভালুকে আমায় খায় তো খাক্। কৃষ্ণের জন্য যদি প্রাণ যায় সেও ভাল ॥ ৯ ॥ বড়াইর উক্তি : যমুনা খরধারায় বহিতেছে। তাহাতে পার হইবে কি করিয়া ॥ ১০ ॥ রাধার উক্তি : তরঙ্গচঞ্চল যমুনার জলে যদি ডুবিয়া মরি তাহা হইলে কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিব ॥ ১১ ॥ বড়াইর উক্তি : কৃষ্ণের আশা পরিত্যাগ করো। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১২ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্পা ॥ দণ্ডকঃ ॥

শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল।
প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল ॥ ১ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়াচুলে।
এহি চিহ্নে কাহ্নাঞিঁকে চাইহ গোকুলে ॥ ২ ॥
সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ।
করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ ॥ ৩ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে।
ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে ॥ ৪ ॥
নেত ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাম্বাএ।
চরণে নূপুর রুণুঝুনু কাঢ়ে রাএ ॥ ৫ ॥
কপুরবাসিত বড়ায়ি নেহ গুআ পান।
শকতি করিআঁ চাহিআঁ আন কাহ্ন ॥ ৬ ॥
আগেত চাইহ বড়ায়ি বসুলের ঘরে।
আবাল চরিত্র কাহ্ন মায়া বড় করে ॥ ৭ ॥
তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে।
মায়া পাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দভোলে ॥ ৮ ॥

তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার কূলে।
বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন[১] জাএ সে গোকুলে ॥ ৯ ॥
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে।
শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনানিকটে ॥ ১০ ॥
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ[২] ভালমতে।
তরুগণে চড়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে ॥ ১১ ॥
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।
তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে ॥ ১২ ॥
তথাত চাহিআঁ না পাহ যবে কাহ্ন।
তবেঁস চাইহ বড়ায়ি গোপগণ থান ॥ ১৩ ॥
তথাহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে।
গোপীগণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে ॥ ১৪ ॥
তথাঁহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথীকূলে ॥ ১৫ ॥
তথাঁহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে ॥ ১৬ ॥
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে।
তবেঁস পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে ॥ ১৭ ॥
তবেঁ সুধি পাইবেঁ যথা বসে জগন্নাথে।
আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে ॥ ১৮ ॥
তোর বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৯ ॥

রাধার উক্তি : হে বড়াই, শত পল সোনা লইয়া প্রাণনাথ কৃষ্ণের উদ্দেশে চলো ॥ ১ ॥ তাঁহার বর্ণ কালো, তাঁহার মাথায় ঘোড়া চুল, এই চিহ্নে গোকুলে তাঁহার খোঁজ করিবে ॥ ২ ॥ গায়ে সুগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া হাতে করতাল ও মুখে মধুর বাঁশি বাজান ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণের অঙ্গে পীতবাস, ষোল শত গোপী তাঁহার পাশে পাশে যায় ॥ ৪ ॥ তাঁহার পরিধানে নেতবস্ত্র, তাহা সম্মুখে পিছনে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পায়ে নূপুর রুণুঝুনু বাজিতেছে ॥ ৫ ॥ বড়াই, এই কর্পূরবাসিত পানসুপারি লইয়া যাও, কষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া আনো ॥ ৬ ॥ আগে বসুদেবের ঘরে তাঁহার খোঁজ করিও। তাঁহার বালকস্বভাব, অনেক মায়া করেন ॥ ৭ ॥ সেখানে না পাইলে যশোদার কোলে খোঁজ করিও, নিদ্রাবেশে সেখানে মায়া পাতেন ॥ ৮ ॥ সেখানেও না পাইলে যমুনার কূলে দেখিও, গো-বৎস চরাইবার জন্য তিনি গোকুলে যান ॥ ৯ ॥ সেখানে না পাইলে যমুনার ঘাটে দেখিও, বালকদের সঙ্গে

১ 'কাহ্ন' তোলাপাঠে।
২ 'চাইহ' তোলাপাঠে। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ যমুনার নিকটেই বেড়ান ॥ ১০ ॥ বৃন্দাবনে ফল খাইবার জন্য তিনি গাছে গাছে চড়েন। সেখানেও ভাল করিয়া খোঁজ করিও ॥ ১১ ॥ হাতে তাঁহার লাঠি, মহানন্দে তিনি বাঁশি বাজান। নারদমুনির সঙ্গে তাঁহার দেখা পাওয়া যাইতে পারে ॥ ১২ ॥ সেখানেও না পাইলে গোপগণের আবাসে তাঁহার খোঁজ করিও ॥ ১৩ ॥ সেখানে খোঁজ করিয়া সঙ্কেতস্থানে যাইও যেখানে তিনি গোপীগণসহ কেলি করেন ॥ ১৪ ॥ সেখানেও যদি না পাও তাহা হইলে ভাগীরথীকূলে গিয়া তাঁহার সন্ধান করিবে ॥ ১৫ ॥ সেখানে না পাইলে সাগর গোয়ালার ঘরে গিয়া ত্বরায় তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ১৬ ॥ সেখানেও তাঁহাকে না পাওয়া গেলে সকলের কাছে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিও ॥ ১৭ ॥ তাহা হইলে জগন্নাথ কৃষ্ণ কোথায় থাকেন সে সংবাদ জানিতে পারিবে। আদ্যন্ত সব কথা তোমাকে বলিলাম ॥ ১৮ ॥ তোমার কথায় কৃষ্ণ আমার নিকটে আসিবেন। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১৯ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

মোঞঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বুঢ়ী ল
বেড়ায়িতেঁ মোতে বল নাহীঁ।
মোঞঁ যে বোলোঁ উত্তর তাত আনুমতি কর
আপণেঞিঁ চাহ ত কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
রাধা ল। না হেলিহ বচন আহ্মারে।
যে পথেঁ উদ্দেশ পাহা সে পথেঁ আপণে যাহা
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ মেলিব তোহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে কাহ্নুর লাগ পাহ
তবেঁ তাক বুলিহ বিনএ।
আঅর বোলোঁ উপাএ ধরিহ তাহার পাএ
তবেঁ তোকে হয়িবে সদএ ॥ ২ ॥
কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুরী
নানা গিরী কন্দর বনে।
বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে ॥ ৩ ॥
চল তোঁ মথুরা পুরী তথাঁ তোকে পাইবে হরী
না ছাড়িহ রাধা তার পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি: হে সুন্দরী রাধা, আমি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি। চলিবার শক্তি আমার নাই। আমি যে কথা বলি তাহাতে সম্মত হও। নিজেই কৃষ্ণের সন্ধান

করো ॥ ১ ॥ রাধা আমার কথা অবহেলা করিও না। যে পথে তাহার উদ্দেশ পাও সেই পথে নিজে যাও, তবেই কৃষ্ণকে পাইবে ॥ ধ্রু ॥ খুঁজিতে খুঁজিতে যখন কৃষ্ণের নাগাল পাইবে তখন বিনয়সহকারে তাঁহাকে বলিও। আরো একটি উপায় বলি, তুমি তাঁহার পায়ে ধরিও, তবেই তিনি তোমার প্রতি সদয় হইবেন ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের সন্ধানে মথুরাপুরীতে এবং নানা পর্বতে গিবিগুহায় ও অরণ্যে পরিভ্রমণ করিও। অনেক কষ্ট করিয়া, চণ্ডীকে পূজা মানত করিয়া তবে তাঁহার দর্শন পাইবে ॥ ৩ ॥ মথুরা নগরে চলো, সেখানে কৃষ্ণের দেখা মিলিবে। তাঁহাকে পাইলে আর তাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিও না। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥

দধি দুধে সজাইআঁ চুকে।
সুণ বড়ায়ি ল। জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে ॥ নাএ ॥
আল হের। না বিকাএ যদি দুধ তথাঁ।
সুণ বড়ায়ি ল। তভোঁ কাহ্নাঞিঁ সমে হৈবে কথা ॥ নাএ ॥ ১ ॥
আল হের। মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।
সুণ বড়ায়ি ল। সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবারে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
পিন্ধি বউল পুষ্পের হার।
কন্নত কুণ্ডল হিরার ধার ॥
পিন্ধিআঁ আমূল পাটোলে।
কাহ্নাঞিঁ দেখি পড়ি গেলোঁ ভোলে ॥ ২ ॥
যেই খনে কাহ্নাঞিঁ দেখিবোঁ।
তখনেই তাক না এড়িবোঁ ॥
যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নমনে[১]।
কাহ্নাঞিঁ ছাড়ী না জাণো মো আনে ॥ ৩ ॥
না শুণিলোঁ তোহ্মার বচনে।
না খাইলোঁ কাহ্নের গুআ পানে ॥
যত কৈল সব মতিমোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: হে বড়াই, দধিদুধ সাজাইয়া লইয়া মথুরার হাটে বিক্রয় করিতে যাইব। দেখো বড়াই, সেখানে যদি দুধ না বিকায় তবু তো কৃষ্ণের সহিত দেখা হইবে ॥ ১ ॥ দেখো বড়াই, মথুরার নামে প্রাণ কাঁদে। কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা হয় ॥ ধ্রু ॥ তিনি বকুল ফুলের মালা পরিয়াছেন। তাঁহার কানে হীরার ঝালর দেওয়া কুণ্ডল। পরিধানে বহুমূল্য পট্টবস্ত্র। সেই কৃষ্ণকে দেখিয়া আমি আত্মবিস্মৃত

---

১ প্রথমে 'যেহে' লেখা। পরে 'হ'র এ-কার কাটা এবং তোলাপাঠে 'মনে' যুক্ত।

হইয়াছি ॥ ২ ॥ কৃষ্ণকে দেখিলে আর ছাড়িব না। যোগী যেমন করিয়া যোগ চিন্তা করেন, আমিও তেমনি কৃষ্ণ বই আর কিছু জানি না ॥ ৩ ॥ তোমার কথা শুনিলাম না, কৃষ্ণের পানসুপারি খাইলাম না। যাহা করিয়াছি বুদ্ধিভ্রংশ হেতু করিয়াছি। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী ॥ আল ॥
এবেঁ মোর মণের পোড়নী ॥ আল বড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী ॥ আল ॥ ১ ॥
কমণ উদ্দেশেঁ মো জাইবোঁ ॥ আল বড়ায়ি গো।
কথাঁ না সুন্দর কাহ্ন পাইবোঁ ॥ আ ॥ ধ্রু ॥
মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ ॥ ২ ॥
দেব অসুর নরগণে।
বস হএ মনমথবাণে ॥
না বসএ তথাঁ কি মদনে।
যে দিগেঁ বসে নারায়ণে ॥ ৩ ॥
পীন কঠিন উচ তনে।
কাহ্নাঞি পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে ॥
তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে।
তা দেখিতেঁ প্রাণ জাএব মোরে[১] ॥ ৪ ॥
না শুণিলোঁ কাহ্নাঞিঁর বোলে।
না নয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে ॥
যত কৈলোঁ সব মতিমোযে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই গো, যেদিকে কৃষ্ণ গেলেন বসন্ত কি সে দিক জানে না? এখন আমার মনের দাহ কুমারের পোয়ানের মত ॥ ১ ॥ আমি কোন্ দিকে যাইব? কোথায় গেলে কৃষ্ণকে পাইব ॥ ধ্রু ॥ আমের শাখায় মুকুল ধরিয়াছে। মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। ডালে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। সে ডাক আমার পক্ষে বজ্রের আঘাতের মতই নিদারুণ ॥ ২ ॥ দেবতা, অসুর এবং মানুষ—মন্মথবাণে বশ হয়

১ 'মো' তোলাপাঠে।

সকলেই। নারায়ণ যেদিকে অবস্থান করেন, মদন কি সেদিকে থাকে না ॥ ৩ ॥ পীনপয়োধর দিয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিব। তবু যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান তাহা হইলে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে ॥ ৪ ॥ আমি কৃষ্ণের কথা শুনি নাই, তাঁহার পান লই নাই। যাহা করিয়াছি তাহা নির্বুদ্ধিতাবশেই করিয়াছি। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৫ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

তোকে তত্ব বোলোঁ। চন্দ্রাবলী।
যোড়হাথ করী বনমালী ॥
তাত বড় পাইল আপমান।
তেঁসি তোক্ষা ছাড়ী গেল কাহ্ন ॥ ১ ॥
এবেঁ তোর বিরহপোড়নী। আল।
কথাঁ। গিআঁ পাইব চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
তোর সখিজন হেন চাহে।
কাহ্নাঞিঁ তেজুক তোহোর[১] নেহে ॥
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ বৃন্দাবনে।
কেলি করে সেহি গোপীগণে ॥ ২ ॥
ষোলহ[২] সহস্র গোপী লয়িআঁ।
বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ ॥
নানা রসে বসে বনমালী ॥
তোহ্মাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী ॥ ৩ ॥
আইস রাধা যাই বৃন্দাবনে।
তবেঁ তার পাব দরশনে ॥
তবেঁ তোরে কাহ্ন বা[৩] সম্ভাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি: চন্দ্রাবলী, তোমাকে সত্য কথা বলি। বনমালী হাত জোড় করিয়া অপমানিত হইয়াছেন। তাই তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন ॥ ১ ॥ এখন তোমার বিরহের জ্বালা। চক্রপাণিকে কোথায় পাইবে ॥ ধ্রু ॥ তোমার সখীরা চায় কৃষ্ণ তোমার প্রেম পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলে তাহারা বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণকে লইয়া কেলি করিতে পারে ॥ ২ ॥ বৃন্দাবনের মধ্যে বসিয়া বনমালী তোমাকে বঞ্চনা করিয়া ষোল সহস্র গোপী লইয়া নানা রসে দিনযাপন করিতেছেন ॥ ৩ ॥ চলো রাধা বৃন্দাবনে যাই। সেখানে গেলে

---

১ 'হো' তোলাপাঠে।
২ 'হ' তোলাপাঠে।
৩ 'ষা' তোলাপাঠে।

তাঁহার দেখা পাইবে। তখন কৃষ্ণ তোমাকে সম্ভাষণ করিতে পারেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

অশরীরশর[১] কৃশিতাঙ্গলতা
বিততাধিযুতা গতসাততিঃ।
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি হরে-
রভিমন্যুজননীং[২] জরতীমবদৎ ॥

মন্মথশরে অভিমন্যুপত্নী রাধার অঙ্গলতা খিন্ন, বিরহবেদনায় তিনি পীড়িত, তাঁহার মনে সুখের লেশ নাই। কৃষ্ণের চরিত চিন্তা করিয়া তিনি বড়াইকে বলিলেন।

ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বন্দাবনে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো ॥ কত দুখ কহিব কাঁহিণী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ২ ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল নন্দন বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে ॥ ৩ ॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই, যে কৃষ্ণের জন্য আমি আর কিছু চাই নাই, যাঁহার জন্য আমি লঘুগুরুজন মানি নাই, আমার মনে হয় তিনি আমার প্রতি রোষবশতঃ আমাকে উপেক্ষা

---

১ অ। প্র: অশরীরশরৈঃ।
২ অ। প্র: রভিমন্যুজনী।

করিয়া অন্য রমণীর সহিত বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন ॥ ১ ॥ বড়াই গো, দুঃখের কথা কত বলিব? ডুবিয়া মরিব বলিয়া সরোবরে ঝাঁপ দিলাম, সে সরোবরও শুকাইয়া গেল, আমি এমনই মন্দ ভাগিনী ॥ ধ্রু ॥ নন্দের নন্দন যিনি যশোদার পুত্র, সেই কৃষ্ণের সহিত প্রীতি বর্ধিত করিলাম। যে কাজ গোপন রাখা উচিত ছিল তাহাই প্রকাশিত করিয়া উচিত ফল পাইলাম ॥ ২ ॥ আমার স্বামী দুর্দান্ত বলিয়া গোপবংশে বিখ্যাত। আমার ননদ প্রতি কথায় দোষ ধরে। গোপীরা সকলেই কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত বলিয়া আমার কলঙ্ক রটনা করিয়াছে ॥ ৩ ॥ এত সব যে আমি সহ্য করিলাম, সে কেবল কৃষ্ণ-প্রেমের জন্য। ওগো বড়াই, আমাকে কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বঙ্গালরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হরি হরি। আসুখ না কর তোহ্মে শুন গোআলী।
নিকট মেলিব তোর প্রিয় বনমালী ॥
হরি হরি। মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ।
তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ ॥ ১ ॥
হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে।
আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
আইস মোর সঙ্গে রাধা যাই বৃন্দাবনে।
চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে।
বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে।
আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে ॥ ২ ॥
কেমনে বেড়াএ কাহ্ন কিবা রূপ ধরে।
একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ আহ্মারে ॥
আবসে জাণিব কেহো যথাঁ বসে কাহ্নে।
পুছিতেঁ পুছিতেঁ তার পাব দরশনে ॥ ৩ ॥
কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে।
গরু রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে ॥
সব ঠাই চাহিআঁ আণিব শ্রীনিবাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি: গোপকন্যা রাধিকা, তুমি দুঃখ করিও না। প্রিয় বনমালীকে তুমি নিকটে পাইবে। তোমার চাঁদের মত মুখখানি মলিন করিও না। তোমার দেহের অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হয় ॥ ১ ॥ হৃদয়ে ভরসা রাখিয়া আমার কাছে থাকো। গোকুলের কৃষ্ণ আপনি আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন ॥ ধ্রু ॥ আমার সহিত আইস। চলো বৃন্দাবনে গিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে তোমার প্রিয় নারায়ণের খোঁজ করি। সবার কাছে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। শ্রীমধুসূদনকে অবশ্যই কেহ না কেহ দেখিয়া

থাকিবে ॥ ২ ॥ আচ্ছা, কৃষ্ণ কিভাবে বেড়ান, কি কি রূপ ধারণ করেন, একে একে আমাকে সব কথা বলো তো। তিনি যেখানে থাকেন সে স্থান অবশ্যই কেহ দেখিয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার দেখা পাইবই ॥ ৩ ॥ নন্দনন্দন শ্রীনিবাস জলেই থাকুন আর স্থলেই থাকুন অথবা বৃন্দাবনে গোচারণেই রত থাকুন, সব স্থান খুঁজিয়া তাঁহাকে তোমার নিকট আনিব। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

ময়ুরপুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা ॥ ১ ॥
দূতা ল
তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জায়িতেঁ। আ।
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতেঁ নান্দের পোঅ
হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ ॥ ধ্রু ॥
নির্ম্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে
রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে।
মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমুতী
জীএ রাহি তার দরশনে ॥ ২ ॥
চন্দন চর্চ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ
হেন বেশ হেন দরশনে।
নেত পরিধান লাসী হাথে মোহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে ॥ ৩ ॥
মোঞঁত আভাগিনী রাহী তেঁসি হারায়িলোঁ কাহ্নাঞিঁ
এবেঁ তাক চাহি বন[১] দেশে।
তথাঁত পাইব সুধী বড়ায়ি তোহ্মার বুধী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : ময়ুরপুচ্ছে তাঁহার চূড়া বাঁধা। কনককুসুমের মালায় কেশপাশ বেষ্টিত। নীল মেঘের ছটার মত তাঁহার দেহদ্যুতি। কপালে সুগন্ধ চন্দনের ফোঁটা দেখিয়া মনে হয় যেন নীল গগনে পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ হে দূতী, তুমি কি কৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ? তুমি কি দেখিয়াছ, নন্দনন্দন হাসিতে হাসিতে বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে পথ দিয়া যাইতেছেন ॥ ধ্রু ॥ নির্মল কমলের মত তাঁহার সুন্দর বদন, নীল উৎপলের মত নয়ন, মাণিক্যের ন্যায় দশনজ্যোতি, গলায় গজমোতি শোভা

১ 'বন' তোলাপাঠে।

পাইতেছে—তাঁহার দর্শনে রাধার জীবন রক্ষা পায় ॥ ২ ॥ তাঁহার অঙ্গ চন্দনচর্চিত, পায়ে ঘাঘর মগর, পরিধানে নেতবস্ত্র, হাতে মোহারী বাঁশি। সে কৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলেন ॥ ৩ ॥ আমি অভাগিনী, তাই কৃষ্ণকে হারাইলাম, এখন বনপ্রদেশে তাঁহার সন্ধান করি। হে বড়াই, তোমার বুদ্ধিতে আশা করি সেখানে তাঁহাকে পাইব। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান।
তোহ্মার থানত মো না বুলিবোঁ আন ॥
আবসি আইসে কাহ্ন কদমের তলে।
হাথত লগুড় করী রাখএ গোকুলে ॥ ১ ॥
চল চল গোআলিনী যমুনার কূলে।
আবসী পাইবী তথাঁ বালগোপালে ॥ ধ্রু ॥
কিবা রাতী কিবা দীন মাঝ বৃন্দাবনে।
নানা ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে ॥
গোপযুবতী সমে করে নিধুবন।
তথাঁ গেলেঁ রাধা[১] তার পাইব দরশন ॥ ২ ॥
শুভ যাত্রা করি রাধা কর মনোবল।
তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব সফল[২] ॥
আহ্মে জাণি কাহ্নাঞিঁর চরিত্র সকল।
ছাড়িতেঁ না পারে সে তো[৩] কদমের তল ॥ ৩ ॥
পরতয় কর রাধা আহ্মার বচনে।
সত্য বচন ছাড়ী না বোলোঁ মো আনে ॥
কদমতলাক জাইউ চিত্তের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি: নাতিনী, তুমি আমার প্রাণের সমান, তোমার কাছে মিথ্যা বলিব না। কৃষ্ণ কদম্বতলে অবশ্যই আসেন এবং হাতে লাঠি লইয়া গোচারণ করেন ॥ ১ ॥ গোয়ালিনী, যমুনার কূলে চলো। সেখানে বালক গোপালের দেখা নিশ্চয় পাইবে ॥ ধ্রু ॥ কি দিন কি রাত্রি নারায়ণ সর্বদাই বৃন্দাবনে নানা ফুল তুলেন, নানা ফল খান এবং গোপযুবতীগণের সহিত কেলি করেন। রাধা, সেখানে গেলে নিশ্চয় তাঁহার দর্শন পাইবে ॥ ২ ॥ হে রাধা, শুভযাত্রা করিয়া মনে সাহস সঞ্চয় করো। সেখানে

১ 'রাধা' তোলাপাঠে।
২ প্রথমে 'সকল'। পরে 'ক' কাটিয়া তোলপাঠে 'ফ' করা।
৩ 'সে তো' তোলাপাঠে।

গমন করিলে তোমার মনোরথ সফল হইবে। আমি শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব জানি, তিনি কদম্বের তল ছাড়িতে পারেন না ॥ ৩ ॥ আমার বাক্যে বিশ্বাস করো, আমি সত্যকথা ভিন্ন মিথ্যা বলি না। প্রসন্নচিত্তে কদমতলায় যাও। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কদমতরুতল গিআঁ।
কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ ॥ আল রাধা ॥
আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।
কাজলে রঞ্জিল দুঈ আখী ॥ ল ॥ ১ ॥
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে।
চলি গেলি রাধিকা হরিষে ॥ ধ্রু ॥
ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে।
পরিধান কর নেত বাসে ॥
ভৃঙ্গার ভরিআঁ নৈল জলে।
বাটা ভরী কর্পূর তাম্বুলে ॥ ২ ॥
তরুদল চালএ পবনে।
কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে ॥
না দেখিআঁ ছাড়এ নিশাসে।
বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে ॥ ৩ ॥
হেনমতেঁ কতোখন রহী।
কদমতলাত রাধা রাহী ॥
না পাইল কাহ্নাঞিঁ দৈবদোষে।
গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি : রাধা কদম্বতরুতলে গিয়া কিশলয়ে শয্যা রচনা করিলেন এবং অঙ্গে অগুরুচন্দন মাখিয়া দুই চক্ষু কাজলে রঞ্জিত করিলেন ॥ ১ ॥ রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল হইয়া বড়াইয়ের নির্দেশ মত হৃষ্টমনে গমন করিলেন ॥ ধ্রু ॥ তিনি পুষ্পমাল্যে কেশপাশ বাঁধিলেন, সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিলেন, ভৃঙ্গার ভরিয়া জল এবং বাটা ভরিয়া কর্পূর ও তাম্বুল লইলেন ॥ ২ ॥ বাতাসে বৃক্ষসমূহ আন্দোলিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল কৃষ্ণ আসিতেছেন। তাঁহাকে না দেখিয়া বড়াইয়ের কাছে আশ্বাস চাহিতেছেন ॥ ৩ ॥ এইভাবে কদমতলায় কিছুক্ষণ থাকিলেন, কিন্তু দৈবদোষে কৃষ্ণের দর্শন পাইলেন না। বডু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কদম্বস্য তলে স্থিত্বা রাধা তত্র চিরক্ষণং।
মনোজশিখিসন্তপ্তা বিললাপ নিরন্তরং ॥

রাধা সেই কদম্বতলে দীর্ঘকলে অবস্থান করিয়া মদনানলে সন্তপ্ত হইয়া বড়ই বিলাপ করিলেন।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি চখুত নাইসে নিন্দে ॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি লুকাওঁ তাহার পেটে ॥ ১ ॥
আল। দহে পৈসু কাল দূতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আণিল নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ধ্রু ॥
তবেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের সমে নেহা বাঢ়ায়িআঁ।
এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি নিকট মেলিল আসিআঁ ॥
দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ দুগুণ পোড়নি সারে।
আর তার মুখ দেখিতেঁ না পাইলোঁ করমফল আহ্মারে ॥ ২ ॥
সব খন মোরে[১] নান্দের নন্দন চুম্বন করে কপোলে।
হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে মো দুখমতীর হেলে ॥
একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ এ শাল থাকিল বুকে ॥ ৩ ॥
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি কি মোর বসতী বাশে[২]।
আন পাণী মোকে একো না ভাএ কি মোর জীবন আশে ॥
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বালসীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: বড়াই, দিবসে সূর্যের উত্তাপ, রাত্রেও চন্দ্র অনল বর্ষণ করে। এত দুঃখ কি করিয়া সহিব? চোখে আমার নিদ্রা নাই ॥ শীতল চন্দন অঙ্গে মাখিতেছি তবু বিরহজ্বালা শান্ত হয় না। মেদিনী বিদীর্ণ হউক, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাঁচি ॥ ১ ॥ কাল-দূতী জলে ডুবিয়া মরুক। আশা ভরসা দিয়া আমাকে আনিল। কিন্তু বৃথা রজনী অতিবাহিত হইল ॥ ধ্রু ॥ তাই বলি বড়াই, কৃষ্ণের সহিত প্রীতি বাড়াইয়া লাভ কি? বড়াই, এখন আমার মৃত্যু সন্নিকট। কয়েকদিনের সুখের জন্য দ্বিগুণ জ্বালা। আমার কর্মফলে তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না ॥ ২ ॥ যে নন্দনন্দন সর্বক্ষণ কপোলে চুম্বন করেন, সেই হাতের নিধিকে এই অভাগিনীর অবহেলায় কে হরণ করিল? এ ঘসির আগুন স্বভাবতই ধিকিধিকি জ্বলিতেছে, তাহা কি আবার কেহ ফুঁ দিয়া জ্বালে? হায়, নিবিড় আলিঙ্গনে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলাম না, এ শাল বুকে

১ 'মোরে' তোলাপাঠে।
২ প্রথমে 'আসে'। পরে 'আ' কাটিয়া তোলাপাঠে 'বা' বসানো।

বিঁধিয়া রহিল ॥ ৩ ॥ আমার যৌবন বলো, ধনরত্নই বলো সব বৃথা। আমার গৃহবাসে কি সুখ? অন্নপানীয় কিছুই আমার ভাল লাগে না। আমার জীবন রাখি কি আশায়? আমি মাথা মুড়াইয়া যোগিনী হইয়া নানা দেশে বেড়াইব। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ১ ॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোল্‌াহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে ॥
মোঞঁ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত ॥ ২ ॥
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর ॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ ॥ ৩ ॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ ॥
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: মেঘান্ধকার ভয়ঙ্কর রাত্রি, আমি কদম্বতলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছি। চারিদিকে খোঁজ করিয়া কৃষ্ণকে কোথাও দেখিতে পাইতেছি না। মেদিনী বিদীর্ণ হউক, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মবিসর্জন করি ॥ ১ ॥ বড়াই গো, এ যৌবন যে আর রাখিতে পারি না। কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য সর্বদাই মন কাঁদিতেছে ॥ ধ্রু ॥ ভ্রমর ভ্রমরীসহ গুঞ্জন করিতেছে, সহকার শাখায় বসিয়া কোকিল কূজন করিতেছে। বড়াই, আমার নিকট তাহারা যতদূতের সমান। হায়, যশোদানন্দন আসিয়া কবে আমার এ দুঃখের খণ্ডন করিবেন ॥ ৪ ॥ বড় আশা করিয়া বনমধ্যে আসিলাম তবু সেই সুন্দর নন্দনন্দনের দেখা পাইলাম না। আমার উন্নত যৌবন ধীরে ধীরে জীর্ণ হইয়া যাইবে। আমার দুর্ভাগ্য, কৃষ্ণ একথা বুঝিতেছেন না ॥ ৩ ॥ বসন্তকালে মলয় পবন বহিতেছে, বিকশিত পুষ্পগন্ধ সেই বাতাসে বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বড়াই গো, শীঘ্র করিয়া এবার আমার নন্দনন্দনকে আনিয়া দাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কহ্লরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে
ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ।
এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞঁ সেজা বিছাইআঁ
কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ ॥ ১ ॥
আল হের। কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ মোকে আণিআঁ দে ॥ ধ্রু ॥
বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি
এহাত কেমনে হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করী
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার ॥ ২ ॥
এহি ত বৃন্দাবন বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে
মণে পড়ে কাহ্নাঞিঁর নেহে।
এবেঁ থীর নহে…[1] এ বড়ায়ি কোণ পরকারে
মরি জাইব কাহ্নের বিরহে ॥ ৩ ॥
এহি বৃন্দাবনে এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল
না পাইল কাহ্নের উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ বড়ায়ি
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই, মথুরার পথে এই কদম্বের তলে ধীরে ধীরে বসন্তবায়ু বহিতেছে। এখন বিবিধ ফুলে শয্যা রচনা করিয়া আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছি ॥ ১ ॥ বড়াই গো, কৃষ্ণকে আমার কাছে আনিয়া দাও। ওগো প্রাণের বড়াই, কৃষ্ণকে আনিয়া দাও ॥ ধ্রু ॥ গহন গভীর এই বিরহসাগর। এ সাগর কি করিয়া পার হইব? আমার কুচকুম্ভকে ভেলা করিয়া কৃষ্ণ যদি পার করিয়া দেন তবেই নিস্তার পাই ॥ ২ ॥ এই বৃন্দাবন দেখিয়া কৃষ্ণপ্রেমের কথা মনে পড়ে আর বিরহজ্বালায় হৃদয় দগ্ধ হয়। এখন কোনো প্রকারে চিত্ত ধৈর্য মানে না। কৃষ্ণবিরহে প্রাণত্যাগ করিব ॥ ৩ ॥ বড়াই গো, এই বৃন্দাবনে তিল তিল করিয়া খুঁজিলাম, তবু কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইলাম না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

---

১ ছাড়। প্র: চিত।

রাধামাধবমন্বিষ্য[1] পরিশ্রান্তা বনান্তরে।
জগাদ জরতীং রাধা স্মরজ্বরভরাতুরা ॥

তখন মদনকাতরা রাধিকা বনান্তরে মাধবকে অন্বেষণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।

বেলাবলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল। আল হের বড়ায়ি।
মোঞ দুখমতী তাক না শুণিল ॥ হরি হরি ॥
এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল। আল হের বড়ায়ি।
সে কারণে আহ্মে এত দুখ পাইল ॥ হরি হরি ॥ ১ ॥
এবেঁ হৈল মোহোর আরতঁতী[2]। আল হের বড়ায়ি।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গে সুরতী ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ কাহ্নু চাহিলে সুরতী।
মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী ॥
এবেঁ মোঞঁ ভৈলোঁ ভর যুবতী।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কাহ্নু গেলা কতী ॥ ২ ॥
সংপুন শশধর বদনে।
কমললোচন পাপ বিমোচনে ॥
সে কাহ্নাঞিঁ দিআঁ মোক দুখ আতী।
রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী ॥ ৩ ॥
কি না বিধি লিখিত কপালে।
মোরে দয়া না করে বালগোপালে ॥
না পায়িলোঁ মো কাহ্নের উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: বড়াই, প্রভু জগন্নাথ আমাকে যত কথা বলিলেন, আমি মন্দভাগিনী তাঁহার কোনো কথাই শুনিলাম না। এখন ওগো বড়াই, আমি মনে মনে বুঝিতে পারিলাম, সেই কারণেই এত দুঃখ পাইলাম ॥ ১ ॥ এখন আমি কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তাঁহাকে বলো যে রাধা তাঁহার মিলন প্রার্থনা করে। বলিও, কৃষ্ণ যখন আমার সঙ্গ কামনা করিয়াছিলেন তখন আমি বালিকা ছিলাম। এখন আমার পূর্ণ যৌবন। আমাকে ছাড়িয়া তিনি কোথায় গেলেন ॥ ২ ॥ পূর্ণচন্দ্রের মত যাঁহার মুখ, পদ্মের মত লোচনযুগল, পাপবিমোচন সেই কৃষ্ণ আমাকে অতিশয় দুঃখ দিয়া কোনো যুবতীর সঙ্গে কেলি করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হায় অদৃষ্টে কি লিখিত আছে? বালগোপাল আমাকে দয়া করিলেন না, কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইলাম না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

---

১ অ। প্র: তদা মাধবমন্বিষ্য।
২ অ। প্র: আরতী।

সংপ্রহৃষ্টোহন্য গোবিন্দো রমমাণো ময়া সহ।
সবিধন্তস্য জরতি প্রণামে গন্তুমুচ্যতাং॥

গোবিন্দ প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত প্রমোদবিহার করিয়াছেন। হে বড়াই, কিভাবে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিতে যাওয়া যায় তাহা বলো।

কহ্নরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ আল আলিছিল নান্দের নন্দন।
বাহুলতাপাশেঁ বান্ধিআঁ এ দিলোঁ মোঞঁ দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১ ॥
কি হরি হরি গোবিন্দ এ আল প্রাণ নৈল বাঁশীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
নানা আভরণগণে শোভক এ নীল জলদ সম দেহা।
সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ ভাবি ভাবি তাহার নেহা ॥ ২ ॥
নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ থাকিলোঁ মো কাহ্নকোলে সুতী।
হেন সম্ভেদে মো জাগিলোঁ এ নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ৩ ॥
সে নারীর সফল জীবন এ জারে কাহ্ন সুরতীঞঁ তোষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই, আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি নন্দনন্দন আসিয়া বাহুপাশে বাঁধিয়া আমাকে নিবিড় আলিঙ্গন দিলেন ॥ ১ ॥ হে হরি, হে গোবিন্দ, বাঁশির শব্দে আমার প্রাণ লইল ॥ ধ্রু ॥ নীল জলদের ন্যায় তাঁহার দেহ নানা আভরণে শোভিত। হায়, সেই কৃষ্ণের প্রীতির কথা ভাবিতে ভাবিতে বিরহ বেদনায় কাতর হইয়াছি ॥ ২ ॥ নানা ফুলে শয্যা রচনা করিয়া কৃষ্ণের অঙ্কে শুইয়াছিলাম। এমন সময় জাগিয়া উঠিলাম। হায়, বৃথাই রাত্রি কাটিয়া গেল ॥ ৩ ॥ তিনি আলিঙ্গন দিয়া যাহাকে পরিতুষ্ট করেন, সেই রমণীরই জীবন সার্থক। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ প্রকীর্ণকং ॥ চিত্রকঃ ॥ লগনী ॥
রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর।
বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর ॥ ১ ॥
হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর।
তথাঁ গিআঁ চাহী তাক কিছু নাহিঁ ডর ॥ ২ ॥
মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহিঁ কিছু বুধী।
হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী ॥ ৩ ॥
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন।
তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন ॥ ৪ ॥

রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন।
তথাঁ হেন রাধিকারে বুইল বচন ॥ ৫ ॥
আগু জাঅ রাধা কাহ্নু চাহিতেঁ আপুণী।
তবেঁসি মেলিব তোকে দেব চক্রপাণী ॥ ৬ ॥
বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী।
একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী ॥ ৭ ॥
দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী।
মদনে মুরুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ৮ ॥
মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ততিখনে।
অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে ॥ ৯ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১০ ॥

বড়াইর উক্তি: নাতিনী রাধা, আমার কথা শোনো। আজ প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে গেলেন ॥ ১ ॥ আমার মনে হয় তিনি বনের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে গিয়া তাঁহার খোঁজ করি। বনে ভয়ের কিছু নাই ॥ ২ ॥ রাধার উক্তি: মুগ্ধা বড়াই, তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। হাতে পাইয়াও গুণনিধি কৃষ্ণকে কেন ছাড়িয়া দিলে ॥ ৩ ॥ চলো চলো, তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাই। সেখানে গেলে অবশ্যই নন্দনন্দনের দেখা পাইব ॥ ৪ ॥ কবির উক্তি: রাধার কথায় বড়াই বৃন্দাবনে গিয়া সেখানে রাধিকাকে এই কথা বলিল ॥ ৫ ॥ বড়াইর উক্তি: রাধা, কৃষ্ণের সন্ধানে তুমি নিজে অগ্রসর হইয়া যাও। তবেই দেবচক্রপাণিকে তুমি দেখিতে পাইবে ॥ ৬ ॥ কবির উক্তি: বড়াইয়ের কথা শুনিয়া রাধা হৃষ্টমনে একাকীই বৃন্দাবনে গেলেন। ॥ ৭ ॥ গিয়া দেখিলেন বনমালী গোষ্ঠরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া মদনকাতরা রাধা মূর্ছিত হইলেন ॥ ৮ ॥ তখনই বড়াই ব্যস্তসমস্ত হইয়া মুখে জল দিয়া রাধার চৈতন্য সম্পাদন করিল ॥ ৯ ॥ চৈতন্য পাইয়া রাধা বলিতে লাগিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১০ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥

বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী ॥ ১ ॥
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুরুতী ॥ ২ ॥
আর যত দুখ দিলোঁ কদমের তলে।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্নু না জাণিলোঁ ভোলে ॥ ৩ ॥

বারেঁ বারেঁ তোক[১] যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব গদাধরে ॥ ৪ ॥
যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ ॥ ৫ ॥
আর দুখ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ ভার।
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার ॥ ৬ ॥
না শুণিলোঁ তোর বোল আঁ[২] জাইতেঁ পাণী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী ॥ ৭ ॥
আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান।
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ ॥ ৮ ॥
নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

রাধার উক্তি: আমি যখন নিতান্তই বালিকা ছিলাম তখন হে বনমালী, তুমি আমার বিরহে ব্যাকুল হইয়াছিলে ॥ ১ ॥ তখন তোমার পান ফুল আমি গ্রহণ করি নাই, তোমার দূতীকে মারিয়াছি। হে মদনমোহন, আমার সে দোষ ক্ষমা করো ॥ ২ ॥ কদম্বতলে ভ্রান্তিবশতঃ আরো যে সব অপরাধ করিয়াছি, হে কৃষ্ণ, সে সকল অপরাধ মার্জনা করো ॥ ৩ ॥ হে গদাধর, অহংকার করিয়া বারংবার তোমাকে যাহা বলিয়াছি সে দোষও খণ্ডন করো ॥ ৪ ॥ নৌকায় পার হইবার সময় তোমাকে যত দুঃখ দিয়াছি, হে কৃষ্ণ, তোমার পায়ে ধরিতেছি, আমার সে দোষ ক্ষমা করো ॥ ৫ ॥ তোমাকে ভারবহন করাইয়া যে দুঃখ দিয়াছি, হে জগন্নাথ, আমার সে অপরাধ খণ্ডন করো ॥ ৬ ॥ জল লইয়া যাইবার সময় তোমার কথা শুনি নাই, চক্রপাণি, আমার সে দোষ ক্ষমা করো ॥ ৭ ॥ অনাথা রমণীর প্রতি কতক্ষণ অভিমান থাকে? হে কৃষ্ণ, আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ বাঁচাও ॥৮॥ হে নন্দনন্দন, আমাকে উপেক্ষা করিও না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৯ ॥

ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে।
আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে ॥
যমুনাত পার কৈলো নিলোঁ দধিভার।
তভোঁ তোষিতেঁ নারিলোঁ মন তোহ্মার ॥ ১ ॥
যৌবনগরবেঁ রাধা বড় দিলে দুখ।
চাহিতেঁ না ফুরে আর তোহ্মার মুখ ॥ ধ্রু ॥

১ 'তোক' তোলাপাঠে।
২ অ। প্র: লআঁ।

বড়ার বহুআরী তোহ্মে আইহনের[১] রাণী।
কোণ লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী ॥
কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ।
ভার বহায়িআঁ ভাণ্ডায়িলেঁ দেবরাজ ॥ ২ ॥
চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী।
ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী ॥
কিসক করহ রাধা আহ্মারে যতন।
না পাত জঞ্জাল এবেঁ জাওঁ বৃন্দাবন ॥ ৩ ॥
ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন।
এতেকেঁ নিবারিলোঁ রাধা তোহ্মাতেঁ মন ॥
এহা তত্ব জাণী কর ঘরকে গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : হে গোপকন্যা, দধি বিক্রয় করিবার জন্য যখন প্রতিদিন যাইতে তখন আকুল অনুনয় করিয়াছি। আজ তাহা কেন ভুলিলে? তোমাকে যমুনা পার করিয়া দিলাম, তোমার দধিভার নিজে বহন করিলাম, তবু তোমার মন তুষ্ট করিতে পারিলাম না ॥ ২ ॥ যৌবনের অহংকারে আমাকে যে দুঃখ দিয়াছ, হে রাধা, সে জন্য আর তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না ॥ ধ্রু ॥ তুমি আইহনের রাণী, বড়লোকের স্ত্রী। তুমি দেবচক্রপাণিকে ভজনা করিতে আসিয়াছ কোন্ লজ্জায়? রাধা, তোমার কাজের কথা বলিতে আমার লজ্জা হয়। আমি দেবরাজ, আমাকে তুমি ভার বহাইয়া বঞ্চনা করিয়াছ ॥ ২ ॥ আমার প্রতি মন না দিয়া, যাও গৃহে গিয়া নিজের স্বামী আইহনের সেবা করো। আমাকে এত অনুনয় করিতেছ কেন? এখন বৃন্দাবন চলিলাম, আর গণ্ডগোল করিও না ॥ ৩ ॥ তোমার যৌবনকে এখন আমি তুচ্ছজ্ঞান করি। তোমার প্রতি এখন আমার অনুরাগ নাই—এই সত্য কহিলাম। ইহা জানিয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বিভাষকহুরাগঃ ॥ একতালী ॥

নান্দের নন্দন কাহ্নাঞি তোহ্মে বনমালী।
ত্রিভুবনে গোসাঞি তোহ্মে আধিকারী ॥
নরসিংহরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারী।
কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী ॥ ১ ॥
আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন।
জায়িতেঁ নে মোরে আপণ ভুবন ॥ ধ্রু ॥

১ 'আই' তোলাপাঠে।

নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ।
বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্নু ॥
তোহ্মাক চাহিআঁ ভৈল পাঞ্জর শেষ।
এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ ॥ ২ ॥
তোহ্মা বিণি মোর রূপ যৌবন নিফল।
হে[১] ভাবি আইলোঁ মোঞ কদমের তল ॥
বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোহ্মার কারণে।
তবেঁ মোকে নাহি দিলেঁ তোহ্মে দরশনে ॥ ৩ ॥
মোর রূপ[২] যৌবনে পড়িলাহা ভোলে।
দূতা দিআঁ পাঠায়িলেঁ কর্পূর তাম্বুলে ॥
দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কালে।
আন্তর পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে ॥ ৪ ॥
যোড় হাত করী গোসাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
আহ্মার সকল দোষ খণ্ডহ বিদূরে ॥
নিকট বসিতেঁ মোক দেহ আনুমতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৫ ॥

রাধার উক্তি: হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ, হে বনমালী, ত্রিভুবন তোমার অধিকারে, ত্রিভুবনের তুমি প্রভু। নরসিংহরূপে তুমি হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিলে। কংস নিধনের উদ্দেশ্যে তুমি গোকুলে অবতরণ করিয়াছ ॥ ১ ॥ হে শ্রীহরি, হে গোবিন্দ, হে মধুসূদন, আমাকে স্বস্থানে লইয়া চলো ॥ ধ্রু ॥ আমার সহিত বিবিধ কেলি করিয়া আমার প্রাণ হরণ করিয়া আমাকে ব্যাকুল- করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও। তোমার সন্ধানে আমার বক্ষের পাঞ্জর বিদীর্ণ হইল। হে হৃষীকেশ এতদিনে তোমার দেখা পাইলাম ॥২॥ তোমা-ভিন্ন আমার রূপযৌবন নিষ্ফল জানিয়া আমি কদম্বের তলে আসিয়াছি। তোমার জন্য সারা রাত্রি এখানে কাটাইলাম॥ ৩ ॥ একদিন তুমিই আমার রূপযৌবনে মোহিত হইয়া দূতীর হাতে কর্পূর তাম্বূল পাঠাইয়াছিলে। তখন আমার বুদ্ধি ছিল অপরিণত, তাই দূতীকে মারিয়াছি। এখন বিরহ অনলে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে ॥ ৪ ॥ আমি তোমায় করযোড়ে বলিতেছি, প্রভু আমার সকল দোষ মার্জনা করো। আমাকে তোমার পার্শ্বে বসিতে অনুমতি দাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৫ ॥

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিকট না আইস লোক বুলিব আবোল।
দূর থাকি বোল রাধা শুণ মোর বোল ॥

---

১ অ। প্র: হেন।
২ 'রূপ' তোলাপাঠে।

এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার ॥ ১ ॥
কমণ ঝগড় রাধা পাতসি তোঁ।
পরনারী হরণ না করোঁ মো ॥ ধ্রু ॥
উতপতি ভৈল তোর উত্তম কুলে।
আহ্মে ত ভাগিনা তোর[১] দেবসমতুলে ॥
সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সঙ্গে[২] কেলি।
মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী ॥ ২ ॥
দূতা দিঞা পাঠায়িলোঁ গলার গজমুতী।
তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি সতী ॥
এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ৩ ॥
বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর।
মায় জসোদা পুষিলেক দিঞাঁ খীর ॥
তেকারণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বন্দিঞাঁ বাসলী ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : নিকটে আসিও না, লোকে কুকথা বলিবে। আমার কথা শোনো, দূরে থাকিয়া যাহা বলিবার আছে বলো। এতদিনে বুঝিলাম কলিকাল আসিয়াছে। সকল লোক ছাড়িয়া নারী অবৈধরূপে ভাগিনাকে কামনা করে॥ ১ ॥ রাধা, এ তোমার কি অন্যায় কথা? আমি কখনো পরনারী হরণ করি না॥ ধ্রু ॥ সদ্‌বংশে তোমার জন্ম হইয়াছে, আমি তোমার ভাগিনেয় দেবসমতুল্য। তোমার সহিত আমার মিলন সমুচিত নহে। সুতরাং আমার সহিত রঙ্গরস করিও না॥ ২ ॥ যখন দূতীর হাতে গলার গজমোতি উপহার পাঠাইয়াছিলাম তখন তো বলিয়াছিলে আমি শিশুকাল হইতে সতী। এখন এতো মনোবেদনা কেন? যাও, তোমার ওই নবযৌবন পুঁটলি বাঁধিয়া রাখো॥ ৩ ॥ আমার পিতা নন্দ ঘোষ, মামা হইলেন বীর আইহন। মাতা যশোদা স্তন্য দিয়া পালন করিয়াছেন। সেইজন্য তুমি আমার মামী, তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। বডু চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

গুণ বুঝি মধুকর পরিহর বন।
আইস বন মাঝেঁ বিকচ নলীন ॥

১ 'র' তোলাপাঠে।
২ অ। প্র: সঙ্গে।

তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত।
নাগর জনের হেন...[১] উচীত ॥ ১ ॥
তোহ্মারে দেখিঞাঁ মোরে পঞ্চশরে মারে।
নিদয়হৃদয় কাহ্নু দয়া কর মোরে ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী।
এক তোহ্মা গতী পুছিঞাঁ চাহা দূতী ॥
বড় পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী।
আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী ॥ ২ ॥
কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্নু।
একবার কর দেব আহ্মার সমান ॥
তোহ্মার সমান তোহ্মার সম মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী।[২]
কর রতী অনুমতী পৃয় বনমালী ॥ ৩ ॥
নিফল না কর রাধা[৩] কাহ্নু আহ্মার যৌবন।
যাচক জনের কাহ্নু করহ তোষণ ॥
আলিঙ্গন দিঞাঁ রাখ আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : মধুকর গুণ বুঝিয়া বন পরিহার করো। যে বনে কমল বিকশিত হইয়াছে সেই বনে আইস। আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কেন? ইহা নাগরজনের পক্ষে উচিত নয় ॥ ১ ॥ তোমাকে দেখিয়া আমি মদনানলে দগ্ধ হইতেছি। নিষ্ঠুর কানাই আমাকে দয়া করো ॥ ধ্রু ॥ হে কৃষ্ণ, আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কাহারো প্রতি আমার আকর্ষণ নাই। তুমিই আমার একমাত্র গতি। সত্য কিনা দূতীকে জিজ্ঞাসা করো। বড় আশা করিয়া খোঁপায় ফুল দিয়া তোমার সন্ধানে বৃন্দাবনে আসিয়াছি ॥ ২ ॥ হে কৃষ্ণ, একবার কায়মনে প্রসন্ন হইয়া আমার মন রাখো। আমি তোমার অযোগ্য নহি। হে বনমালী, হে প্রিয়তম, একবার আমার আলিঙ্গন-প্রার্থনা পূরণ করো ॥ ৩ ॥ আমার যৌবন ব্যর্থ করিও না। যে যাচক তাহাকে তুষ্ট করো। আলিঙ্গন দান করিয়া আমাকে বাঁচাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন।

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই ॥

১ ছাড় প্র : না হএ।
২ অ। প্র : তোহ্মার সমান মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী।
৩ 'রাধা' শব্দটি অতিরিক্ত বসিয়া গিয়াছে।

মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞাঁ আহ্মে ব্রহ্মগেআন ॥ ১ ॥
দূর আমুসর সুন্দরি রাহী।
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী ॥ ধ্রু ॥
ইহা[1] পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥ ২ ॥
গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ।
তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন ॥
এবে দেহে মোর নাহি বিকার।
আসার দেখীলো সব সংসার ॥ ৩ ॥
রাধাক বুলিলোঁ[2] নিঠুর বাণী।
নাগরবর দেব চক্রপাণী ॥
ধেআনে থাকিল নিচলমনে।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : মন পবনকে গগনে স্থাপন করিয়া দিবারাত্র আমি যোগসাধন করি। এখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মূলকমলে মধুপান করিয়াছি ॥ ১ ॥ সুন্দরী রাধিকা, দূরে থাকো, আমাকে কামনা করিও না ॥ ধ্রু ॥ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সন্ধিস্থলে মন-পবনকে বন্দী করিয়াছি। দশম দ্বার রুদ্ধ করিলাম, এখন আমি যোগমার্গে আরোহণ করিয়াছি ॥ ২ ॥ আমি জ্ঞানবানের সাহায্যে মদনবানকে ছিন্ন করিয়াছি। তাই তোমার যৌবন দেখিয়া আর ভুলি না। আর আমার দেহে কোনো বিকার নাই। সমস্ত সংসারকে অসার বুঝিয়াছি ॥ ৩ ॥ কবির উক্তি : দেবচক্রপাণি নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া নিশ্চল মনে ধ্যানমগ্ন হইলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

চিরাদমধুরাং[3] পীত্বা রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ।
জগাদ জগতাং রম্যা বচনং করুণান্বিতং ॥

জগতের মনোরমা শ্রীরাধিকা মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের এই অমধুর বাক্য অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিলেন। অনন্তর করুণামিশ্রিত এই বাক্য বলিলেন।

---

১ অ। প্র: ইড়া
২ অ। প্র: বুলিল।
৩ অ। প্র: মধুরং।

বঙ্গালবরাড়ী[১] ॥ রূপকং ॥

আতি দুখিনী বালী ল।
আল নবলীদলকোঅলী ল।
আল মদনবাণে পরাণে আকুলী ল।
বিরহে না মার মোরে ল।
আল চরণে ধরোঁ[২] তোরে ল।
আল তিরিবধপাপ নাহিক ডর তোহ্মারে ল ॥ ১ ॥
কাহ্নু কিকে কর আসম্মতী ল।
আল মাথ তুলিঞাঁ দেখহ আহ্মার গতী ল ॥ ধ্রু ॥
যাবত আছে পরাণে ল। তাবত দেহ বচনে[৩]।
আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে ল।
যবে দরশন ভৈল। তবে কেহ্নে না তেজিল।
এবেঁ তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল ॥ ২ ॥
কাহ্নু তোহ্মার নেহাত লাগি ল। সকল রজনী জাগি ল।
তোহ্মাক না পাইল মোঞেঁ ত বড় আভাগী[৪]।
এবে পায়িলোঁ দরশনে ল। আর জরমের পুনে ল।
দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল ॥ ৩ ॥
দেখী মোর দেহগতী ল। নিঠুর তোহ্মার মতি ল।
বুঝিতেঁ নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল ॥
এভোঁ দয়া ধর মোরে ল। জীঞোঁ মোঁ সঙ্গমে তোরে ল।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস[৫] বাসলীবরে ল ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : হে কৃষ্ণ, আমি অতি দুঃখিনী বালিকা, বনমল্লিকা দলের মত কোমল আমি। তাহাতে মদনজ্বালায় প্রাণ কাতর। আমি তোমার চরণ ধরিয়া বলি আমাকে বিরহজ্বালায় আর জ্বালাইও না। স্ত্রীবধ পাপের ভয়ও কি তোমার নাই ॥ ১ ॥ ওগো, মাথা তুলিয়া আমার দশা দেখো। কেন আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ ॥ ধ্রু ॥ দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে সম্মতি দাও। নহিলে তোমার ধ্যানেই আমার প্রাণ বাহির হইবে। যখন দেখা হইল তখনই কেন ত্যাগ করিলে না? এখন তুমি আমাকে

১ অ। প্র : বঙ্গালবরাড়ীরাগঃ।
২ 'র' কাটিয়া তোলাপাঠে 'রোঁ'।
৩ ছাড়। প্র : বচনে ল।
৪ ছাড। প্র : আভাগী ল।
৫ 'গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস' বাক্যটি লিপিকরের অনবধানতাবশতঃ দুইবার বসিয়া গিয়াছে।

অতিশয় দুঃখিনী করিলে ॥ ২ ॥ হে কৃষ্ণ, তোমার প্রেমলাভের আশায় সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। অভাগিনী আমি তবু তোমাকে পাইলাম না। গতজন্মের পুণ্যফলে এতক্ষণে তোমার দেখা পাইয়াছি। দামোদর আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৩ ॥ আমার দেহের অবস্থা দেখিয়াও তুমি নিষ্ঠুর হইয়া রহিলে, তুমি স্ত্রী না পুরুষ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখনো আমাকে দয়া করো। তোমার আলিঙ্গন পাইয়া প্রাণে বাঁচি। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥

রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম
আহ্মার শুণ তোহ্মে কথা।
সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল
তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা ॥ ১ ॥
রাধা ল আহ্মে চিত্ত নেবারিল তোরে।
বাপ বসুল মাঅ দৈবকী ইল[১] মোরে ॥ ধ্রু ॥
উত্তম কুলত মোর জরম ভৈল ল
আহ্মা লঞাঁ নাহি পরদারে।
... ...
আহ্মে দেব ত্রিভুবনে সারে ॥ ২ ॥
আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল
যুগেঁ যুগে অবতার করী ল।
অসুর মারিঞাঁ ধরণী পাতিল
সব পাপ করম নেবারী ॥ ৩ ॥
এভহোঁ নিলজী রাহী ছাড় মোর আশে ল
সব গোপ নাহী জাণে।
চল তোহ্মে নিজ বাস গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বন্দিঞাঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি: আমি রঘুবংশপ্রধান, আমার নাম শ্রীরাম। আমার কথা তুমি শোনো। পুত্র এবং বান্ধবাদিসহ লঙ্কার রাবণ যখন দুর্বার হইয়া উঠিল তখন আমিই তাহার দশ মাথা ছেদন করিয়াছি ॥ ১ ॥ রাধা, তোমা হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিলাম। পিতা আমার বসুদেব, মাতা দৈবকী ॥ ধ্রু ॥ উত্তম কুলে আমার জন্ম হইয়াছে, আমি পরদার গ্রহণ করি না। ত্রিভুবনে আমি প্রাধান ॥ ২ ॥ আমি হরি, আমিই নারায়ণ, মুকুন্দমুরারী আমারই নাম। আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অসুর নিধন করিয়া

১ অ। প্র: হইল।

ধরণীকে সকল পাপকর্ম হইতে মুক্ত করিয়াছি ॥ ৩ ॥ লজ্জাহীনা রাধিকা, এখনো আমার আশা পরিত্যাগ করো, এখনো সকল গোপী ইহা জানে না। তুমি নিজবাসে ফিরিয়া যাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী।
আরে কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী ॥ ল ॥
তোহ্মে জবে[১] যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ।
থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ ॥ ল ॥ ১ ॥
না জাইবোঁ ঘর আর[২] তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ।
বড় দুখ পাইলোঁ তোর বিরহে পুড়িঞাঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
পরাণে না মার মোরে[৩] দেব গদাধরে।
তিরিবধভয় কেহ্নে নাহিক তোহ্মারে ॥
সপনে গেআনে মনে তোহ্মাক চিন্তিলোঁ।
তার ফল ভাল কাহ্নাঞি তোহ্মা হইতে পায়িলোঁ ॥ ২ ॥
হেন মনে পরিভাব জগত ইশর।
আহ্মাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোহ্মার ॥
আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী।
তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী ॥ ৩ ॥
এত কাল আহ্মাক তেজিতেঁ এখোখণে।
সকতি না ভৈল তোর নেহার[৪] কারণে ॥
কোণ লাজে বোল এবেঁ মোক জাইতে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: বহু তপস্যার ফলে বিধাতার কাছে তোমাকে পাইয়াছি। কেন আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ। তুমি যদি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া যোগী হইয়া থাকো তাহা হইলে আমিও যোগিনী হইয়া তোমার সেবিকা হইয়া থাকিব ॥ ১ ॥ আর তোমাকে ছাড়িয়া ঘরে যাইব না। তোমার বিরহে দগ্ধ হইয়া বড় দুঃখ পাইয়াছি ॥ ধ্রু ॥ হে প্রভু হে গদাধর, আমাকে প্রাণে মারিও না। তোমার কি স্ত্রীবধের ভয় নাই? কি স্বপ্নে কি জাগরণে সারাক্ষণ মনে মনে তোমার চিন্তা করিয়াছি। হে কৃষ্ণ, তোমা

১ 'জবে' তোলাপাঠে।
২ 'আর' তোলাপাঠে।
৩ 'মোরে' তোলাপাঠে।
৪ 'হ'র 'া'-কার ও 'র' তোলাপাঠে।

হইতে তাহার এই ভাল ফল পাইলাম ॥ ২ ॥ হে জগদীশ্বর, এই কথাটি মনে করিয়া দেখো তো, আমাকে প্রাণে মারিলে তোমার লাভ কি ? আমি অনাথ রমণী, তোমার অনুগত, তোমার ভক্ত, তথাপি হে মুরারী, আমাকে কি কারণে পরিত্যাগ করিতেছ ॥ ৩ ॥ আমার প্রতি প্রেমবশতঃ এতকাল একমুহূর্তের জন্যও আমাকে ত্যাগ করিতে পার নাই। এখন কোন্ লজ্জায় আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ ? বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আতি বিরহে অন্ন না খাইলো তোর প্রথম যৌবনে।
দুতার বচনে আতি বিরাগেঁ তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাণে ॥
মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ তোহ্মা তেজিলোঁ জতনে।
এবে গোআলিনী তো কাকুতি করসী আহ্মা পায়িতেঁ আকারণে ॥ ১ ॥
না কর জতন সুন্দরী রাধা আহ্মাত না পাত মায়া।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী আহ্মে নিরঞ্জন কায়া ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে তোক না কৈলোঁ[১] যতনে।
এবেঁ আকুলী হঞাঁ কাম বাণে কেহ্নে চাহসি আহ্মারে[২] ॥
হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা না দিল সরস বাণী।
ছারেঁ খারেঁ এবে যাউর[৩] যৌবন সুণ আয়িহনের রাণী ॥ ২ ॥
আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুয়র তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।
যৌবন গরবে আহ্মা না চিহ্নিলী সুণ মুগধী পামরী ॥
সব দৈত্যগণ আপণে মারিলো মোঞে তোহ্মার আন্তরে।
... ...[৪] যুগতি করিঞাঁ তোহ্মা সংপিল আহ্মারে ॥ ৩ ॥
তেজ সঙ্গ মোর[৫] নাহি মোতে রঙ্গ আর তোহ্মার শৃঙ্গারে।
সকল গোকুল ভার বহাইলে করায়িলে বড় খাঁখারে ॥
ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস তেজহ আহ্মার আস।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিঞাঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : তোমার প্রথম যৌবনে তোমার জন্য কাতর হইয়া অন্ন গ্রহণ করি নাই। তোমার উপরে রাগ করিয়া দূতীর কথায় তোমাকে পঞ্চশর হানিয়াছি। এখন

১ অ। প্র : মোকে না কৈলে।
২ অ। প্র : আহ্মারে চাহসি কেহ্নে।
৩ অ। প্র : যাউক।
৪ আনুমানিক ছয়টি অক্ষর ছাড় পড়িয়াছে। বসন্তরঞ্জন 'সব দেবেঁ মেলি' বসাইয়াছেন
৫ অ। প্র : তেজ মোর সঙ্গ।

মনকে নিবৃত্ত করিয়া তোমাকে সযত্নে পরিহার করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছি। এখন হে গোপকন্যা, আমাকে লাভ করিবার জন্য বৃথাই অনুনয় করিতেছ ॥ ১ ॥ আমাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিও না। আমিই সত্য আমিই ত্রেতা আমিই দ্বাপর আমিই কলি। নিরঞ্জনকায় বুদ্ধও এই আমি ॥ ধ্রু ॥ অহোরাত্র যমুনাতীরে অবস্থান করিয়াছি, তখন আমাকে গ্রাহ্য করো নাই। এখন মদনশরাহত হইয়া আমাকে প্রার্থনা করিতেছ কেন? আমি যখন হাসিয়া কথা বলিয়াছি তখন একটি সরস কথা বলো নাই। হে আইহন-ঘরণী, এখন তোমার যৌবন ছারখার হউক ॥ ২ ॥ আমি কশ্যপ ঋষির পুত্র, তুমি সাগর-দুহিতা। যৌবনের অহংকারে হে মুগ্ধা পামরী, তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না। তোমারই জন্য সকল দৈত্যকে আমি নিধন করিয়াছি। সকল দেবতা মিলিয়া পরামর্শ করিয়া আমার জন্য তোমাকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩ ॥ এখন আমার সঙ্গ ত্যাগ করো। তোমার সাহচর্যে এখন আমার আনন্দ নাই। গোকুলে আমার দ্বারা ভার বহাইয়া আমাকে বড়ই যন্ত্রণা দিয়াছ। এখন আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কহুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

আহে কাহ্নাঞিঁ।
আছিলোঁ মোঁ শিশুমতী — না জাণিলোঁ রঙ্গ রতী
এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ।
আহোনিশি একমতী — তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী
এবেঁ কৃষ্ণ[১] করহ আদেশ ॥ ১ ॥

আহে রাধা।
বাপ বসুল মোর — গোকুলে আহ্মার ঘর
গোপ লোকেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে।
সুণিলেঁ পাইব লাজ — তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ
মোর পাশ আইস অকারণে ॥ ২ ॥

ছার তিরী বামা জাতী — নানা দোষেঁ উতপতী
তাক কোপ রহে কত খনে।
তোহ্মার বিরহে মোর — আকুল পরাণ হে
নিঠুর বোলহ কি কারণে ॥ ৩ ॥

সুণ ল সুন্দরী সতী — বুঝিলোঁ তোহ্মার মতী
সুণ পাপপুণ্যের উত্তর।
পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গ জাইএ — নানা উপভোগ পাইএ
পাপেঁ হএ নরকের ফল ॥ ৪ ॥

১ প্রথম 'সরস' ছিল, পরে কাটিয়া তোলাপাঠে 'কৃষ্ণ'।

দৈবকীর পুত্র তোহ্মে বসুলকুমার হে
তোহ্মে দেব কংশের আরী।
গোপীর বালেন্দু হরী আহ্মে বিরহিণী নারী
তোহ্মা বিণি বঞ্চিতেঁ না পারী ॥ ৫ ॥
তোরে বোলোঁ চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
কেহ্নে বোল হেন পাপবাণী।
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল
তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী ॥ ৬ ॥
না বোল মোরে[১] নিরাস একবার নেহ পাশ
তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস।
আনেক জরম পুনে ভজিলোঁ তোর চরণে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৭ ॥

রাধার উক্তি: হে কৃষ্ণ, আমি নিতান্তই শিশু ছিলাম, রঙ্গরতি জানিতাম না। এখন দেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এখন তোমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি। তোমা ছাড়া আর আমার গতি নাই। হে কৃষ্ণ, আমার প্রতি অনুকূল হও ॥ ১ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: রাধা, বসুদেব আমার পিতা, গোকুলে আমার বাস, গোপগণ আমাকে ভালরূপে জানে। তাহারা শুনিলে লজ্জা পাইবে। তোমাতে আমার আর প্রয়োজন নাই। আমার নিকটে তুমি বৃথাই আসিয়াছ ॥ ২ ॥ রাধার উক্তি: স্ত্রীজাতি বুদ্ধিহীনা, নিতান্তই তুচ্ছ। নানা দোষে তাহার উৎপত্তি। তাহার প্রতি কি কেহ দীর্ঘকাল কোপ পোষণ করে? তোমার বিরহদুঃখে আমার প্রাণ ব্যাকুল, আমাকে কেন নিষ্ঠুর কথা বলিতেছ ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: ওগো সুন্দরী সতী, তোমার মতি আমি বুঝিয়াছি। এখন পাপপুণ্যের কথা বলি শোনো। পুণ্য করিলে স্বর্গে গিয়া নানা সুখ উপভোগ করে। পাপের ফলে নরকে যাইতে হয় ॥ ৪ ॥ রাধার উক্তি; তুমি দৈবকীর পুত্র, তুমি বাসুদেব, হে প্রভু, তুমি কংসের অরি। গোপীগণের নিকট নবোদিত চন্দ্রের মত প্রিয়। তোমা ভিন্ন আমি প্রাণে বাঁচি না ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: শোনো চন্দ্রাবলী, তোমাকে বলি। আমি দেববনমালী। আমার নিকট পাপকথা বলিও না। যশোদা আমার মাতা, আইহন আমার মামা। তুমি আমার নিকট-সম্পর্কের মাতুলানী ॥ ৬ ॥ রাধার উক্তি: আমাকে এমন নৈরাশ্যকর কথা বলিও না। তুমি আমার পতি, একবার তোমার পার্শ্বে আমায় গ্রহণ করো। বহুজন্মের পুণ্যফলে তোমার চরণভজনা করিতে পাইলাম। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৭ ॥

১ 'মোরে' তোলাপাঠে।

শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার ।
লাজে পিঠ দিআঁ মো বহিলোঁ দধিভার ॥
দুসহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল ।
রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল ॥ ১ ॥
বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে ।
যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা না চিহ্নিলেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা পাইলোঁ দুখ ।
হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর ।
তোভোঁ মোর বচনে না দিলেঁ উত্তর ॥ ২ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলোঁ মাহাদাণী ।
তবেঁ বোলাইলেঁ সতী আইহনের রাণী ॥
এবেঁ কেহ্নে গোআলিনী হেন তোর মতী ।
তোহ্মে রতীএঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী ॥ ৩ ॥
নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দূর ।
জুণি সুধি পাএ রাধা[১] রাজা কংশাসুর ॥
আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : হে রাধা, দুস্তর যমুনায় তোমাকে পার করিয়াছি। লজ্জা বিসর্জন দিয়া দধির ভার বহন করিয়াছি। দুঃসহ মদনবাণে বড় দুঃখ পাইয়াছিলাম। তাই রাজ্য ভরিয়া কলঙ্ক রহিল ॥ ১ ॥ বিরহসন্তাপ কাহাকে বলে, হে রাধিকা এতদিনে তাহা বুঝিলে। তখন যৌবনের অহঙ্কারে আমাকে চিনিতে পার নাই ॥ ধ্রু ॥ তোমার জন্য বড় দুঃখ পাইয়াছি, তাই মনে মনে স্থির করিয়াছি আর কখনো তোমার মুখ দেখিবো না। তোমার জন্য ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি। তবু তুমি আমার কথার অনুকূল উত্তর দাও নাই ॥ ২ ॥ তোমার জন্য যখন মহাদানী সাজিলাম তখন হে আইহনঘরণী, নিজেকে সতী বলিয়া প্রচার করিলে। এখন গোয়ালিনী, তোমার এমন কুমতি হইল কেন? আমার চিত্ত এখন ধর্মে নিবদ্ধ ॥ ৩ ॥ আমাদের নিকট সম্পর্ক বিকৃত করিও না। এসব কথা যেন রাজা কংসাসুর শুনিতে না পায়। জানিও তোমার প্রতি আমার আর অনুরাগ নাই। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

১ 'রাধা' তোলাপাঠে।

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ ।
আপণে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞিঁ ॥
সকল সংপুন্ন মোর যৌবন সাজে ।
তাহাক তেজিতেঁ না জুআএ দেবরাজে ॥ ১ ॥
বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী ।
সিতা রামে দুঃখ পাইল সুণ চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী ।
রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ ।
তবেঁ তিরীবধ লাগে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মাএ ॥ ২ ॥
মদনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ ।
অকোপ হআঁ মোর আবথা দেখ ॥
একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

রাধার উক্তি : হে কৃষ্ণ কোন্ অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ। হে ভুবনেশ্বর, একবার বিচার করিয়া দেখো। এখন আমার পূর্ণ যৌবন। হে দেবরাজ আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয় ॥ ১ ॥ বিনা দোষে কেহ রমণীকে ত্যাগ করে না। হে চক্রপাণি, সীতার জন্য রাম দুঃখ পাইলেন। (তথাপি রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন।) ॥ ধ্রু ॥ কি স্বপ্নে কি জাগরণে একেলা কদমতলায় বসিয়া দিবা-রাত্র মনে মনে তোমারই চিন্তা করি। তোমার জন্য যদি আমার প্রাণ যায় তবে জানিও, স্ত্রীবধের পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে ॥ ২ ॥ মদনানলে আমি বিকল হইয়াছি। ক্রোধ বিসর্জন দিয়া আমার অবস্থা দেখো। একবার চলো, তোমায় আমায় বৃন্দাবনে যাই। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৩ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ ভাণ্ডাআঁ পাঠাইলি মোরে ।
এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহ মন জাএ তোহ্মারে ॥ ল ॥ ১ ॥
আল। চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা মো পরিহরিলোঁ তোরে ।
বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোদা তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ আগুনতাপে ।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে ॥ ২ ॥

যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ তোর সুরতির আশে।
বোল দিআঁ মোক ভার বহায়িলেঁ দেখি লোক উপহাসে ॥ ৩ ॥
এতেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী তোতে নিবারিলোঁ মন
ছাড় তোঁ আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : যখন তোমার কাছে দূতীকে পাঠাইলাম তখন আমাকে বঞ্চনা করিলে। এখন আমার প্রেম ভাঙ্গিয়াছে, তোমার প্রতি আর আমার আসক্তি নাই ॥ ১ ॥ রাধা, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। তুমি ফিরিয়া যাও। আমার পিতা নন্দ ঘোষ, মাতা যশোদা, সেই সম্পর্কে তুমি আমার মামী ॥ ধ্রু ॥ সোনা ভাঙ্গিলে তবু উপায় আছে তাহাকে আগুনের তাপে জোড়া যায়। পুরুষের প্রেম একবার ভাঙ্গিলে তাহাকে জুড়িতে পারে এমন ক্ষমতা কাহার আছে ॥ ২ ॥ যমুনার তীরে তোমার আলিঙ্গনের আশায় যখন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম তখন তুমি আমাকে আশ্বাস দিয়া ভার বহাইলে। তাহা দেখিয়া লোকে উপহাস করিল ॥ ৩ ॥ এইসব চিন্তা করিয়া তোমা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়াছি। আমার আশা পরিত্যাগ করো। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

সরস বসন্ত কালে কোকিলের কোলাহলে
এ নআ যৌবন কাহ্নাঞি প্রাণ রে ॥
এবেঁ তোহ্মার বিরহে মোর আকুল দেহে
আহ্মাকে তেজিতেঁ তোর উচিত নহে ॥ ১ ॥
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞি তোহ্মার মাউলানী।
তোর মোর নেহ সব দেব লোকেঁ ভালেঁ জাণী ॥ ধ্রু ॥
আছিলোঁ মো শিশুমতী না বুঝিলোঁ সুরতী
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী ॥
এবেঁ মো ভরযুবতী তোহ্মা ছাড়ি নাহিঁ গতী
এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী ॥ ২ ॥
সাগর সঙ্গম জলে তেজিবোঁ মো কলেবরে
এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে ॥
এহা জাণী গদাধর একবার দয়া কর
নহে তিরীবধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৩ ॥
যত কৈলোঁ সংযম করিলোঁ ব্রত নিয়ম
নঠ হএ কাহ্ন মোর সে সব ধরম ॥
এহি শপথ করোঁ কভোঁ যবেঁ তোহ্মা হরোঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : সরস বসন্তকাল আসিয়াছে, কোকিলের কূজন শুনিতেছি। হে কৃষ্ণ, এ নব যৌবন (কেমন করিয়া রক্ষা করি।) তোমার বিরহে আমি ব্যাকুল। আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নয়॥ ১॥ আমি তোমার মাতুলানী নই। তোমার আমার প্রেম দেবতাসমাজে সকলেই ভাল করিয়া জানে॥ ধ্রু॥ তখন শিশুমতি ছিলাম বলিয়া রতিকলা বুঝিতাম না। তাই তোমার বাক্যে সম্মতি দিই নাই। এখন আমি পূর্ণযৌবনা, তোমা ছাড়া অন্য পতি নাই। ইহা বুঝিয়া আমার প্রতি অনুকূল হও॥ ২॥ (নহিলে) সাগরসঙ্গমে দেহত্যাগ করিব অথবা এইখানেই বিষ খাইয়া মরিব। ইহা জানিয়া একবার আমার প্রতি দয়া করো। অন্যথা তুমি স্ত্রীবধের পাপে লিপ্ত হইবে॥ ৩॥ যত সংযম করিয়াছি, যত ব্রতনিয়ম পালন করিয়াছি, আমার সে সকল ধর্মানুষ্ঠান সবই বিফল হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আর কখনো তোমাকে বঞ্চনা করিব না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪॥

দেশবরাড়ীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালী॥
এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে বাঞ্ছহ রতী।
পরিহরি আপণার আইহন পতী॥ ১॥
এবেঁ কেহ্নে রাধা পাতসি মায়া মোহো।
এহাত না ভুলে আর নান্দের পোহো॥ ধ্রু॥
যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী।
পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী॥
আসুর মারিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীর ভার।
পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার॥ ২॥
যতন না কর রাধা আইহনের রাণী।
পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী॥
ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্মল কাএ।
তোক দেখি আরবার মন না জাএ॥ ৩॥
আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধেআন।
আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্ন॥
এহা বুঝী গোআলিনী ছাড় মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

কৃষ্ণের উক্তি : হে চন্দ্রাবলী, আমি যখন তোমাকে অনুনয় করিলাম তখন তুমি আমার পিতামাতার নাম উচ্চারণ করিয়া গালি দিলে। এখন নিজের স্বামী আইহনকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গ কামনা করিতেছ কেন॥ ১॥ এখন হে রাধা, মায়ামোহ-

বিস্তার করিতেছ কেন? নন্দপুত্র আর ইহাতে ভুলিতেছে না॥ ধ্রু॥ সৃষ্টিকর্তা বিশেষভাবে এই বিধান করিয়াছেন যে পাপ করিলে কোনো কর্মে সিদ্ধি লাভ হয় না। অসুর নিধন করিয়া আমি পৃথিবীর ভার খণ্ডন করিব। পাপ করিলে তাহা সম্ভব হইবে না ॥ ২ ॥ হে আইহনমহিষী, আমাকে লাভ করিবার জন্য আর প্রয়াস করিও না। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। ব্রহ্মোপাসনা করিয়া দেহ নির্মল করিয়াছি আর তোমার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইতেছে না॥ ৩॥ দিবারাত্র আমি যোগসাধনায় মগ্ন। তোমার মোহে আর আমার মন মুগ্ধ হইবে না। হে গোপকন্যা, এই বুঝিয়া আমার আশা পরিত্যাগ করো। চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ॥ যতিঃ॥

মৈলাক মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ।
আপণেঁঞিঁ গুণ কাহ্নাঞিঁ আপণ হৃদএ॥
এ তীন ভুবনে তোহ্মার আধিকার।
তোর আগেঁ গোপনারী হএ কোণ কাজ[১]॥ ১॥
না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন।
তাহার উচিত ফল দিলেক মদন॥ ধ্রু॥
কাহ্ন তোর নেহে আপণাক বড় মানোঁ।
তোত উপজিব রোষ তাক না জাণোঁ॥
পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।
তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদাক আহ্মে॥ ২ ॥
শরণ পসিলোঁ কাহ্ন চরণে তোহ্মারে।
যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে॥
সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী।
তোর বিরহসন্তাপ সহিতেঁ না পারী॥ ৩॥
একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার।
তোর পরসাদেঁ ঘুচে বিরহ আন্ধার॥
তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: যে মরিয়াই আছে তাহাকে মারিলে কি লাভ হইবে, হে কৃষ্ণ, তাহা আপন মনেই একবার চিন্তা করিয়া দেখো। তুমি তিনভুবনের অধিকারী, সামান্য গোপনারী—সে তোমার কাছে নিতান্তই নগণ্য॥ ১॥ দুর্বুদ্ধিবশতঃ তোমার কথা শুনি নাই এখন মদনের হাতে তাহার উচিত ফল পাইলাম॥ ধ্রু॥ হে কৃষ্ণ, তোমরাই প্রেমের গৌরবে আমি গর্বিতা, সেই তুমিই যে আমার প্রতি রুষ্ট হইবে আমি জানিতাম না॥ ২॥

---

১ অ। প্র: ছার/।

হে কৃষ্ণ, তোমার চরণে শরণ লইলাম, আমার যে গতি করিতে চাও এখনও তাহা করো। আমি সকল তাপ সহিতে পারি, কেবল তোমার বিরহজ্বালা সহিতে পারি না ॥ ৩ ॥ একবার হে জগন্নাথ, ইহার প্রতিকার করো, তোমার প্রসাদে বিরহদুঃখ দূর হউক, অনুকূল দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে আশ্বাস দাও। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে।
শুণী মোরে মনমথ মারে ॥
তিরীবধভয় না মানসি।
কেহ্নে মিছা মাউলানী ঘোসসি ॥ নাএ ॥ ১ ॥
আল হের মোরে দয়া না করহ কেহ্নে।
কাহ্নাঞিঁ ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
দুখদিআঁ সত্য বোলোঁ শিরে দেওঁ হাথ।
তোহ্মে মোর প্রাণ জগন্নাথ ॥
জিআঅ আড় নয়নে চাহী।
বিরহের জালাএ মরে রাহী ॥ ২ ॥
তিলেক যৌবন নাহিঁ টুটে।
তোহ্মা বিণী বুক মোর ফুটে ॥
এহা জাণী দয়া ধর মণে।
আহ্মা লআঁ জাহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥
তোহ্মা চিন্তি ঝুরোঁ আহোনিশী।
তভোঁ কেহ্নে দয়া না করসী ॥
মোরে না মারিহ শ্রীনিবাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: ভ্রমরের গুঞ্জন কোকিলের কুহুধ্বনি মদনের বাণরূপে আমার হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। হে কৃষ্ণ, কেন অকারণে মাতুলানী সম্বোধন করিতেছ? তোমার কি স্ত্রীবধের ভয় নাই ॥ ১ ॥ হে কৃষ্ণ, নিষ্ঠুর হইও না। কেন তুমি আমার প্রতি সদয় হইতেছ না ॥ ধ্রু ॥ হে আমার দুঃখদাতা, মাথায় হাত দিয়া শপথ করিতেছি তুমিই আমার প্রাণস্বরূপ। হে জগন্নাথ, তোমার বিরহজ্বালায় রাধার জীবন যায়। তুমি আড়নয়নে তাকাইয়া তাহাকে বাঁচাও ॥ ২ ॥ আমার যৌবন তিলমাত্র ক্ষয় পায় নাই, কিন্তু তোমাকে না পাইয়া আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। এই বুঝিয়া আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে লইয়া কুঞ্জবনে চলো ॥ ৩ ॥ তোমাকে ভাবিয়া ভাবিয়া দিবারাত্র চোখের জল ফেলিতেছি। তবু কেন তুমি দয়া করিতেছ না? হে শ্রীনিবাস মিনতি করিয়া বলিতেছি আমাকে প্রাণে মারিও না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধা ল। মথুরা জাইতেঁ যমুনাপথে দধির পসার লআঁ।
আনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ গেলাহা মোক দুখ দিআঁ ॥ ১ ॥
আল। ছিনারী পামরী নাগরী রাধা কিকে পাতসি মায়া।
তোহ্মে যবেঁ জাণ আহ্মে তোর প্রিয় তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া ॥ ধ্রু ॥
পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে দূতার হাথত দিআঁ।
বোল না ধরিলেঁ তাম্বূল পেলাইলেঁ বাম চরণে টালিআঁ ॥ ২ ॥
যেহেন প্রকারেঁ বড়ায়িক মাইলেঁ তিরীবধ হৈত মোরে।
যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মে তেঁসি জীবন তাহারে ॥ ৩ ॥
যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।
এহা বুলী কাহ্নাঞিঁ নিরব হয়িলা গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : হে রাধা, তুমি দধির পসরা লইয়া যখন যমুনার পথে মথুরায় যাও তখন তোমাকে অনেক কাকুতিমিনতি করিয়াছি। তখন তুমি আমাকে নিরাশ করিয়া দুঃখ দিয়া চলিয়া গেলে ॥ ১ ॥ ছলনাময়ী চতুরা রঙ্গিনী, আজ তুমি মায়া বিস্তার করিতেছ। যদি আমাকে তোমার প্রিয় বলিয়াই জান তো আগে দয়া করিলে না কেন ॥ ধ্রু ॥ দূতীর হাত দিয়া যখন পান ফুল পাঠাইলাম তখন কথায় কান দিলে না, বামচরণে সে পান ফেলিয়া দিলে ॥ ২ ॥ আর বড়াইকে যেভাবে মারিলে তাহাতে স্ত্রীবধ হইতে পারিত। কেবল আমি স্বয়ং নারায়ণ বলিয়া তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে ॥ ৩ ॥ বড়াই যখন তোমার কাছে যাইতে বলিবে তখনই যাইব। কবির উক্তি : এই বলিয়া কৃষ্ণ নীরব হইলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজপ্রাণপরিত্রাণকরং বচঃ ॥

কৃষ্ণের বচন শুনিয়া রাধা বড়াইর নিকট গিয়া যাহাতে নিজের প্রাণ রক্ষা পায় এমন কথা বলিলেন।

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী ॥ আল ॥ ১ ॥
মোরে কি না ভয়িঞাঁ গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোজো মোঁ নান্দের পোএ ॥ ধ্রু ॥
নিশি সপন দেখিলোঁ কাহ্নু কোলে করি সুয়িলোঁ
চিআয়িঞাঁ চাহোঁ নাহিক বাল গোপালে ॥

এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসার
আনল সরণ হৈবে দূতা রে ॥ ২ ॥
যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আনি দেহ যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে
তাক না তেজিবোঁ আর জরমে ॥ ৩ ॥
নেহ আমূল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আণি দেহ কাহ্নে।
ধরোঁ দূতা তোর পাএ হের মোর প্রাণ যাএ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: রাত্রি অন্ধকার। প্রিয়তম যাহার পার্শ্বে নাই সে রমণী কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করে ॥ ১ ॥ হে বড়াই, আমার এ কি হইল? আমি যে বিরহে ব্যাকুলা হইয়া নন্দনন্দনকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি ॥ ধ্রু ॥ রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলাম কৃষ্ণের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছি। জাগিয়া দেখিলাম সে বালগোপাল নাই। আমার এ যৌবন ব্যর্থ হইল। এখন অনলই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ২ ॥ হায়, আমি যে ডালই আশ্রয় করি তাহাই ভাঙ্গিয়া পড়ে। যেখানে বিশ্রাম লাভ করিতে পারি এমন আশ্রয় আমার নাই। কৃষ্ণকে যদি একবার আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে তাঁহাকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করি। একবার পাইলে আর জীবনে তাঁহাকে ছাড়িব না ॥ ৩ ॥ এই লও অমূল্যরত্ন উপহার লও। দূতী, আমার কথা শোনো, তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, এই দেখো আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। একবার শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

যখণ কাহ্নাঞিঁ তোরে পাঠাইলে পানে।
তবেঁ তারে বুলিলি বচন আনচানে ॥
এবেঁ মোক[১] বোলসি কাহ্নাঞিঁ আণিবারে।
বুঢ় বয়সত বড় দুখ দিলে মোরে ॥ ১ ॥
এবেঁ বলহীন আহ্মে চলিতে না পারী।
কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী ॥ ধ্রু ॥
এড় ঘর যাঞোঁ মোঞেঁ শকতি না কর।
কথাঁ গিঞাঁ পায়িবোঁ নিঠুর গদাধর ॥
মোঞেঁ ভালেঁ জাণ[২] তোক নিঠুর ভৈল কাহ্ন।
এ জরমে নাইসে আর তোহ্মার থান ॥ ২ ॥

১ 'ক' তোলাপাঠে। ২ অ। প্র: জাণোঁ।

পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান॥
নানা রঙ্গে রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে।
বাসলী সিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৩॥

বড়াইর উক্তি: যখন কৃষ্ণ তোমার কাছে পান পাঠাইলেন তখন বিপরীত কথা বলিলে। এখন আবার কৃষ্ণকে আনিয়া দিতে বলিতেছ, আমার বৃদ্ধ বয়সে বড়ই দুঃখ দিতেছ॥ ১॥ এখন আমি দুর্বল, চলিবার শক্তি নাই। আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে আনিব॥ ধ্রু॥ যাও, গৃহে ফিরিয়া যাও, আমাকে আর অনুরোধ করিও না। সে নিষ্ঠুর গদাধরকে কোথায় পাইব? আমি বেশ জানি কৃষ্ণ তোমার প্রতি নির্দয় হইয়াছেন, এ জন্মে আর তিনি তোমার নিকট আসিবেন না॥ ২॥ জানিবে পুরুষ ও ভ্রমর দুই একরূপ। উভয়েই নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধু পান করে। কৃষ্ণও নানা রঙ্গে অন্য রমণীর পাশে অবস্থান করিতেছেন। চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৩॥

রামগিরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে। বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের তাম্বূলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে। বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে।
বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে॥ ১॥
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে॥ ল॥ ধ্রু॥
সব খন চিন্তিআঁ মুরারী। পরাণ ধরিতেঁ না পারী।
রহিব যৌবনে আহ্মে কেমনে মন নেবারী॥
মোঞঁ সে দগধকপালী। নাম মোর চন্দ্রাবলী।
আন মোর নাহিঁ গতী ছাড়িআঁ প্রিয় বনমালী॥ ২॥
মোঁ তোলোঁ যমুনাত পাণী। পরিহাস কৈল চক্রপাণী।
মতিমোষেঁ যশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিণী॥
কাহ্ন না চিহ্নিলোঁ খাইলোঁ আখী। চান্দ সুরুজ তুয়ি সাখী।
এ রূপ যৌবন কাহ্নেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী॥ ৩॥
বাঁশী বাজায়িল যবেঁ কাহ্নে। কোকিল কৈল পালি গানে।
আগুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে॥
এবেঁ লাজ থুইআঁ এক পাশে। শরণ ভৈলোঁ শ্রীনিবাসে।
আণি দেহ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধার উক্তি: বড়াইগো, বালিকা বয়সে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কৃষ্ণের পান গ্রহণ করি নাই। এখন সেই বাল গোপালে আমার মন মগ্ন হইয়াছে। তুমি শুভক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করো। শীঘ্র কৃষ্ণের সন্নিধানে গিয়া বিনয়বচনে তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস॥ ১॥ দূতী, তুমি কৃষ্ণের নিকট গিয়া বলো তিনি যেন একটিবার দয়া করিয়া আমাকে দর্শন দেন॥ ধ্রু॥ সর্বক্ষণ মুরারির চিন্তা করিয়া আমি যে প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেছি না। আমি যৌবন কালে মনকে নিবারণ করিয়া থাকিব কিরূপে? আমি চন্দ্রাবলী হতভাগিনী, প্রিয়তম বনমালী ব্যতীত আমার দ্বিতীয় কোনো গতি নাই॥ ২॥ আমি যখন যমুনায় জল ভরিতেছিলাম তখন চক্রপাণি পরিহাস করিয়াছিলেন। আমি বুদ্ধিহীনা সে সব কথা যশোদাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। হায়, দুই চোখ খাইয়া কৃষ্ণকে চিনিতে পারি নাই। আজ চন্দ্র সূর্য উভয়কে সাক্ষী করিয়া কৃষ্ণের জন্য এ যৌবন তুলিয়া রাখিলাম॥ ৩॥ কৃষ্ণ যখন বাঁশি বাজাইলেন, কোকিল গান গাহিল, তখন দক্ষিণপবন আমার দেহে আগুন জ্বালাইল। এখন আমি লাজলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনিবাসের শরণ লইলাম। হে দূতী, কৃষ্ণকে আনিয়া দাও। চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪॥

ধানুষীরাগঃ॥ একতালী॥

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী।
পাছু না গুণিলোঁ আছিদরী॥
বড় রোষ তার মনে জাগে।
এহা গুণী না মারে মোকে বড় ভাগে॥ ১॥
এবেঁ তোহ্মে মোরে বোল বুধী।
মোঞঁ ভৈলোঁ এহাত মুগধী॥ ধ্রু॥
কাকুতী করিল কাহ্ন তোরে।
মোক পাঁঠায়িল বারে বারে॥
তভোঁ তার না কৈলেঁ সমানে।
তেকারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে॥ ২॥
বন্ধুজন করাআঁ বিমনে।
ছন্দে বন্দে তোষিবে কমনে॥
আতি বড় সিআন সে কাহ্নে।
তাক ভাণ্ডী কাহার পরাণে॥ ৩॥
তোহ্মে মোর পরাণ নাতিনী।
তোর দুখ না সহে পরাণী॥
কথাঁ পাইব কাহ্নের উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

বড়াইর উক্তি : অহংকারে মাতিয়া শ্রীহরিকে তুষ্ট করিলে না। বুদ্ধিহীনা তুমি ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখিলে না। তাই তিনি বড় রুষ্ট হইয়াছেন। এ কথা শুনিয়া যে আমাকে প্রহার করেন নাই ইহাই আমার ভাগ্য ॥ ১ ॥ আমি তো কোনো পথ দেখিতে পাইতেছি না এখন তুমিই আমাকে বুদ্ধি বলিয়া দাও ॥ ধ্রু ॥ কৃষ্ণ বারংবার তোমার প্রেম প্রার্থনা করিয়া আমাকে তোমার নিকট পাঠাইলেন, তবু তাঁহার সম্মান করিলে না। সেইজন্যই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ॥ ২ ॥ বন্ধুজনকে বিমুখ করিলে, এখন ছলেকৌশলে তাঁহাকে কি প্রকারে তুষ্ট করিবে? কৃষ্ণ অতিশয় চতুর, এমন শক্তি কাহারো নাই যে তাঁহাকে ভুলাইতে পারে ॥ ৩ ॥ তুমি আমার প্রাণের নাতিনী, তোমার দুঃখ আমার প্রাণে সহে না। তুমিই বলিয়া দাও কোথায় গেলে কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইব। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

জরতীবচনং শ্রুত্বা মনোজশরকাতরা।
সখিগণমুবাচেদং মাধবংপ্রাপ্তিবাঞ্ছয়া ॥[১]

বড়াইয়ের কথা শুনিয়া মদনশরে জর্জরিতা রাধিকা মাধবকে লাভ করিবার ইচ্ছায় সখীগণকে বলিলেন।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা কি পুছহ মোরে বুধী।
আহ্মার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞি আপণেঞি কর শুধী ॥ ল বড়ায়ি ॥ ১ ॥
রাধার বচন শুণী বড়ায়ি বুইল মনত গুণী।
তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন তবেঁ পাইব চক্রপাণী ॥ ল রাধা ॥ ২ ॥
দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞি চাহিল না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে।
হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী আসিআঁ দিল দরশনে ॥ ল রাধা ॥ ৩ ॥
করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে রাধা পুছে যোড় হাথে।
নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন কথাঁ বসে জগন্নাথে ॥ ল মুনী ॥ ৪ ॥
কি মোর জীবন যৌবন নারদ কি মোর এ ধন বাসে।
কাহ্নু বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ ভ্রমিবোঁ সকল দেশে ॥ ৫ ॥
রাধার বচন শুণী মাহামুনী বাসলী[২] যোগ ধেআনে।
জাণিল কদম তলাত বসিআঁ আছেন্ত নাগর কাহ্নে ॥ ৬ ॥
নারদ বুইল কদমতল চল বৃন্দাবন মাঝে।
কুসুমসেজাত বসিআঁ আছে তথাঁ পাইবেঁ দেবরাজে ॥ ৭ ॥

১ অ। প্র: সখীগণমুবাচেদং মাধবপ্রাপ্তিবাঞ্ছয়া ॥
২ অ। প্র: বসিলা।

নারদের বোল বেদ সমতুল মনে ধরী চন্দ্রাবলী ।
চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত বৃন্দাবনে বনমালী ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণের বদন দূরে দেখি রাধা মুরুছা পাইল তখনে ।
ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি রাধার কইল চেতনে ॥ ৯ ॥
চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ ধরিল আতি যতনে ।
বুলিতেঁ নারেঁা বচন বড়ায়ি না চলে মোর চরণে ॥ ১০ ॥
এবেঁ কি করিবোঁ পরাণ নাতিনী বোল হরষিত মণে ।
তোহ্মার আন্তরে প্রাণ উপেখিআঁ করিবোঁ তাক যতনে ॥ ১১ ॥
মণে পরিভাবী মোরে দয়া করী বড়ায়ি চল আপণে ।
ভালমতেঁ মোর দুখকথা কহ নিঠুর কাহ্নচরণে ॥ ১২ ॥
এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল গিআঁ কাহ্নের পাশে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৩ ॥

রাধার উক্তি : (তখন রাধা বড়াইকে বলিলেন) আমাকে তাঁহার উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? কৃষ্ণ আমার হৃদয়চন্দন। হে বড়াই, তুমি নিজেই তাঁহার সন্ধান করো ॥ ১ ॥ কবির উক্তি : রাধার কথা শুনিয়া বড়াই মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল। বড়াইর উক্তি : তুমি আমি দুইজন মিলিয়া বৃন্দাবনে খোঁজ করি চলো, তাহা হইলে হয়তো চক্রপাণিকে পাওয়া যাইবে ॥ ২ ॥ কবির উক্তি : দুইজনে মিলিয়া কৃষ্ণের খোঁজ করিয়াও তাঁহার দেখা পাইলেন না, তখন তাঁহারা রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ মুনি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ নারদের চরণে প্রণাম করিয়া রাধা বলিলেন : হে মুনিবর, কঠিনহৃদয় নন্দনন্দন জগন্নাথ কোথায় অবস্থান করিতেছেন আমাকে বলো ॥ ৪ ॥ হে নারদ, আমার জীবন-যৌবন, আমার ধনরত্ন, আমার বেশবাস সবই নিষ্ফল। তাঁহাকে না পাইলে আমি যোগিনী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব ॥ ৫ ॥ কবির উক্তি : রাধার কথা শুনিয়া মুনিবর ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যানযোগে জানিলেন, নাগর কৃষ্ণ কদম্বতলে আছেন ॥ ৬ ॥ তখন নারদ বলিলেন : বৃন্দাবনে কদম্বতলে পুষ্পশয্যায় দেবরাজ বসিয়া আছেন। সেখানে গেলে তাঁহাকে পাইবে ॥ ৭ ॥ কবির উক্তি : নারদের বচন বেদতুল্য, এই মনে করিয়া চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ-সন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে অকস্মাৎ বৃন্দাবনে বনমালীর দেখা পাইলেন ॥ ৮ ॥ দূর হইতে কৃষ্ণ-মুখ দেখিয়া রাধা সংজ্ঞা হারাইলেন। তখন বড়াই রাধার মুখে ভৃঙ্গারের জল দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ॥ ৯ ॥ চৈতন্য লাভ করিয়া রাধা বড়াইয়ের পায়ে ধরিয়া বলিলেন : আমার মুখে কথা সরিতেছে না, আমার দুই চরণ চলৎশক্তিরহিত ॥ ১০ ॥ বড়াইর উক্তি : প্রাণের নাতিনী তুমি। প্রসন্ন মনে বলো, এবার কি করিতে হইবে। তোমার জন্য প্রাণ দিয়াও আমি তাহা করিব ॥ ১১ ॥ রাধার উক্তি : আমার প্রতি যখন তোমার এতই দয়া তখন হে বড়াই তুমি একবার নিজেই যাও, গিয়া সদানন্দ সেই কৃষ্ণ-

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির ২১৩।২ পৃষ্ঠা

চরণে এই দুঃখিনীর দুঃখকথা ভাল করিয়া নিবেদন করো ॥ ১২ ॥ কবির উক্তি : এই কথা শুনিয়া বড়াই কৃষ্ণসন্নিধানে সব কথা বলিল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১৩ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

স্তনের উপর হারে। আল মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে ॥
সরস চন্দন পঙ্কে। আল দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥ ১ ॥
আল তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ ধ্রু ॥
কুসুমশর হুতাশে। তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে ॥
ক্ষেপে সজল নয়নে। দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে ॥ ২ ॥
দেখি পল্লব শয়নে। আঙ্গাররাশি সমানে।
মূদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥
বাম করতে বদনে। দিআঁ গগনে নয়নে।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥
খনে হাসে খনে রোষে। খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে ॥
চলিতেঁ তোহ্মার পাশে। নারে মদনের রোষে।
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি : স্তনবিনিহিত হারখানির ভারও রাধার পক্ষে দুর্বহ মনে হইতেছে। কাতরহৃদয়া রাধা চলিতে পারিতেছে না। সরসচন্দন পঙ্ক গায়ে মাখিতে তাহার বড় শঙ্কা, আর চন্দ্রকিরণ তো তাহাঁর নিকট অগ্নির সমান অসহ্য ॥ ১ ॥ তোমার বিরহের আগুনে রাধা দগ্ধ হইয়া আছেন, তোমার দর্শন পাইলে তবে প্রাণ ফিরিয়া পাইবে ॥ ধ্রু ॥ মদনের পুষ্পশরের জ্বালায় জর্জরিত রাধা একপাশে বসিয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে এবং সজল নয়নে ক্ষণে ক্ষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে। হায় নীলপদ্ম দুইটি যেন বৃন্তচ্যুত হইয়াছে ॥ ২ ॥ কিশলয় শয্যা তাহার কাছে অগ্নিরাশির সমান, তাহা দেখিয়া সে ভয়ে দুই চক্ষু বন্ধ করে। বাম হাতে মুখ রাখিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া রাধা একমনে তোমার কথাই চিন্তা করে ॥ ৩ ॥ সে কখনো হাসিতেছে কখনো কাঁদিতেছে কখনো বা উল্লসিত হইতেছে। মদনশরাতুরা হতভাগিনী তোমার কাছে হাঁটিয়া আসিবে সে শক্তিটুকুও নাই। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥[১]

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয়পবনে ॥
করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥
আল। কাহ্নাঞিঁ ল। রাধা বিরহদহনে।
দগধিলী ভৈলী তোহ্মার শরণে[২] ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥
সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে ॥ ২ ॥
নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুএঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার ॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ ॥ ৩ ॥
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে ॥ ৪ ॥
বনের হরিণী যেন তরাসিলী মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥
দয়া করী এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

বড়াইর উক্তি : চন্দ্র ও চন্দন (জ্বালাকর বলিয়া) রাধা সর্বক্ষণ তাহাদের নিন্দা করিতেছে। মলয়পবন তাহার নিকট গরলতুল্য বোধ হইতেছে। কুসুমশয্যা তাহার পক্ষে মদনের শয্যা। সেই শরশয্যায় শয়ন করিয়া সে তোমার আলিঙ্গন কামনার ব্রতপালন করিতেছে ॥ ১ ॥ বিরহদহনে দগ্ধ হইয়া রাধা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে ॥ ধ্রু ॥ মদনদেব দিবারাত্র তাহাকে শরাঘাত করিতেছে। তাই রাধা হৃদয়ে নলিনীদলের বর্ম পরিধান করিয়াছে। তুমি তো সর্বক্ষণই তাহার অন্তরে বিরাজ করিতেছ,

---

১ ইহার পর 'নাহং মনসি রাধায়া বর্ত্তে জরতি সন্ততং। মিথ্যাবচনজাতেন বঞ্চনং কুরুষে বৃথা ॥' শ্লোক লেখা ও কাটা। পুঁথি-চিত্র দ্রষ্টব্য।

২ প্রথমে ছিল 'তোর দরশনে'। পরে 'তো' ও 'র'-এর মধ্যে তোলাপাঠে 'হ্মা' যুক্ত করিয়া 'তোহ্মার' হয় এবং 'দরশনে' কাটিয়া 'শরণে' করা হয়। পুঁথি-চিত্র দ্রষ্টব্য।

তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই তাহার বিবিধ চেষ্টা ॥ ২ ॥ তাহার নয়নে অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে, মনে হয় যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্র হইতে অমৃতধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কন্দর্পরূপী তোমার চিত্র অঙ্কন করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছে ॥ ৩ ॥ সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া রাধার ধারণা হইয়াছে যেন তুমি তাহার সম্মুখেই আছ। তাই সে কখনো হাসিতেছে কখনো রোষ প্রকাশ করিতেছে কখনো কাঁদিতেছে আবার কখনো বা ভয়ে কাঁপিতেছে। হতভাগিনীর গৃহ আজ অরণ্যরূপ, সখীগণ জালের মত তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বিরহের নিদারুণ অগ্নিজ্বালা বহন করিয়া দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে ॥ ৪ ॥ রাধার অবস্থা হইয়াছে বনের হরিণীর মত। সে ভীত চকিতভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে। হে কৃষ্ণ, দয়া করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন দাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৫ ॥

অধুনাপি কিমু সদয়ং হৃদয়ে
কুরুষেঽন্যরমণীকরণে[১]।
গতৃতৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে
সুতনস্তনোতি[২] মদনঃ কদনং ॥

এখনো তুমি কেন অন্য রমণীকে সদয় হৃদয়ে গ্রহণ করিতে চাহিতেছ? ওহে গততৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বিরহে মদন, সুতনু রাধিকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক ॥
লগনী ॥

কাহ্নাঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে।
চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে ॥ ১ ॥
লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে।
সংপুন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে ॥ ২ ॥
বিলম্ব না কর সুণ সুন্দর মুরারী।
রাধার পরাণে সুখ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই।
হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি ॥ ৪ ॥
বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই।
রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞিঁ ॥ ৫ ॥
চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী।
ঈসত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী ॥ ৬ ॥

১ অ। প্র: কুরুষেমনোঽন্যরমণীকরণে।
২ অ। প্র: সুতনোস্তনোতি।

বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী।
পাসে আসী বৈসু বোলেঁা মধুরস বাণী ॥ ৭ ॥
কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে।
সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে ॥ ৮ ॥
রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

বড়াইর উক্তি : (কৃষ্ণকে মধুর বচনে বলিল) চন্দ্রাবলী রাধা তোমার বিরহে কাতরা ॥ ১ ॥ তাহার দেহ নবনীত কোমল রসের সিন্ধুসদৃশ। এখন সে পূর্ণযৌবনা, তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে প্রীত করো ॥ ২ ॥ রাধিকা প্রাণে দুঃখ পাইবে ইহা আমি সহিতে পারি না। অতএব হে মুরারি, আমার কথা শোনো, আর বিলম্ব করিও না ॥ ৩ ॥ কবির উক্তি : বড়াই কৃষ্ণের মুখচুম্বন করিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া অনেককাকুতি করিল ॥ ৪ ॥ অগ্রপশ্চাৎ বুঝাইয়া বড়াই বারবার বলিল : কথা শোনো, রাধাকে তুষ্ট করো ॥ ৫ ॥ কবির উক্তি : বড়াইয়ের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন এবং মৃদু হাস্য করিয়া হৃষ্ট চিত্ত হইলেন ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : রাধিকা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসুক এবং মধুক্ষরা বাণী বলুক ॥ ৭ ॥ কবির উক্তি : কৃষ্ণের আদেশে বড়াই দ্রুত গতিতে রাধার নিকট গিয়া সকল কথা কহিল ॥ ৮ ॥ তাহা শুনিয়া রাধার এক মুহূর্তকে এক যুগ বলিয়া মনে হইল। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৯ ॥

মাধবস্য নিদেশেন মুদিতায়া প্রমোদিতঃ[১]।
রাধায়া জরতী চক্রে বেশং জনমনোহরং ॥

মাধবের আদেশে আনন্দিত হইয়া বড়াই উল্লসিত রাধিকার জনমনোহর বেশ রচনা করিয়া দিল।

ভৈরবীরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

আল রাধা
শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা
সিসত সিন্দূর নব সূরে ॥ ১ ॥
গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।
হুআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুই ধারে
পড়ে যেন সুমেরুশিখরে ॥ ২ ॥

১ অ। প্র : মুদিতায়াঃ প্রমোদিতা।

পরাইল হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে
দেখি আভিসার সুশোভনে।
মিলি হেমকরগণে বান্ধিল আতি যতনে
যেন কথু রতনক রতনে ॥ ৩ ॥
মণিকিরণ উজলে আঙ্গদ ভুজযুগলে
পহ্রায়িল আতি কুতুহলে।
বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী
রতন কঙ্কণ করমূলে ॥ ৪ ॥
রতিরণে জয়ধুনী করএ কিঙ্কিণী
তাক গাস্থি বান্ধিল মাঝে।
কনক মল্লতোর আর পাসলীনিকর
জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে ॥ ৫ ॥
কর্পূর কস্তুরী যোগ[১] আআর[২] তাম্বুলরাগে
গন্ধ রাংগে রচিল বদনে ॥ ৬ ॥
আতি রূপসী স্বভাবে লাসবেস করী রতিভাবে
রাধা গেল কাহ্নের পাশে।
রাধাক দেখিঞাঁ কাহ্ন[৩] উতরল ভৈলা মনে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

কবির উক্তি : তোমার কবরী শম্ভুসদৃশ, চাঁপা ফুল দিয়া তাহা বেষ্টন করা হইয়াছে। সীমান্তে সিন্দুর শোভা পাইতেছে যেন নবোদিত সূর্য। রাধার গলায় রত্নমণিখচিত গজমোতির হার, উন্নত পয়োধর যুগলের উপর ওই মুক্তামালা যেন সুমেরুশিখরের দুই পার্শ্বে সমধারায় প্রবাহিত গঙ্গাস্রোতের মত শোভা পাইতেছে ॥ ২ ॥ বড়াই অভিসারিকার কণ্ঠে নানা অলঙ্কার পরাইল, যেন স্বর্ণকারগণ শঙ্খরত্নকে অন্যান্য রত্ন দিয়া সজ্জিত করিল ॥ ৩ ॥ হৃষ্টচিত্তে রাধার হাতে মণিকিরণে সমুজ্জ্বল অঙ্গদ, বাহুতে মুক্তা ও রত্নে জড়িত সোনার চুড়ি, করমূলে রত্নকঙ্কণ পরানো হইল ॥ ৪ ॥ রতিরণে জয়বাদ্য বাজায় যে কিঙ্কিণী, রাধা তাহাই গাঁথিয়া কটিদেশে পরিলেন। সোনার মল্লতোড় ও পাসলি দিয়া জঙ্ঘা চরণ এবং পদাঙ্গুলি ভূষিত করিলেন ॥ ৫ ॥ কর্পূরকস্তুরীযুক্ত তাম্বূল এবং সুগন্ধ রঞ্জনে রাধার মুখ রঞ্জিত হইল ॥ ৬ ॥ যিনি স্বভাবতঃই সুন্দরী, বিলাসবেশ পরিধান করিয়া (অধিকতর মনোহারিণী হইয়া) সেই রাধা রতিভাবে কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণের চিত্ত চঞ্চল হইল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৭ ॥

১ অ। প্র: যোগে।
২ অ। প্র: আঅর।
৩ অ। প্র: কাহ্নে।

রাধিকা[১] মনসিজজ্বরাতুরাং
মণ্ডণেত্যাদি[২] গুণরামণীয়কাং।
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো হরি-
র্বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাতঃ ॥[৩]

মদনবিহ্বলা এবং মণ্ডনবশতঃ দ্বিগুণ রমণীয় রাধিকাকে দেখিয়া মন্মথ-শরকাতর শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ এইভাবে কেলিবিলাসে রত হইলেন।

কোড়াদেশরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ভুজযুগে ধরী কাহ্নে। আল কৈল আলিঙ্গনে।
রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞিঁক আতি জতনে॥
কাহ্ন করিল চুম্বনে। কপোল যুগ নয়নে।
ললাট আধর রতন যুগল নয়ানে ॥ ১ ॥
আল কাহ্ন করিল সুরতী।
পুরী মনোরথ রাধার পিরিতী ॥ ধ্রু ॥
যুড়ী রসনে রসনে। কৈল মুখমধু পানে।
রাধা না জাণিল আপন পর তখণে ॥
তার দসন রসনে[৪]। কাহ্ন চাপিল দশনে।
ইঙ্গিতকারেঁ হারিল রাধা কাহ্নের বচনে ॥ ২ ॥
দৃঢ় করি ত্নয়ি তনে। নখ দিল ঘন ঘনে।
পীযূষে সেচিল কাহ্ন রাধার মরণে[৫] ॥
রাধাএে কৈল কুজনে। মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে।
উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে ॥ ৩ ॥
আতি চির আনুবন্ধে। রতি কৈল নানা বন্ধে।
কভো কেহ না কৈল যেন রস প্রবন্ধে ॥
ভৈল মুকুল নয়নে। সুখী ভৈল দুই জনে।
...[৬] বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

উপরের পদটি কবির উক্তি। এই পদে রাধা-কৃষ্ণের কেলিবিলাসের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

১ অ। প্র: রাধিকাং।
২ অ। প্র: মণ্ডনদ্বি।
৩ অ। প্র: ক্রমাৎ।
৪ অ। বসনে।
৫ অ। প্র: মণে।
৬ ছাড়। প্র। গাইল।

শ্রীরামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা

এহে রতিসুখ ভুঞ্জিঞাঁ রাধা গোআলিনী।
চরণত ধরী বুইল সুণ চক্রপাণী ॥
তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতী।
এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্ন তোহ্মাতে ভকতী ॥ ১ ॥
উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি জাওঁ নিন্দ ॥ ধ্রু ॥
হেন সুণি তাত কাহ্নাঞি আনুমতি দিল।
নব কিশলয়ত শয্যা রচিল ॥
নিজ উরুতলে তাক নিশ্চলে রাখিল।
তখণ কাহ্নাঞি কিছু মনে চিন্তিল ॥ ২ ॥
হেন সম্ভেদে দেখি শীতল বহে বাএ।
ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ ॥
কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ।
রাধার নয়নে গিঞাঁ নিন্দ কৈল বাস ॥ ৩ ॥
রাধাক এড়িঞাঁ জায়িতেঁ কাহ্ন কৈল মন।
বড়ায়ির পাণে কাহ্ন করিল গমন ॥
বড়ায়িক সম্বোধিঞাঁ বুলিল বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বিহারান্তে গোপবালিকা রাধিকা কৃষ্ণের চরণ ধরিয়া বলিলেন : হে চক্রপাণি, তুমি ভিন্ন আমার কোনো আশ্রয় নাই। হে কৃষ্ণ, আমার চিত্ত একান্তভাবে তোমাতেই নিবদ্ধ ॥ ১ ॥ হে গোবিন্দ, আমি বড় শ্রান্ত হইয়াছি। তোমার উরু পাতিয়া দাও, মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাই ॥ ধ্রু ॥ কবির উক্তি : এ কথায় কৃষ্ণ সম্মত হইলেন। তিনি কিশলয়ে শয্যা রচনা করিলেন এবং নিজ উরুতলে রাধিকাকে শোয়াইয়া মনে মনে কিছু চিন্তা করিলেন ॥ ২ ॥ এমন সময় শীতল বাতাস বহিতে লাগিল, ভ্রমর এবং কোকিল মিলিয়া কলগীত ধরিল, চারিদিকে ফুলের গন্ধ বহিতে লাগিল, রাধার নয়নে নিদ্রা নামিয়া আসিল ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে রাখিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বড়াইয়ের নিকটে গিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

কেদাররাগঃ ॥ একতালী ॥

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে।
এবেঁ মেলাণী দেহ আহ্মারে ॥
সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে।
রাধা লঞাঁ ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে ॥ ১ ॥

তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি।
কৈলো মোঞেঁ রাধার সঙ্গে ল ॥ ধ্রু ॥
আর বচনেক বোলোঁ সুণ ল বড়ায়ি
ধরিঞাঁ তোর করে।
তাক রাখিহ যতনে আপণ আন্তরে
জাইব আহ্মে মথুরা নগরে ॥ ২ ॥
নিন্দ ছল করি তাক[১] রাধার পাশে
বড়ায়িক বুলিহ[২] যতনে।
ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু
কাঢ়ি...[৩] মথুরা নগরক কাহ্নে ॥ ৩ ॥
কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী
কাহ্নাঞিঁ না দেখিল পাশে।
বড়ায়িক চিআইঞাঁ বুইল বচন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণের উক্তি: বড়াই, আমি তোমার কথা রাখিয়াছি। এবার আমাকে বিদায় দাও। বৃন্দাবনে সন্ধ্যা নামিয়াছে। তুমি সত্বর রাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও ॥ ১ ॥ বড়াই, তোমারই জন্য রাধার সঙ্গে বিলাস করিয়াছি ॥ ধ্রু ॥ আর একটি কথা হে বড়াই, তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি শোনো। আমি মথুরায় চলিলাম, তুমি রাধাকে আপনার মত ভাবিয়া যত্ন করিয়া রাখিবে ॥ ২ ॥ কৃষ্ণ বড়াইকে নির্বন্ধ সহকারে বলিলেন: ঘুমের ভাণ করিয়া রাধার পার্শ্বে থাকো। কবির উক্তি: এই বলিয়া ধীরে ধীরে রাধার মাথার নীচ হইতে নিজের উরু সরাইয়া কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন ॥ ৩ ॥ কিছুক্ষণ পরে রাধাচন্দ্রাবলী জাগরিত হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে পার্শ্বে দেখিতে পাইলেন না। তখন বড়াইকে জাগাইয়া এই কথা বলিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ভায়িঠালীরাগঃ[৪] ॥ যতিঃ ॥

এই ত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে
তার উরে দিলো মো সিয়রে।
আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে
নিন্দত এড়িঞাঁ গেল মোরে ॥ ১ ॥

১ অ। প্র: থাক।
২ অ। প্র: বুলিল।
৩ একটি শব্দ ছাড় পড়িয়াছে মনে হয়। বসন্তরঞ্জন ঐ স্থলে 'গেলা' বসাইয়াছেন
৪ অ। প্র: ভাঠিয়ালীরাগঃ।

বড়ায়ি গো
কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে মরিলোঁ ল।
আণি দেহ শ্রীমধুসূদনে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি একমনে চিন্তো মোঞেঁ সব খণে
সে কাহ্ন পায়িব কত খণে।
চরণে পড়ো দূতী আণী দেহ প্রাণপতী
তার মোর হউ দরশনে ॥ ২ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িঞা পালাইবে কাহ্ন
তবে কেহ্নে কাল ঘুম যাইবোঁ।
এ রূপ যৌবন ভার কাহ্ন বিণি আসার
তা লাগি গরল মোঞেঁ খায়িবোঁ ॥ ৩ ॥
হের মোঁ কাকুতি করোঁ দূতী তোর পাএ রোঁ[১]
এহোবার পুর মোর আশে।
চল দূতী তার থান[২] আণ শ্রীমধুসূদনে
গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: বালগোপাল এখনই তো কদম্বতলে ছিলেন। আমি তাঁহার উরুতে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিলাম। কেলিবিলাসে অতিশয় শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলে তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন ॥ ১ ॥ বড়াই, কৃষ্ণবিরহে আমি জীবন্মৃত হইয়া আছি, তুমি শ্রীমধুসূদনকে আনিয়া দাও ॥ ধ্রু ॥ কি দিন কি রাত্রি সর্বক্ষণ আমার কেবল এই চিন্তা—তাঁহাকে কখন পাই। দূতী তোমার পায়ে পড়ি আমার প্রাণপতিকে আনিয়া দাও তাঁহার সহিত আমার একবার দেখা হউক ॥ ২ ॥ আমাকে তিনি ফেলিয়া পলাইবেন তাহা কেমন করিয়া জানিব। জানিলে কি এমন কালঘুম ঘুমাই? আমার এ রূপ এ যৌবন সবই ব্যর্থ। হায় তাঁহার জন্য বিষ পান করিব ॥ ৩ ॥ দেখ দূতী, আমি তোমার পায়ে ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিতেছি, এইবারটির মত আমার আশা পূর্ণ করো। একবার যাও শ্রীমধুসূদনকে আমার নিকট আনো। বডু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞি ল
তোর সঙ্গে রতিকুতূহলে।

১ অ। প্র: ধরোঁ।
২ অ। প্র: থানে।

রাধা ল

তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী

এবেঁ কথাঁ পাইব গোপালে ॥ ১ ॥

রাধা ল

কিমনে পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশে।

না জাণো সে গেল কোণ দিশে ॥ ধ্রু ॥

প্রবোধবচন কত . বুঝাঞাঁ তাহারে

আণিঞাঁ মেলাইলো তোর থানে।

এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা

শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে ॥ ২ ॥

বিষম পুরুষ জাতী কপটপুরিত মতী

নানা বোলে সে তিরিক রঙ্গে।

হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লঞাঁ

কাহ্ন রতি ভুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে ॥ ৩ ॥

এবেঁ তোঞেঁ এখানে থাক মো গিঞাঁ চাহোঁ তাক

যবেঁ পাওঁ তার দরসনে।

তবেঁ তোক আণি দিবোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস

...[১]বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি : তোমার সহিত কেলিবিলাসে মগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তো এই কদম্বতলে এখনই ছিলেন। বুদ্ধিহীনা রাধিকা তুমি নিজেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে। সেই বালগোপালকে কোথায় পাইব ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেলেন তাহা তো জানি না। রাধা তাঁহার উদ্দেশ পাইব কেমন করিয়া ॥ ধ্রু ॥ কত প্রবোধবাক্য বলিয়া কত বুঝাইয়া তবে তাঁহাকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করাইলাম। আর তুমি এমন ঘুমই ঘুমাইলে যে শিয়র হইতে তিনি চলিয়া গেলেন আর তুমি টের পাইলে না ॥ ২ ॥ পুরুষজাতি বড় ভয়ানক, তাহাদের মন কপটতায় পূর্ণ। আমার মনে হয় তিনি অন্য কোনো যুবতীর সহিত কুঞ্জে কুঞ্জে কেলি করিতেছেন ॥ ৩ ॥ এখন তুমি এখানে থাকো, আমি গিয়া তাঁহার সন্ধান করি। তাঁহার দেখা পাইলে তাঁহাকে তোমার কাছে আনিয়া দিব। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

একাকিনী পরিক্রম্য বনং শ্রমভরা[২]।

রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধ্বা মধুসূদনং ॥

১ ছাড়। প্র : বন্দিঞাঁ।

২ অ। প্র : শ্রমাভরাতুরা।

বচনেন তবানেন বৃদ্ধে ব্যাকুলমানসা।
জাতাস্মি জগদালোক্য শূন্যমেতদ্‌বচঃ শৃণু॥

বড়াইর উক্তি: হে রাধা, একাকিনী বনে বনে ঘুরিয়া বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি শ্রীমধুসূদনকে পাইলাম না। রাধার উক্তি: বড়াই, তোমার কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অতিশয় ব্যকুল হইল। আজ সমস্ত জগৎ আমার নিকট শূন্যবোধ হইতেছে।

রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি।
এখণে আসিবে মোর সুন্দ[১] কাহ্নাঞিঁ॥
তেকারণে আহ্মে গিঞাঁ তাক না চাহিলোঁ।
আপণার দোষে মোঞেঁ উচিত ফল পাইলোঁ॥ ১॥
কেমনে বঞ্চিমো মোঞে একসরী কুঞ্জে।
কা লঞাঁ কথা কাহ্নাঞিঁ রতিসুখ ভুঞ্জে॥ ধ্রু॥
দুয়জ পহরে মোঁ চিন্তিলোঁ একসরী।
আহ্মাক তেজিঞাঁ আজি কথাঁ গেলা হরী॥
কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।
যা লঞাঁ সুখরতি ভুঁজয়ে মুরারী॥ ২॥
তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ।
কাহ্নের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে॥
চিন্তিঞাঁ চাহিলোঁ কিছু নাহিক উপায়[২]।
কাহ্ন কাহ্ন করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ॥ ৩॥
চারি পহর দিন পুরিল সকল।
কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ আহ্মে কদম্বের তল।
এবেঁ কেহ্নেমনে রহে আহ্মার জীবন।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

রাধার উক্তি: প্রথম প্রহরে মনে করিলাম আমার কৃষ্ণ-সুন্দর এখনই আসিবেন। তাই হে বড়াই, আমি নিজে গিয়া তাঁহার খোঁজ করিলাম না॥ এখন আমার অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম॥ ১॥ শ্রীকৃষ্ণ অন্য কাহাকে লইয়া বিলাস করিতেছেন, আমি একাকিনী কেমন করিয়া কুঞ্জে দিন কাটাই॥ ধ্রু॥ দ্বিতীয় প্রহরে আমি একাকিনী ভাবিতে লাগিলাম আজ কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন। কোন্ রমণী আজ সুতীর্থে স্নান করিয়া ধন্য হইয়াছে যাহার সহিত মুরারি সুখবিলাসে মগ্ন আছেন

১ অ। প্র: সুন্দর।
২ অ। প্র: উপায়ে।

॥ ২ ॥ তৃতীয় প্রহরে কোকিল বারংবার ডাকিতে লাগিল আর কৃষ্ণবিরহে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না তখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম ॥ ৩ ॥ এমনি করিয়া দিনের চারিপ্রহরই কাটিয়া গেল। কৃষ্ণকে না পাইয়া কদম্বতলে আসিলাম। এখন হে বড়াই, কেমন করিয়া প্রাণ বাঁচে। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

তার সুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী।
যে নারীক লঞাঁ কাহ্নু ভুঁজে সুখরতী ॥ ১ ॥
ভাল আনুমান তোঁ করিলি রাহী।
এবে ভালমতে চাহি সুন্দর কাহ্নাঞী ॥ ধ্রু ॥
কদমের তলে খণে যমুনার কুলে।
শিশু লঞাঁ বাটেহাটে হরিষে বুলে ॥ ২ ॥
যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বলিবোঁ তারে।
ভালমতেঁ গোআলিনি শিখাহ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি: শ্রীকৃষ্ণ যে-রমণীর সহিত কেলিবিলাস করিতেছেন, তাহারই শুভদিন। সে রমণী পুণ্যবতী ॥ ১ ॥ রাধিকা, তুমি সত্যই অনুমান করিয়াছ। দেখি, এখন ভাল করিয়া সেই মনোহর শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করি ॥ ধ্রু ॥ তিনি কখনো কদম্বতলে কখনো বা যমুনাকূলে কখনো বা হাটেবাটে হৃষ্টমনে গোবৎস লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান ॥ ২ ॥ হে গোপকুমারী, যখন তাঁহার দেখা পাইব তখন তাঁহাকে কি বলিব সে কথা আমাকে ভাল করিয়া শিখাইয়া দাও ॥ ৩ ॥ কবির উক্তি: বড়াইর কথা শুনিয়া রাধা আনন্দিত মনে বলিলেন। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার তীতে।
বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে ॥
নিকুঞ্জত চাহা আর যমুনার তীরে।
আর চাহা বড় বড় গাছের উপরে ॥ ১ ॥
লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু করী।
গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল ॥ ধ্রু ॥
আওর চাহিহ যথাঁ বসে শিশুগণে।
ছাওআল হঞাঁ কাহ্নু রহে খণে খণে ॥

চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে ।
সাবধান হঞাঁ চাহ যেহ্ন পাহ লাগে ॥ ২ ॥
এবার পায়িলে বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে ।
খাণিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে ॥
য়েবাব আণিঞাঁ দিলে কাহ্ন মোর ঠাগ্নি ।
তোক আর কভোঁ দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি ॥ ৩ ॥
হর আৰ্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে ।
য়েতেকে যাণিল নারী যেহেন শরীরে ॥
হেন বুঝায়িঞাঁ কাহ্ন আণ মোর পাশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি : বড়াই, যমুনার দিকে তাহার খোঁজ করো, বকুলতলায়ও ভাল করিয়া দেখিও। যমুনার তীরে কুঞ্জবনে এবং বড় বড় গাছের উপরেও তাঁহার সন্ধান করিও ॥ ১ ॥ তাঁহার দেখা পাইলে বিনয় করিয়া বলিও, রাধা বনমধ্যে একাকিনী তোমার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছে ॥ ধ্রু ॥ শিশুগণ যেখানে অবস্থান করিতেছে সেখানেও দেখিও, কারণ তিনি ক্ষণে ক্ষণে শিশুমূর্তি ধারণ করেন। চারিযুগ ধরিয়া তাঁহার চরিত্র কেহই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহার যাহাতে দেখা পাও সেজন্য সাবধান হইয়া চেষ্টা করিও ॥ ২ ॥ বড়াই, এবার সেই মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইলে আর প্রাণ থাকিতে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়িব না। এবার তাঁহাকে আমার কাছে আনিয়া দিলে আর কখনো তোমাকে দুঃখ দিব না ॥ ৩ ॥ মহাদেব অর্ধঅঙ্গে গৌরীকে ধারণ করিয়াছেন আর গঙ্গাকে ধরিয়া আছেন শিরে। ইহা হইতে বুঝা যায় রমণী পুরুষের অঙ্গীভূত। কৃষ্ণকে এই কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহাকে আমার কাছে আনিয়া দাও। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

হেন রাধিকার বচনে ।
চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে ল ॥
আল বড়ায়ি। সুণিঞাঁ রাধার আরতী ।
কাহাকেহো না কৈল সংহতী ॥ ল ॥ ১ ॥
আল বড়ায়ি। মনে ধরী রাধার বচনে ।
কাহ্নাঞিক চাহে বনে বনে ॥ ধ্রু ॥
যমুনা? পাঞাঁ গোপালে ।
পুন গেলী বকুলের তলে ॥

১ অ। প্র: যমুনাত না।

তথাঁ না পাইঞাঁ গদাধরে।
চাহিলেক গাছের উপরে ॥ ২ ॥
চাহিঞাঁ না পায়িল বনমালী।
শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী ॥
একশরী বনের ভিতরে।
ভঞেঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে ॥ ৩ ॥
বাহুড়িঞাঁ বড়ায়ির[১] থানে।
বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে ॥
বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কবির উক্তি : রাধিকার এই কথা শুনিয়া বড়াই বৃন্দাবনে চলিল। রাধার অনুনয় বাক্য শুনিয়া বড়াই কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকী বাহির হইল ॥ ১ ॥ রাধার বাক্য মনে ধরিয়া বড়াই বনে বনে কৃষ্ণের খোঁজ করিতে লাগিল ॥ ধ্রু ॥ যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া বকুলতলায় উপস্থিত হইল, সেখানেও তাঁহার দেখা না পাইয়া গাছের উপর তাঁহার খোঁজ করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ সেখানেও বনমালীর দেখা মিলিল না। বড়াই বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একাকিনী স্ত্রীলোক নির্জন বনে বড় ভয় পাইল ॥ ৩ ॥ দীর্ঘকাল পরে বড়াই রাধিকার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কৃষ্ণের উদ্দেশ মিলিল না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

ভায়িঠালীরাগঃ[২] ॥ যতিঃ ॥

হরি হরি।
আয়াসেঁ কাহ্নের উরে শুতিলোঁ দিঞাঁ শিয়রে
প্রাণের বড়ায়ি ল দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল।
কাহ্নাঞি র দরশন যেহেন ভৈল সপন
প্রাণ বড়ায়ি ল যাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে ॥ ল ॥ ১ ॥
কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞি উদ্দেশ বোল বড়ায়ি। ল।
প্রাণ বড়ায়ি ল তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই ॥ ধ্রু ॥
নানাবিধ দুখ পায়িলোঁ যার বিরহে পুড়িলোঁ
সে কেহ্নে নান্দে যাইতে মোরে।
কোণ আদিবস ভৈল কিবা অপরাধ কৈল
যবেঁ কাহ্নাঞি রোষিল আহ্মারে ॥ ২ ॥

১ অ। প্র: রাধিকার।
২ অ। প্র: ভাঠিয়ালীরাগঃ।

সোঞঁরী কাহ্নের বাণী না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলো সুখ আসেস দিনে দিনে তনু ষেষ
ভাবিঞাঁ সে কাহ্নের নেহে ॥ ৩ ॥
বিধি বিপরিত ভৈল আহ্মা ছাড়ি কাহ্ন গেল
বিরহেঁ মো জিবোঁ কত দিশে।
বোল বড়ায়ি উপদেশে কাহ্ন গেলা কোণ দিশে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: প্রাণের বড়াই, শ্রান্তিবশতঃ কৃষ্ণের উরুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিলাম, নয়নে দারুণ নিদ্রা নামিয়া আসিল। সেই অবসরে তিনি স্বপ্নের মত অন্তর্হিত হইলেন। জাগিয়া দেখি গোবিন্দ নাই ॥ ১ ॥ বড়াই, কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেলেন আমাকে বলিয়া দাও। তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি সেখানে যাইব ॥ ধ্রু ॥ যাহার বিরহে দগ্ধ হইয়া বহু দুঃখ পাইলাম তিনি কেন আমাকে নিকটে যাইবার অনুমতি দেন না? কেন এমন দুর্দিন আসিল? আমি কি অপরাধ করিলাম যে কৃষ্ণ আমার উপরে রুষ্ট হইলেন ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের কথা মনে করিয়া আমি প্রাণ ধরিতে পারিতেছি না, আমার দেহে সংজ্ঞা নাই। আমি সর্বসুখ ত্যাগ করিয়াছি, তাঁহার প্রেমের প্রতীক্ষায় আমার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে ॥ ৩ ॥ বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ তাই কৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। হায়, এ বিরহ সহ্য করিয়া আমি কতদিন বাঁচিব। বড়াই, কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেলেন তুমি আমাকে সেকথা বলিয়া দাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে।
বিলম্ব করিতেঁ আর লাগে বড় ডরে ॥
উতরলী নহ রাধা মন কর থীর।
যা নাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর ॥ ১ ॥
পাছে কাহ্নায়িক আণী দিবোঁ তোর থানে।
করিব আপণ কাজ না জাণিব আনে ॥ ধ্রু ॥
বড় কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী।
চিরকাল সুখ ভুঞ্জে সেসি সিআণী ॥
আহ্মার বচন ধর থীর করী মনে ॥
ঝাঁট ঘর গেলেঁ দোষ না দিব আইহনে ॥ ২ ॥
মুখ চুম্বী বোলোঁ রাধা মোর বোল ধর।
ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব আনুখর ॥

আরতি না কর দুখে বেধিল আন্তর।
আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর ॥ ৩॥
হেনস প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর।
রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর ॥
সব সখিগণ সমে করিআঁ সংহতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি: অনেকক্ষণ হইল বনের ভিতর আসিয়াছি। আর দেরি করিতে ভয় হয়। রাধা চঞ্চল হইও না, মনকে শান্ত করো। এখন গৃহে ফিরি, নহিলে লোকে জানিতে পারিবে॥ ১ ॥ পরে কৃষ্ণকে তোমার কাছে আনিয়া দিব। এমন ভাবে নিজের কাজ করিব যে অন্যলোকে কিছুই জানিতে পারিবে না॥ ধ্রু ॥ বড় কাজ করিয়া লোক জানাজানি করিতে নাই। যে নারী বুদ্ধিমতী সে এমনি করিয়া চিরদিন সুখভোগ করে। আমার কথা শোনো, মন স্থির করিয়া শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া যাও। তাহা হইলে আইহন দোষ দিবে না॥ ২ ॥ রাধা, তোমার মুখচুম্বন করিয়া বলিতেছি, আমার কথা শোনো। শীঘ্র গৃহে ফিরিলে কেহ তিরস্কার করিবে না। তোমার দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কথা শোনো, গদাধর শ্রীকৃষ্ণ নিজেই আসিয়া তোমাকে দেখা দিবেন। তুমি অস্থির হইও না॥ ৩ ॥ এইরূপে বিবিধ প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া বড়াই সখীদল সহ রাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন॥ ৪ ॥

নিনায় কতিচিৎ কালং[১] কথঞ্চিৎ কৃষ্ণতৃষ্ণয়া।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং ॥

কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় কিয়ৎকাল অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়া রাধা জরতীকে ত্রিভুবনের অধীশ্বর সম্পর্কে এই কথা বলিলেন।

৮৩ মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ॥ ১ ॥
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল॥ ধ্রু ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর ॥

১ অ। প্র: কালান্।

কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥ ২ ॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে ॥
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল[১] বুক না জাএ ফুটিআঁ ॥ ৩ ॥
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: প্রস্ফুটিত কদম্বপুষ্পের ভারে ডালগুলি নুইয়া পড়িয়াছে, হায় এখনো বালগোপাল গোকুলে আসিলেন না। আমার এ উন্নত যৌবন বসনাঞ্চলে আর কতদিন আবৃত রাখিব। নিষ্ঠুর শ্রীকৃষ্ণ একবার বলিয়াও গেলেন না ॥ ১ ॥ হায় বড়াই, শৈশবের প্রেম কে নষ্ট করিয়া দিল জানি না, প্রাণনাথ তো এখনো গৃহে আসিলেন না ॥ ধ্রু ॥ বড়াই, আমি সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া ফেলিব, আমার বাহুর বলয় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। বিষাক্ত শরের আঘাতে হরিণীর যেমন হয়, কৃষ্ণবিহনে আমার প্রাণও সর্বক্ষণ সেইরূপ দগ্ধ হইতেছে ॥ ২ ॥ আর সব গোয়ালিনী পুণ্যবতী, তাহারা সুখে আছে। আমি কি দোষ করিয়াছি যে বিধাতা আমাকে এত দুঃখ দিলেন। অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ স্মরণ করিতেছি কিন্তু আমার বুক বজ্র দিয়া গঠিত, তাই এখনো বিদীর্ণ হইল না ॥ ৩ ॥ জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া আষাঢ় আসিল, হায়, নিষ্ঠুর সে নন্দনন্দন তো এখনো আসিলেন না। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

চতুরে চতুরো মাসান্ রাধে মুদিরমেদুরান্।
গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচন ॥

চতুরা রাধিকা, মেঘান্ধকার (বর্ষার) এই চারিটা মাস কোনো প্রকারে কাটাইয়া দাও, আমার এখন যাইবার মত শক্তি নাই।

৬৪ শ্রীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদনে[২] কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ ॥ ১ ॥

১ অ। প্র: গঢ়িল।
২ অ। প্র: মদন।

কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ॥ ধ্রু ॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা ॥ ২ ॥
ভাদর মাসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট[১] জায়িবে বুক ॥ ৩ ॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।
তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: আষাঢ় মাসে নবমেঘের গর্জন শোনা যাইতেছে। মদন-জ্বালায় আমি অশ্রু বর্ষণ করিতেছি। হায়, আমি তো পাখী নই, নহিলে আমার প্রাণনাথ যেখানে অবস্থান করিতেছেন সেখানে উড়িয়া যাইতাম ॥ ১ ॥ বর্ষার এই চারিমাস কেমন করিয়া কাটাই। আমার এখন পূর্ণ যৌবন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিরাশ করিলেন ॥ ধ্রু ॥ শ্রাবণ মাসে অবিরত বৃষ্টি পড়িতেছে, শয্যায় একলা শুইয়া নিদ্রা আসিতেছে না। আর যে পুষ্পশরের জ্বালা সহ্য করিতে পারিতেছি না। বড়াই, এবার তুমি কৃষ্ণের সহিত মিলনের আয়োজন করো ॥ ২ ॥ ভাদ্র মাসের আকাশ দিবারাত্র মেঘে অন্ধকার করিয়া আছে। ময়ূর দাদুরী ও ডাহুকের কলরব শোনা যায়। এই অবস্থায় যদি কৃষ্ণ-মুখ দেখিতে না পাই, তাহা হইলে ভাবিতে ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে ॥ ৩ ॥ আশ্বিন মাসের শেষে বর্ষা ধরিয়া আসিবে, মেঘ চলিয়া গেলে কাশফুল ফুটিবে। তখনো যদি কৃষ্ণ দেখা না দেন তাহা হইলে এ জীবন বিফল হইবে। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং।
রাধে কৃষ্ণোচিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি ॥

কল্যাণী রাধিকা, খেদ করিও না মন স্থির করো। কৃষ্ণ শীঘ্রই আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিবেন।

---

১ অ। প্র: ফুটি।

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

হাথে চান্দ মানী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী।
আইহনক পীঠ দিলোঁ লাজে তিলাঞ্জলী ॥
আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা এক ভীতে।
কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে ॥ ১ ॥
জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞিঁ।
আছুক পরসরস দরশনে নাহিঁ ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল।
কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল ॥
পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল।
তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল ॥ ২ ॥
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর ডাল[১] যেন তখনে পালাইল ॥
দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে।
কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে ॥ ৩ ॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে।
কেমতেঁ পাওঁ এবেঁ শ্রীমধুসূদনে।
কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রাধার উক্তি: বড়াই, হাতে চাঁদ তুলিয়া দিবে এই ভরসা দিয়া আমাকে পাগল করিলে। আমি আইহনকে অবজ্ঞা করিলাম, লাজলজ্জা বিসর্জন করিলাম। তুমি আশ্বাস দিয়া সরিয়া গেলে, আমি শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল চিত্তে কালযাপন করিতেছি ॥ ১ ॥ বড়াই, শ্রীকৃষ্ণকে ভাল করিয়াই চিনিলাম। স্পর্শরস দূরের কথা তাঁহার দর্শন পর্যন্ত পাইলাম না ॥ ধ্রু ॥ বড়াই, তোমারই কথায় প্রেম বাড়াইলাম। কিন্তু তাঁহার সহিত ভাল করিয়া রসভোগের সুযোগ পাইলাম না। পূর্বজন্মে হয়তো খণ্ডব্রত করিয়াছি তাই আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না ॥ ২ ॥ তাঁহার কাছে সুখদুঃখের কথা বলা হইল না। যাদুকরের তৈয়ারি গাছের ডাল যেমন দেখা দিয়া মুহূর্তমধ্যেই অন্তর্হিত হয়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই অন্তর্ধান করিলেন। মদনজ্বালায় আমার তনুদেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যিনি কৌতুকবশে আমার প্রেমের উদ্বোধন করিলেন তিনিই তাহা বিনষ্ট করিতেছেন ॥ ৩ ॥ বড়াই গো, তোমার কথায় আমার মন শান্ত হইতেছে না। বলো কেমন করিয়া এখন শ্রীমধুসূদনকে পাই। আমি বলি তুমি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে একবার যাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

---

১ বসন্তরঞ্জন 'ডাল' স্থলে 'জল' হইবে মনে করেন। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ।
ততঃ কিং গমনাশক্তা যতোহং রাধিকেঽধুনা ॥

হে রাধিকা, কৃষ্ণের উদ্দেশ আমি জানিলেই বা কি আর না জানিলেই বা কি? কারণ আমি এখন যাইতে অসমর্থ।

আহেররাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আহ্মার ধর
রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে।
হের মোঁ করোঁ কাকুতী তোর চরণে ভকতী
আণিআঁ দিআর জগন্নাথে ॥ ১ ॥
আল রাধে।
নিলজী নিকুপেঁ থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক
পাপমতী না বাসসি লাজে।
বুইল তাক একবার তোষ মন রাধার
বোল পালী গেলা দেবরাজে ॥ ২ ॥
আল বড়ায়ি।
না বোল বড়ায়ি হেন আতি নিঠুর বচন
এ তোহ্মার বএসের দোষে।
আলিসের পরসাদেঁ দুখমুখ নাহিঁ জাণ
তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে ॥ ৩ ॥
আমুখর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর
ঠাঁঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ।
উপদেশ বোল তোহ্মে কথাঁ কাহ্ন পাইব আহ্মে
চাহিআঁ আনিআঁ দিবোঁ মো ॥ ৪ ॥
এ বোলে পাইলোঁ সুখ[১] চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ
আজি মোর ভৈল শুভদিনে।
যথাঁ যথাঁ বুলে কাহ্ন চাহ বড়ায়ি সেই থান
তবেঁ তার পাইব দরশনে ॥ ৫ ॥
শুণহ নাতিনী রাহী হাঁঠীবাক বল নাহিঁ
কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।
মণে কৈলোঁ আনুমান তোকে উপেখিআঁ কাহ্ন
গেলা দূর মথুরা নগরী ॥ ৬ ॥

১ 'সু' তোলাপাঠে।

তোর যুগতীঞঁ বুঢ়ী আহ্মাক নিন্দতে ছাড়ী
মথুরাক গেলা প্রাণেশ্বরে।
চরণে ধরেঁা তোহ্মার কাহ্ন দেহ একবার
নহে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৭ ॥
জাইবোঁ মথুরা নগর মোর আগে সত্য কর
আর কভোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে।
বারে বারে দুখ পাইলেঁা ভাগে পরাণে না মরিলেঁা
সরূপ কহিলো তোহ্মারে ॥ ৮ ॥
হের শির কর যোগে সত্য করেঁা তোর আগে
তোক দুখ না দিবোঁ মো আর।
যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সেসি কালে
তার থান জাহ একবারে[১] ॥ ৯ ॥
নাতিনী তোর বচনে হের মোঁ করিলেঁা গমনে
মথুরা কাহ্নের উদ্দেশে।
লাগ পাইলেঁ তার থানে করিবোঁ বড় যতনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

রাধার উক্তি: বড়াই, আমার কথা শোনো। এই রত্নাঙ্গুরীয় দিতেছি, হাতে পরো। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি জগন্নাথকে আনিয়া দাও ॥ ১ ॥ বড়াইর উক্তি: লজ্জাহীনা রাধা, তুমি চুপ করিয়া থাকো। তাঁহাকে এখন কোথায় পাইব? পাপিষ্ঠা, এ কথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় না? তোমার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে একবার বলিলাম। তিনি আমার কথা রক্ষা করিয়া গেলেন ॥ ২ ॥ রাধার উক্তি: ওগো বড়াই, এমন নিষ্ঠুর বাক্য বলিও না। তোমার বয়স হইয়াছে। আলস্যবশতঃ তোমার দুঃখবোধ লুপ্ত হইয়াছে ॥ তাই তুমি রুষ্ট হইতেছ ॥ ৩ ॥ বড়াইর উক্তি: বাজে কথা বলিও না। রাধা, তুমি বড় প্রগলভা। কে তোমার সঙ্গে কথায় পারিবে? কোথায় কৃষ্ণকে পাইব সেই কথা আমাকে বলিয়া দাও। তাহা হইলে আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিয়া দিব ॥ ৪ ॥ রাধার উক্তি: বড়াই, তোমার এ কথা শুনিয়া আমি সুখী হইলাম। তোমার মুখচুম্বন করি। আজ আমার শুভদিন হইল। ওগো বড়াই, কৃষ্ণ যেখানে যেখানে ঘুরিয়া বেড়ান সেই সেই স্থানে সন্ধান করো। অবশ্যই তাঁহার দর্শন পাইবে ॥ ৫ ॥ বড়াইর উক্তি: নাতিনী রাধিকা, তোমাকে বলি শোনো। কোথা গিয়া শ্রীহরির সন্ধান করিব? আমার চলিবার শক্তি নাই। অনুমান হয় কৃষ্ণ তোমাকে উপেক্ষা করিয়া সুদূর মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৬ ॥ রাধার উক্তি: বৃদ্ধা, তোমার পরামর্শেই প্রাণেশ্বর আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়াছেন। তোমার চরণে ধরিয়া বলিতেছি একবার কৃষ্ণকে আনিয়া দাও। নহিলে তোমাকে

১ অ। প্র: একবার।

আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী করিব ॥ ৭ ॥ বড়াইর উক্তি : আচ্ছা, সত্য করিয়া বলো যে আর কখনো আমাকে তিরস্কার করিবে না। তাহা হইলে মথুরায় যাইতে পারি। বারংবার অনেক দুঃখভোগ করিয়াছি। প্রাণে যে মরি নাই সেই আমার বড় ভাগ্য। এই সার কথা তোমাকে বলিলাম ॥ ৮ ॥ রাধার উক্তি : এই মাথায় হাত দিয়া তোমার সম্মুখে শপথ করিতেছি, তোমাকে আর কখনো দুঃখ দিব না। আমার কপালে যাহা আছে কালক্রমে তাহা ফলিবেই। তবু তুমি একবার তাঁহার কাছে যাও ॥ ৯ ॥ বড়াইর উক্তি : নাতিনী রাধা, তোমার কথায় কৃষ্ণের উদ্দেশে এই দেখো মথুরায় যাইতেছি। তাঁহার নাগাল পাইলে তাঁহাকে আনিবার জন্য অতিশয় যত্ন করিব। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১০ ॥

মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনং।
জগাদ বিরহে মগ্না রাধা তে শরণং গতা ॥
ইতি শ্রোত্রশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ।
রাধিকামন্ননিঃশেষ নাগরো[১] পরমাক্ষরং ॥

বৃদ্ধা মথুরানগরে গিয়া মধুসূদনকে বলিল, বিরহিণী রাধা তোমার শরণার্থী। এই কথা শুনিয়া নাগর হরি রাধিকার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলেন।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা। নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে।
আল। তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে ॥
এথো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মণে।
কেমনে বাঢ়ায়িব পা জাণহ আপণে ॥ ১ ॥
আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে।
রাধাত লাগিআঁ কাহ্ন কিবা নাহিঁ করে ॥ ধ্রু ॥
হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।
আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে ॥
তভোঁ আমুমতী মোক নাঁ দিলেক রাহী।
আর তার মুখ নাঁ দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ॥ ২ ॥
বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাহীঁ।
তোহ্মার বিদিত যত বুইল রাহী ॥
চরণে ধরিআঁ বোলোঁ চল তোহ্মে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : রাধা বড়াই প্রগলভা। তাহাকে দেখিলে হৃৎকম্প হয়। তাহার

১ অ। প্র : রাধিকামম্নানিঃশেষং নাগরঃ।

নিকটে যাইতে ভয় লাগে। গোপীদের মধ্যে একজনও ভাল নয়। সকলেরই দুষ্ট স্বভাব। তুমি নিজেই বলো, এ অবস্থায় কেমন করিয়া যাই ॥ ১ ॥ রাধার জন্য আমি কি করি নাই বলো? তথাপি আমাকে যাইবার জন্য আর কেন বলিতেছ ॥ ধ্রু ॥ আমার দগ্ধ প্রাণ শান্ত করিবার জন্য তুমি নিজে তাহার হাতে ধরিয়া বলিলে। তবু রাধা আমার প্রতি আনুকূল্য করিল না। তাই স্থির করিয়াছি আর তাহার মুখ দেখিব না ॥ ২ ॥ দেখো বড়াই, বেশী কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই। রাধা যাহা বলিয়াছে তাহা তোমার অবিদিত নয়। তাই তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি গৃহে ফিরিয়া যাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৩ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত ॥
আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী ॥ ১ ॥
আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে ॥ ধ্রু ॥
মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ।
পাছে কলি কাহ্নাঞিঁ বিরহদুখ পাইবেঁ ॥
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ কেহ্নে ॥ ২ ॥
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী ॥
যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট ॥ ৩ ॥
রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে ॥
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বড়াইর উক্তি: হে কৃষ্ণ, তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে পারি না। হাতে পাওয়া অমৃতকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? বনমালী, আমার কথায় ভরসা করিয়া আইস। চন্দ্রাবলী আর কখনো তোমাকে দুর্বচন বলিবে না ॥ ১ ॥ দুঃখিনী রাধিকা বিরহে ব্যাকুল, তাহাকে এখন ত্যাগ করা তোমার পক্ষে উচিত নয় ॥ ধ্রু ॥ আমার কথায় যদি তাহার কাছে আসিতে না চাহ, তাহা হইলে পরে কিন্তু বিরহ-দুঃখ পাইবে। একদিন তাহার জন্য ভাত খাও নাই, আজ তুমি শাকর খাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছ কেন ॥ ২ ॥ সোনার

ঘট ভাঙ্গিলেও জোড়া যায়। সজ্জনের প্রেমও তেমনই। কিন্তু যে জন অধম, যাহার অন্তর কপটতাপূর্ণ, তাহার প্রেম মাটির ঘটের সমান ॥ ৩ ॥ রাধিকা আপন গৃহে বসিয়া রহিল, আর তুমি আসিয়া রহিলে মথুরা নগরে। আসা যাওয়া করিয়া আমার প্রাণান্ত হইল। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুণী তারে ॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে ॥ ১ ॥
আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী ॥ ধ্রু ॥
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত ॥
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী ॥ ২ ॥
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ॥
বিরহে কা[১]

[illegible]

পুঁথির শেষ ছত্র

কৃষ্ণের উক্তি: বড়াই তোমাকে বলি, তুমি আর অনুরোধ করিও না। তাহার নাম শুনিয়া আমার আর যাইতে ইচ্ছা হয় না। সে যে আমাকে কত দুঃখ দিয়াছে তাহা তো তোমার অবিদিত নয়। আমি মনস্থির করিয়াছি আর তাহাকে দেখিব না ॥ ১ ॥ ওগো বড়াই, যাও তুমি সেখানে ফিরিয়া যাও। রাধিকার জন্য আর আমাকে বলিও না ॥ ধ্রু ॥ কাটা ঘায়ে আর কত লেবুর রস দিবে? রাধা যত কথা বলিয়াছে তাহা তো তোমার অজানা নয়। এই ধন-রত্ন-রাজ্য-ঐশ্বর্য সবই ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু দুঃসহ বাক্যজ্বালা সহ্য করিতে পারি না ॥ ২ ॥ গোকুলের বাস ত্যাগ করিয়া মথুরায় আসিয়াছি। স্থির করিয়াছি কংসের বিনাশ করিব।

১ পুঁথি অসমাপ্ত। শেষাংশ পাওয়া যায় নাই।

ভাষাতাত্ত্বিক টীকাটিপ্পনী

অথবেঁথে <অস্তব্যস্ত।

অশঙ্কেত—সংকেত। স্বার্থে 'অ' আগম।

আঁঅর<অপর>অবর>আঅর। আধুনিক রূপ 'আর'।

আইল<আয়াত+ইল্ল। আধুনিক বাংলায় 'এলো'। মনে রাখা প্রয়োজন, (<আ + √যা) এবং √আস্ (আ+বিশ্) এই দুই ধাতুর মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

আইহন<অভিমন্যু> অহিবন্নু, অহিমন্নু।

আউলাইলোঁ<আকুলায়িত+ইল+উত্তমপুরুষে ওঁ।

আখর<অক্ষর>অক্‌খর>আখর।

আখায়িল—ধোয়া। <আক্ষায়িত+ইল্ল। আ উপসর্গ ঈষৎ অর্থে প্রযুক্ত।

আখী<অক্ষি। চন্দ্রবিন্দু কোথাও আছে কোথাও নাই।

আগ—সম্বোধনবাচক অব্যয়। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক কর্তৃক স্ত্রীলোকের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত।

আগর<অগুরু>অগরু।

আচম্বিত<আ+চমক+স্তম্ভিত।

আছিদরী<অচ্ছিদ্রা।

আথান্তর<অবস্থান্তর।

আদরহ—নামধাতু।

আধর<অধর।

আন<অন্য>অণ্ণ>আন।

আনচান<অন্যছন্দ>অন্নছন্ন>আনছান।

আনন্তর<অনন্তর।

আনল—অনল। আদ্যক্ষরে স্বরাঘাতবশতঃ অ স্থানে আ।

আনুখর—দুর্বাক্য। <অনক্ষর।

আনুমতী—অনুমতি। আদ্যক্ষরে স্বরাঘাত।

আন্তর—অন্তর। আদ্যক্ষরে স্বরাঘাত।

আন্ধারী<অন্ধকার>অন্ধআর>অন্ধার, আন্ধার। 'ঈ' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হইয়াছে।

আনিআর—আনিয়া দাও। অনুজ্ঞা। আনিহ>আনিঅ+আর।' সমাপিকা ক্রিয়াপদের সহিত স্বার্থে যুক্ত '-র' এবং '-আর' প্রত্যয়ের বহু দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে

পাওয়া যায়। যেমন, আছের—আছে, শোভের—শোভে, গেলির—গেল, কহিআর—কহ, দিআর—দাও।

আপনা<আত্মন্।

আবগাহী—অবগাহন করিয়া।

আমরিষে—অসন্তুষ্ট। অমর্ষ।

আমূল<অমূল্য।

আহ্মার—আমার। <অস্ম>অম্হ>আম্হা=আহ্মা।

আয়র<অপর>অবর>অঅর>আয়র।

আরোপিল—নামধাতু।

আহ্রো<আর+হো (নিশ্চয়ার্থে)।

আশোয়াসে<আশ্বাস।

আসুখিনী<অসুখিত+ইল্ল=অসুখিল। প্রথম 'অ'কার 'আ'কার হইয়াছে শ্বাসাঘাতের জন্য। 'নী'র 'ঈ'কার স্ত্রীলিঙ্গবশতঃ।

আহুঠ<অর্ধ-চতুর্থ।

উথাআঁ পাথাআঁ<উত্থাপিত প্রস্থাপিত। আধুনিক বাংলায় ছুটোপাটি বা ছুটোপুটি।

উনমত্ত<উন্মত্ত। স্বরভক্তি।

উপজিল<উৎপদ্য>উৎপজ্জ>উপজ+ইল।

উপেখিআঁ—উপেক্ষা করিয়া। <উপ+ঈক্ষ্।

উঝঁট<অবত্যাবৃত্ত>ওচ্চবট্ট>উচ (ছ) ট>উঝঁট (>হোঁচট)।

উয়ে—উত্তপ্ত হয়, উত্তপ্ত করে। <উষ্ম>উম্হ। উয়ে—উঠে। <উদেতি।

উড়ী<উৎ- √ডী>উড্ড>উড়+অসমাপিকা 'ঈ'=উড়ী।

একসরী—একাকিনী। এক+ √সৃ->একসর+ঈ। তুলনীয়—দোসর, দোসরা, তেসরা। একেশ্বরীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই।

এথাত্রিঁ<এত্র-এত্র>এত্থ-এত্থ।

এভোঁ<এবেঁ+হো।

এড়—ছাড়িয়া দাও। দেশী শব্দ।

এহি—অনুধাবনাত্মক অব্যয় 'হি' সংস্কৃত হইতে মধ্যবাংলা পর্যন্ত আসিয়াছে। 'এহি' 'সেহি' 'তৈহি' প্রভৃতি রূপ লক্ষণীয়। এই 'হি' আধুনিক বাংলায় 'ই' হইয়াছে।

ওহাড়িআঁ—ঢাকিয়া। <অববেষ্ট+ইয়া।

কণ্ণত্ত<কর্ণ>কণ্ণ। 'অ'-অন্ত-জাত।

কথাঁ—কোথা। কুত্র বা কত্র।

কমণ<কঃ পুনঃ>কবণ।

করুআ<করক।

কহিআরেঁা—বলি, let me narrate। অনুজ্ঞার রূপ। 'আনিআর' দ্রষ্টব্য।

কাঁন্তি<কান্তি।

কাঁহিণী<কথনিকা>*কথিনিকা>কাহিনী। চন্দ্রবিন্দু অকারণে বসিয়াছে। তুলনীয় —হিন্দী কহানী।

কাঢ়ে<কৃষ্ট>কড্ঢ>কাঢ়+এ।

কান্দন<ক্রন্দন।

কালিনী<কালিন্দী।

কাহ্নাঞিঁ<কাহ্ন (<কৃষ্ণ)+আঞিঁ। আধুনিক রূপ কানাই। তুলনীয়—বলাই, জগাই, মাধাই ইত্যাদি।

কুম্ভারের<কুম্ভকার।

কুয়িলী<কোকিল>কোইল।

কুহলে—ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

কৈলেঁ।<করিত+ইল্ল+ওঁ।

কোঁয়রী<কুমারী।

কোল—কোল। <ক্রোড়।

খএ<ক্ষয়।

খণ্ডএ<খণ্ডয়তি।

খরল<খর+গরল।

খাঁখায়—দেশী শব্দ।

খাইএ<খাদ্যতে>খাইঅই।

খাউ<খাদ>খা+উ। অথবা খাদতু>খাঅউ>খাউ (অনুজ্ঞা অর্থে)।

খাপর<খর্পর।

খিনী<ক্ষীণ>খীণ+ঈ।

খেপিলেঁ।< √খেপ্ (<ক্ষিপ্)+ইল্+ওঁ।

খোণেকে<ক্ষণেকে।

খোম্পা।<গুম্ফক।

গজমুতি<গজমৌক্তিক। মৌক্তিক>মোত্তিঅ>মোতি, মুতি, মুতী। আধুনিক বাংলায় মোতি।

গরজএ<গর্জতি।

গাএ<গায়তি।

গিএ<গীব>গীঅ>গিএ।

গুআ—সুপারী। <গুবাক।

গেলাস্তি—গেলেন। গৌরবে বহুবচন। <গত+ইল্ল+অস্তি।

গোঠ<গোষ্ঠ>গোট্ঠ।

গোহারি<গোচর+ঈ>গোআরী।

ঘর<গৃহ>গর্হ>ঘর।

ঘাঘর<ঘর্ঘর>ঘগ্ঘর।

ঘুসঘুসাআঁ—ঘুসঘুস করিয়া। ধীরত্ব এবং দীর্ঘস্থায়িত্বব্যঞ্জক ধ্বন্যাত্মক শব্দ। তুলনীয়—আধুনিক বাংলায় 'ঘুস্ঘুসে' জ্বর।

ঘাঅত<ঘাত>ঘাঅ+ত। ত<অন্তঃ।

চাঁচর<চর্চ্চরী>চচ্চরী।

চালএ<চালয়তি।

চাহিআঁ—খোঁজ করিয়া। <চক্ষ্>চক্খ্>চাহ্।

চিআইলী<চেতয়িত+ইল্ল+ঈ।

চিপিআঁ<ক্ষিপ্>ছিপ্, চিপ্+ইআঁ।

চৈত<চৈত্র<চইত্ত>চৈত। আধুনিক বাংলায় চোত।

চৌঠ<চতুর্থ>চউট্ঠ।

ছাড়এ<ছর্দতি।

ছাওয়াল—ছেলে। <শাব+ল।

ছিণ্ডিআঁ—ছিঁড়িয়া। <ছিন্দ্>ছিণ্ড্>ছিঁড়্।

ছিনারী—ভ্রষ্টা। <ছিন্নারিকা।

ছুইলোঁ—স্পর্শ করিলাম। প্রাকৃত ছুবই (সং স্পৃশতি)>ছুঁয়ে, ছুঁএ, ছোঁয়, ছুএ, ছুয়ে, ছোয়।

জয়ধুনী<জয়ধ্বনি।

জরম<জন্ম>জর্ম। 'জন্ম'কে সংস্কৃত রূপ দিবার জন্য রেফ লাগাইয়া 'জর্ম্ম' করা হইয়াছে। স্বরভক্তির ফলে 'জরম' হইয়াছে।

জাইহ—যাইও। <যাস্যথ।

জাএ—যায়। <যাতি।

জাণী<*জানিত>জাণিঅ>জাণী।

জিএ<জীবতি>জীঅই।

জিঠী<জ্যেষ্ঠী।

জুআএ—উচিত হয়। যুজ্যাতে।

জুণি—যেন না। <যন্ন (যৎ+ন)।

জুতী<যুক্তি>জুত্তী>জুতী।

জেঠ<জ্যৈষ্ঠ>জেট্ঠ।

ঝাঁট—শীঘ্র। <ঝটিতি।

ঝরে—কাঁদে। অশ্রু<*অঞ্র ঝু-র সহিত যোগ থাকা সম্ভব। ঝর্ (<ক্ষর্)-এর সহিত যোগ থাকিতে পারে। অঝরু, অঝোর প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়।

ঝিউ<দুহিতা>ধিতা>ঝিঅ>ঝিউ।

টুটিল< √ত্রুট্।
ঠাঁই<স্থামন্>ঠামন, ঠামে>ঠাবিঁ, ঠাঁই।
ডালী—অগভীর প্রশস্ত ঝুড়ি। দেশী শব্দ।
তভোঁ<তবেঁ+হো।
তরাসিত<ত্রাসিত। স্বরভক্তি।
তাহাক—তদ্‌বিষয়ে। সম্প্রদান বা অধিকরণ।
তিঅজ<তৃতীয়>তিঅজ্‌জ>তিঅজ।
তিরীকলা<স্ত্রীকলা।
তেঁসি—সেইজন্য। তেন>তেঁ। সিনি (বরং অর্থে)>সিন্>সি।
তেকারণে—সেই কারণে। তে<তৎ। কারণে<কারণ+এন।
তেজুক—ত্যাগ করুক। তেজ্+উ অনুজ্ঞায়। স্বার্থে 'ক'।
তেরচ্ছ—বাঁকা। <তিরশ্চ।
তেলী<তৈলিক>তেল্লিঅ>তেলি।
তোক—তোমাকে। তো (<ত্বয়া)+ক (<কৃত)।
তোত—তোমাতে। অধিকরণ।
তোহ্মাক—তোমাকে। <যুষ্ম>*তুষ্‌ম>তুম্‌হ>তুহ্ম, তুম্‌হ। প্রাচীন বাংলায় কর্তৃপদ 'তুম্‌হে'। মধ্য বাংলায় তুর্ম্‌হি, তুম্‌হে, (তুহ্মি, তুহ্মে)।
থির<স্থির।
থুয়িল<স্থাপয়িত+ইল্ল।
দহ<হ্রদ>হদ>দহ। বর্ণবিপর্যয়।
দিগেঁ—'দিক্' শব্দ 'দিগ্' রূপে উচ্চারিত। শব্দের মধ্যবর্তী অথবা অন্তস্থিত অঘোষ ব্যঞ্জনের প্রাকৃত স্তরে ঘোষবৎ হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মধ্য বাংলায় এবং আধুনিক বাংলায় কিছু কিছু শব্দে এইরূপ ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যেমন, সগুণী (শাকুনিক)। দিগেঁ—করণের এঁ<এন।
দুঅজ<দ্বিতীয়>দুঅজ্‌জ>দুঅজ। আধুনিক বাংলায় 'দোজ'। যেমন, দোজবরে।
দুচারিণী<দ্বিচারিণী।
দুঠ<দুষ্ট>দুট্‌ঠ।
দুতর<দুস্তর।
দুরুবার<দুর্বার। বিপ্রকর্ষ।
দেখিলোঁ<দেখিত+ইল্ল +উঁ।
দোষসি<দূষয়সি।
ধল—সাদা। <ধবল>ধঅল>ধল।
ধুনী<ধ্বনি।
নঠী<নষ্ট।

নহুলী—নূতন। <নবল+ইকা—নবলী>নউলী, নহুলী।

নাইল—আসিল না। <ন+আইল।

নারোঁ—পারি না। <ন √ পার্> ন + রার্> নার্। তুলনীয়— অসমীয়া 'নোবার'।

নিফল<নিষ্ফল>নিপ্ফল>নীফল, নিফল।

নিশিবোঁ<নি- √ ক্ষিপ্>নিছিপ্ বা নিছিব্ নিশিব্>উত্তম পুরুষের ওঁ। নি- √ক্ষপ (অর্থ—প্রায়শ্চিত্ত) হইতেও আসা সম্ভব। নিশ্চাতয় (অথর্ববেদে অপসারণ অর্থে ব্যবহৃত) শব্দটিও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। তুলনীয়—হিন্দী নিছাবর, মধ্য বাংলায় নিছা, নিছনি।

নেআলী<নবমল্লিকা>ণোমালিআ।

নেত—রেশমী বস্ত্র। <নেত্র।

নেবারী<নিবারিত>নিবারিঅ>নেবারী।

নেহ<স্নেহ>সনেহ>নেহ।

নেহালিলোঁ—দেখিলাম। <নি- √ভাল্>নিহাল>নেহাল+ইল+ওঁ।

পণী—পোয়ান। <পবন>পোঅন>পোন+ঈ।

পতিআশে<প্রত্যাশা।

পদুমিনী<পদ্মিনী।

পসিআঁ<প্র- √বিশ্>পইস, পৈস, পস।

পড়এ<পততি>পড়ই>পড়এ।

পরকারে<প্রকার। বিপ্রকর্ষ।

পরতয়<প্রত্যয়।

পরলা<পটোল।

পরসন—প্রসন্ন।

পরিভায়—উচ্চারণ পরিভাঅ। <প্রতিভা-> পরিভা-, পরিহা- পড়িহা-, পড়িহা-। অনুজ্ঞার রূপ।

পহরে—প্রহরে। অর্ধতৎসম শব্দ। প্রাকৃতের একটি ধ্বনিবৈশিষ্ট্য এই যে, শব্দে আদ্যক্ষর যুক্ত থাকিতে পারে না, অযুক্ত হইয়া যায়। বাংলাভাষাতেও সাধারণ লোকের উচ্চারণে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

পাছু<পশ্চাৎ।

পানে<পর্ণ>পণ্ণ>পান। দ্বিতীয়ায় '-এ' বিভক্তি।

পাড়াইলে—প্রচার করিলে। পড়্ ধাতুর ণিজন্তরূপ।

পাইলোঁ—পাইলাম। <প্রাপিত+ইল্ল>পাইল (পায়িল)+ওঁ।

পারী<*পার্যতে (কর্মভাববাচ্য)।

পালঙ্কি<পর্যঙ্কিকা।

পিন্ধি—পরিধান করিয়া। অপিনদ্ধ>পিনদ্ধ>পিন্ধ।

পুছে<পৃচ্ছতি>পুচ্ছই।

পুণি<পুনঃ।

পুতলী<পুত্রলিকা>পুত্তলিআ>পুত্তলী।

পুনমন্তী<পুণ্যবতী।

পিসী<পিতৃষ্বসা>পিউসিআ>পিসী।

পুরুবেঁ<পূর্বে। বিপ্রকর্ষ।

পেট<পেট্ট। দেশী শব্দ।

পেলায়িবোঁ—ফেলিব। পেল<প্রের্। ইব<ইব্ব<তব্য। 'ওঁ' উত্তম পুরুষের চিহ্ন।

পৈসু<প্রবিশ+পইস্+অনুজ্ঞায় 'উ'।

পোঁআর<প্রবাল।

পোআল<পুত্র+আল।

পোটলী—কাপড়ে বাঁধা ছোট মোট। বড় মোট পোটলা। প্রাকৃতে পোট্টল। আধুনিক বাংলায় পোঁটলা, পুঁটলি।

পোড়ে<পুট্>পুড়্।

পোহাওঁ—পোহাই। *প্রভাতায়তে, প্রভাতি>পোহায়।

ফুকে<ফুৎকার।

ফুরে<স্ফুরয়তি।

বড়<অর্বাচীন সংস্কৃত বড্র। অথবা<বৃত>বট>বড়।

বহুআরী<বধু্>বহু+আরী>বহুআরী। তুলনীয়—ঝিআরী।

বহে<বহতি।

বাঁশীত<বাঁশী+ত। ত<অন্ত।

বাএ<বাদয়তি>বাএ, বায়।

বাছা—বাছুর। <বৎস>বচ্ছ>বাছ।

বাজাএ<বাদ্য+আপয়তি।

বাএঁর<বাম>বাআঁ+সম্বন্ধে 'র'।

বাঞ্ছএ<বাঞ্ছয়তি।

বাটত<বর্ত্ম>বট্ট>বাট+ত।

বাঢ়ায়িলোঁ<বর্দ্ধাপিত+ইল্ল+ওঁ।

বাসলী<বাগীশ্বরী>বাইসরী>বাসরী>বাসলী। বজ্রেশ্বরী হইতে আগত বলিয়াও কেহ কেহ মনে করেন।

বাহুড়ী<ব্যাঘুটিত।

বিচনী<ব্যজনী।

বিছাইআঁ<বিচ্ছাদ্- ।
বিথর<বিস্তর ।
বিসরামে<বিশ্রাম ।
বিহড়াইল<বিঘটায়িত+ইল্ল ।
বুঝে<বুধ্যতে>বুজ্ ঝই>বুঝে ।
বুঢ়<বৃদ্ধ>বুড্ ঢ>বুঢ় ।
বুলি—বলিয়া । √ব্রূ ।
বেআকুলী<ব্যাকুল+স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' ।
বেআপিত<ব্যাপ্ত ।
বেভার<ব্যবহার ।
বেশোআর—ঝাল মশলা । <বেশবার ।
বেঢ়া<বেষ্ট্>বেড্ ঢ>বেঢ় ।
বোলসী<ব্রূ>বোল্+অসি ।
ব্রহ্মগেআন<ব্রহ্মজ্ঞান ।
ভাঁগিল<ভগ্ন+ইল্ল ।
ভাএ—মনে হয় । <ভাতি ।
ভাণ্ডায়িলে—প্রবঞ্চিত করিলে । 'ভণ্ড' হইতে নামধাতু ।
ভিড়ি<বেষ্ট্>বেড্ ঢ>ভেড়, ভিড় ।
ভৈল—হইল । < √ভূ (ভবতি+ইল্ল) ।
মাইলোঁ—মারিলাম । <মারিত+ইল্ল>মারিল>মাইল+উত্তম পুরুষে ওঁ ।
মাথী<ম্রক্ষিত>মক্‌খিঅ>মাথী ।
মাগে<মার্গয়তি>মগ্ গই ।
মাটি<মৃত্তিকা>মট্টিআ ।
মাথানি<মন্থন+ই ।
মাহলী<মল্লিকা ।
মিলিহে—মিলে । ভবিষ্যৎ কাল । মেলিষ্যতি>মেলিহই>মেলিহে, মিলিহে ।
মুকুলিত—মুকুলিত হইল । নামধাতু ।
মুগধী—মুগ্ধা । স্বরভক্তি । বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় ।
মেণ—অব্যয় ।
মৈলোঁ<মৃত+ইল্ল+ওঁ ।
মো—উত্তমপুরুষ সর্বনামের তির্যক রূপ ।
মোক<মো+সম্প্রদান 'ক' ।
মোঞিঁ—আমি । সং অস্মদ্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনের রূপ ময়া=*ময়েন<প্রা মএঁ, মই ।

মৌহারী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, একধরনের বাঁশি। মোহরি, মুহরি, মহরী, মহুঅরি প্রভৃতি নানা রূপভেদ দেখা যায়। মধুকারিকা>মহুআরিআ>মহুআরী, মৌহারী। অথবা, মদহারিকা>মঅহারিআ>মওহারী, মৌহারী। অথবা, মধু>মহু+আরি।

যেহেন>যাদৃশন>জাইশণ, জইশণ>যেহেন।

যোগবাট—যোগপথ। বাট<বর্ত্ম>বট্ট>বাট।

রহাএ—আটকাইয়া রাখে। রহ<রক্ষ্। √রহ-এর নিজস্ব রূপ।

রাএ<রাব>রাঅ>রাএ

লাগিআঁ—মধ্যযুগের বাংলায় এই অনুসর্গটি 'জন্য' 'উদ্দেশ্যে' এইরূপ অর্থে সুপ্রচলিত। মূল শব্দ অথবা ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত শব্দের সহিত ইহা ব্যবহৃত হয়। রূপান্তর 'লাগি' 'লাগী'।

লাজাই—লজ্জা পাই। নামধাতু।

লাম্ফ<লম্ফ।

লাসা<লাসিকা।

লুণী<নবনীত>নোনীঅ>লোণী>লুণী।

লৈলেঁ।—লইলাম। লব্ধইল্ল>লব্‌ভইল্ল>লহ্ইল্ল>লহিল, লৈল+ওঁ।

লোহে—চোখের জল। <লোতস্।

শঙ্খাচূর—চূর্ণবিচূর্ণ। চূর<চূর্ণ।

শাকর—পাথর। <শর্করা।

শিয়ল<শীতল।

শিষের<শীর্ষ (ষষ্ঠী)।

সংনাহা—বর্ম। <সন্নাহ।

সগুণী—ব্যাধ। <শাকুনিক।

সমে—সহিত। সম+হি (সপ্তমী)>সমে। প্রাচীন বাংলায় 'সম' শব্দটিই 'সঙ্গে' অর্থে ব্যবহৃত হইত। যেমন, 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ'--চর্যা। এই 'সমে' শব্দটিরই আধুনিক রূপ 'সনে'।

সাঁঝ<সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ।

সিআন—চতুর। <সজ্ঞান>সিআন।

সুখাইল<শুষ্ক।

সুতিব—শুইব। <সুপ্ত>সুত্ত>সুত।

সুধি—সংবাদ। <শুদ্ধি।

সুনে—শোনে। <শৃণোতি>সুণই>সুনে।

সুরুজ<সূর্য। বিপ্রকর্ষ

সুরেশরী<সুরেঁশ্বরী।

সোআথ<স্বস্থ>সুঅথ>সোআথ।

হরিবোঁ<হৃ>হর+ইব+ওঁ।

হাণিল<হানিত+ইল্ল।

হাকান্দ—হাহাকার রবে ক্রন্দন। <হাক্রন্দএ>হাকংদ>হাকান্দ।

হারায়িলোঁ।< √হৃ>*হারায়িত+ইল্ল+ওঁ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-পরিচয়

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

ছন্দোরীতি (verse styles)

উপক্রম

অপভ্রংশের সূতিকাগার থেকে সদ্য-নিষ্ক্রান্ত বাংলা ছন্দের রূপ দেখা যায় চর্যাগীতিগুলিতে। যেমন—

কাআ তরুবর | পঞ্চ বি ডাল- ।
চঞ্চল চীএ | পইঠো কাল- ॥
—লুই, চর্যা ১

আজি ভুসুকু বঙ্ | -গালী ভইলী ।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ | -ডালী লেলী ॥
—ভুসুকু, চর্যা ৪৯

এই হল বাংলা ছন্দের শিশুমূর্তি। কিন্তু এই ছন্দোরূপ বাংলাভাষার স্বভাবজাত নয়, আর্যভারতীয় প্রাকৃত-অপভ্রংশের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। বাংলার স্বভাবজাত ছন্দ অর্থাৎ বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ- ও শ্রুতি -সম্মত ছন্দ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম দেখা যায় বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে (১৪৮৪-৮৫), আর তার পরিণত রূপের নিদর্শন মেলে লোচনদাসের ধামালি-রচনায় (ষোড়শ শতক)। যেমন—

মনে প্রাণে মৈল ধনী | রূপে মনপ্রাণ টানে ।
ছন্‌ছনানি মনে লো সই | ছট্‌ফটানি প্রাণে ॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন | কিসের হলুদ-বাটা ।
আঁখির জলে বুক ভিজিল | ভেসে গেল পাটা ॥
উঠিল গৌরাঙ্গভাব | সম্বরিত নারে ।
লোহেতে ভিজিল বাটনা | গেল ছারেখারে ॥
—লোচনদাস

চর্যাগীতির উদ্ধৃত অংশ-দুটির ছন্দ হচ্ছে প্রাকৃত 'পাদাকুলক' ছন্দের বাংলা প্রতিরূপ। আর লোচনদাসের 'ধামালি' অংশটি রচিত হয়েছে খাঁটি বাংলা লৌকিক রীতির ছন্দে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল যেমন চর্যাগীতি ও লোচনদাসের মধ্যবর্তী, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দোরীতিও আর্যভারতীয় প্রাকৃত ও খাঁটি বাংলা লৌকিক রীতি মধ্যবর্তী। এক দিকে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রবর্তনা ও অপর দিকে বাংলার

ধ্বনিপ্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা, এই উভয়ের সম্মিলিত প্রভাবের ফল দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে। বস্তুতঃ প্রাচীন প্রাকৃত রীতি বাংলা লৌকিক রীতির আকর্ষণে বিবর্তিত হয়ে এই উভয়ের মাঝামাঝি বিশেষ একটা নূতন রূপ ধারণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এই নূতন ছন্দোরীতিকে বলা যায় বাংলা **সাধুরীতি**। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায়, বাংলা ছন্দের এই সাধুরীতিটি সেকালে পরিচিত হয়েছিল **পয়ার** নামে।

১। পয়ার বা সাধুরীতি (standard style)

এই নূতন অর্থাৎ সাধু বা 'পয়ার' রীতির সাক্ষাৎ পাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে। শুধু তাই নয়, তার বিবর্তনের পথরেখাটিও এই কাব্যের রচনায় লক্ষ করা যায়। এই পথরেখার এক প্রান্ত দেখা যায় চর্যাগীতিগুলিতে, আর অপর প্রান্ত লক্ষিত হয় বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায়। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা সহজে বোঝা যাবে।—

নী-ল জলদ সম | কু-ন্তল ভা-রা-।
বেকত বিজুলি শোভে | চ-ম্পকমা-লা- ॥
শিশত শোভএ তোর | কামসি-ন্দু-র।
প্রভাত সমএ যেন | উয়ি গেল সূ-র ॥
ললাটে তিলক যেহ্ন | নব শশিকলা।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু | শ্রবণযুগলা ॥

—দানখণ্ড, পাণ্ডুলিপি ৩৪।১

এই অংশটির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে প্রাচীন প্রাকৃত রীতি বিশুদ্ধভাবেই রক্ষিত হয়েছে। তার পরে এই প্রাকৃত রীতি প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতেই ধাপে ধাপে নেমে এসে শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে বিশুদ্ধ বাংলা সাধুরীতিতে পরিণত হয়েছে। বস্তুতঃ এই পঙ্‌ক্তি-কয়টি বাংলা ছন্দ-বিবর্তনের একটি সুন্দর সোপান বলে গণ্য হতে পারে। মনে হয় ভারতের ছন্দ-সরস্বতী যেন প্রাকৃতের তুঙ্গভূমি থেকে এই সোপান বেয়েই এক-পা এক-পা করে নেমে এলেন বাংলার সমতল ভূমিতে।

দেখা গেল, চর্যাগীতিস্বীকৃত প্রাকৃত রীতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার কালেই প্রায় অপ্রচলিত অর্থাৎ প্রত্ন (archaic) -পর্যায়ভুক্ত হয়ে এসেছিল। এই প্রাচীন প্রাকৃত- বা প্রত্ন-রীতিতে প্রত্যেকটি হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদল (short open syllable, যেমন— ল, বি, কু, তু) একমাত্রিক এবং প্রত্যেকটি দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল (long open syllable, যেমন— নী, ভা, দূ, বে, শো) ও প্রত্যেকটি রুদ্ধদল (closed syllable, যেমন— কুন্, চম্, সিন্, ভৈ, গৌ) দ্বিমাত্রিক বলে গণনীয়। উদ্‌ধৃত অংশের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে এই নীতি নিখুঁতভাবে অনুসৃত হয়েছে। হিসাব করলে দেখা যাবে এই পঙ্‌ক্তিতে আছে মোট ষোল মাত্রা। প্রাকৃত পাদাকুলক ছন্দের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ষোল মাত্রাই

থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে এই নীতি রক্ষিত হয়েছে শুধু এটির দ্বিতীয় অংশে ('চম্পকমালা')। প্রথম অংশে দীর্ঘস্বরগুলি খাঁটি বাংলা পদ্ধতিতে একমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে। তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'সিন্দূর' এবং চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে শুধু 'সূর' শব্দে প্রাচীন রীতি স্বীকৃত হয়েছে, অন্যত্র বাংলা রীতি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে প্রাচীন প্রাকৃত রীতির লেশমাত্রও নেই। সর্বত্রই বাংলা রীতির একাধিপত্য। গাণিতিক হিসাবে প্রথম চার পঙ্‌ক্তিতে যথাক্রমে চার, তিন, দুই ও এক দলে প্রাচীন প্রাকৃত রীতি স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই চার পঙ্‌ক্তিতে প্রাকৃত রীতি ক্রমে ক্রমে বর্জিত হয়ে বাংলার আদর্শ সাধুরীতি প্রকাশ পেয়েছে পরের দুই পঙ্‌ক্তিতে।

এবার আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

> ষোল কলা 'স-ংপূন্ন' ¦ 'চ-ন্দ্র'বদন।
> বেকত আমৃত তোর | মধুর বচন॥
> 'কাঁ-চ' কনয়া যেহ্ন | দেহের বরণ।
> কণ্ঠ কম্বু মণিগণ | শোভএ দশন॥
>
> —দানখণ্ড, পা ৩৪।২

এখানে 'সংপূন্ন' শব্দের একটি রুদ্ধদল (সং বা পূণ্‌) এবং 'চন্দ্র' শব্দের 'চন্‌', এই রুদ্ধদলটি দ্বিমাত্রক। 'কাঁচ' শব্দের 'কাঁ', এই দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদলটিও দ্বিমাত্রক। এ-রকম দ্বিমাত্রকতা প্রাচীন প্রাকৃত রীতি-সম্মত, বাংলা রীতি-সম্মত নয়। বাংলা রীতিতে দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদলের (যেমন—'ষোল' ও 'কলা' শব্দের ষো ও লা) উচ্চারণ হ্রস্ব এবং তার ধ্বনিমূল্যও একমাত্রা। তেমনি খাঁটি বাংলায় শব্দের অপ্রান্তস্থ রুদ্ধদলের (যেমন—'সম্পূর্ণ' ও 'চন্দ্র' শব্দের সম্‌, পূর্‌ ও চন্‌, কিংবা 'কণ্ঠ' ও 'কম্বু' শব্দের কণ্‌ ও কম্‌) উচ্চারণও সংকুচিত এবং তার ধ্বনিমূল্যও এক মাত্রার বেশি নয়। দেখা যাচ্ছে, উদাহৃত রচনাংশটির প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে প্রাচীন প্রাকৃত ও অর্বাচীন বাংলা রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। বাকি দুই পঙ্‌ক্তিতে বাংলা রীতিই স্বীকৃত হয়েছে।

পূর্বে বলেছি, রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এ-রকম বাংলা রীতির নাম 'সাধুরীতি'। এই সাধুরীতির আর-একটি লক্ষণ এই যে, এই রীতিতে শব্দের অপ্রান্তস্থ রুদ্ধদল সংকুচিত এবং একমাত্রক হলেও শব্দের প্রান্তস্থ রুদ্ধদল প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক বলেই গণ্য হয়। যেমন—'কুণ্ডল্‌' শব্দের কুণ্‌ সংকুচিত ও একমাত্রক, কিন্তু ড-ল্‌ প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক। হাইফেন চিহ্নটি প্রসারণসূচক হিসাবে ব্যবহৃত হল। সুতরাং বাংলা সাধুরীতির হিসাবে 'কুণ্ডল্‌' শব্দের (হসন্ত উচ্চারণে) মাত্রাপরিমাণ তিন (কুণ্‌=এক, ড-ল্‌=দুই)। তেমনি 'পুণ্যবান্‌' শব্দের মাত্রাপরিমাণ চার (পুণ্‌=এক, ণ্য=এক, বা-ন্‌=দুই)। বাংলা উচ্চারণে 'মধুর' ও 'বচন' শব্দ হসন্ত এবং বাংলা সাধুরীতির ছন্দে ধুর্‌ ও চন্‌ এই দল-দুটি প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক। ফলে মধু-র্‌ ও বচ-ন্‌, এই দুই শব্দেরই মাত্রাপরিমাণ

তিন। তাই এই রীতির ছন্দে মদিরা ও মন্দিরা, বসন ও বসন্ত, নিপুণ ও নৈপুণ্য মাত্রামর্যাদায় সমান বলেই গণ্য।

প্রাচীন প্রাকৃত রীতি ও বাংলা সাধুরীতির পার্থক্য এই।—প্রাকৃত রীতিতে অবস্থান-নির্বিশেষে রুদ্ধদলমাত্রই প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক, আর বাংলা সাধুরীতিতে শব্দের অন্তিম রুদ্ধদল প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক বটে, কিন্তু অপ্রান্তবর্তী রুদ্ধদল সংকুচিত ও একমাত্রক। নিম্নে তালিকা-আকারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই পার্থক্য দেখানো গেল।—

প্রাকৃত রীতি	বাংলা সাধুরীতি
প-শ্চা-ৎ : চার মাত্রা	পশ্চা-ৎ : তিন মাত্রা
তি-র্য-ক্ : চার মাত্রা	তির্য-ক্ : তিন মাত্রা
বি-দ্বা-ন্ : চার মাত্রা	বিদ্বা-ন্ : তিন মাত্রা
পু-ণ্যবা-ন্ : পাঁচ মাত্রা	পুণ্যবা-ন্ : চার মাত্রা

বোঝা যাচ্ছে, বাংলা সাধুরীতির ছন্দে শব্দের শেষাংশে প্রাচীন প্রাকৃত উচ্চারণই স্বীকৃত হয়, অন্যত্র খাঁটি বাংলা উচ্চারণ। বাংলা সাধুরীতির ছন্দ আসলে একটি মিশ্র-প্রকৃতির ছন্দ, কেননা এ ছন্দ রুদ্ধদলের দ্বিবিধ রূপের যোগে গঠিত।

২। লাচাড়ি বা লোকরীতি (folk style)

এবার বাংলা ছন্দের লৌকিক রীতির প্রসঙ্গে আসা যাক। এই রীতিতে রুদ্ধদল সর্বত্রই সংকুচিত ও একমাত্রক। ছেলেভুলানো ছড়া, বাউলের গান প্রভৃতি লোক-সাহিত্যের প্রধান বাহন বলে এই ছন্দোরীতিকে বলা যায় বাংলা 'লৌকিক রীতি' বা 'লোকরীতি'। এই রীতির ছন্দ সর্বপ্রথম সাহিত্যে স্থান পায় বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের (১৪৮৪-৮৫) কোনো কোনো অংশে। অতঃপর এই ছন্দোরীতির গুরুত্ব ও মর্যাদা বহুলপরিমাণে বেড়ে যায় লোচনদাসের ধামালি-রচনা ও রামপ্রসাদের গানের যোগে। বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায়, বাংলা ছন্দের এই 'লোকরীতি' তৎকালে পরিচিত ছিল **লাচাড়ি** নামে। রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ছন্দকে বরাবরই রামপ্রসাদের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। রামপ্রসাদের রচনা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি।—

"ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি -রত্নাকরের অগাধ জলে।"

কিংবা

"মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

'হৃদি' এবং 'এমন', এই দুটি 'অতিপর্ব' বাদ দিয়ে হিসাব করলে দেখা যাবে, দুই

দৃষ্টান্তেরই প্রতি ছত্রে আছে আট দল (syllable)। একটু মন দিলেই বোঝা যাবে, এই অংশ-দুটিতে রুদ্ধদলগুলি অবস্থাননির্বিশেষে সর্বত্রই সংকুচিত ও একমাত্রক। মুক্তদলগুলি তো বাংলা উচ্চারণ অনুসারে সবই একমাত্রক। অর্থাৎ এই লৌকিক রীতির ছন্দে মুক্তরুদ্ধনির্বিশেষে প্রত্যেক দলই এক মাত্রা বলে স্বীকৃত। সুতরাং উপরের দৃষ্টান্ত-দুটির প্রত্যেক ছত্রেই আট দলে আট মাত্রা গণনীয়। এই রীতির ছন্দ সর্বতোভাবেই বাংলা-ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এই লৌকিক রীতির ছন্দকে বলেছেন বাংলাভাষার 'স্বাভাবিক' ছন্দ।

বড়ু চণ্ডীদাসের কালেও যে এই স্বাভাবিক ছন্দোরীতি অর্থাৎ লাচাড়িরীতি লোকমুখে প্রচলিত ছিল তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাপদ্ধতিতে। যেমন—

১। 'তাহার' হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে॥

—জন্মখণ্ড, পা ৩।১

২। বেদ উদ্ধারিলোঁ ক্রীড়া 'সাগর' জলে
লীলাএ আহ্মে মুরারী।
দৈ-ত্য দলিলো 'আসুর' সংহারিলো
শঙ্খ চক্র গদা ধরী॥

—দানখণ্ড, পা ৫১।২

৩। 'ঘাটের' ঘাটিআল মোরে | ঝাঁট কর পার।
তোর মায় যশোদায় | ননন্দ আহ্মার॥

—নৌকাখণ্ড, পা ১৭।২

৪। যমুনার তীরে 'কদম' তরুতলে
বাঅ বহে সুশীতলে।

—বংশীখণ্ড, পা ১৭৮।১

এখানে তাহার্, সাগর্, আসুর্, ঘাটের্, কদম্, এই প্রত্যেকটি শব্দই দ্বিমাত্রক। অর্থাৎ এসব স্থলে শব্দের অন্তিম রুদ্ধদলগুলি (হার্, গর্, সুর্, টের্, দম্) সংকুচিত ও একমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে। এই সংকোচন প্রত্নরীতি (অর্থাৎ প্রাচীন প্রাকৃতরীতি) -সম্মতও নয়, বাংলা সাধুরীতি-সম্মতও নয়। এই সংকোচন সম্পূর্ণরূপেই বাংলা লৌকিক বা লাচাড়ি রীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেব কোনো স্থানেই ধারাবাহিক ভাবে লৌকিক বা লাচাড়ি রীতির ছন্দ অনুসৃত হয় নি। কিন্তু নানা স্থানেই এই রীতির কিছু-কিছু প্রভাব এসে পড়েছে। উপরের দৃষ্টান্তগুলিই তার নিদর্শন। পূর্বে দেখেছি এই কাব্যে প্রত্নরীতিও কোথাও একনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হয় নি, যদিও স্থানে স্থানে এই বিলীয়মান রীতির কিছু-কিছু রেশ বা অবশেষ থেকে গিয়েছে। ফলকথা এই যে, এই কাব্যের ছন্দ প্রধানতঃ গঠিত হয়েছে

একদিকে বিলীয়মান প্রত্নরীতি ও অপরদিকে উদীয়মান লৌকিক রীতির মধ্যবর্তী ও উভয়ের প্রভাবজাত বাংলা সাধুরীতির ছাঁচে। বাংলা সাধুরীতি যদিও নিজেই একটি মিশ্ররীতি, তথাপি তার একটি সুনির্দিষ্ট রূপ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ প্রধানতঃ এই নির্দিষ্টাকৃতি সাধুরীতিতে রচিত। কিন্তু মাঝে মাঝে এই সাধুরীতির সঙ্গে প্রত্নরীতির মিশ্রণ ঘটেছে, আবার কখনও বা তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে বাংলা লৌকিক রীতি। পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতেই এই উভয়বিধ মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যাবে। এ-রকম মিশ্রণের আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

'মে-ঘ' আন্ধারী অতি | ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো- | 'কদম' তলে বসী ॥

—রাধাবিরহ, পা ১৯৯।২

এখানে সাধুরীতির সঙ্গে প্রত্ন ও লৌকিক, এই দুই রীতিরই মিশ্রণ ঘটেছে। কেননা এখানে 'মেঘ' শব্দের 'মে' দলটি দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে প্রত্নরীতির আদর্শে, আবার 'কদম্' শব্দের 'দম্' দলটি একমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে বাংলা লৌকিক রীতি অনুসারে। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, এই দৃষ্টান্তের 'মো' দলটি দ্বিমাত্রক হয়েছে খাঁটি বাংলা উচ্চারণরীতির অনুসরণে। বাংলা উচ্চারণের একটা বিশেষ নীতি এই যে, যদি কোনো একক মুক্তদল পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে অলগ্নভাবে উচ্চারিত হয় তবে সেই দলটি স্বতঃই দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রক হয়। আরও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

গোআলার 'ঝি-' আহ্মে | আতিশয় বালী।

—দানখণ্ড, পা ৪৯।১

'কে-' তোকে জানাইলে | মাউলানী সম্বন্ধ।

—দানখণ্ড, পা ২৬।১

এখানে 'ঝি' ও 'কে' শব্দের দ্বিমাত্রকতা লক্ষিতব্য। দ্বিতীয় উদাহরণের 'মাউলানী' শব্দের ধ্বনিরূপটিও লক্ষিতব্য। এই শব্দের 'মাউ্' দলটি সংকুচিত ও একমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে। শব্দের অপ্রান্তবর্তী স্বরান্ত রুদ্ধদলের সংকোচন ও একমাত্রকতা খাঁটি বাংলা উচ্চারণ-সম্মত অর্থাৎ বাংলাভাষার পক্ষে স্বাভাবিক। বাংলা ভাষার এই স্বাভাবিক উচ্চারণরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে বহুলপরিমাণে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

গোআলের বহু ঝি- | লই্আঁ জাই্ব আহ্মে।

—তাম্বুলখণ্ড, পা ১৫।১

এখানে শুধু 'ঝি' শব্দের দ্বিমাত্রকতা নয়, 'লই্আঁ' ও 'জাই্ব' শব্দের লই্ ও জাই্ এ-দুটি শব্দমধ্যবর্তী স্বরান্ত রুদ্ধদলের সংকোচন তথা একমাত্রকতাও লক্ষণীয়। মুক্ত ও রুদ্ধদলের এই দ্বিবিধ প্রয়োগই বাংলাভাষার পক্ষে স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার স্বীকৃতি বড়ু চণ্ডীদাসের পক্ষে কৃতিত্বের বিষয় এবং এটা তাঁর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী কালে

এই বৈশিষ্ট্য লোপ পেয়ে যায়। কেননা, সংস্কৃত 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের সংস্কার ভারতচন্দ্র-প্রমুখ কবিদের প্রবর্তিত করে বাংলা ছন্দকে অক্ষরসংখ্যার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার দিকে। ফলে ধ্বনিপ্রকৃতি-নিরপেক্ষ 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত' রীতির ছন্দে যে কৃত্রিমতা দেখা দেয়, বাংলা ছন্দ এখনও তার থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে নি। বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় এই কৃত্রিমতা ছিল না।

উপসংহার

দেখা গেল, বড়ু চণ্ডীদাসের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত ছিল প্রাচীন প্রাকৃত- বা প্রত্ন-বাংলা রীতির ছন্দ। তার নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাগীতিগুলিতে। তার পরে প্রচলিত হয় লৌকিক বা লাচাড়ি রীতির ছন্দ। এই রীতির নিদর্শন মেলে বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন অংশে এবং লোচনদাসের ধামালি-রচনায়। আর বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় পাই এই দুএর সমন্বয়ে গঠিত বাংলা সাধুরীতির প্রথম যথার্থ নিদর্শন। এই সাধুরীতিই ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। সে সময় থেকে এই সাধুরীতিই বাংলা সাহিত্যেরও প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে এই সাধু-রীতিকেই অক্ষর-সংখ্যার লোহার ছাঁচে ফেলে গড়ে তোলা হয় 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত' রীতির ছন্দ।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে এই ছন্দোরীতিগুলির একটু পারিভাষিক পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। চর্যাগীতিগুলিতে যে প্রাচীন ছন্দোরীতির প্রয়োগ দেখা যায়, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে তাকে বলা হয় 'মাত্রাবৃত্ত' (quantitative)। আধুনিক পরিভাষায় তাকে বলি প্রাচীন বা প্রত্ন কলামাত্রক বা **কলাবৃত্ত** (moric) রীতি। কেননা, ঠিক এইজাতীয় কলাবৃত্ত রীতি (যাতে দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদলের দ্বিমাত্রকতা স্বীকৃত হয়) আজকাল আর প্রচলিত নেই। বিজয় গুপ্তের লাচাড়ি রচনায়, লোচনদাসের ধামালিতে ও রামপ্রসাদের গানে যে লৌকিক রীতির প্রয়োগ দেখি, আধুনিক পরিভাষায় তাকে বলি দলমাত্রক বা **দলবৃত্ত** (syllabic) রীতি। কেননা, এই রীতিতে মুক্তরুদ্ধনির্বিশেষে প্রত্যেকটি দলই এক মাত্রা বলে গণ্য। আর, বড়ু চণ্ডীদাসের অবলম্বিত যে মুখ্য ছন্দোরীতিকে বলেছি 'সাধুরীতি', তার আধুনিক পারিভাষিক নাম **মিশ্র-কলাবৃত্ত** (mixed moric), সংক্ষেপে **মিশ্রবৃত্ত** (composite)। এই রীতিকে 'মিশ্র' বলার হেতু কি, তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আধুনিক 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত' যে এই রীতিরই অর্বাচীন প্রকারভেদমাত্র, সে-কথাও পূর্বে বলা হয়েছে।

ছন্দোরূপ (metrical forms)

ছন্দোরীতির দ্বারা সূচিত হয় ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি, আর ছন্দোরূপের দ্বারা প্রকাশ পায় তার বহিরাকৃতি। ছন্দোরূপেরই নামান্তর **ছন্দোবন্ধ**। ছন্দোগত রূপসম্পদের অর্থাৎ বন্ধবৈচিত্র্যের বিচারেও বাংলা ছন্দের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থান প্রথম পর্যায়েই নির্দিষ্ট হতে পারে। এই কাব্যের ছন্দোবন্ধ দ্বিবিধ— পঙ্‌ক্তিবন্ধ ও শ্লোকবন্ধ।

পঙ্‌ক্তিবন্ধ (verse froms)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দপঙ্‌ক্তি গঠিত হয়েছে প্রধানতঃ চার মাত্রার পর্বযোগে। ছয় মাত্রার পর্বের নির্দশনও আছে কিছু-কিছু। ছন্দের **পদ** গঠিত হয় সাধারণতঃ দুই পর্বের যোগে এবং কখনও কখনও তিন পর্বের যোগে।[১] পদসংখ্যা অনুসারে ছন্দপঙ্‌ক্তি একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী, এই চার প্রকারের হয়ে থাকে। পঙ্‌ক্তির আয়তনগত এইসব প্রকারভেদের সাধারণ নাম **পঙ্‌ক্তিবন্ধ**। আর ছন্দের রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ তার পঙ্‌ক্তিবৈচিত্র্যের দ্বারা। নিম্নে দৃষ্টান্তযোগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পঙ্‌ক্তিবন্ধগত রূপবৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

১। ছয়মাত্রা পর্বের পঙ্‌ক্তিবন্ধ

অধুনাপূর্ব যুগের বাংলা সাহিত্যে চারমাত্রা পর্বের তুলনায় ছয়মাত্রা পর্বের প্রয়োগ কম। তবু বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় ছয়মাত্রা পর্বের যে প্রয়োগবৈচিত্র্য দেখা যায়, তাঁর পক্ষে তা কৃতিত্বেরই বিষয়। এই কাব্যে ছয়মাত্রা পর্বের রচনায় দু-রকম পঙ্‌ক্তিবন্ধ দেখা যায়— একপদী ও দ্বিপদী। যেমন—

১। দুই পর্বের (৬+৫ মাত্রা) অপূর্ণ **একপদী** বন্ধ —

আয়িলা দেবের | সুমতি গুণী।
কংসের আগক | নারদ মুনী ॥
—জন্মখণ্ড, পা ৩।১

প্রাচীন পরিভাষায় এই বন্ধের নাম 'একাবলী'।

২। তিন পর্বের (৬+৬+২ মাত্রা) অপূর্ণ **একপদী** বন্ধ—

নিশি আন্ধিআরী | তাহাত কেমনে | নারী।
জিএ সে জাহার | পাসত পুরুষ | নাহী ॥
—রাধাবিরহ, পা ২১২।১

১ অর্ধযতি-সূচিত পঙ্‌ক্তিবিভাগের নাম 'পদ', আর লঘুযতি-সূচিত বিভাগের নাম 'পর্ব'। দ্রষ্টব্য পরবর্তী পাদটীকা।

৩। চার পর্বের (৬+৬ | ৬+২ মাত্রা) অপূর্ণ **দ্বিপদী** বন্ধ—

চারি দিগেঁ তরু | -পুষ্প মুকুলিল | বহে বসন্তের | বাএ।
আম্বডালে বসী | কুয়িলী কুহলে | লাগে বিষবাণ | -ঘাএ॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৭০।১

প্রাচীন মতে এই বন্ধের নাম 'লঘু ত্রিপদী'। আসলে এই বন্ধকে 'ত্রিপদী' না বলে 'দ্বিপদী' বলাই সমীচীন। কারণ এর ছয় মাত্রার ভাগগুলি 'পদ' নয়, পর্ব।[১]

২। চারমাত্রা পর্বের পঙ্‌ক্তিবন্ধ

চারমাত্রা পর্বের পরবর্তী যতিটি অনেক সময় লোপ পায়। ফলে দুটি পর্ব মিলিত হয়ে এক-একটি 'যুক্তপর্বিক পদ' উৎপন্ন হয়। পরবর্তী দৃষ্টান্তগুলিতে লুপ্ত পর্বযতি নির্দিষ্ট হল 'ত্রিবিন্দু দণ্ড' চিহ্নের দ্বারা।

১। দুই পর্বের (৪+৪) **একপদী** বন্ধ—

বৃন্দাবন | মোর থানে।
ব-ংশ বা ⋮ -জাওঁ গানে॥
না কর তোঁ- | মন আনে।
আহ্মে অসুর্ | -দলন্ কাহ্নে॥

—দানখণ্ড, পা ২৫।১

'বংশ' শব্দ ত্রিমাত্রক প্রত্নকলাবৃত্ত রীতি অনুসারে। 'অসুর্' ও 'দলন্' শব্দ-দুটি দ্বিমাত্রক বাংলা লৌকিক রীতি অনুসারে। খাঁটি বাংলা উচ্চারণ অনুসারে 'তোঁ' শব্দটিও দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে।

২। সার্ধ দুই পর্বের (৪+৪+২) **একপদী** বন্ধ—

যোগী যোগ | চিন্তে যেহ্ন | -মনে।
কাহ্নাঞি ছাড়ী | না জাণো মো | আনে॥

—রাধাবিরহ, পা ১৯৫।১

'কাহ্নাঞি' (=কাহ্নাই্) শব্দটি দ্বিমাত্রক লৌকিক উচ্চারণে।

৩। সার্ধ তিন পর্বের (৪+৪ | ৪+২) **দ্বিপদী** বন্ধ—

পাখি নহোঁ | তার ঠাই | উড়ী পড়ি | জাওঁ॥
মেদনী বি ⋮ -দার দেউ | পসিআঁ লু ⋮ -কাওঁ॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৬৯।২

আট-ছয় মাত্রার এই দ্বিপদী বন্ধেরই প্রচলিত অর্বাচীন নাম পয়ার বন্ধ।

---

১ দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী পাদটীকা এবং লেখকের 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থ (১৯৬৫) পৃ ৪, ৬-৭ এবং ১২৬-২৭।

৪। দশ আট (৪+৪+২ | ৪+৪) মাত্রার **দ্বিপদী** বন্ধ—

গোআল-জরম আহ্মে শুণ |
দধি দুধে উতপতী।
এবেঁ তাক উপেখহ কেহ্নে |
তোর ভৈল কি কুমতী ॥

—নৌকাখণ্ড, পা ৭২।২

দণ্ডচিহ্ন পদযতিজ্ঞাপক। অনাবশ্যকবোধে পর্বযতি দেখানো হল না। পরবর্তী দৃষ্টান্ত-গুলিতেও এই রীতিই অনুসরণ করা যাবে।

৫। আট-ছয়-আট মাত্রার **ত্রিপদী** বন্ধ—

মো যবেঁ জাণিতোঁ হেন | করিবেঁ তো ল- |
তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে।
নাহিঁ যাইতোঁ দধি দুধ | বিকণিতেঁ ল- |
কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে ॥

—বৃন্দাবনখণ্ড, পা ১২৪।১-২

৬। আট-ছয়-দশ মাত্রার **ত্রিপদী** বন্ধ—

সুসর বাঁশীর নাদ | শুণিআঁ বড়ায়ি |
রাধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো- | বেশোআর দিলোঁ |
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী ॥

—বংশীখণ্ড, পা ১৭৫।২

৭। **আট-আট-দশ মাত্রার ত্রিপদী** বন্ধ—

সোঞরী কাহ্নের বাণী |
না রহে মোর পরাণী |
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলো সুখ আসেস |
দিনে দিনে তনু শেষ |
ভাবিঞাঁ সে কা-হ্নের নেহে ॥

—রাধাবিরহ, পা ২২২।১

এই বন্ধ পরবর্তী কালে দীর্ঘ ত্রিপদী নামে খ্যাত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যথার্থ চৌপদীর নিদর্শন নেই। এই কাব্যে একপদী ও ত্রিপদীর তুলনায় দ্বিপদীর প্রয়োগই বেশি। আবার দ্বিপদী বন্ধগুলির মধ্যে পয়ার-বন্ধের প্রয়োগই

সর্বাধিক। বস্তুতঃ পয়ার-বন্ধই বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রধান আশ্রয়। এই পয়ার-বন্ধের আদিরূপ এবং তার প্রাধান্যের সূচনা দেখা গেল বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায়। বাংলা ছন্দের ইতিহাসে এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩। শ্লোকবন্ধ (verse grouping)

একপদী, দ্বিপদী ও ত্রিপদী, এগুলি হল পঙ্‌ক্তিবন্ধের প্রকারভেদ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে **শ্লোকবন্ধ** রচনাতেও কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়। নিম্নে দু-রকম শ্লোকবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

দুই পঙ্‌ক্তির যোগে যে শ্লোক রচিত, তাকে বলা যায় **যুগ্মক বা দ্বৈতবন্ধ** (couplet)। যুগ্মকবন্ধ সুপরিচিত। পূর্বোদধৃত সব দৃষ্টান্তই এই বন্ধে রচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যুগ্মকেরই প্রাধান্য।

তিন পঙ্‌ক্তিতে রচিত শ্লোককে বলা যায় **ত্রিক** বা **ত্রৈতবন্ধ** (triplet)। যুগ্মকের ন্যায় ত্রিকবন্ধও পর্বের আয়তনভেদে দ্বিবিধ— চারমাত্রা ও ছয়মাত্রা পর্বের ত্রিকবন্ধ।

ষণ্মাত্রপর্বিক ত্রিকবন্ধের প্রয়োগবৈচিত্র্য অপেক্ষাকৃত কম। যেমন—

কেহ্নে হেন কাম | কৈলে।
সব ফুল ফল | লৈলে।
বৃন্দাবন মাঝে | পসিআঁ- রাধা | সব তরু শুন | কৈলেঁ॥

—বৃন্দাবনখণ্ড, পা ১২৪।১

চতুর্মাত্রপর্বিক ত্রিকবন্ধের বৈচিত্র্য কিছু বেশি। যেমন—

১। আট-আট-দশ মাত্রার ত্রিকবন্ধ—

দূতী ধরোঁ তোর পাএ।
হের মোর প্রাণ জাএ।
কহ মোরে জীবন-উপাএ॥

—রাধাবিরহ, পা ১৯০।১

২। আট-আট-চৌদ্দ মাত্রার ত্রিকবন্ধ—

বাম করতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে।
তো-হ্মাক চিন্তে রাধা | নি-শ্চল মনে॥

—রাধাবিরহ, পা ২১৫।২

'তোহ্মাক' ও 'নিশ্চল' শব্দে চার মাত্রা গণনীয় কলাবৃত্ত রীতিতে।

৩। দশ-দশ-দশ মাত্রার ত্রিকবন্ধ—

এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ।
হারায়িলোঁ কা-হ্নের লাগ।
আর তার না পায়িবোঁ লাগ॥
—রাধাবিরহ, পা ১৯০।২

৪। দশ-দশ-চৌদ্দ মাত্রার ত্রিকবন্ধ—

সব খন চিন্তিআঁ মুরারী।
পরাণ ধরিতেঁ না পা-রী।
রহিব যৌবনে আহ্মে | [কেমনে] মন নেবা-রী॥
—রাধাবিবহ, পা ২১৩।১

এখানে 'কেমনে' সম্ভবতঃ গানের 'আখর' মাত্র। সুতরাং ছন্দের অঙ্গ হিসাবে গণনীয় নয়।

পরিশেষ

আশা করি এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দসম্পদ, বিশেষতঃ তাব রূপবৈচিত্র্য উপেক্ষণীয় নয়। এই কাব্যেই বাংলা ছন্দের সাধুরীতি অনেকাংশে বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং তৎকালেই দ্বিপদী ('পয়ার') প্রভৃতি প্রধান প্রধান বন্ধগুলিও সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে সাহিত্যের আসরে দেখা দিয়েছিল। তাই স্বীকার করতে হবে যে, বাংলা ছন্দের ইতিহাসে এই কাব্যখানির গুরুত্ব কম নয়। অর্থাৎ শুধু ভাষাতত্ত্বের বিচারে নয়, ছন্দতত্ত্বের বিচারেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি ইতিহাসের আসরে একটি মর্যাদার আসন পাবার অধিকারী।

রচনা ১৩৭৩ বৈশাখ | পরিমার্জনা ১৩৮১ পৌষ ৭